প্রায় প্রতি সপ্তাহের ‘বেস্ট সেলার’ প্রাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র
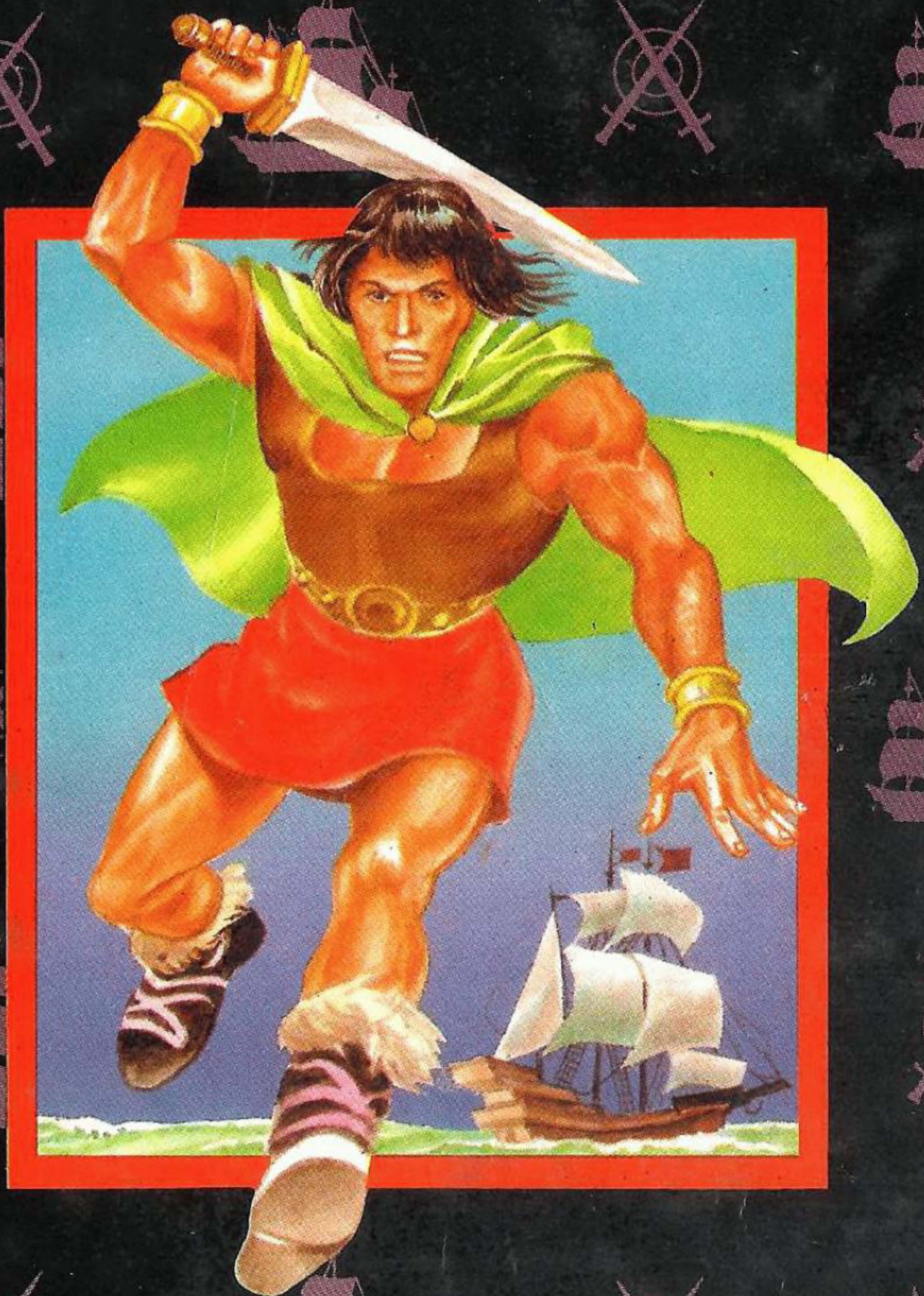
ফ্রান্সিস সমগ্র

অনিল ভৌমিক

রূপোর নদী ★ মনিমানিক্যের জাহাজ ★ বিষাক্ত উপত্যকা ★ চিকামার দেবরক্ষী

ফ্রান্সিস সমগ্র (২য়)

অনিল ভৌমিক

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

FRANCIS SAMAGRA PART 2
by Anil Bhowmick
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market
Calcutta-700 007

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০০০

পরিবেশক
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা
শরৎ চন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রন
জি. পি. ডি. বক্স

নব্বই টাকা মাত্র

ISBN-81-7334-122-2

"আজকের দিনে যে সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সবকিছুর পরেই তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথ

নেশা সাহিত্য হলেও পেশায় শিক্ষক আমি। ছাত্রদের কাছেই প্রথম বলতে শুরু করি দুঃসাহসী ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের গল্প। দেশ, কাল, মানুষ সবই ভিন্ন, তবু গভীর আগ্রহ নিয়ে ছেলেরা সেই গল্প শুনতো। তখনই মাথায় আসে-ফ্রান্সিসদের নিয়ে লিখলে কেমন হয়। "শুকতারা" পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদারকে একটা পরিচ্ছেদ লিখে পড়তে দিই। উনি সেটুকু পড়ে খুশী হন। তাঁরই উৎসাহে শেষ করি প্রথম খণ্ড "সোনার ঘণ্টা"। "শুকতারা" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় সেটা। পরবর্তী খণ্ড "হীরের পাহাড়" ও "শুকতারা"তেই প্রকাশিত হয়। পরের খণ্ডগুলো প্রকাশের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেন 'উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির'-এর কর্ণধার কিরীটিকুমার পাল। উভয়ের কাছেই আমি ঋণী।

ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের দুঃসাহসিক অভিযানের সমগ্র কাহিনী একটি বইয়ের মধ্যে পেয়ে কিশোর কিশোরীরা খুশী হবে, এই আশাতেই "ফ্রান্সিস সমগ্র"র খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

অক্টোবর : ১৯৯০

অনিল ভৌমিক

এই লেখকের কয়েকটি বই

সোনার ঘণ্টা
হীরের পাহাড়
মুক্তোর সমুদ্র
তুষারে গুপ্তধন
রূপোর নদী
মনিমানিক্যের জাহাজ
বিষাক্ত উপত্যকা
চিকামার দেবরক্ষী
চুনীপান্নার রাজমুকুট
কাউন্ট রজারের গুপ্তধন
যোদ্ধামূর্তি রহস্য
রাণীর রত্নভাণ্ডার
যীশুর কাঠের মূর্তি
মাজোরকা দ্বীপে ফ্রান্সিস
চার্লসের স্বর্ণসম্পদ
রূপোর চাবি
ভাঙা আয়নার রহস্য
সম্রাটের রাজকোষ
রত্নহার উদ্ধারে ফ্রান্সিস
রাজা ওভিড্ডোর তরবারি
চিচেন ইতজার রহস্য
স্বর্ণখনির রহস্য
পাথরের ফুলদানি
হীরক সিন্দুকের সন্ধানে
ফ্রান্সিস সমগ্র ১
ফ্রান্সিস সমগ্র ২
ফ্রান্সিস সমগ্র ৩
ফ্রান্সিস সমগ্র ৪
ফ্রান্সিস সমগ্র ৫
ফ্রান্সিস সমগ্র ৬
এছাড়াও
সোনার শেকল
সর্পদেবীর গুহা
মেরীর স্বর্ণমূর্তি
হাতিপাহাড়ের গুপ্তধন
অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র
কিশোর গল্পসম্ভার

রূপোর নদী

রাজকুমারী মারিয়ার সঙ্গে বিয়ে হলো ফ্রান্সিসের। ভাইকিং দেশের অধিবাসীরা সাত দিন ধরে আনন্দ উৎসব করল। সকলের প্রিয় ফ্রান্সিস। তার বিয়ে। কনে রাজকুমারী মারিয়া। কাজেই দেশের লোকের আনন্দ আর ধরে না।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে বিয়ের পর ফ্রান্সিস আর মারিয়া এল ফ্রান্সিসদের বাড়ি। সামনে ঘোড়সওয়ারের সারি। রূপোর ঝালর ঝুলছে ঘোড়াগুলোর মুখে-পিঠে। ঘোড়সওয়ারদের পরনে সবুজ-হলুদ পোশাক। টুপি থেকে ঝুলছে সোনালী ঝালর। ঘোড়সওয়ারদের সারির পরে একটা কালো ওক কাঠের গাড়িতে বরকনের সাজে ফ্রান্সিস আর মারিয়া। গাড়িটা খোলা গাড়ি। গাড়ির গায়ে সোনালী কাজ করা লতাপাতা। গাড়ি চলছে মন্থর গতিতে। দু'পাশের রাস্তার ধার থেকে, বাড়িগুলো থেকে লোকজন ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে ফ্রান্সিসদের গাড়িতে। ওদের দু'জনের গাড়ির পর কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গাড়ি। তার মধ্যে ফ্রান্সিসের বাবার গাড়িও আছে।

শোভাযাত্রা এসে শেষ হলো ফ্রান্সিসদের বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নেমে বরকনে পাশাপাশি হেঁটে ঢুকল বাড়িতে। এত আনন্দ হৈ-হল্লার মধ্যেও বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে ফ্রান্সিসের বুকটা হাহাকার করে উঠল। বারবার মা'র কথা মনে পড়তে লাগল। মা বেঁচে থাকলে কত খুশি হতো। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। মারিয়া পাশে-পাশে যাচ্ছিল। ও ফ্রান্সিসের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারল। মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিল, 'মা'র কথা ভেবে মন খারাপ করো না। কারণ মা তো চিরদিন থাকেন না।'

ফ্রান্সিস পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। তারপর আস্তে- আস্তে হেঁটে দু'জনে বাড়িতে ঢুকল।

ফ্রান্সিসের নতুন সংসার শুরু হলো। মারিয়া রাজকুমারী হলে কী হবে, খুব কাজের মেয়ে। কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ির দু'টো ঝিকে সঙ্গে নিয়ে খেটেখুটে ঘরদোরের চেহারাই পাল্টে ফেলল। ফ্রান্সিসের মা মারা যাবার পর ঘরদোর তেমন যত্ন করে আর কে সাজাবে-গুছোবে। মারিয়া আবার ঘরদোরের আগের চেহারা ফিরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস এতে খুব খুশি হলো।

আনন্দে কাটতে লাগল দু'জনের জীবন। আজকে প্রিয় বন্ধু হ্যারির বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কালকে আর এক বন্ধু বিস্কোর বাড়িতে। এভাবে প্রায় প্রতিদিন এ বাড়ি-ও বাড়ি নিমন্ত্রণ লেগে রইল। এর ওপর রয়েছে এখানে-ওখানে সন্ধ্যায় নাচের আসর। সবাই চায় ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে। আনন্দের স্রোতে ভেসে চলল দিনগুলো।

কোনো-কোনো দিন বিকেলে দু'জনে গাড়ি চড়ে বেরোয়। রাস্তায় ময়দানে, সমুদ্রের ধারে-ধারে ঘুরে বেড়ায়। পথে লোকজন ওদের অভিবাদন জানায়। কেউ-কেউ এগিয়ে এসে করমর্দন করে। বেশ আনন্দে কাটতে লাগল দু'জনের দিন।

বন্ধুরা ফ্রান্সিসের বাড়ি আসে। আগের মতোই আড্ডা বসে। সোনার ঘণ্টা আনা, হীরে মুক্তো আনার সেই কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা বলাবলি করে ওরা। কেউ কেউ উৎসাহে

বলে ওঠে — 'চলো ফ্রান্সিস, আবার জাহাজ নিয়ে ভাসি।'

দিন কাটে। মাঝে-মাঝে ফ্রান্সিস হাঁপিয়ে ওঠে। এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বেকার জীবন ওর ভাল লাগে না। মারিয়া পাছে মনে ব্যথা পায়, তাই ফ্রান্সিস মুখ ফুটে কিছু বলে না। কিন্তু মাঝে-মাঝে একা বেরিয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ধারে চলে আসে। বন্দরে দেশ-বিদেশ থেকে এসে নোঙর করা জাহাজগুলো দেখে। কতরকমের পতাকা উড়ছে সেসব জাহাজগুলোতে। নাবিকদের সঙ্গে গল্পটল্প করে। কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাবে, এসব কথা হয়।

একদিন এমনি একা-একা বেড়াচ্ছিল ফ্রান্সিস। রাত হয়েছে তখন। বন্দরের ধারে পরপর কয়েকটা সরাইখানা। তারই একটাতে ঢুকল ফ্রান্সিস। দোকানটায় আলো জ্বলছে, বিরাট উনুনে রুটি সেঁকা হচ্ছে। কাঠের টানা টেবিলে বেঞ্চিতে লোকজন খাচ্ছে। ফ্রান্সিসও ওদের সঙ্গে বসল। যে ছেলেগুলো খাবার দিচ্ছিল, তাদের একজনকে ডাকল। ছেলেটি কাছে এলে বলল — 'চারটে ফুলকো রুটি আর মাংস নিয়ে এসো।'

ছেলেটি চলে গেল। দোকানদার এক পেটমোটা ইহুদি। ইয়া গোঁফ মুখে। তার সামনে একটা কালো কাঠের বাক্স। দাম নিচ্ছে, ভাঙানি ফেরত দিচ্ছে। খুব ব্যস্ত সে।

ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে। বেশীর ভাগই বিদেশী নাবিক। এইরকম দু'টো নাবিকের দল খেয়েটেয়ে বেরিয়ে যেতেই সরাইখানাটায় ভিড় কমে গেল। ফ্রান্সিস খাচ্ছে। তখনই দোকানদারের হঠাৎ নজর পড়ল ফ্রান্সিসের দিকে। এ কী? ফ্রান্সিস আমার দোকানে? সে তাড়াতাড়ি বাক্সে তালা লাগিয়ে ছুটে এল ফ্রান্সিসের সামনে। হাত নেড়ে দ্রুত বলতে লাগল 'আপনি-মানে-আমার দোকানে মানে-আপনাকে-কি বলবো মানে, ফ্রান্সিস আমার দোকানে'।

'আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। নিজের কাজ করুন গে।' ফ্রান্সিস বলল।

দোকানদার তবু কিছু বলতে গেল। ফ্রান্সিস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল — 'উঁহু-কোন কথা নয়, নিজের কাজে যান।'

দোকানদার ফিরে গিয়ে কাঠের বাক্সের সামনে বসল। খদ্দেরদের কাছ থেকে দাম নিতে লাগল। ভাঙানি ফেরত দিতে লাগল। ফ্রান্সিসের খাওয়াও প্রায় হয়ে এসেছে। তখনই শুনল টেবিলের ওপাশ থেকে কে বলল — 'আপনিই ফ্রান্সিস?'

বেশ মোটা ভারী গলা লোকটার! ফ্রান্সিস তাকাল লোকটার দিকে। লোকটা মধ্যবয়সী। মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। মাথায় কাঁচাপাকা বাবরি চুল, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। পরনে নাবিকদের ঢিলে হাতাঅলা পোশাক। ফ্রান্সিস দেখল লোকটা খাওয়া বন্ধ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও 'হ্যাঁ' বলল তারপর আবার খেতে লাগল।

লোকটা বলল — 'আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি। পাদ্রীদের সোনার ঘন্টা এনেছেন, হীরে, মুক্তো এনেছেন। আপনি তো এই দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।'

ফ্রান্সিস খেতে-খেতেই হাসল। কোনো কথা বলল না। লোকটা চুপ করে থেকে বলল — 'রূপোর নদীর কথা শুনেছেন?'

ফ্রান্সিস চমকে উঠল কথাটা শুনে। খাওয়া থামিয়ে লোকটার দিকে তাকাল। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে লোকটার চোখ দু'টো কেমন রহস্যময়। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল — 'না'।

তারপর একটু থেমে বলল — 'আপনি জানেন রূপোর নদী কী? কোথায় আছে

সেটা?'

'হ্যাঁ জানি। রূপোর নদী আছে কঙ্কাল দ্বীপে।'

'আপনি দেখেছেন সেই নদী?'

লোকটা মাথা নাড়ল। বলল — 'না', তারপর তার পাশে বসা আরো দু'জন নাবিককে দেখিয়ে বলল — 'আমরা সবাই মিলে দীর্ঘ ছ'মাস ঐ দ্বীপে ছিলাম। তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু খুঁজে পাই নি।'

'কঙ্কাল দ্বীপ কোথায়?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'ডাইনির দ্বীপ চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'তার পাঁচশ মাইল পশ্চিমে।'

'দ্বীপটা কি জনহীন?'

'না। ইকাবো নামে এক জাতীয় লোক ওখানে বাস করে। তাদের গায়ের রঙ তামাটে। চোখ নীল। মাথায় লম্বা চুল। ওরা মাথার চুল বেণী পাকিয়ে রাখে। এদের রাজা আছে।'

ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে নাবিকদের কথা শুনছিল। এবার বলল — 'আচ্ছা, ইকাবোরা আপনাদের এতদিন কঙ্কাল দ্বীপে থাকতে দিয়েছিল কেন?'

লোকটা দাড়ির ফাঁকে হাসল। বলল — 'ওদের বাগে আনতে হয়েছিল কী করে জানেন? আয়না, চিরুনি, টুপি, চকচকে পুঁতির মালা এসব রাজাকে দিয়েছিলাম। রূপোর নদীর কথা ইকাবোদের মুখেই শুনেছিলাম। কিন্তু কোথায় সেই নদী, অনেক খুঁজেও আমরা তার হদিস পাই নি।'

'কিন্তু রূপোর নদী যে আছেই, এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন কী করে?'

'কঙ্কাল দ্বীপের পাহাড়ের নীচে আছে ওদের দেবমন্দির। সেই মন্দিরের থাম রূপোর তৈরী। সামনে নিরেট রূপোর থাম পোঁতা আছে। এত রূপো ওরা পেল কোথায়? একথা জিজ্ঞেস করলে রাজা বলেছিল ওদের পূর্বপুরুষরা এই রূপো পেয়েছিল রূপোর নদী থেকে।'

'আচ্ছা ঐ দ্বীপে নদী আছে?'

'হ্যাঁ, একটাই নদী। পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এসেছে। ওরা বলে কুন্‌হা নদী। ওদের ভাষায় 'কুন্‌হা' অর্থ রূপো।'

'কুন্‌হা নদীর জলের রং কেমন?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'কাল্‌চে জল।' লোকটা বলল।

নাবিকদের আর তার সঙ্গীদের তখন খাওয়া হয়ে গেছে। রাতও বাড়ছে। দোকানে ওরা ছাড়া আর কোনো খদ্দের নেই। সরাইখানার মালিক দোকান বন্ধ করে দিত। কিন্তু ফ্রান্সিসকে নাবিকদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত দেখে দোকান বন্ধ করতে বলেনি।

ফ্রান্সিসেরও খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ও উঠে দাঁড়ালো। নাবিকটির দিকে হাত বাড়াল। নাবিকও ওর হাত ধরল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল — 'আপনার নাম কি?'

'পাঞ্চো। আমার দেশ স্পেনে।'

'আমরা কঙ্কাল দ্বীপে যাবো। রূপোর নদী খুঁজে বের করবো।'

পাঞ্চো দাড়িগোঁফের ফাঁকে হাসল — 'দেখবেন চেষ্টা করে।'

তারপর ফ্রান্সিস ওদের আর নিজের রুটি মাংসের দাম দিতে গেল দোকানদারকে।

দোকানদার কিছুতেই দাম নেবে না; বারবার বলতে লাগল — 'আপনি আমার দোকানে এসেছেন। কত সৌভাগ্য আমার।'

ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা কিছুতেই দাম নেবে না।

একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি আসছিল। গাড়ি থামিয়ে ফ্রান্সিস গাড়িতে উঠে বসল। বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হলো। মারিয়া তখনও জেগে ছিল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল — 'বাইরে খেয়ে এসেছি। আর খাবো না।'

'আমি তো খাবো। খাবার টেবিলে বসবে এসো।।'

ওরা খাবার টেবিলে বসল। মারিয়া খাচ্ছে তখনই ফ্রান্সিস ওকে পাঞ্চোর কথা, কঙ্কাল দ্বীপ, ইকাবোদের কথা আর রূপোর নদীর কথা বলতে লাগল। মারিয়া খেতে-খেতে সব শুনল। তারপর বলল — 'কী ভাবছো, যাবে।'

'নিশ্চয়ই।' ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল।

'কিন্তু পাঞ্চোরা ছ'মাস খুঁজেও যার হদিস পায়নি, তোমরা তা পারবে?'

ফ্রান্সিস বলল — 'সেটা ঐ দ্বীপে না পৌঁছে বলতে পারবো না। ওখানে গিয়ে সব খবরাখবর নিয়ে তবেই বুঝবো রূপোর নদী আসলে ছিল না, সবটাই মনভোলানো গপ্পো।'

'কিন্তু — '

'মারিয়া — তুমি ভালো করেই জানো — এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বেকার জীবন আমার কাছে অসহ্য। আবার জাহাজ নিয়ে ভেসে পড়ব, সে কথা ভাবতে - ভাবতে আমি বোধহয় আজ রাতে ঘুমোতে পারবো না।'

'আমার কোনো আপত্তি নেই।' মারিয়া খেতে - খেতে বলল।

'এই তো চাই মারিয়া।' ফ্রান্সিস খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল — 'আমি জানতাম তুমি আপত্তি করবে না।'

মারিয়া হাসল। বলল — 'তোমার মন আমি বুঝি ফ্রান্সিস। তুমি ভালোবাসো দুরন্ত জীবন।'

ফ্রান্সিস বলল — 'তা ঠিক।'

'কিন্তু তোমার বাবাকে রাজী করাতে পারবে এবার?'

'দেখি বলে-কয়ে। না পারলে আবার পালাতে হবে!'

'বরং আমিই তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলবো। মনে হয় আমি বললে উনি আপত্তি করবেন না।'

পরদিনই ফ্রান্সিস সব বন্ধুদের খবর পাঠালো বিস্কোকে দিয়ে। বিস্কো সবাইকে খবর দিয়ে এল রাতে সেই পোড়ো বাড়িটায় আসতে।

একটু রাত হতেই ফ্রান্সিস তৈরী হলো সেই পোড়ো বাড়িতে যাবার জন্যে। মারিয়াও চলল ওর সঙ্গে। ওরা যখন পোড়ো বাড়িতে পৌঁছল, তখন ফ্রান্সিসের অনেক বন্ধুরাই এসে গেছে। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মারিয়াকে দেখে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসের সব বন্ধুরা এসে হাজির হলো। গল্পগুজব আনন্দ উল্লাসের শব্দে বাড়িটা গম্ গম্ করতে লাগল। একসময় ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে গলা চড়িয়ে বলল — 'ভাইসব। আমরা আবার সমুদ্রযাত্রায় বেরুবো।'

সবাই একসঙ্গে আওয়াজ তুলল — 'ও হো-হো।'

ফ্রান্সিস বলতে লাগল — 'ডাইনির দ্বীপের পশ্চিমে একটা দ্বীপ আছে। কঙ্কাল

দ্বীপ। জানি না কেন দ্বীপটার নাম 'কঙ্কাল দ্বীপ'। সেখানে ছিল রূপোর নদী। কিন্তু আজ কেউ সেটার খোঁজ জানে না। 'পাঞ্চো' নামে একজন স্পেনীয় লোক ঐ দ্বীপে ছ'মাস রূপোর নদীর সন্ধানে কাটিয়েছে। কিন্তু কোনো হদিস পায়নি। এবার আমরা যাবো সেই রূপোর নদীর সন্ধানে।' ফ্রান্সিস থামল।

একজন ভাইকিং বলল — 'রাজা কি এই অভিযানের জন্যে জাহাজ দেবেন?'

ফ্রান্সিস তার দিকে তাকিয়ে বলল — 'যদি দেন ভালো,না দিলে আবার চুরি করবো।'

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো — 'ও হো-হো।'

এবার হ্যারি এগিয়ে এল। বলল — 'কিন্তু সত্যিই কি রূপোর নদীর অস্তিত্ব আছে।'

ফ্রান্সিস বলল — ' ইকাবো নামে এক উপজাতি বাস করে ওখানে। ওদের পূর্বপুরুষরা পাহাড়ের ধারে তৈরী করেছে রূপোর থামওলা একটা মন্দির। ওদের উপাস্য দেবতার মন্দির। এত রূপো তারা পেল কোথায়? নিশ্চয়ই রূপোর নদী থেকে। রূপোর থামও আছে মন্দিরের সামনে।'

' ঐ দ্বীপে কি কোনো নদী আছে?' একজন ভাইকিং জিজ্ঞাসা করল।

ফ্রান্সিস বলল — ' ঐ দ্বীপে মাত্র একটা নদী — 'কুন্‌হা'। ইকাবোদের ভাষায় কুন্‌হা শব্দের অর্থ রূপো।'

ওদের কথাবার্তা ভাইকিংরা নিবিষ্ট মনে শুনল। ফ্রান্সিস এবার চেঁচিয়ে বলল – 'ভাইসব তোমরা কি এই অভিযানে বেরোতে রাজী?'

সবাই চিৎকার করে উঠল — ' ও-হো-হো।'

ফ্রান্সিস বলল — 'আজকের মত সভা এখানেই শেষ। আমি আর হ্যারি এর মধ্যে সব পরিকল্পনা করবো। কারা যাবে, তার তালিকা তৈরী করবো। তারপর আর একটি সভা ডাকা হবে এবং শেষ সিদ্ধান্ত জানানো হবে।'

সভা ভেঙে গেল। ভাইকিং বন্ধুরা একে-একে চলে গেল। ফ্রান্সিস আর মারিয়াও ফিরে চলল।

* * *

কয়েকদিন পরে এক রাতে ফ্রান্সিস আর ওর বাবা খেতে বসেছে। মারিয়া পরিবেশন করছে। রাঁধুনি রয়েছে। তারই পরিবেশন করার কথা। কিন্তু এ কাজটা মারিয়া নিজেই করে। দু'বেলা ফ্রান্সিস আর মন্ত্রীমশাই খেতে বসলে মারিয়াই খাবার পরিবেশন করে। খেতে-খেতে ফ্রান্সিস ডাকল — 'বাবা।'

মন্ত্রীমশাই মুখে শব্দ করলেন — ' হুঁ।'

ফ্রান্সিস বলল — 'যদি অভয় দাও,তাহলে একটা কথা বলি।'

'বলো।'

'আমি সমুদ্রযাত্রায় বেরোতে চাই।'

'আবার?' বাবা কড়া চোখে ওর দিকে তাকালেন।

'কঙ্কাল দ্বীপে আছে রূপোর নদী। আমি তারই সন্ধানে বেরোতে চাই।'

বাবা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন — 'মাকে তো অনেক কষ্ট দিয়েছ। এবার মারিয়াকেও দুশ্চিন্তা কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাও?'

'মারিয়ার কোনো আপত্তি নেই।' ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের বাবা মারিয়ার দিকে তাকালেন। মারিয়া মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল — 'বাবা, ও গেলে আমার কোনো দুশ্চিন্তা বা কষ্ট হবে না।'

'ঠিক আছে। মারিয়া, তুমি যদি সব মেনে নিতে পারো তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

খুশিতে ফ্রান্সিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এত সহজে বাবার সম্মতি পাওয়া যাবে, তা ও ভাবতে পারেনি। ও মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। মারিয়াও হাসল। ফ্রান্সিস একটু তাড়াতাড়ি খেতে লাগল; খেয়েই ছুটতে হবে হ্যারিদের বাড়ির দিকে। সব বলতে হবে ওকে। বাবা গলা খাঁকারি দিলেন— 'আস্তে খাও।'

রাজামশাইও শুনলেন কথাটা। মারিয়াও বাবাকে সব বুঝিয়ে বলল। রানীও শুনলেন। দুজ'নেই আপত্তি তুললেন। বিয়ে-টিয়ে করে ফ্রান্সিস এখন সংসার পেতেছে। এখন আর ওসব পাগলামি কেন? মারিয়া বলল — 'মা, তোমরা অপত্তি করো না।'

'পাগল হয়েছিস। কোথায় কঙ্কাল দ্বীপ, কোথায় রূপোর নদী, কী পরিবেশ, ওখানে কোন অসভ্য জাতির বাস — কোন সাংঘাতিক বিপদ কখন ঘটে তার কিছু ঠিক আছে?' রাজা বললেন।

'কিন্তু আগে তো তুমিই ফ্রান্সিসকে উৎসাহ দিতে।'

'তখনকার কথা আলাদা। এখন ওর জীবনের সঙ্গে তুইও তো জড়িয়ে গেছিস। এখন আর ও একা নয়।'

'ওকে এমনি যেতে না দিলে ও জাহাজ চুরি করে পালাবে।'

'ঠিক আছে—আমরা কথা বলবো ওর সঙ্গে। রাত্রে তোদের নিমন্ত্রণ রইলো। তোর হাতেই একটা চিঠি দিচ্ছি ফ্রান্সিসকে। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।'

মারিয়া রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসে ফ্রান্সিসকে সব বলল। রাজার চিঠি দিল। ফ্রান্সিস বলল—'বেশ চলো।'

রাত্রে ফ্রান্সিস আর মারিয়া এল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। অনেক ক'টা সুসজ্জিত ঘর পেরিয়ে ওরা অন্দর মহলে ঢুকল। রাতের খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। একটা লম্বাটে ঘরে। ঝাড়লণ্ঠনের নীচে ঝকঝকে টেবিল ও কাঠের সবুজ গদিমোড়া চেয়ার, বাসনপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুস্বাদু খাবার থরে-থরে সাজানো।

রাজা-রানী ফ্রান্সিসদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। ওরা আসতেই রাজা বললেন— 'বসে পড় তোমরা। খেতে-খেতেই কথা হবে।' পরিচারকরা খাবার-দাবার এগিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস ও মারিয়া চেয়ারে বসল। খাওয়া শুরু করেছে, তখনই রানী হেসে ডাকলেন—'ফ্রান্সিস!'

'বলুন।' ফ্রান্সিস রানীর দিকে তাকাল।

'তুমি নাকি আবার সমুদ্রযাত্রায় যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবে?'

'কঙ্কাল দ্বীপে—রূপোর নদীর খোঁজে।'

রাজা একটু কেশে বললেন—'ফ্রান্সিস—এখন তুমি সংসারী হয়েছো। সোনার ঘন্টা থেকে শুরু করে অনেক কিছু এনেছো। তোমার বীরত্ব নিয়ে চারণ কবিরা গান বেঁধেছে।

সারা রাজ্যে সেই গান গেয়ে বেড়ায়। আর কেন। এবার সংসারে মন দাও।'

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল—'আমার এই অভিযানে বাবার মত আছে, মারিয়ারও কোনো আপত্তি নেই। শুধু আপনারাই আপত্তি করছেন।'

'তুমি রাগ করলে ফ্রান্সিস?' রানী জিজ্ঞেস করলেন।

'না। তবে আপনারা আমাকে নিরুৎসাহ করবেন, এটা কখনো ভাবিনি।'

রাজা বললেন—'মারিয়া ছেলেমানুষ—ও কী বোঝে। তোমার বাবাও সম্মতি দিয়েছেন মারিয়া রাজী হয়েছে বলেই। যাক গে—এ খেয়াল ছাড়ো।'

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। মাথা গুঁজে খেতে লাগল। বুঝল রাজা-রাণী কিছুতেই সম্মতি দেবেন না। অগত্যা সেই পুরনো রাস্তাই ধরতে হবে। জাহাজ চুরি করতে হবে। ফ্রান্সিসের অভিযান নিয়ে আর কোনো কথা হলো না। রাজা-রানী অন্য বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ করে রাজা-রানীর থেকে বিদায় নিয়ে দু'জনে বাড়ি ফিরে এল।

পালকের বিছানায় অনেক রাত অবধি জেগে রইল ফ্রান্সিস। নানা চিন্তা মাথায়। তারপর বিছানা থেকে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও একটু অবাক হলো, ফ্রান্সিসকে পায়চারি করতে দেখে। বলল 'তুমি ঘুমুবে না?'

'হ্যাঁ। তারপর এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মারিয়া বলল—'কী ঠিক করলে?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'সব ছক ভাবা হয়ে গেছে। আমি যাবোই।'

'ঠিক আছে। এখন ঘুমোও'। মারিয়া বলল।

পরদিন ফ্রান্সিস বিস্কোর কাছে গেল। ওকে দিয়ে সবাইকে খবর পাঠাল—রাত্রে সেই পোড়ো বাড়িটায় সভা হবে। সবাই যেন আসে।

রাত্রে ফ্রান্সিস পোড়ো বাড়িটায় যখন এল, তখন প্রায় সবাই এসেছে। আজকে মারিয়া এল না। ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল—'ভাইসব, এইবারের সমুদ্রযাত্রায় আমরা আবার অসুবিধেয় পড়েছি। রাজামশাই-এর মত নেই। তাই উনি জাহাজ দেবেন না। এখন একটাই পথ খোলা জাহাজ চুরি।'

সবাই চেঁচিয়ে উঠল-'ও-হো-হো।'

ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'কাল রাত্রে আমরা যাত্রা শুরু করবো। যারা-যারা যাবে, তাদের নাম পড়ছি।'

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে হাত বাড়াল। হ্যারি তালিকার কাগজটা ওকে দিল। ফ্রান্সিস সব নাম পড়ে গেল। মোট তিরিশ জন। যাদের নাম নেই, তারা গুঞ্জন তুলল। ফ্রান্সিস বলল—'ভাইসব—যাদের নাম বাদ গেল তারা দুঃখ করো না। অন্য কোনো অভিযানে তাদের পরে নেওয়া হবে।'

একটু থামল ফ্রান্সিস। পরে বলতে লাগল—'এবার যারা যাবে তাদের বলছি, কাল রাত্রে অস্ত্রশস্ত্র পোশাক নিয়ে জাহাজঘাটায় উপস্থিত থাকবে নিশানঘরের কাছে। জাহাজ চুরির সেই আগের পদ্ধতি আমরা নেব।'

থামল ফ্রান্সিস। তারপর আবার বলতে লাগল—'ভাইসব জেনে রেখো—অনিশ্চিতের পথেই আমাদের যাত্রা। আদৌ 'কঙ্কাল দ্বীপ' বলে কোনো দ্বীপ আছে কিনা জানি না। থাকলেও সেখানে রূপোর নদী ছিল কি ছিল না তাও জানি না। শুধু জানি ডাইনি

দ্বীপের পশ্চিমে এই কঙ্কাল দ্বীপ আছে। কত দিন যাবে এই দ্বীপ খুঁজে বের করতে জানি না। কাজেই আমাদের ধৈর্য ধরে খুঁজতে হবে। ততদিন আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। হয়তো খাদ্য ফুরিয়ে যাবে, হয়তো খাবার জলও ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। তোমাদের কোনো ওজর আপত্তি শোনা হবে না। আমার আর হ্যারির কথাই হবে শেষ কথা। সেই কথা শুনেই তোমাদের চলতে হবে।'

ফ্রান্সিস থামলো। বন্ধুরা সব একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো।'

সভা শেষ হলো। সবাই চলে গেল। সবশেষে বেরিয়ে এল ফ্রান্সিস আর হ্যারি। পথে আসতে-আসতে হ্যারি বলল—'রূপোর নদীর গল্পটা ছেলেভুলোনো গপ্পো কিনা কে জানে।'

ফ্রান্সিস বলল—'যদি কঙ্কাল দ্বীপের খোঁজ পাই, তাহ'লে বুঝবো রূপোর নদী আছে, মানে ছিল'।

'আমরও তাই মনে হয়।' হ্যারি বলল।

বাড়ি ফিরে খেতে বসে ফ্রান্সিস ওদের পরিকল্পনার কথা মারিয়াকে বলল। মারিয়া বলল—'বাবা রাগ করবে না তো?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'যখন তাল-তাল রূপো নিয়ে ফিরবো, তখন তোমার বাবা খুশিই হবেন।'

'ঠিক আছে—তোমরা নির্বিঘ্নে ফিরে এসো এখন আমার একমাত্র কামনা' মারিয়া বলল।

পরদিন সারা সকাল বিকেল ফ্রান্সিস আর বাড়ি থেকে বেরোল না। চুপচাপ শুয়ে-বসে সময় কাটাল।

সন্ধ্যে হতেই খেয়ে নিল। পোশাক-তলোয়ার সব গুছিয়ে তৈরী হলো। বাবাকে কিছু বলল না। বাবা আর রাজামশাই-এর অজান্তেই জাহাজ চুরি করতে হবে।

একটু রাত হতেই ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিল। মারিয়ার দু'চোখ ছল-ছল করে উঠল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'অত ভীতু হলে চলবে না।'

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ফ্রান্সিস একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল। টক্ টক্ টকাস্-গাড়ি চলল পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে। গাড়ি কিছুটা চলতে ফ্রান্সিস জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পেছনের দিকে তাকাল। দেখল, দেউড়ির আলোর নীচে মারিয়া তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস একটু উন্মনা হয়ে পড়ল। কিছু পরক্ষণেই দুর্বল হয়ে পড়া মনকে শক্ত করল। এসব কি ভাবছে সে? মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ও গলা চড়িয়ে বলল...'ভাই, একটু তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাও।'

গাড়ি চলার বেগ বাড়ল। গাড়ি বন্দরের জেটির কাছে এসে থামল। ফ্রান্সিস গাড়ি থেকে নেমে এল। ভাড়া চুকিয়ে দ্রুত পায়ে নিশানঘরের সামনে এল। দেখল,—প্রায় সবাই এসে গেছে। একটু অপেক্ষা করতেই বাকিরা এসে পড়ল।

ফ্রান্সিস সবাইকে অপেক্ষা করতে বলল। তারপর নিজে নিশান ঘরের আড়াল থেকে জেটিতে এল। কিছুক্ষণ এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াল। অন্ধকারে জাহাজগুলো ভাসছে কোনো জাহাজে আলো আছে, কোনো জাহাজে নেই। একটা জিনিয লক্ষ্য করল যে আজকে অনেক পাহারাদার সৈন্য জাহাজঘাটা পাহারা দিচ্ছে, সাধারণত এত পাহারাদার সেনা জাহাজঘাটায় থাকে না। ফ্রান্সিস বুঝল—পাহারা এত কড়াকড়ি করা হয়েছে রাজার আদেশে।

রাজা জানেন যে ফ্রান্সিস যদি জাহাজ চুরি করে পালাবে এটা স্থির করে থাকে তবে সেটা করবেই। কাজেই রাজা সাবধান হয়েছেন।

ফ্রান্সিস একটু চিন্তায় পড়ল। পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই না করে, রক্তপাত না ঘটিয়ে কী করে জাহাজ চুরি করা যায়। নিশানঘরের আড়ালে ও যখন এল তখন বন্ধুরা ওকে ঘিরে ধরল। জিজ্ঞেস করতে লাগল এখন কী করবে ওরা। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে বলল—'রাজা টের পেয়েছেন যে আমরা জাহাজ চুরি করবো। তাই বন্দরের পাহারায় অনেক সৈন্য মোতায়েন করেছেন।'

তারপর হ্যারিকে বলল—'হ্যারি—একটা কিছু উপায় বার করো। কোনো খুনখারাপির মধ্যে আমরা যাবো না।

হ্যারি হেসে বলল—'তোমার বুদ্ধি আমার চেয়ে কিছু কম নয় । তুমিই একটা উপায় বার কর।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল—'না—মাথাটা কেমন হালকা লাগছে। কিছু ভাবতেই পারছি না।

বিস্কো এগিয়ে এল। বলল—'খড়, কেরোসিন বাক্সে আগুন লাগিয়ে দিই। এর আগে তো এভাবেই পালিয়েছি'।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'রাজামশাই অত বোকা ভেবো না। সারা জাহাজঘাটা সাফ্। খড়, কেরোসিন, কাঠের বাক্স কিছ্ছু নেই।'

কথাটা শুনে সকলেই বেশ চিন্তায় পড়ল। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। ওদিকে রাতও বাড়ছে। অনেকেই নিশানঘরের সিঁড়িতে বসে পড়ল।

হঠাৎ হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—সৈন্যরা আমাকে চিনে ফেলবে। তাই বিস্কোকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। বিস্কো সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবে কোন জাহাজটায় আটা, ময়দা, চিনি এসব খাবার ভালো মজুত আছে, জল আছে। সেই অনুযায়ী আমরা একটা জাহাজ বেছে নেব। তারপর জাহাজ নিয়ে পালাবার উপায় ভাববো।'

হ্যারি আর বিস্কো চলে গেল। জাহাজঘাটায় এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। জলে কাঁপছে সেই আলো। একটা পাথুরে দেওয়ালের পেছনে হ্যারি দাঁড়াল। বিস্কো গেল সৈন্যদের সঙ্গে গল্প জমাতে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বিস্কো ফিরে এল। বলল—'সব খবর পেয়েছি।প্রথম তিনটে জাহাজের পরে চার নম্বর জাহাজটায় সব খাবার-দাবার জল রাখা আছে, ওটা কাল সকালে লিসবনের দিকে রওনা হবে। জাহাজটা নতুন, খুব মজবুত।'

কোন্ জাহাজটা নিয়ে পালাতে হবে সেটা ঠিক হলো। কিন্তু পালাবার উপায়? হ্যারি জাহাজঘাটার জ্বলন্ত মশালগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। জাহাজগুলোও দেখতে লাগল। তখনই দেখল দু'নম্বর জাহাজটা থেকে শীল মাছের তেলের পিপে খালাস করা হচ্ছে। জাহাজটার ডেকে অনেকগুলো তেলের পিপে সাজিয়ে রাখা। জাহাজ থেকে ঘাট পর্যন্ত একটা কাঠের পাটাতন পাতা। জাহাজের খালাসীরা পিপেগুলো পাটাতনের ওপর দিয়ে ঘাটে এনে জড়ো করছে। হ্যারি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ একটা চিন্তা ওর মাথায় খেলে গেল। পিপেগুলোতে আগুন লাগালে কেমন হয়? খুব সহজেই তেলের পিপেগুলোতে আগুন ধরে যাবে। হ্যারি দ্রুত বলে উঠল—' বিস্কো—চলো'।

ওরা দু'জনে নিশানঘরের নিচে এল। বন্ধুরা বসে ছিল, তারা উঠে এল। হ্যারি

চাপাস্বরে ডাকল 'শাঙ্কো—শাঙ্কো কোথায়।'

শাঙ্কো এগিয়ে এল—'তীর ধনুক এনেছো তো?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

শাঙ্কো মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলল—'নিশ্চয়ই'।

'তাহলে এক কাজ কর। অন্ধকারে কোনো জাহাজ থেকে তেলেভেজা মশালের পলতে নিয়ে এসো। শীগ্‌গির।'

শাঙ্কো খুব দক্ষ তীরন্দাজ, অনেক প্রতিযোগিতায় ও তীর ছোঁড়ায় প্রথম হয়েছে। শাঙ্কো তীর-ধনুকটা বিস্কোকে দিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সবাই অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই শাঙ্কো ফিরে এল। হাতে মশালের তেলেভেজা পলতে। হ্যারি বিস্কোর হাত থেকে একটা তীর নিল। তেলে ভেজা পলতেটা তীরটায় জড়াল। শাঙ্কোর হাতে তীরটা দিয়ে বলল...মশালের আগুন থেকে তীরটায় আগুন জ্বালাও। তারপর অন্ধকার জাহাজঘাটায় গিয়ে দাঁড়াও। দেখবে দু'নম্বর জাহাজটা থেকে তেলের পিপে নামানো হচ্ছে। একটা পিপেয় জ্বলন্ত তীর ছোঁড়ো। শীল মাছের তেল খুব দাহ্য পদার্থ। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের পিপেটায় আগুন লেগে যাবে। সেই আগুন ছড়াতেও সময় নেবে না। শীগ্‌গির যাও।

শাঙ্কো জ্বলন্ত তীর-ধনুক নিয়ে চলে গেল। একটু এগোতেই দেখল—দু'নম্বর জাহাজের পিপে খালাস হচ্ছে। ও হাতের কাছের মশালটা থেকে তীরটায় আগুন লাগাল। দেখল খালাসীরা পাটতনের ওপর দিয়ে একটা তেলের পিপে গড়িয়ে নিয়ে আসছে। সেই পিপেটা লক্ষ্য করে ও জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ল। তীরটা গিয়ে কাঠের পিপেটায় বিঁধে গেল। মুহূর্তের মধ্যে পিপেটায় আগুন লেগে গেল। যে দু'জন খালাসী ওটা গড়িয়ে নিয়ে আসছিল, তারা জ্বলন্ত পিপেটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল। জ্বলন্ত পিপেটা গড়াতে-গড়াতে পাটাতন থেকে সরে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। নিভে গেল আগুন। শাঙ্কো নিজের কপালে চাপড় দিয়ে...'ইস্ ফস্কে গেল।'

শাঙ্কো হ্যারির কাছে ফিরে এল। আর একটা পলতে নিল। তীরে জড়াল। আবার মশালের আলো থেকে তীরটায় আগুন জ্বালল। ততক্ষণে খালাসিরা আবার পিপেগুলো পাটাতনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে তুলতে শুরু করেছিল। লক্ষ্য স্থির করে শাঙ্কো জ্বলন্ত তীরটা ছুঁড়ল। পিপেটায় জ্বলন্ত তীর ঢুকে গেল। পিপেটায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। খালাসি দু'জন পিপে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। জ্বলন্ত পিপেটা ঢালু পাটাতন দিয়ে গড়াতে-গড়াতে জাহাজের ডেক-এর দিকে চলল। ডেক-এর সাজিয়ে রাখা পিপেগুলোয় গিয়ে পড়ল জ্বলন্ত পিপেটা। মুহূর্তের মধ্যে আর একটা পিপেতে আগুন ধরে গেল। দেখতে-দেখতে আরো ক'টা পিপেয়। প্রচণ্ড শব্দে প্রথম পিপেটা ফাটল এবার। চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই ফাটল আর একটা পিপে। চোখের পলকে জাহাজটার ডেকে আগুন লেগে গেল। আগুনের ফুলকি ছিটকোতে লাগল অনেক দূর পর্যন্ত।

সৈন্যরা প্রথমে হকচকিয়ে গেল। ওরা বুঝতেই পারল না জাহাজে আগুন লাগল কী করে। তারপরেই ওরা সবাই জ্বলন্ত জাহাজটার সামনে এসে হৈচৈ শুরু করল। কিন্তু পিপেগুলো যে প্রচণ্ড শব্দে ফাটছে, তাই ওরা কাছে যেতে সাহস পেল না। দূর থেকে বালতি করে জল ছুঁড়ে দিতে লাগল। কিন্তু আগুন তাতে নিভল না। আগুন আরো ছড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে হ্যারি চাপাস্বরে বলে উঠল—'সব ছোটো—চার নম্বর জাহাজটায় গিয়ে

উঠবে। কোনো শব্দ করবে না।'

ততক্ষণে শাঙ্কোও এসেছে। সবাই দ্রুত পায়ে ছুটল চার নম্বর জাহাজটার দিকে। দ্রুতহাতে পাটাতন পেতে সব নিঃশব্দে জাহাজটায় উঠে পড়ল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল সবাইকে—'নোঙর তোল—নিঃশব্দে। দাঁড়ঘরে চলে যাও কিছু। কোনো শব্দ না করে দাঁড় বাইতে থাকো।'

ফ্রান্সিসের কথামতো সবাই কাজে লেগে পড়ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নোঙর তোলা হলো—দাঁড় বাওয়া শুরু হলো। জাহাজটা আস্তে আস্তে ভেসে চলল গভীর সমুদ্রের দিকে।

ওদিকে সৈন্যরা জাহাজের আগুন নেভাতে ব্যস্ত। কিন্তু একটু পরেই বুঝল যে আগুন নেভানো অসম্ভব। আগুন তখন সমস্ত জাহাজটায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে-মাঝে প্রচণ্ড শব্দে পিপেও ফাটছে। কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না কারো।

এদিকে আগুন আর হৈ-চৈয়ের মধ্যে সৈন্যরা দেখল, একটা জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। সৈন্যরা ভেবে উঠতে পারল না কী করবে ওরা। জাহাজটা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। সৈন্যরা হাল ছেড়ে দিল। ঐ জাহাজ আর ফেরানো সম্ভব নয়। এদিকে অন্য জাহাজগুলোতেও যাতে আগুন না লেগে যায়, তার জন্যে ওরা জ্বলন্ত জাহাজটার নোঙর তুলল। জ্বলন্ত জাহাজটা ঠেলে দিল গভীর সমুদ্রের দিকে। অন্য জাহাজগুলোতে আর আগুন লাগল না। জ্বলন্ত জাহাজটা ভেসে চলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটা বন্দর থেকে অনেকদূরে এসে পড়েছে তখন। ভাইকিংরা খুশীতে চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো-।' দাঁড়ীদের ঘর থেকে দাঁড়ীরাও চীৎকার করে উঠল 'ও-হো-হো-।' ঘড়্ঘড়্ শব্দে পালগুলো তোলা হলো। সব পাল হাওয়ার তোড়ে ফুলে উঠল। একটা পাক খেয়ে জাহাজটা যেন জল কেটে উড়ে চলল। জাহাজ চলল দক্ষিণমুখো।

জাহাজ চলেছে। ওপরে নির্মেঘ আকাশ। নীচে শান্ত সমুদ্র বাতাসও বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে বাতাসে। বেশ জোরেই চলল জাহাজ। ভাইকিংদের আর দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। শুধু জাহাজের ডেক মোছা, পালের দড়িদড়া ঠিক রাখা আর রান্নাবান্না এ ছাড়া কোনো কাজ নেই।

রাত হলে ওরা ডেক-এ জড় হয়। ছক্কা-পাঞ্জা খেলে। নাচে, গান গায়। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও নাচগানের আসরে বসে কখনো। নাচগানের আসর ভেঙে যায় আর একটু রাত হলেই। ফ্রান্সিস তখন ডেক-এ একা-একা পায়চারি করে বেড়ায়। হ্যারিও কোনো দিন ওর সঙ্গে থাকে। দু'জনে কথাবার্তা হয়—রাত বাড়ে। দু'জনে কেবিন ঘরে ফিরে আসে। শুয়ে পড়ে।

এর মধ্যে একদিন বিকেলে অন্ধকার করে মেঘ জমল। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। বিদ্যুতের জ্বলন্ত রেখা আঁকাবাঁকা জলের মতো কালো আকাশটায় ফুটে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে বজ্রপাতেরপ্রচণ্ড গভীর শব্দ।

দেখতে-দেখতে প্রচণ্ড গতি নিয়ে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজটার ওপর। ভাইকিংরা অভিজ্ঞ নাবিক। ওরা আগেই দড়িদড়া কেটে পাল নামিয়ে ফেলেছিল। এবার জাহাজের হুইলের সামনে দাঁড়াল কয়েকজন। বাকীরা দাঁড়ীঘর থেকে উঠে এল ডেক-এ। তৈরী হলো ঝড়ের মোকাবিলা করবার জন্যে।

শুরু হলো ঝড়ের তাণ্ডব। বিরাট-বিরাট ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল জাহাজের ডেক-এ। জাহাজ একবার ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে। আবার আছাড় খেয়ে নেমে আসছে ঢেউয়ের ফাটলের মধ্যে। আবার উঠছে। আবার পড়ছে। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনিতে কেউ স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ডেক-এর ওপর এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়ছে। ওরই মধ্যে ভাইকিংরা হুইল ঘুরিয়ে চলল। দড়িদড়া আঁকড়ে ধরে টাল সামলাতে লাগল। জলে ভিজে সবাই যেন স্নান করে উঠল।

প্রচণ্ড ঝড় চলল প্রায় আধঘন্টা। হঠাৎ ঝড়ের দাপট কমে গেল। বাতাসের বেগ কমে এল। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে গেল। বাতাসের বেগ স্বাভাবিক হলো। মেঘ উড়ে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। তারা ফুটল আকাশে। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত ভাইকিংরা যে যেখানে পারল কেউ বসে পড়ল, কেউ শুয়ে পড়ল।

ঠিক করেছিল প্রথমে ডাইনীর দ্বীপে যাবে। দ্বীপে নামবে না। ঐ দ্বীপ থেকে দিক নির্ণয় করে পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে জাহাজ চালাবে। তবেই পৌঁছুতে পারবে কঙ্কাল দ্বীপে। পাঞ্চো সে রকমই বলেছিল।

জাহাজ চলছে। এর মধ্যে আর ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয়নি। বেশ দ্রুতই চলছে জাহাজ। অনেকদিন হয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে একটু গুঞ্জন শুরু হলো। এখনও ডাইনীর দ্বীপে পৌঁছোতে পারলাম না। সেখান থেকে আবার কঙ্কাল দ্বীপ। তার দূরত্ব কত কে জানে? হ্যারি শুনল এসব কথা। কিন্তু ফ্রান্সিসকে কিছু বলল না।

একদিন ভোর-ভোর সময়ে দূর থেকে দেখা গেল ডাইনীর দ্বীপ। স্পষ্ট দেখা গেল না। কারণ একটা কুয়াশার আস্তরণ দ্বীপটাকে ঘিরে ছিল। মাস্তুলের ওপর যে নজরদারি করছিল সেই প্রথম দেখল ডাইনী দ্বীপ। ও চীৎকার করে বলে উঠল—'ফ্রান্সিস, ডাইনীর দ্বীপ।'

ওর চীৎকার চেঁচামেচিতে অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম খুব পাতলা। ও প্রথম ডাকেই উঠে পড়ল। ডেক-এর ওপর উঠে এল। ভোরের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সবাই ডাইনীর দ্বীপ দেখল।

একটু বেলা হতেই কুয়াশার আবরণ সরে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল ডাইনীর দ্বীপ। সবুজ পাহাড়, সবুজ গাছগাছালি।

ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে দ্বীপটা দেখল। তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—'জাহাজের মুখ পশ্চিমদিকে ঘোরাও। সোজা পশ্চিম দিকে যেতে হবে আমাদের। তাহলেই কঙ্কাল দ্বীপে পৌঁছবো আমরা।'

জাহাজের মুখ ঘোরান হলো পশ্চিমদিকে। জাহাজ চলল জল কেটে। লক্ষ্য কঙ্কাল দ্বীপ।

জাহাজ চলল। কয়েকদিন পরে এক রাতে ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে। হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল 'হ্যারি এই জাহাজে কাঠ কত আছে'?

'কাঠের তক্তাগুলো গুণে দেখি নি। তবে কাঠের স্তূপটা ছোট নয়।'

'তুমি কালকেই ভাল করে দেখ—কেমন কাঠ আছে।'

'কী করবে কাঠ দিয়ে?'

'সেই কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরী করতে হবে। যে ক'টা নৌকা হয় বানাতে হবে। কঙ্কাল দ্বীপে যেতে লাগবে। জাহাজ থেকে সরাসরি দ্বীপে নামা যাবে না।'

'বেশ—ফার্নান্দো ওস্তাদ কাঠের মিস্ত্রী। ওকেই বলবে কয়েকজনকে নিয়ে কাজ শুরু করতে।'

ফার্নান্দোকে বলতে ও পরদিনই নৌকা তৈরীর কাজে হাত লাগাল।

* * *

জাহাজ চলেছে। এর মধ্যে দু'বার ঝড়ের মুখে পড়েছিল জাহাজটা। তবে ঝড় তেমন প্রচণ্ড ছিল না। দু'তিনটে পাল ফেঁসে গিয়েছিল শুধু। সেগুলো মেরামত করে জাহাজ পূর্ণ গতিতেই চলল।

মাঝখানে দিন চারেক হাওয়া পড়ে গিয়েছিল। পালে কাজ হয়নি। ক্রমাগত দাঁড় বাইতে হয়েছিল ভাইকিংদের।

দিন কুড়ি কেটে গেল। কিন্তু কঙ্কাল দ্বীপের দেখা নেই। এবার বেশ জোরে গুঞ্জন উঠল ভাইকিংদের মধ্যে। হ্যারীর কানে গেল সে কথা। ও বুঝল এই অসন্তোষকে বাড়তে দিলে যে কোনো মুহূর্তে ভাইকিংরা ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। ও ফ্রান্সিসকে বলল সব কথা। ফ্রান্সিস সেইদিন সন্ধ্যেবেলাই ডেক-এ সভা ডাকল।

সন্ধ্যে হতেই ভাইকিংরা ডেক-এ এসে জড়ো হলো। একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে কেবিন ঘর থেকে ডেক-এ উঠে এল। সব ভাইকিং বন্ধুদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'ভাইসব—এই অভিযানে বেরোবার আগেই আমি বলেছিলাম আমাদের পথ ভুল হতে পারে, খাদ্যজল ফুরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। সোনার ঘন্টা আনতে গিয়েও এরকম সমস্যায় আমাদের পড়তে হয়েছিল। সেদিন বন্ধুরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বলেই বলছি কেউ যদি হতাশ হয়ে পড়ো তাহ'লে বলো, সামনে কোনো বন্দর পেলে তাকে নামিয়ে দেবো। সে অন্য জাহাজ ধরে দেশে ফিরে যাবে।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'বলো তোমরা কে-কে ফিরে যেতে চাও।'

ভাইকিংরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর—'তাহলে সবাই হাত লাগাও। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে যাও। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালাও। কঙ্কাল দ্বীপে আমাদের যেতেই হবে।'

ভাইকিংরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো—।' তারপর যে যার কাজে লেগে পড়ল। জাহাজের গতি বাড়ল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

আরো দু'দিন কাটল। বাতাসের বেগ বাড়ল। পাল ফুলে উঠল। দাঁড় বাওয়াও চলল। জাহাজ চলল দ্রুত গতিতে। ভাইকিংরা আবার আগের মতো প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা ফ্রান্সিসকে মনে - প্রাণে বিশ্বাস করে।

* * *

পরের দিন। সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়েছে। তখনও অস্ত যায়নি। মাস্তুলের মাথায় পালা করে ওরা থাকে।

চারদিক নজর রাখে। সেই বিকেলে মাস্তুলের নজরদার চিৎকার করে উঠল—'ডাঙা দেখা যাচ্ছে—ডাঙা।' ফ্রান্সিসকে খবর দেওয়া হলো। ও দ্রুতপায়ে ডেক-এ উঠে এল। হ্যারিও এল।

ফ্রান্সিস নজরদারকে চীৎকার করে বলল—'কী দেখছো?'

'মনে হচ্ছে একটা দ্বীপ। একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে।' নজরদার বলল।

'জাহাজ ঠিক ঐ দ্বীপের দিকে যাচ্ছে?' ফ্রান্সিস বলল।

'না। আমাদের একটু উত্তরের দিকে সরে যেতে হবে।'

ফ্রান্সিস জাহাজ চালকের কাছে এল। বলল—'একটু উত্তর দিক ঘেঁষে চালাও।'

জাহাজ একটু উত্তরমুখো হলো।

একটু পরেই অস্তগামী সূর্যের আলোয় দ্বীপটা দেখা গেল। লাল আকাশের নীচে কালো পাহাড়ের মাথাটা দেখা গেল। মানুষের মাথার খুলির মতো। জাহাজ থেকে সবাই দেখছিল পাহাড়টা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি এটাই কি কঙ্কাল দ্বীপ?'

'আমার বিশ্বাস এটাই কঙ্কাল দ্বীপ, দেখছো না পাহাড়টা দেখতে করোটির মতো।'

'হ্যাঁ—মানুষের মাথার খুলির মতো।' ফ্রান্সিস বলল। একটু পরেই পশ্চিমের লাল আলো আকাশ থেকে মুছে গেল। অন্ধকার নেমে এল।

ফ্রান্সিস জাহাজের চালককে বলল—'জাহাজ থামাও।'

তারপর সবাইকে বলল—'পাল নামাও। দাঁড় বাওয়া বন্ধ কর। কাল দিনের বেলা দ্বীপের দিকে যাবো আমরা।'

একটু পরেই জাহাজ থেমে গেল।

পুব আকাশের আধভাঙা চাঁদটা আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হলো। মেটে জ্যোৎস্না ছড়াল সমুদ্রের ওপর। আবছা দেখা গেল দূরের কঙ্কাল দ্বীপ।

পরদিন সকালে কারো কোনো কাজ নেই। সকালের খাবার খেয়ে সকলেই ডেকে-এসে জড়ো হলো। দেখতে লাগল কঙ্কাল দ্বীপ। পাহাড়ের চুড়োটা ন্যাড়া। কিন্তু পাহাড়ের নীচ থেকে শুরু করে চারদিকে প্রচুর গাছপালা। তীরের কাছে জঙ্গল অত ঘন নয়। অতদূর থেকে মানুষ জন্তু বা পাখি দেখা গেল না। হঠাৎ একজনের নজর পড়ল—গভীর সমুদ্রের দিকে দূরে একটা ভেলামত কী যেন ঢেউয়ের মাথায় উঠছে পড়ছে। সে সঙ্গীদের ডাকল—'দ্যাখ্ তো ওটা কী?' প্রায় সকলেরই দৃষ্টি পড়ল ওদিকে। কিন্তু অতদূর থেকে ওরা বুঝতে পারল না জিনিসটা কি?

দেখতে লাগল কঙ্কাল দ্বীপ

দু'জন ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে খবর দিল। ফ্রান্সিস ডেকে-এ উঠে এল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ভেলাটার দিকে। তারপর ফিরে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এক কাজ কর—জাহাজ চালু কর। ঐদিকে জাহাজ নিয়ে চল।'

কথামত সবাই কাজে লেগে পড়ল। জাহাজটা একবার নড়ে উঠে গভীর সমুদ্রের দিকে চলতে লাগল। জাহাজটা যত কাছে যেতে লাগল ভেলাটা ততই স্পষ্ট হতে লাগল।

কাছে আসতে দেখা গেল—কতকগুলো গাছের কাণ্ড দিয়ে, বুনো লতা দিয়ে বাঁধা একটা ভেলা। তার ওপর দু'জন মানুষ। একজন বৃদ্ধ, অন্যজন যুবক। দু'জনের হাত পা ভেলাটার সঙ্গে জংলী লতা দিয়ে বাঁধা। বৃদ্ধটির গায়ে বিচিত্র রঙের ডোরাকাটা আলখাল্লার
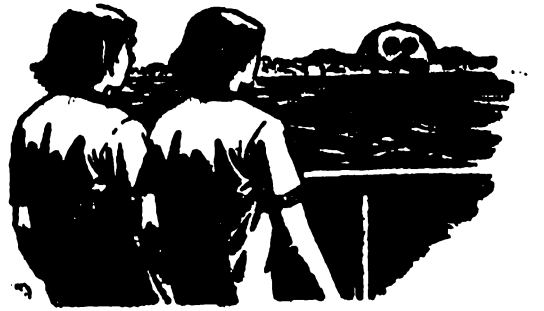
মতো কী একটা। যুবকটির গা খালি। দু'জনেরই পরনে ঘাসের তৈরী ঘাগরামতো। বৃদ্ধটির মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি। তা'তে কয়েকটা লম্বা পাখির পালক গোঁজা।

ফ্রান্সিস ডেক থেকে দেখল সব। কিন্তু বুঝে উঠতে পারল না মানুষ দু'টো বেঁচে আছে কিনা। ফ্রান্সিসের কথামতো এর মধ্যেই পাঁচটা নৌকো তৈরী হয়েছিল। তারই একটা জলে নামানো হলো। বিস্কো একটা বৈঠা হাতে জাহাজের ঝোলানো দড়ি বেয়ে বেয়ে নৌকোটায় নামল, তারপর নৌকা বেয়ে চলল ভেলাটার দিকে। কাছে আসতে ও নৌকো থেকে ভেলাটায় উঠল। প্রথমে লতা দিয়ে বাঁধা যুবকটির বুকে নিজের কান চেপে ধরল। তারপর নাকের কাছে হাত রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জাহাজের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—'শ্বাস পড়ছে—বেঁচে আছে।' এবার বৃদ্ধটিকে পরীক্ষা করল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'দু'জনেই বেঁচে আছে।'

তারপর বিস্কো কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করল। লতার বাঁধন কাটল। প্রথমে যুবকটি আস্তে আস্তে উঠে বসল। বৃদ্ধটি শুয়েই রইল। বিস্কো যুবকটিকে বলল...'নৌকোয় চড়তে পারবে?'

যুবকটি ওর ভাষা বুঝল না। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল।

বিস্কো এবার পর্তুগীজ ভাষায় বলল। যুবকটি বুঝল না। মাথা নাড়ল। তখন বিস্কো স্প্যানিশ ভাষায় বলল। যুবকটি এবার চোখ খুলে ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় বলল—'আমার নড়বার শক্তি নেই।' বিস্কো বুঝল ওদের নৌকোয় তোলা যাবে না। ও নিজের নৌকোয় ফিরে এল। নৌকো থেকে কাছি নিয়ে কাঠের ভেলাটার সঙ্গে বাঁধল! তারপর ভেলাটাকে টেনে নিয়ে এল জাহাজের কাছে। জাহাজ থেকে ভাইকিংরা একটা দড়িতে ফাঁস পরিয়ে ঝুলিয়ে দিল। বিস্কো যুবকটিকে তুলে ধরে ফাঁসটায় বসিয়ে দিল। জাহাজ থেকে ভাইকিংরা টেনে টেনে যুবকটিকে জাহাজে তুলে নিল। আবার দড়ির ফাঁস নামিয়ে দিল। বিস্কো অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে তুলে ফাঁসে বসিয়ে দিল। বৃদ্ধের দেহটি ফাঁসে ঝুলতে লাগল। ভাইকিংরা দড়ি টেনে টেনে বৃদ্ধটিকে জাহাজে তুলে নিল। বিস্কোও নৌকোটা জাহাজের গায়ে বেঁধে দড়ি ধরে জাহাজে উঠে এল।

ততক্ষণে কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে বৃদ্ধ ও যুবকটিকে একটা কেবিনঘরে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছে। ওদের গায়ে কম্বল ঢাকা দিয়েছে। যুবকটি তবু চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু বৃদ্ধটি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল। আবার চোখ বন্ধ করে ফেলছিল।

ফ্রান্সিস যুবকটির কাছে এসে বসল। বিস্কো ফ্রান্সিসকে বলল—যুবকটি স্প্যানিস ভাষা বোঝে।' ফ্রান্সিস যুবকটিকে জিজ্ঞেস করল—'তোমরা কারা?' যুবকটির খুব দুর্বল কণ্ঠে বলল—'ইকাবো।' ফ্রান্সিস পাঞ্চোর কাছে শুনেছিল কঙ্কাল দ্বীপের অধিবাসীরা ইকাবো জাতি।

'তোমরা কঙ্কাল দ্বীপের অধিবাসী?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা যে দ্বীপটিকে এখান থেকে দেখছি সেটাই কি কঙ্কাল দ্বীপ?'

'হ্যাঁ?' তারপর যুবকটি ভীষণ ক্লান্তস্বরে বলল—'আমার কথা বলতে—কষ্ট।' ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বলল—'মাপ করো ভাই—এসময় আমার কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি।' ও বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল—'বিস্কো, ওদের আগে জল খেতে দাও, তারপর গরম মাংস রুটি।'

বিস্কো অল্পক্ষণের মধ্যে সব ব্যবস্থা করল। প্রথমে যুবকটিকে ধরাধরি করে বিছানায় বসানো হলো। তারপর জল খাওয়ানো হলো। জল খেয়ে যুবকটি একটু সুস্থ হলো যেন। ওর হাতে মাংস রুটির থালা দেওয়া হলো। যুবকটি বৃদ্ধটির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বিস্কোকে জিজ্ঞেস করল—'আমার বাবা বেঁচে আছেন?' বিস্কো বুঝল বৃদ্ধটি ওর বাবা। বলল—হ্যাঁ—বেঁচে আছেন। তুমি নিশ্চিন্ত মনে খাও।' যুবকটি আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

কয়েকজন ধরাধরি করে বৃদ্ধটিকে উঠিয়ে বসাল। জল খাওয়াল। তারপর মাংস রুটির থালাটা ওঁর হাতে দিল। বৃদ্ধটি কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল। তারপর চোখ খুলে ছেলের দিকে তাকিয়ে ইকাবো ভাষায় কী বলল। ছেলেটিও মৃদুস্বরে কী উত্তর দিল। বৃদ্ধটি আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

রাত্রে ফ্রান্সিস একা একা ডেক-এ পায়চারি করছিল। কী করবে এখন তাই ভাবছিল। হ্যারি এসে ওর কাছে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পায়চারী থামিয়ে বলল—ওরা কি সুস্থ এখন।

'না, এখনও ওদের দুর্বলতা কাটেনি।'

এখন কী করবো বলো তো?'

'এখন কঙ্কাল দ্বীপে যাবে কি না ভাবছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মনে হয় কয়েকদিন অপেক্ষা করা ভাল।'

'ও কথা বলছো কেন?'

'দেখ—এরা ইকাবো। কী এরা অপরাধ করেছে যে ভেলায় বেঁধে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে? অথবা কঙ্কাল দ্বীপে এমন কিছু ঘটেছে যে জন্যে এদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা না জেনে এখন কঙ্কাল দ্বীপে যাওয়াটা উচিত হবে না।' হ্যারি বলল।

'ঠিকই বলেছো।' ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—'এদের কাছে আগে সমস্ত ব্যাপারটা শুনি তারপর সিদ্ধান্ত নেবো।'

কয়েকদিনের মধ্যেই যুবকটি আর তার বাবা অনেকটা সুস্থ হলো। ফ্রান্সিস দু'বেলাই ওদের খোঁজখবর নিতে যেতো।

আজকেই বিকেলের দিকে ওদের কেবিনঘরে এল। দেখল যুবকটি বিছানায় বসে আছে। বৃদ্ধটি শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'ভাই—এখন কেমন আছো?' 'ভালো।' যুবকটি মাথা নেড়ে হাসল। বলল—'আপনারা আমাদের বাঁচিয়েছেন। আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।'

ফ্রান্সিস হেসে ওর পিঠ চাপড়াল—'মানুষ হিসেবে আমাদের যা কর্তব্য তাই করেছি।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—'তোমার এখন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'ন্নাঃ।'

'তাহ'লে তোমাদের ব্যাপারটা একটু বল। আসল কথা তোমাদের ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত আমরা কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না।'

যুবকটি ফ্রান্সিসের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। পাশেই ছিল হ্যারি। হ্যারি বলল—'তোমার বলতে কোন আপত্তি আছে?'

'ন্নাঃ তা কেন?' তারপর আস্তে আস্তে যুবকটি বলতে লাগল—'আমার বাবা হচ্ছেন ইকাবোদের রাজা। আমি রাজপুত্র। আমার নাম মোকা।' একটু থেমে মোকা বলতে লাগল—কঙ্কাল দ্বীপের দক্ষিণে বেশ দূরে ত্রিস্তানদের একটা দ্বীপ আছে। ওরা আমাদের

চিরশত্রু। এর আগেও অনেকবার আমাদের দ্বীপ আক্রমণ করেছে। কিন্তু আমাদের হারাতে পারে নি।' মোকা থামল। একটু দম নিল। তারপর বলতে লাগল—'কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য। কিছুদিন আগে দ্বীপে ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল। অনেক ইকাবো তাতে মারা যায়। কমসংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে এবার ত্রিস্তানদের আক্রমণ রোধ করতে পারলাম না। আমরা হেরে গেলাম। আমাদের যোদ্ধারা বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। আমি আর বাবা ধরা পড়লাম ত্রিস্তানদের হাতে। ওরা আমাদেব প্রাণে মারল না। ভেলায় বেঁধে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল।'

'কতদিন আগে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'তা বলতে পারবো না। দিন সাতেকের কথা মনে আছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।'

'তাহলে কঙ্কাল দ্বীপ এখন ত্রিস্তানদের দখলে?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'এখন তোমরা কী করবে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

মোকা একটু চুপ করে থেকে বলল—'আমরা প্রাণে বাঁচবো এটা তো স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আপনাদের দয়ায় আমরা বেঁচে গেছি। এবার নতুন করে ভাবতে হবে এখন আমরা কী করবো?'

মোকার কথা শেষ হলে বৃদ্ধ রাজা মোকাকে ইকাবোদের ভাষায় কী জিজ্ঞেস করল। দু'জনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। ওদের কথা শেষ হলে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—

'তোমার বাবা মানে রাজামশাই কী বললেন?'

'বাবা বলছেন—পলাতক যোদ্ধাদের একত্র করে তিনি আবার ত্রিস্তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তাতে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি মৃত্যুই মেনে নেবেন।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চুপ করে রইল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল রুপোর নদীর কথা। ও জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা তোমাদের দ্বীপে কি রূপোর নদী আছে?'

মোকা যেন একটু চমকাল। বলল—'রূপোর নদীর কথা আপনি কি করে শুনলেন?'

'পাঞ্চো নামে একজন স্প্যানিশ নাবিক বলেছিল। আমাদের দেশে এক সরাইখানায় পাঞ্চোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।'

'পাঞ্চো।' মোকা হাসল। বলল—'পাঞ্চো কিছুদিন আমাদের দ্বীপে ছিল। ওর কাছেই আমি স্প্যানিশ ভাষা শিখেছি। ও রূপোর নদীর খোঁজে এসেছিল। এর আগেও দু'তিনজন এসেছে। কিন্তু রূপোর নদীর খোঁজ কেউ পায়নি। ত্রিস্তানরা যে আমাদের দ্বীপ দখল করেছে, ওদেরও লোভ রূপোর নদীর দিকে।' একটু থেমে মোকা বলল—'কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ রূপোর নদী খুঁজে পায়নি।'

'তোমরা নিজেরা খুঁজেছো?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। অনেকভাবে চেষ্টা করেছি—খুঁজেছি, পাইনি।'

'তোমার বাবাও জানেন না বোধহয়?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'না বাবাও জানেন না।'

'তোমরা কী মনে করো?' হ্যারি বলল—'সত্যিই রূপোর নদী ছিল, না সবটাই একটা ছেলে-ভুলানো গপ্পো?'

'না—গপ্‌পো নয়। বাবা বলেন—রূপোর নদীর কথা তিনি আমার ঠাকুরদার মুখে শুনেছেন। তা ছাড়া আমাদের দ্বীপের দেবতা—গিয়ানি। তার মন্দিরমত একটা পুজোর স্থান আছে। সমস্ত মন্দিরটা তাল তাল রূপোর থাম দিয়ে তৈরী। সামনে আছে রূপোর থাম। আমাদের পূর্বপুরুষরা এত রূপো পেল কোত্থেকে?'

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—'হ্যারি, এবার বুঝতে পারছো?'

'হুঁ। কিন্তু রূপোর নদী গেল কোথায়?' হ্যারি বলল।

'আচ্ছা মোকা—' ফ্রান্সিস বলল—'তোমাদের দ্বীপে তো একটাই নদী?'

'হ্যাঁ।'

'সেটার নাম কুনহা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের ভাষায় কুন্‌হা-র অর্থ রূপো—তাই কিনা?'

'হ্যাঁ, আপনি এতসব জানলেন কী করে?'

'পাঞ্চো বলেছে।'

'পাঞ্চো—চোর। ঠকবাজ।' মোকা বেশ রেগে বলল—'জানেন ও গিয়ানির মন্দিরের একটা থাম চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হ'লো। বলল—'আমি অতশত জানি না। পাঞ্চো আমার বন্ধু নয়, এক রাত্রের আলাপ। ঠিক আছে—' ফ্রান্সিস মোকার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল—'তোমরা বিশ্রাম করো। পরে কথা হবে।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রাত্রে ফ্রান্সিস একা একা জাহাজের ডেক-এ পায়চারি করছিল। গভীরভাবে ভাবছিল—কী করবে এখন? হ্যারি এল। ওর মাথায়ও এক চিন্তা। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দু'জনে কথাবার্তা বলছে, তখনই বিস্কো এল। একটা দুঃসংবাদই নিয়ে এল ও। বলল—'ফ্রান্সিস, জাহাজে খাবার জল ফুরিয়ে এসেছে। কী করবে?'

'কঙ্কাল দ্বীপ থেকেই জল আনতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

'কিন্তু দিনের বেলা যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'না, রাত্রে যেতে হবে।'

'তাহ'লে আজ রাত্রেই যেতে হয়।'

'ঠিক আছে। দু'টো পিঁপে নিয়ে তোমরা চারজন যাও কিন্তু তার আগে মোকার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কঙ্কাল দ্বীপে কোথায় পানীয় জল পাওয়া যাবে তার হদিস একমাত্র ও-ই দিতে পারবে।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—'চলো তো হ্যারি—মোকার সঙ্গে কথা বলে আসি।'

ওরা দু'জনে মোকা যে কেবিনঘরে ছিল সেই ঘরে এল। দেখল রাজামশাই মোকা দু'জনেই ঘুমিয়ে আছেন।

ফ্রান্সিস মোকাকে আস্তে আস্তে ঠেলল। ঘুম ভেঙে মোকা বসল। এত রাত্রে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে দেখে ও অবাকই হ'লো। ফ্রান্সিস বলল—'মোকা—আমাদের জাহাজে জল ফুরিয়ে এসেছে। তোমাদের দ্বীপে কোথায় পানীয় জল পাওয়া যাবে?'

'পাহাড়ের নীচে উত্তর দিকে একটা ঝর্ণা আছে। আমরা আছি দ্বীপের দক্ষিণ দিকে। যারা যাবে তাদের উত্তর দিক থেকে দ্বীপে নামতে হবে।'

'যে বেলাভূমি আমরা এদিক থেকে দেখছি সেখানে নেমেও তো উত্তর দিকে যাওয়া যায়।'

'যে বেলাভূমিটা এদিক থেকে দেখছেন তাকে মৃতের বেলাভূমি বলা হয়।

'কেন?'

'এই বেলাভূমির কাছে সমুদ্রের নীচে যে বালি আছে তা অত্যন্ত হালকা। পা দিয়ে দাঁড়ালে বালি দ্রুত পায়ের নীচে সরে যায়। এখান দিয়ে তীরে উঠতে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। তাই এইদিকের বেলাভূমির ধারে কেউ আসে না। দেখবেন এই দিকের বেলাভূমির ধারে ত্রিস্তানদের একটাও ক্যানো নৌকা বাঁধা নেই। সব উত্তরের খাঁড়িগুলোতে বাঁধা আছে।' মোকা বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—'হ্যারি—আমি এই দিক দিয়েই দ্বীপে নামবো ভেবেছিলাম। ভীষণ বিপদে পড়তাম তা'হলে।'

মোকা বলল—'উত্তর দিকে পাহাড় পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে। কিন্তু সেই রাস্তাটা নিশ্চয়ই ত্রিস্তান যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে। যারা জল আনতে যাবে তাদের যেতে হবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।'

'ঠিক আছে।' ফ্রান্সিস বলল—'ওদের উত্তরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যেতে বলবো।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। বিস্কো আর তিনজন ভাইকিংকে নিয়ে তৈরী হয়ে ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ফ্রান্সিস বলল—'বিস্কো—দুটো জলের পিপে নিয়ে যাও। কিন্তু এদিকের সমুদ্রের তীরে নামা চলবে না। তোমাদের যেতে হবে উত্তর দিকে। সেখানে খাঁড়ি আছে। সেখানে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের দিকে যাবে। পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে ঝর্ণা পাবে। রাস্তামতো নাকি আছে ওখানে। কিন্তু সেই রাস্তা দিয়ে যাবে না। ত্রিস্তান যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে সেই রাস্তা।'

'ঠিক আছে। আমরা নৌকা নিয়ে উত্তর দিক থেকে দ্বীপে যাবো।'

বিস্কোরা চলে গেল। একটু পরেই দু'টো নৌকায় ওরা দু'টো জলের পিপে নামাল। তারপর নৌকো চলল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে। আকাশে ভাঙা চাঁদ। ম্লান জোৎস্নায় ওরা নিঃশব্দে নৌকো বেয়ে চলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজ থেকে তাকিয়ে রইল ওদের নৌকোর দিকে। একটু পরে আর নৌকো দেখা গেল না। পাতলা কুয়াশায় আড়াল পড়ে গেল। ওরা নিজেদের কেবিনে এসে শুয়ে পড়ল।

ভোর হলো। বেলা বাড়ল। কিন্তু বিস্কোদের নৌকোর দেখা নেই। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বেশ চিন্তিত স্বরে বলল—'ওরা ফিরলো না। কী ব্যাপার বলো তো?

চিন্তার কথা। দেখি আজকের দিনটা।' হ্যারি বলল।

সারাদিনই ফ্রান্সিসের চিন্তায় চিন্তায় কাটল। বিস্কোদের নৌকোর দেখা নেই।

সন্ধ্যে হলো। রাত বাড়তে লাগল। সবাই ডেক-এ এসে জড়ো হলো। তাকিয়ে রইল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে। বিস্কোদের নৌকোর কোনো পাত্তাই নেই। কয়েকজন ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল ওরা বিস্কোর খোঁজে দ্বীপে যাবে। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল—'না আমি একা যাবো।' হ্যারি আপত্তি করল। ফ্রান্সিস বুঝিয়ে বলল—বিস্কোরা নিশ্চয়ই ত্রিস্তানদের হাতে ধরা পড়েছে। আমি একা বোকার মতো ওদের সঙ্গে লড়তে যাবো না। শুধু কী ঘটেছে সেটা জেনে আসবো। তারপর সবাই মিলে যাবো। লড়াই যদি করতে হয়

তখ্যনি করবো।

রাত একটু গভীর হলে ফ্রান্সিস পোশাক পরে নিল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। তারপর দড়ি বেয়ে জাহাজ থেকে নৌকোয় নেমে এল। আজকের চাঁদ আরো উজ্জ্বল। জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছে ঢেউয়ের মাথা।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বৈঠা বাইতে লাগল। ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে নৌকো এগিয়ে চলল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে।

উত্তর দিক থেকে ঘুরে যেতে হলো বলে একটু দেরীই হলো কঙ্কাল দ্বীপে পৌঁছতে। উত্তর দিকের দ্বীপের খাঁড়িগুলোতে দেখল অনেক ক্যানো নৌকো বাঁধা। ফ্রান্সিস নৌকা নিয়ে তীরের জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল। তখনি আবছা জ্যোৎস্নায় দেখল ওদের দু'টো নৌকো একটা খাঁড়িতে বাঁধা। ফ্রান্সিস বুঝল—এখানেই বিস্কোরা নেমেছে। ফ্রান্সিসও নৌকোটা ভেড়াল ওখানে। একটু নীচু ঝুঁকেপড়া গাছের ডালে নৌকোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ও মাটিতে নামল। বনের মধ্যে দিয়ে চলল পাহাড়টার দিকে।

বনের নীচে অন্ধকার গভীর। যেখানে গাছগাছালি একটু কম সেখানে ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে ঘাসে ঝোপে। বিচিত্র সব শব্দ শোনা যাচ্ছে। কয়েকটা নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটাল। এক গাছ থেকে উঠে অন্য গাছে গিয়ে বসল।

ফ্রান্সিস কোমর থেকে খুলে তরোয়ালটা হাতে নিল। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ ভাঙ্গা জোৎস্নার আলোয় দেখল দু'টো জলের পিপে পড়ে আছে। একটা কাত হয়ে পড়ে আছে, অন্যটা সোজা বসানো। সেটার ভিতর হাত দিয়ে দেখল জল ভরা। বুঝল বিস্কোরা এখানেই ধরা পড়েছে।

তাহলে ঝর্ণাটা কাছেই। কিন্তু সেদিকে গিয়ে লাভ নেই। বরং ত্রিস্তানদের আস্তানা কোন দিকে দেখতে হয়। বিস্কোদের বন্দী করে নিশ্চয়ই ওদিকে কোথাও রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সিস ডানদিকে ঘুরল। বন থেকে বেরোতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে ত্রিস্তানদের আস্তানা। ও এগিয়ে চলল।

হঠাৎ পায়ের কাছে কী যেন কিলবিল করে উঠল। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা শক্ত বুনো লতা ওর পায়ে ফাঁস হয়ে লেগে গেল। চোখের নিমেষে লতার বাঁধনটা এক হ্যাঁচকা টানে সামনের গাছের মাঝামাঝি টেনে তুলল ওকে। হাত থেকে তরোয়ালটা ছিট্‌কে গেল। ডাল থেকে ঝোলানো লতার ফাঁদ ওর বাঁ পাটা বাঁধা। ওর মাথা নীচের দিকে। ও ঝুলতে লাগল। বুঝল ত্রিস্তানরা বনের মধ্যে ফাঁদে পেতে রেখেছে। সেই ফাঁদেই ও ধরা পড়েছে।

মাথা নীচের দিকে। পা ওপরে। ফ্রান্সিস ঝুলতে লাগল। শব্দ করে কয়েকটা পাখি গাছটা থেকে উড়ে গেল। হাতে তরোয়ালটাও নেই যে বুনো লতার ফাঁসটা কাটবে। ও ঝুলতে লাগল। গায়ের ঢোলা জামাটা মুখের ওপর আটকে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও। জামাটা দু' হাত দিয়ে খুলে নীচে ছুঁড়ে ফেলল।

বেশ কিছু সময় কাটল। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। ও বুঝল ঐভাবে আর কিছুক্ষণ ঝুললে মাথায় রক্ত উঠে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ও শরীরটা বাঁকাতে লাগল। কয়েকটা ঝুল খেয়ে হঠাৎ শরীরটা বাঁকিয়ে পায়ের ওপরের লতাটা ধরে ফেলল। কিছুক্ষণ রইল ওভাবে। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে লতাটা দু'হাতে ধরে আস্তে আস্তে একটু সোজা হলো। পায়ের লতার বাঁধনটায় ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাঁপাতে লাগল। পায়ের বাঁধনটা প্রায় হাঁটুর কাছে উঠে এল। বুনো লতাটা যেন কেটে বসল পায়ে। ঘষা লেগে লেগে অনেকটা জায়গা ছড়ে গেল। ভীষণ জ্বালা করতে লাগল। যে ডাল থেকে ফাঁদের লতাটা ঝুলছে সেই ডালটা বেশ উঁচুতে। নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। মাঝে মাঝে তন্দ্রামত এল। কিন্তু পায়ের অসহ্য জ্বালায় তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতে লাগল।

কতক্ষণ এভাবে ফ্রান্সিস ঝুলে রইল ও জানে না। চারপাশের বনে জঙ্গলে পাখি ডাকতে লাগল। বিচিত্র ডাক পাখিগুলোর।

ওপরে গাছের পাতার ফাঁকগুলো দিয়ে ফ্রান্সিস দেখল আকাশ আর কালো নয়। তা'হলে ভোর হয়েছে। গাছের নীচের অন্ধকার তখনও কাটেনি। ও নিরুপায়। কিছুই করার নেই ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া। হাতে তরোয়ালটা থাকলে তবু কিছু করতে পারত। কিন্তু এখন একেবারেই অসহায়, অসহ্য ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ছে যেন।

ফ্রান্সিস আর ওভাবে বেশীক্ষণ থাকতে পারল না। বুনো লতাটা থেকে হাত ছেড়ে দিল। আবার মাথা নিচু পা ওপরে করে ঝুলতে লাগল।

কতক্ষণ এভাবে ঝুলে রইল তা' ও হিসেব করতে পারল না। হঠাৎ বনের মধ্যে কাদের কথাবার্তা ভেসে আসতে লাগল। তখন বনের নীচে কিছুদুর পর্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দেখল পাঁচজন লোক কথা বলতে বলতে আসছে। দুর্বোধ্য সেই ভাষা। হাতে ওদের কাঠের লম্বা বর্শা। মাথাটা ছুঁচলো। ওদের পরনে তাসক ঘাসের ঘাগরা। গায়ে কিছু নেই। কপালে গালে বুকে লাল সাদা রঙের দাগ। ফ্রান্সিস বুঝল—এরা ত্রিস্তান যোদ্ধা। ফাঁদে কেউ ধরা পড়ল কিনা খুঁজতে এসেছে। ওরা এসব ফাঁদ পেতেছে নিশ্চয়ই পলাতক ইকাবোদের ধরবার জন্যে।

ওরা একটু দূর থেকেই ফ্রান্সিসকে ঝুলতে দেখল। সবাই একসঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায়

কী বলে চিৎকার করে উঠল। ছুটে ওরা সিডার গাছটার নীচে এল। একজন টিকটিকির মতো গাছের কাণ্ড বেয়ে ওপরে উঠে গেল। তরতর করে ডাল ধরে ধরে ফ্রান্সিস যে ডাল থেকে ঝুলছিল সেইটার কাছে এল। কোমর থেকে একটা ধারালো লোহার টুকরো বের করল। সেটা দিয়ে ফাঁদের তলাটা কাটতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল মাথা সোজা করে মাটিতে পড়লে ও ভীষণভাবে আহত হবে। তাই শরীরটা বেঁকিয়ে ও তৈরী হলো। লতাটা কাটা হতেই পিঠ দিয়ে একটা ঝোপের ওপর পড়ল। ঘাড়ে লাগল তবু। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না। আবার শুয়ে পড়ল। ত্রিস্তান যোদ্ধারা বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিসকে তুলে ধরল। ও একবার ভাবল ছিট্‌কে-যাওয়া তরোয়ালটা খুঁজে বের করবে। পরক্ষণেই ভাবল তরোয়ালের কথা বললে হয়তো ত্রিস্তানরা ক্ষেপে যাবে। বিপদ বাড়বেই তাতে। বরং চুপচাপ থাকা যাক। দেখা যাক ওকে ত্রিস্তানরা কী করে।

ত্রিস্তান যোদ্ধারা নিজেদের ভাষায় কী বলাবলি করল। তারপর ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে চলবার ইঙ্গিত করল। ধাক্কা খেয়ে ফ্রান্সিস রাগে জ্বলে উঠল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। ওদের নির্দেশমত হাঁটতে লাগল। ছড়ে-যাওয়া পা'টা অসম্ভব জ্বালা করছে। কিন্তু উপায় নেই। ওদের অবাধ্য হলে হয়তো প্রাণ বিপন্ন হতে পারে।

ফ্রান্সিসকে সামনে রেখে ত্রিস্তান যোদ্ধারা পেছনে চলল।

কিছুক্ষণ বনের মধ্যে দিয়ে চলার পর বনের বাইরে এল ওরা। ঘাস, বুনো ঝোপে ঢাকা প্রান্তর উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে। উজ্জ্বল রোদে দেখা গেল পাহাড়ের ন্যাড়া মাথাটা। সবুজের চিহ্ন নেই ওখানে। নিরেট কালচে পাথরের প্রায় গোল মাথাটা। ফ্রান্সিস দূর থেকে দেখেছিল পাহাড়ের মাথাটা। এবার কাছ থেকে উজ্জ্বল রোদে দেখল। ঠিক মানুষের মাথার করোটির মতো দেখতে। চোখের ফুটোর মতো বড় একটা গর্তও দেখা যাচ্ছে। অন্য গর্তটা আধ-ভাঙা। দ্বীপের উত্তর দিকটাই বসতি এলাকা। সেখানে যখন পৌঁছল তখন বেশ বেলা হয়েছে। একটু দূরে দূরে তাসক ঘাসের ছাউনি দেওয়া পাথর দিয়ে তৈরী ইকাবোদের বাড়ি দেখা গেল। পাথর সাজিয়ে বেশ শক্ত করেই বাড়িগুলো তৈরী।

ফ্রান্সিসকে সামনে রেখে ত্রিস্তানরা হেঁটে আসছিল। বাড়িগুলো থেকে ত্রিস্তান যোদ্ধারা বেরিয়ে এল। দেখতে লাগল বন্দী ফ্রান্সিসকে, পেছনের যোদ্ধার দলকে। সবই ইকাবোদের বাড়ি। হয়তো ইকাবোরা পালিয়েছে, নয়তো ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটা বাড়িঘর ছাড়া বাকিগুলো যোদ্ধারা দখল করে নিয়েছে।

পাহাড়ের মাথার নীচে যেখান থেকে ঘাস-ঢাকা জমি শুরু হয়ে নীচে নেমে এসেছে সেখানেই ছাড়া ছাড়া বাড়ি নিয়ে বসতি এলাকা। যে কিছু ইকাবো বৃদ্ধ আর মেয়েরা ও শিশুরা ছিল তারা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। পাথরের বাড়িঘর ছাড়িয়ে পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি আসতে দেখা গেল একটা বড় ঘর। কাঠ আর পাথরের। চালাটা তাসক ঘাসের হলেও ভালোভাবে তৈরী। ফ্রান্সিস আন্দাজে বুঝল এটা নিশ্চয়ই রাজার বাড়ি। ইকাবোদের রাজা তো এখন জাহাজে। ত্রিস্তানদের রাজা নিশ্চয়ই এখানে আস্তানা গেড়েছে।

অনেক ত্রিস্তান যোদ্ধা ওদের পিছনে পিছনে রাজবাড়ির দিকে আসতে লাগল। রাজবাড়ির বাইরে একটা পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ। তার দু'পাশে পাথরের আসন মতো সাজানো।

প্রাঙ্গণের মাঝখানে ফ্রান্সিসকে দাঁড় করানো হলো। দুজন ঢুকল রাজার ঘরের মধ্যে। এর মধ্যে পাঁচ ছ'জন ত্রিস্তানপ্রাঙ্গণের দু'পাশে রাখা পাথরগুলোতে বসল। ওরা সবাই বয়স্ক, বৃদ্ধ। বোঝা গেল ওরা যোদ্ধা নয়। রাজার পরামর্শদাতা, পারিষদবর্গ।

একটু পরেই ঘরটা থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি খুব বলিষ্ঠ দেহী ত্রিস্তান। মুখে বুকে উল্‌কি আঁকা। নাক টিকালো, মাথার লম্বা চুল পিছনের দিকে ঝুঁটি করে বাঁধা। ফ্রান্সিস ধরে নিল ইনিই ত্রিস্তানদের দলনেতা। তিনি বেরিয়ে আসতে পাথরের ওপর বসে থাকা বৃদ্ধরা উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে একটা কাঠের সিংহাসন মতো এনে বাইরে রাখা হলো। সিংহাসনে বসার জায়গায় পাখির পালকের গদি । বলিষ্ঠদেহী লোকটি একবার চারদিকে চেয়ে নিয়ে কাঠের সিংহাসনে বসলেন।

একজন ত্রিস্তান দলনেতার সামনে এসে দাঁড়াল। উবু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দলনেতাকে সম্মান জানাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ত্রিস্তান ভাষায় গড়গড় করে কী বলে গেল। ফ্রান্সিস তার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না। দলনেতা তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। যোদ্ধাটি উত্তর দিল। এবার দলনেতা একজন পারিষদের দিকে তাকিয়ে কী বললেন। সেই পারিষদটি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসকে আস্তে আস্তে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল—'তুমি কে?' ফ্রান্সিস আশ্বস্ত হলো যে যাহোক একজনকে পাওয়া গেল যে ওর কথা কিছু বুঝবে। ফ্রান্সিস বলল—'আমরা জাতিতে ভাইকিং।'
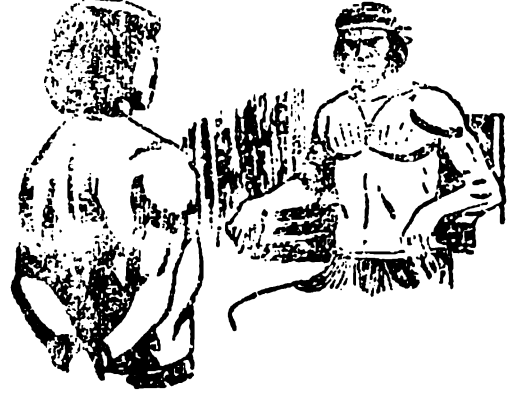
'তুমি এসেছো কেন?' বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করল।

'জাহাজে জল ফুরিয়ে গেছে, জল নিতে এই দ্বীপে এসেছিলাম।' থেমে থেমে বৃদ্ধটি বলল—'যুদ্ধ হয়েছে—আমরা জিতেছি—রাজা মরেছে। বনে আমাদের পাতা ফাঁদে তুমি ধরা পড়েছো—।' এসময় দলনেতা বৃদ্ধটিকে কী বললেন। বৃদ্ধ বলল—'সেনাপতি বলছেন—তুমি গুপ্তচর—ত্রিস্তানদের ক্ষতি করতে তুমি এখানে এসেছো।' ফ্রান্সিস এবার সেনাপতির দিকে তাকালো। বলল—'আপনি ভুল করছেন। আমার আগে আরো চারজন ভাইকিং এই দ্বীপে এসেছে—জল নিতে। তারা জল নিয়ে ফিরতে পারেনি। তাই তাদের খোঁজে আমি এসেছিলাম। 'বৃদ্ধটি সেনাপতিকে ত্রিস্তান ভাষায় সব বলল। সেনাপতি উত্তরে কী বললেন। বৃদ্ধটি বলল—'সেনাপতি বলছেন—সেই চারজনও ধরা পড়েছে। তোমরা গুপ্তচর।'

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাহলে বিস্কোরাও ধরা পড়েছে। ও চিৎকার করে বলল—'আমরা কোন অপরাধ করিনি। যুদ্ধেও অংশ নিইনি। দ্বীপের দক্ষিণে আমাদের জাহাজ রয়েছে। জল নিয়ে জাহাজে যাবো। তারপর জাহাজ ছেড়ে দেব।

বৃদ্ধটি সেনাপতিকে বলল সে কথা। সেনাপতি মাথা ঝাঁকিয়ে কী বলে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধটি বলল—'সেনাপতি বলছেন—প্রাণদণ্ড।'

ফ্রান্সিস বুঝল—এই সেনাপতি নির্মম। নরহত্যা তার কাছে কিছু না। সেনাপতি ঘরে ফিরে গেলেন।

কয়েকজন ত্রিস্তান যোদ্ধা এসে ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে হাঁটবার ইঙ্গিত করল।

ওখান থেকে পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে উপত্যকার মতো একটা জায়গায়। উপত্যকার কাছাকাছি আসতেই ফ্রান্সিস দেখতে পেল ইকাবোদের রূপোর মন্দিরটা। প্রায়

কুড়ি ফুট উঁচু মন্দিরটা। চারকোণা। থামগুলো নিরেট রূপোর। সামনেও অর্ধবৃত্তাকারে কয়েকটা রূপোর থাম। মোটা মোটা থাম। মন্দিরের মধ্যে গিয়ানি দেবতার মূর্তি। চৌকোণা একটা কাঠের থাম কুঁদে কুঁদে তৈরী হয়েছে গিয়ানির মূর্তি। মন্দিরের মাথার ছাউনি তাসাক ঘাস আর নারকেল পাতায় শক্ত করে বোনা। থামগুলোতেও কুঁদে কুঁদে নানা কারুকাজ করা।প্রচুর কাঁচা রূপো না পেলে এত বড় মন্দির তৈরী করা যায় না। রূপোর নদী ছেলে-ভুলানো গপ্পো নয়। সত্যি এরকম কিছু ছিল। যেখান থেকে মোকার পুর্বপুরুষরা প্রচুর রূপো পেয়েছিল। ফ্রান্সিস উপত্যকা দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যেতে দেখল। এটাই তাহ'লে কুন্হা নদী।

উপত্যকা পার হয়ে ওরা এবার ওপরের দিকে উঠতে লাগল । বেশ কিছুটা ওঠবার পর ওরা একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। এবার ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। দেখল প্রায় কুড়ি পঁচিশজন ত্রিস্তান যোদ্ধা এসেছে। কারণটা একটু পরেই বুঝল যখন সবাই মিলে গুহার মুখের পাথরটা ঠেলতে লাগল। কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর গুহার মুখের পাথরটা কিছুটা সরে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে ত্রিস্তান যোদ্ধারা ফ্রান্সিসকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। তারপর পাথর ঠেলে গুহার মুখ বন্ধ করতে লাগল।

গুহার ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। প্রথমে ফ্রান্সিস কিছুই দেখতে পেল না। একটা ভ্যাপসা গরম অনুভব করল। পাথুরে দেয়ালের খাঁজে একটা মশাল জ্বলছে। সেই মশালের নীচে এসে ও দাঁড়াল। পাথুরে মেঝেতে কয়েকজনকে শুয়ে থাকতে দেখল। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু'জন লোক এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। বিস্কো? ফার্নাণ্ডো? ফ্রান্সিস খুশিতে চিৎকার করে উঠল—'তোমরা বেঁচে আছো? কিন্তু আর দু'জন কোথায়?'

'বলছি।' বিস্কো বিষণ্ণ স্বরে বলল—'বসো।'

ততক্ষণে অন্ধকারে ফ্রান্সিসের চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। দেখল আরো চারজন মেঝেতে শুয়ে আছে। ওরা ইকাবো। কিন্তু বন্ধু দু'জন কোথায়?

ফ্রান্সিস মেঝেতে বসল। বিস্কো ফার্নান্দো বসল। ফ্রান্সিস বলল—'কী হয়েছিল বলো তো?'

'আমরা পিপে ভর্তি করে জল নিয়ে ফেরার পথে গর্ত-ফাঁদে আটকে পড়ে গিয়েছিলাম। ত্রিস্তানরা আমাদের বন্দী করে ওদের রাজার কাছে নিয়ে আসে।' বিস্কো বলল।

'রাজা নয়, ও সেনাপতি। লোকটা সাপের মতো ধূর্ত আর বাঘের মত হিংস্র।'

'একজন বৃদ্ধ ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় আমাদের জানাল আমাদের নাকি প্রাণদণ্ড হয়েছে। তারপর এই গুহায় এনে বন্দী করল।'

'তারপর?'

'তারপর কয়েকজন বন্দী ইকাবোর সঙ্গে আমাদের দুই বন্ধুকে ধরে নিয়ে গেল। ওরা কেউ আর ফেরেনি।' বিস্কো আস্তে আস্তে বলল।

বন্ধুদের এই মৃত্যুসংবাদে ফ্রান্সিস প্রথমে চমকে উঠল। তারপর গভীর দুঃখে ওর বুক ভেঙে যেতে লাগল। ও কথা বলতে পারল না। ওর শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। একটু ফুঁপিয়ে উঠল ও। বিস্কো ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল। মৃদুস্বরে বলল—'ফ্রান্সিস আমরা এখনো মুক্ত নই। ভেঙে পড়লে চলবে না।'

ফ্রান্সিস স্থির হলো। চোখ মুছে বলল—'পালাতে হবে।'

'কিন্তু কী করে?'

'ত্রিস্তানরা কীভাবে আমাদের খেতে দেয়—কীভাবে পাহারা দেয় সেটা খুঁটিয়ে দেখি—তারপরই পালাবার পরিকল্পনা করবো।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—'আচ্ছা গুহাটার চারধার ভালো করে দেখেছো?'

'হ্যাঁ দেখেছি—নিরেট পাথর চারদিকে।'

'কিন্তু কোথাও না কোথাও ফাঁকফোকর নিশ্চয়ই আছে। নইলে এই বদ্ধ গুহায় তোমরা মরে যেতে।'

'হ্যাঁ, একটা বড় ফোকর আছে ওপরে দিকে। ঐ দেখ।' বিস্কো আঙুল দিয়ে দেখাল। ফ্রান্সিস দেখল গুহাটার ছাতের দিকে একটা বড় পাথুরে ফোকর। দু'জন মানুষ একসঙ্গে বেরোতে পারে এরকম ফোকর। কিন্তু এত উঁচুতে ওঠা? অসম্ভব। গুহার মুখের পাথরটাও এমন চেপে বসে আছে যে সামান্যতম ফাঁকও নেই। তাছাড়া ওটা সরানো পাঁচ ছয়জনের পক্ষে সম্ভব নয়। বিস্কো বলল—ঐ ফোকরটা দেখেই আমরা রাত-দিনের পার্থক্য বুঝতে পারি। ওখানে দিনের বেলা আলো থাকে।'

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল! ভীষণ ক্লান্ত লাগছে শরীর। ছড়ে যাওয়া পায়ের জ্বালাটাও কমে নি। কিন্তু এখন বিশ্রামের সময় কোথায়। ও পাথুরে মেঝের ওপর এদিক ওদিক পায়চারি করল কিছুক্ষণ। তারপর পাথরের খাঁজ থেকে মশালটা তুলে নিয়ে সমস্ত গুহাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। চারদিকেই নিরেট পাথর। গুহার শেষ মাথায় দেয়ালের মতো সমান কিছুটা জায়গা। এখানে ওখানে পাথুরের বড় বড় টুকরো ছড়ানো। ফিরে এসে গুহাটার মাঝামাঝি দাঁড়ালো। ওপরদিকে বড় ফোঁকরটা দেখল। তারপর বিস্কোকে ডাকল। বিস্কো কাছে এলে ওর হাতে মশালটা দিয়ে পাথুরে দেয়ালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে ঐ ফোকরটার দিকে উঠতে লাগল। কিছুটা উঠল। কিন্তু ফোকরটা তখনও বেশ দূরে। আর এগোতে পারল না। পাথুরে দেয়ালের খাঁজে শরীরের ভারসাম্য রাখা যাচ্ছে না। ও পাথুরে খাঁজে খাঁজে পা রেখে নেমে এল।

যে চারজন ইকাবো মেঝেয় শুয়েছিল তারা এবার উঠে বসল। ফ্রান্সিসের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস পাথুরে দেয়াল থেকে নেমে বসল। হাঁপাতে লাগল।

এমন সময় গুহার মুখের পাথরটা সরে যেতে লাগল। বিস্কো ফ্রান্সিসকে ফিসফিস করে বলল—'খাবার দিতে যে লোকটা ঢুকবে তাকে খতম করে তো আমরা পালাতে পারি।'

ফ্রান্সিস হাসল—'পাগল হয়েছো। এই পাথর সরাতে অন্তত কুড়িজন ত্রিস্তান ওর সঙ্গে আসে। আমরা তো মোট-সাতজন। তাও নিরস্ত্র।'

দুজন ত্রিস্তান গুহায় ঢুকল। হাতে হাতে করে কয়েকটা মাটির পাত্রে খাবার ওদের সামনে রাখল। ম্যাকরেল মাছসেদ্ধ, বুনো কলা আর বুনো আলুসেদ্ধ। বিস্কো চিৎকার করে বলে উঠল—'নিয়ে যা এসব। আমার বন্ধুদের হত্যা করেছিস তোরা, তোদের দেয়া খাবার—থুঃ-থুঃ।' বিস্কো থুতু ফেলল। লোক দু'টো বেশ রেগে গেছে মুখ দেখেই বোঝা গেল। বিস্কো বলল—'কাল রাত্রেও ওদের দেওয়া খাবার আমরা খাইনি।' ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'আহাম্মকের কাজ করেছো। না খেলে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়বে—পালানোর কোন আশা থাকবে না। বরং বেশী বেশী করে খাবে। শরীরে জোর রাখবে তবে না পালাতে পারবে। খেয়ে নাও।'

বিস্কো আর আপত্তি করল না। ওদের দেখাদেখি ইকাবো বন্দীরাও খেতে লাগল। খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে আরো খাবার চাইল। ওরা খাওয়া নিয়ে ঝামেলা পাকাচ্ছে না দেখে ত্রিস্তান যোদ্ধা দু'টি খুশি হলো। একটা বড় মাটির পাত্র নিয়ে এল। বোধ হয় ওদেরও খাবার আছে ওর মধ্যে। ফ্রান্সিস তাই চেয়ে চেয়ে খেল। বিস্কোরাও বেশী করে খেল। আর কেউ বেশী চাইল না। ত্রিস্তান দু'জন এঁটো পাত্র নিয়ে চলে গেল। একটু পরে বড় কাঠের পাত্রে জল নিয়ে এল। নারকেলের মালা চুবিয়ে জল নিয়ে ফ্রান্সিসরা খেল। পেট ভরে জল খেল ফ্রান্সিস, এত জলতেষ্টা পেয়েছিল ও বুঝতেই পারেনি।

ত্রিস্তান দু'জন চলে গেল। গুহার মুখে পাথরটার চাপা দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস উঠে পাথরটা কাছে গেল। দেখল মুখে মুখে চেপে বসে গেছে। জলও গলবে না এমন নিরেটভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে পাথুরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ । পাশ ফিরে ইকাবো বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা ফ্রান্সিসের কোনো কথাই বুঝতে পারল না। হাল ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সিস চোখ বুজে বিশ্রাম করতে লাগল।

একটু তন্দ্রাও এসেছিল। কিন্তু পায়ের ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় জ্বালা করে উঠল। তন্দ্রা ভেঙে গেল। হঠাৎই মনে পড়ল দেশের কথা। বাবার কথা। মারিয়ার কথা। কোথায় বাড়ির ধপধপে সাদা পালকের নরম বিছানা আর কোথায় ও শুয়ে আছে। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে মেঝে। পিঠের হাড়ে খোঁচা দিচ্ছে। মৃদু হাসি ফুটলো ফ্রান্সিসের মুখে। যাও সব। ও এক ঝট্‌কায় উঠে পড়ল।

আবার মশালটা নিয়ে গুহার পাথুরে দেওয়ালগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আবার এল গুহার শেষে। সেই একটু সমতল একটা পাথরের স্তর। ও সমতল স্তরটায় একটা পাথর দিয়ে ঠুকতে লাগল। আশ্চর্য! নিরেট পাথরের আওয়াজ পাতলা? ফ্রান্সিস দেওয়ালের মতো জায়গাটায় কান চেপে ধরল। খুব মৃদু শব্দ। প্রায় ধরাই যায় না। জলের শব্দ।

ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বিস্কোকে ডাকল। ওর চড়া গলায় ডাকের শব্দটা গুহার মধ্যে গমগম করতে লাগল। বিস্কো ছুটে ওর কাছে এল। বলল— কি ব্যাপার?'

এই জায়গাটায় কান পেতে শোনো তো -কোন শব্দ শুনতে পাও কিনা দেখতো?' বিস্কো ঐ জায়গাটায় কান চেপে পাতল। একটু পরেই ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। চেঁচিয়ে বলে উঠল-। ফ্রান্সিস, জলের শব্দ।' ফ্রান্সিস বলল -'এখানটায় পাথুরে আস্তরণটা বেশী মোটা নয়। মনে আছে মোকা বলেছিল, কিছুদিন আগে এই দ্বীপে ভূমিকম্প হয়ে গেছে। কাজেই পাথর মাটির স্তরে কিছু পরিবর্তন ঘটা আশ্চর্য নয়।' ফ্রান্সিস তারপর চেঁচিয়ে ফার্নান্দোকে ডাকল-'ফার্নান্দো, আমরা প্রায় মুক্তির দোরগোরায়।' ফার্নান্দোও ছুটে এল। কান পাতল, ওর মুখেও হাসি ফুটে উঠল। ইকাবো বন্দীরা অবাক চোখে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখল । ওরা বুঝে উঠতে পারল না এত খুশি হবার কী কারণ ঘটল ।

ফ্রান্সিস ওদের ইশারায় কাছে ডাকল। এরা উঠে ফ্রন্সিসের কাছে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস একটা ছুঁচোলো মুখ পাথর তুলে নিল। দেওয়ালের মত পাথুরে স্তরে একটা জায়গায় গোলমত দাগ দিল। ওদেরও পাথর তুলতে বলল। বড় বড় পাথরের টুকরো ওখানে এখানে পড়েছিল। ফ্রান্সিস ঐ কিছুটা সমতল দাগ দেওয়া জায়গায় পাথরের ছুঁচালো মুখ খন্ডটা দিয়ে ঘা মারতে লাগল। ওদেরও তাই করতে ইঙ্গিত করল। ওরা এবার ব্যাপারটা

বুঝতে পারল দ্রুত হাতে পাথর তুলে নিল। তারপর এলোপাথাড়ি ঘা মারতে লাগল। ফ্রান্সিস ওদের থামিয়ে দিল। দেখিয়ে দিল নির্দিষ্ট জায়গায় কী করে একজন করে পরপর ঘা মারবে। ওরা সেইভাবে ঘা মারতে লাগল। গুহাটায় সেই শব্দ প্রচন্ড জোরে প্রতিধ্বনি হতে লাগল।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল -'আগে ওরা ঘা মারতে থাকুক। ওরা পরিশ্রান্ত হলে আমরা আরম্ভ করবো।' চলল ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটায় পাথর দিয়ে ঘা মারা। গুহাটায় শব্দ উঠতে লাগল-'দুম-দুড়ুম-।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ইকাবো বন্দীরা ঘা মারল। এবার ওরা হাঁপাতে লাগল। দু'জন বসে পড়ল। ফ্রান্সিস ওদের সরে যেতে বলল। ওরা বিশ্রাম করতে লাগল।

ফ্রান্সিস কাছে গিয়ে ভালো করে জায়গাটা দেখল। ঘাগুলো ঠিক এক জায়গায় পড়ে নি দু'একটা জায়গায় সামান্য গর্তমত হয়েছে। ওর মধ্যে যে জায়গাটা বেশি গর্তমত হয়েছে ও সে জায়গাটা বেছে নিল। বিস্কো আর ফার্নান্দোকে জায়গাটা দেখিয়ে বলল-'ঠিক এ জায়গাটায় ঘা মারো।

ওরা তিনজন এবার ঘা মারতে লাগল। গুহাটায় দুম দুম শব্দপ্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা ঘা মেরে ওরা ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। ঘা মারা থামিয়ে ওরা বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস ওপরে ফোকরটার দিকে তাকাল। দেখল ওখানে আলো কমে এসেছে। তার মানে বিকেল হয়েছে। ভাবল, আজ রাতের মধ্যেই ঐ আস্তরণটা ভাঙতে হবে। তারপর রাতের অন্ধকারে পালানো। ও এবার ইকাবোদের ইঙ্গিত করল। দেখিয়ে দিল কী করে একই জায়গায় পরপর ঘা মেরে যেতে হবে।

আবার ঘা মারা চলল। কিন্তু ঐ জায়গাটায় ফাটল দেখা দিল না।

এবার ফ্রান্সিসরা ঘা মারতে লাগল। চলল ঘা মারা। ফ্রান্সিস ফোকরটার দিকে তাকাল। অন্ধকার হয়ে গেছে। তা'হলে বাইরে এখন রাত।

পাথরের ঘা মারা চলল। দুম্ দুম্ শব্দও উঠতে লাগল।

হঠাৎ ফার্নান্দোর হাতের পাথর আস্তরণ ভেঙে ঢুকে গেল । জল ছিটকে ঢুকল । ফুটো থেকে পাথরটা খুলে নিয়ে আসতেই ফোয়ারার মতো জল ঢুকতে লাগল । ফ্রান্সিস বলল,— 'ঘা মারা থামিও না । ফাটল বড় করতে হবে ।'

ওরা ঘা মেরে চলল । ফাটল আর একটু বড় হলো । কিন্তু মানুষের শরীর বেরোবার মতো বড় হলো না ।

ফ্রান্সিস বুঝল- বৃথা চেষ্টা। এর বেশি ফাটল বড় হবে না। বাকীটুকু নিরেট। ওদিকে গুহায় জল ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিস্কো শঙ্কিত স্বরে ডাকল।-'ফ্রান্সিস?'

'বলো।'

'গুহায় জল জমছে। আমরা কী করবো?'

'এই সম্ভাবনাটা আমি আগেই ভেবে রেখেছি।' ফ্রান্সিস বলল।

'কী ভেবেছ তুমি?'

'জল বাড়বে। ডুব জল হলে আমরা ভেসে থাকবো। জল উঁচুতে উঠতে থাকবে।

আমরাও উঁচুতে উঠতে থাকবো। তারপর ঐ ফোকরে পৌঁছে যাব।'

বিস্কো আর ফার্নান্দো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল-'ও হো হো।' বিস্কো দু'হাতেফ্রান্সিসকে জড়িয়ে বলে উঠল—'সাবাস ফ্রান্সিস।'

ওদিকে ইকাবো বন্দীরা শঙ্কিতভাবে দেখতে লাগল যে গুহায় জল জমেছে। ওরা ভয়ে পাথুরে দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু খাড়া দেয়াল। উঠবে কি করে?

ফ্রান্সিস ওদের সাঁতারের ভঙ্গি দেখাল। ওরা মাথা ঝাঁকাল। অর্থাৎ সাঁতার জানে। ওরা দ্বীপবাসী। সাঁতারে ওস্তাদ। ফ্রান্সিস তারপর আঙুল দিয়ে ওদের ওপরের ফোকরটা দেখাল। এতক্ষণে ওরা ফ্রান্সিসের পরিকল্পনাটা বুঝতে পারল। হাসি ফুটল ওদের মুখে।

গুহাটায় আস্তে-আস্তে জল বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁটু অব্দি জল উঠল। ওদিকে ফুটো দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জল ঢুকছে। জলও বাড়ছে। গুহার মুখের পাথরটা এমন এঁটে বসে গেছে যে ওখান দিয়ে এক ফোঁটা জলও বেরোতে পারছে না।

সময় কাটতে লাগল । জল বাড়তে লাগল । আস্তে- আস্তে কোমর অব্দি জল উঠল। বাড়তে লাগল জল । আস্তে-আস্তে কাঁধ পর্যন্ত জল উঠল । ওরা হাতে পায়ে জল ঠেলতে -ঠেলতে ভেসে রইল ।

আরো বাড়ল জল । ওরা একই ভাবে ভেসে রইল ।

আস্তে আস্তে জলের স্তর গুহার মাথার কাছে চলে এল । মশালটা নিভে গেছে ততক্ষণে। চারিদিক অন্ধকার । শুধু ফোকরটা দিয়ে একটু আলোর আভাস ।

ফ্রান্সিস ফোকরটার কাছে এসে পায়ে ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে ফোকরের পাথুরে খাঁজটা ধরে ফেলল । তারপর শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফোকরের ওপর উঠে এল । পরিশ্রমে ও হাঁপাতে লাগল । চারদিকে তাকাতে লাগল । কিন্তু অন্ধকারে কিছুই বুঝল না। ভাবল— বেরোনোর পথ পরে খোঁজা যাবে, আগে ওদের সবাইকে টেনে তুলি ।

ও ফোকরটার দু'পাশে পায়ের ভর রেখে মাথা নিচু করে ডাকল—''বিস্কো— এই দিকে।' অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না । ফ্রান্সিসের গলার শব্দ লক্ষ্য করে বিস্কো সাঁতরাতে সাঁতরাতে এগিয়ে এল । হাত বাড়াল । ফ্রান্সিস ওর বাড়ানো হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে ওপরে তুলে নিল । বিস্কো বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল । ফ্রান্সিস এবার চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকতে লাগল । ওর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে সবাই অন্ধকারে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে ওর কাছে এল । ও একে-একে সবাইকে তুলে নিল ।

এবার বেরোবার পথ খোঁজা । ওরা সকলেই তখন ভীষণ পরিশ্রান্ত । কিন্তু ফ্রান্সিস ওদের বিশ্রাম করতে দিল না । চেঁচিয়ে বলল — এক মুহূর্তও আর দেরি করা চলবে না । রাত থাকতে থাকতেই আমাদের পালাতে হবে।'

ফ্রান্সিস সবার আগে - আগে পায়ে-পায়ে এগোল । দেখল এ জায়গাটাও একটা গুহা মতো । কিছুটা এগোতেই সামনে দেখল যেন একটা অর্ধগোলাকার পর্দা ঝুলছে । তাতে তারা জ্বলছে । আকাশ! ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল - 'আমার পেছনে - পেছনে এসো। সামনেই গুহার মুখ ।'

একটু পরেই গুহাটার মুখে এসে দাঁড়াল সবাই । সামনেই দূরবিস্তৃত আকাশ । বেশ উজ্জ্বল চাঁদ । নরম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে চারদিকে — উপত্যকায়, বসতিতে, বনে ।

ফ্রান্সিস ইকাবো বন্দীদের আঙ্গুল দিয়ে দূরের বন দেখাল । ইঙ্গিত করল — ওখান দিয়ে আমরা পালাব । বন্দীরা মাথা ঝাঁকাল । মানে - বুঝেছে ।

পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে ঢালু জমি। ফ্রান্সিস দক্ষিণ দিকে চলল। ম্লান জ্যোৎস্না পড়েছে উপত্যকায়, ঘাসের ঢালু জমিতে, পাথরে। সেই অলোয় ওরা দ্রুত ছুটতে লাগল বনের দিকে।

ওরা দূর থেকে দেখল বনের ধারে আগুন জ্বলছে। আগুন ঘিরে ত্রিস্তান যোদ্ধারা বসে হৈ হল্লা করছে।

দূর থেকে ফ্রান্সিস দেখে আশ্চর্য হলো দ্বীপের বিচিত্র সব পাখি সেই আগুনের কাছে উড়ে - উড়ে আসছে। ত্রিস্তান যোদ্ধারা গাছের ডাল দিয়ে গিয়ে পাখি মারছে আর আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছে। আশ্চর্য! মৃত্যু জেনেও পাখির ঝাঁক উড়ে - উড়ে আসছে। ঐ দলের পেছনে বিরাট একটা পাথরের চাঁই। সেটার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গিয়ে ওরা বনে ঢুকে পড়ল।

আর চাঁদের আলো নেই। অন্ধকারেই ছুটতে হচ্ছে ওদের। বনের নীচে ভাঙা - ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে কোথাও কোথাও। ফ্রান্সিস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ও সবার আগে আগে যাচ্ছিল। ওকে থামতে দেখে সবাই থেমে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল — 'বিস্কো, আমরা সামনে যাবো না। ইকাবোদের আগে-আগে ছুটতে দাও। ওরা সহজেই পাতা ফাঁদ দেখে বুঝতে পারবে। তখন সকলেই সাবধান হতে পারব।' বিস্কো বলল, 'ঠিক বলেছো।' ও ইকাবোদের কাছে কাছে ডাকল। তারপর ইঙ্গিতে অঙ্গভঙ্গী করে ফাঁদের ব্যাপারটা বোঝাল। বিস্কো কী বলছে সেটা ওরা বুঝল। ওদের মধ্যে একজন বুকে আঙুল ঠুকে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরল। তার মানে ওরা আগে যাবে।

এবার ইকাবোরা আগে আগে চলল। চলার গতি কমিয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে ওরা চলল। ফ্রান্সিসরা ওদের পেছনে পেছনে যেতে লাগল।

হঠাৎ নিস্তব্ধ বনে একসঙ্গে কয়েকটা পাখি বিচিত্র সুরে শিস দিয়ে ডেকে উঠল। সঙ্গে -সঙ্গে ইকাবোরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন ইকাবো মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর পাখির মতো শিস দিল। শিসের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। হঠাৎ বনের অন্ধকার থেকে তিনজন ইকাবো ওদের সামনে এসে দাড়াল। ইকাবোরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস ওদের কাছে গিয়ে ছোটার ইঙ্গিত করল। যারা বনের আড়াল থেকে বেরিয়েছিল তারা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল ইকাবোরা পাখির মতো শিস দিয়ে পরস্পরকে সঙ্কেত দিতে পারে।

আবার ওরা চলতে লাগল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও একজন ইকাবো লতার ফাঁদে আটকে গেল। এক ঝটকায় সে উঠে গেল ওপরে। মাথা নীচে ঝুলতে লাগল। আর একজন ইকাবো দ্রুত গাছের কাণ্ড বেয়ে উঠে গেল। যে ডাল থেকে ফাঁদটা ঝুলছিল সেই ডালটা ধরে ঝুঁকে ঝুলন্ত লতাটা কামড়াতে লাগল। একটু পরেই লতাটা ছিঁড়ে গেল। ফাঁদে আটকানো ইকাবোটিও মাটিতে পড়ে গেল।

আবার চলা শুরু হলো। কিছুদূর যেতেই একটা ঝর্ণার কাছে এল ওরা। ফ্রান্সিস সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল। আঁজলায় জল ভরে ও জল খেতে লাগল। একে একে সবাই জল খেল। বিস্কো বলল—' এই ঝর্ণা থেকেই জল নিয়ে ফিরছিলাম আমরা।"

'তাহলে কাছেই জলের পিপে দুটো আছে। ও দু'টো পেলে আমরা জল ভরে নিয়ে যাব।"

ওরা চলল। কিছুটা এগোতেই জ্যোৎস্নার ভাঙা আলোয় দেখল পিপে দুটো পড়ে আছে। একটায় জলভরা আছে। অন্যটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ফ্রান্সিস, বিস্কো আর ফার্নান্দো পিপেটা নিয়ে ঝর্ণার দিকে ফিরে গেল। একটু পরেই জলভর্তি পিপেটা নিয়ে ফিরল। ওরা একটা পিপে আর ইকাবোরা অন্য পিপেটা নিয়ে চলতে শুরু করল। ফ্রান্সিস এদিক-ওদিক নজর রেখে চলল— যদি হারানো তরোয়ালটা পাওয়া যায়। কিন্তু নজরে পড়লো না। মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর।

বনের মধ্যে ত্রিস্তানদের ফাঁদ এড়িয়ে ওরা যখন সমুদ্রের ধারে পৌঁছল তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। ওদের ভাগ্য ভাল দেখল তিনটি নৌকাই গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা আছে। গাছের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল বলেই নৌকাগুলো ত্রিস্তানদের নজরে পড়েনি। নৌকায় কাঠের বৈঠাও রয়েছে। ওরা ধরাধরি করে পিপে দু'টো একটা নৌকায় তুলল। সেটাতে রইল বিস্কো। ফ্রান্সিস এবার ইকাবোদের ইঙ্গিত করল ওদের সঙ্গে যাবার জন্য। কিন্তু ওরা মাথা ঝাঁকাল। আঙুল দিয়ে বনটা দেখাল। অর্থাৎ ওরা বনে ফিরে যাবে। ফ্রান্সিস ওদের সঙ্গে হাত মেলাল। তারপর একটা নৌকায় গিয়ে উঠল। অন্যটায় উঠল ফার্ণান্দো। নৌকা ছেড়ে দিল। একটা পাক খেয়ে নৌকো ঢেউয়ের ওপর নাচতে- নাচতে চলল। ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে আর ইকাবোদের দেখতে পেল না। ওরা বনের মধ্যে চলে গেছে।

ফ্রান্সিসরা যখন জাহাজের গায়ে এসে নৌকা লাগাল তখন ভোর হয়ে এসেছে। জাহাজের রেলিং থেকে ঝুকে হ্যারি ডাকল 'ফ্রান্সিস? 'ফ্রান্সিস উত্তর দিল 'হ্যারি'। তখনই জাহাজে হ্যারির ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি সুরু হয়ে গেল। অনেকেই ঘুম থেকে উঠে রেলিঙ দিয়ে ঝুঁকে ফ্রান্সিসদের দিকে দড়ি ছুড়ে দিল। ফ্রান্সিসরা দড়ি চেপে ধরে রইল। ভাইকিংরা ওদের টেনে টেনে তুলল। একটু পরে কয়েকজন নেমে এসে জলের পিপে দুটোও দড়ি বেঁধে জাহাজে তুলল।

নিজের কেবিনঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখে হাত চাপা দিল। হ্যারি বলল—'তুমি খুব পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম কর- - পরে আসবো।'

ফ্রান্সিস চোখ থেকে হাত সরাল। আস্তে-আস্তে বলল —'আমরা ফিরেছি কিন্তু বাকী দু'জনের কোনো খোঁজ পাইনি।''

'ওদের কি হত্যা করা হয়েছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ত্রিস্তান সেনাপতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক। হয়তো মেরেই ফেলেছে ওদের।'

হ্যারি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। তারপর যখন কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন ফ্রান্সিস বলল — 'বৈদ্যকে একটু পাঠিয়ে দাও তো। বাঁ পা'টা ছড়ে
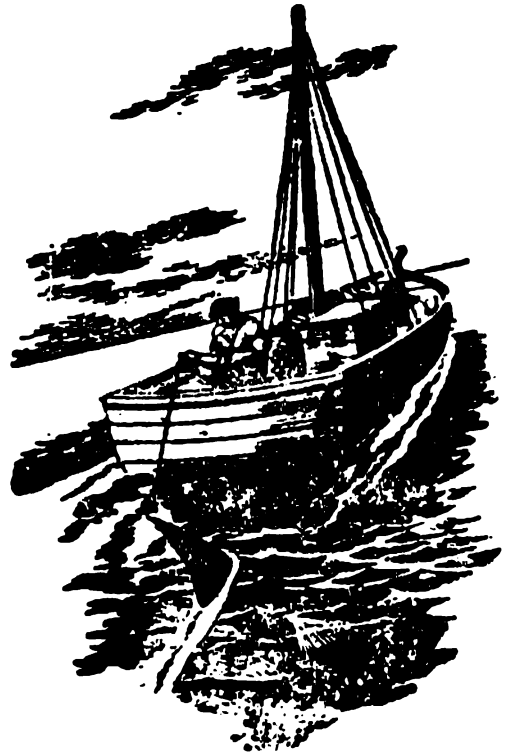
গেছে। সমুদ্রের নোনা জল লেগে জ্বালাটা বেড়ে গেছে। ঘুমোতে পারব 'না।'

'পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঘুমোবার চেষ্টা কর। পরে সব শুনবো।' হ্যারি চলে গেল।

হ্যারির মুখেই ভাইকিংরা ওদের দুই বন্ধুর নিখোঁজ হয়ে যাবার খবর পেল। বন্ধু দু'জনের জন্যে ওদের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। ওরা ধরেই নিল বন্ধু দু'জন বেঁচে নেই।

সেদিন ফ্রান্সিস আর কেবিনঘর থেকে বেরোলো না। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিল। পরের দিন বাইরে এল। ডেক-এ ঘুরে বেড়াল। সবসময়ই ভাবতে লাগল এরপর কী করবো ?

একদিন পরে। সেদিন রাতে ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারী করছিল। হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বিস্কোদের নিয়ে পালাবার কাহিনী হ্যারি শুনছিল। ও কাছে আসতে ফ্রান্সিস বলল--'হ্যারি একটা বুদ্ধি দাও।'

'কী ব্যাপার ?' হ্যারি জানতে চাইল।

'এখন কি করবো ?'

'মনে হয় রাজপুত্র মোকার সঙ্গে আগে কথা বল। ও কী বলে শোনা যাক।'

তখন দু'জন ভাইকিং হালের কাছে শুয়ে ছিল। হ্যারি তাদেরই একজনকে পাঠাল মোকাকে নিয়ে আসতে।

একটু পরেই মোকা এল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ফ্রান্সিস বলল —'মোকা—কঙ্কাল দ্বীপে আমাদের বন্দী হওয়া, পালানো সব কথাই তোমাকে বলেছি।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল— 'সত্যি কথা বলি এবার। মোকা— আমরা এবার রূপোর নদী খুজে বের করতেই এখানে এসেছি।'

মোকা চুপ করে কোনো কথা না বলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল— কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কঙ্কাল দ্বীপ এখন ত্রিস্তানদের দখলে। কাজেই রূপোর নদীর খোঁজ করা এখন অসম্ভব।

মোকা বলল — 'ত্রিস্তানরা ভীষণ হিংস্র। আমাদের ওপর চরম অত্যাচার করেছে। যদি আপনারা আমাদের সাহায্য করেন তবে আমরা কঙ্কাল দ্বীপ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারব।'

'আচ্ছা' যদি আমরা নদী খুঁজে বের করতে পারি নিশ্চয়ই অনেক রূপো পাবো। সেসব কি আমরা নিয়ে যেতে পারবো ?

মোকা কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল। তারপর মাথা তুলে বলল—'এসব নির্ভর করছে কতটা রূপো আপনারা পাবেন তার ওপর। আপনারা বাবার আর আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এতেই আমরা আপনাদের কাছে ঋণী। এরপরে যদি ত্রিস্তানদের পরাজিত করতে আমাদের সাহায্য করেন তা'হলে আমাদের কৃতজ্ঞতা আরো বাড়বে। তখন আপনারা যদি রূপো চান মানে যতটা পারেন ততটাই চান তা'হলেও আমরা তো না করতে পারবো না।'

'না মোকা।' তোমাদের অসন্তুষ্ট করে আমরা কিছু নেব না।'

'বেশ।' মোকা বলল।

'দেখ মোকা —ত্রিস্তানরা আমাদের দু'জন বন্ধুকে বন্দী করেছে। তারা বেঁচে আছে, কি তাদের মেরে ফেলা হয়েছে এখনও জানি না। যদি ত্রিস্তানরা ওদের মেরে থাকে তা'

হলে একজন ত্রিস্তানকে আমরা ফিরে যেতে দেব না । যদি না মেরে থাকে এবং ওদের জাহাজে ফিরে আসতে দেয় তা'হলে তো অন্যায়ভাবে ত্রিস্তানদের কোন ক্ষতি আমরা করবো না । তোমাদের সমস্যা তোমরাই মেটাবে ।'

মোকা মাথা নীচু করে কি ভাবল । তারপর বলল— আমি নিশ্চিত যে ত্রিস্তানরা ওদের মেরে ফেলেছে। যদি না মেরে থাকে তা'হলে নিশ্চয়ই সেনাপতি কোন চাল চেলেছে। তবে এটা সত্যি, ওদের বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই।

'আমারাও সেই কথাই ভাবছি।' ফ্রান্সিস বলল।

'এখন কী করবেন ভাবছেন?' মোকা জানতে চাইল।

'দু'একটা দিন যাক। এর মধ্যে ওরা না ফিরলে ওদের মুক্ত করতে আমরা ত্রিস্তানদের আক্রমণ করবো।'

'বেশ।' মোকা আর কিছু বলল না। চলে গেল।

পরদিন রাত্রে ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে। একা। হ্যারি আসেনি তখনও।

হঠাৎ কঙ্কাল দ্বীপের দিকে চোখ পড়তে ফ্রান্সিস চমকেউঠল। কঙ্কাল দ্বীপের বনে আগুনের লাল আভা। বোঝা যাচ্ছে সে আগুন ছড়াচ্ছে। আকাশে চাঁদ অনেকটা উজ্জ্বল। সেই বন থেকে জ্যোৎস্নায় আলোকিত আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। ফ্রান্সিস দ্রুত কেবিন ঘরের দিকে ছুটল । হ্যারিকে ডেকে নিয়ে এল । হ্যারি সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল — 'এ আগুন হঠাৎ লাগেনি । ত্রিস্তানরা লাগিয়েছে । তুমি বলেছিলে বনে আত্মগোপনকারী কয়েকজন ইকাবোকে তুমি দেখেছো । আরো অনেক ইকাবো নিশ্চয়ই ঐ বনে আত্মগোপন করে আছে । এই আগুন লাগানোর উদ্দেশ্য হলো ওদের পুড়িয়ে মারা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ছুটোছুটি করতে দেখে ডেকের ওপর শুয়ে-থাকা কয়েকজন ভাইকিং-এর ঘুম ভেঙে গেল । ওরা উঠে এসে ফ্রান্সিসের কাছে দাঁড়াল । আগুন দেখল । কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ভাইকিংরা জানতে পারল কঙ্কাল দ্বীপে আগুন লেগেছে । সবাই ডেক-এ এসে জড়ো হলো । রাজপুত্র মোকাও এল । আগুন দেখে ও পাগলের মত ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে । ফ্রান্সিসের হাত দুটি ধরে কাঁদো- কাঁদো স্বরে ও বলে উঠল—' আপনারা ইকাবোদের বাঁচান '

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল — 'দেখ মোকা— ওরা যদি সাঁতরে এসে জাহাজে আশ্রয় নেয় আমরা ওদের আশ্রয় দেব, খাদ্য দেব । কিন্তু ওদের জন্য এগিয়ে গেলে আমরা ত্রিস্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবো । এটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না ।'

'কি বলছো ফ্রান্সিস— হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল'— 'চোখের সামনে লোকগুলো পুড়ে মরবে আর আমরা বসে থাকবো ?'

'ভুলে যেও না হ্যারি আমাদের দুজন বন্ধু এখনও ত্রিস্তানদের হাতে বন্দী ।'

'ঠিক । কিন্তু তুমি এখন জানো না ওরা বেঁচে আছে না হত্যা করা হয়েছে ।'

'কিন্তু'—

'কোনো কিন্তু নয় ফ্রান্সিস । ভালো করে তাকিয়ে দেখ, জ্বলন্ত বনের আগুনের আলোয় দেখ— ত্রিস্তানদের ক্যানো নৌকাগুলো ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে । ইকাবোরা সাঁতরে এসেও প্রাণ বাঁচাতে পারবে না ।'

ফ্রান্সিস কঙ্কাল দ্বীপের দিকে তাকাল । আগুনের আভায় আর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায়

দেখল কয়েকটা ক্যানো নৌকা ঐ বনের কাছে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস সব ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকাল। চেঁচিয়ে বলল— 'একদল দাঁড়ঘরে চলে যাও। জাহাজ দ্বীপের দিকে নিয়ে চল। আর একদল অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে এস। পাঁচটা নৌকাই জলে ভাসাও।' একটু থেমে ডাকলো — 'শাঙ্কো'

শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল— 'তুমি তীর ধনুক নিয়ে আমার নৌকোয় চলো।' মোকা এগিয়ে এল। বলল— 'আমিও আপনার সঙ্গে যাবো!'

'বেশ'— ফ্রান্সিস বলল। দাঁড় বাওয়া শুরু হলো। জাহাজ আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে।

দ্বীপের কাছাকাছি এসে জাহাজ থামানো হলো। হ্যারির অনুমানই ঠিক। যেসব ইকাবোরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে পালাতে চাইছে, ত্রিস্তানরা ক্যানো নৌকো থেকে তাদের বুকে পিঠে কাঠের বর্শা বিঁধিয়ে দিচ্ছে।

পাঁচটা নৌকোই জলে নামানো হলো। তরোয়োল, বল্লম হাতে ভাইকিংরা ত্রিস্তানদের ক্যানোগুলো লক্ষ্য করে এগোতে লাগল।

একেবারে সামনের নৌকোটায় ফ্রান্সিস, মোকা আর শাঙ্কো। ক্যানোগুলোর কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিস বলল—'শাঙ্কো—বর্শা হাতে ক্যানোয় দাঁড়ানো ত্রিস্তানদের মারো। নৌকো দুলছে। নিখুঁত নিশানা নিয়ে মারবে। তীর যেন বাজে খরচ না হয়।' নৌকোগুলো এগিয়ে চলল।

তখনই মোকা নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত গোল করে মুখের কাছে এনে তীক্ষ্ণ সুরে শিস দিতে লাগল। ও থামলেই বনের দিক থেকেও অমনি শিসের শব্দ ভেসে এল। বেশ কয়েকবার মোকা শিস দিল। বনের দিক থেকেও শিসের শব্দ ভেসে এল। মোকা নৌকোয় বসে পড়ল। বলল—'ফ্রান্সিস—আমার সঙ্কেত ওরা পেয়েছে। সঙ্কেতে বলেছি আমি আর বাবা বেঁচে আছি। ওরা যেন সাঁতরে জাহাজে আশ্রয় নেয় জাহাজের লোকেরা আমাদের বন্ধু।'

ওদিকে ভাইকিংরা তরোয়াল বল্লম হাতে ত্রিস্তানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। নৌকো আর ক্যানোর ওপর লড়াই শুরু হলো ত্রিস্তানদের সঙ্গে।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের নির্দেশে ত্রিস্তানদের লক্ষ্য করে নিঁখুত নিশানায় তীর ছুঁড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কিছু ত্রিস্তান যোদ্ধা মারা পড়ল। আরোহীহীন ত্রিস্তানদের ক্যানোগুলো এখানে-ওখানে ঢেউয়ে দোল খেতে লাগল। সেগুলোতে সাঁতরে এসে ইকাবোরা উঠতে লাগল।

বেগতিক বুঝে ত্রিস্তানরা ক্যানো নিয়ে পালাতে লাগল। আধঘন্টার মধ্যে ত্রিস্তানরা

বেশ কিছু মরল, বাকিরা প্রাণভয়ে পালাল ক্যানোয় চড়ে।

মোকা নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ইকাবোদের ভাষায় কী বলতে লাগল। ইকাবোরা সাঁতরে চলল জাহাজে। কেউ-কেউ ভাইকিংদের নৌকোয় উঠে পড়ল। মোকা একবারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন আহত ইকাবোকে নৌকোয় নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস দেখল বনের আগুন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তবে আকাশে এখনো কালো ধোঁয়া উঠছে। ও নৌকোয় উঠে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল—'ভাইসব—জাহাজে ফিরে চল।'

সব ভাইকিংরা চেঁচিয়ে উঠল—'ও-হো-হো। জাহাজেও শোনা গেল প্রতিধ্বনির মতো—ও-হো -হো।

আস্তে-আস্তে নৌকোগুলো জাহাজের দিকে ফিরে যেতে লাগল।

সব ইকাবোদের জাহাজে আশ্রয় দেওয়া হলো। অনেক ইকাবোদের গা-হাত-পা পুড়ে গিয়েছিল। ভাইকিংরা কয়েকজন আহত হয়েছিল। জাহাজের বৈদ্য তাদের চিকিৎসার ভার নিল।

এসব তদারকি করতে হলো হ্যারিকে। ফ্রান্সিস নিজের কেবিনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ও।

একটু বেলায় ওর ঘুম ভাঙল। সকালের খাবার খেয়ে ও ডেক-এ উঠে এল। দেখল আহতরা এখানে-ওখানে শুয়ে আছে কম্বল পেতে। হ্যারি সব দেখাশুনো করছে।

একপাশে দেখল মোকা বসে আছে। ওর পেছনে রেলিঙে রোদে শুকোচ্ছে রাজার সেই গায়ের কাপড়টা। মোকা চড়া রোদের মধ্যে বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল—'মোকা, তুমি ছায়ায় গিয়ে বসো।'

মোকা রাজার গায়ের কাপড়টা আঙুল দিয়ে দেখাল।

'ওটা তো তোমার বাবার গায়ে থাকে। ভিজল কী করে?'

'কাল রাত্রে ওটা গায়ে দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। একজন আহত ইকাবোকে বাঁচাতে জলে নেমেছিলাম। তাই ভিজে গিয়েছিল। এই কাপড়ের নাম কোহালহো।'

'ঠিক আছে, ওটা শুকোক — তুমি ছায়ায় গিয়ে বসো।' মোকা মাথা নাড়ল। বলল—'ঐ কোহালহো গিয়ানির মন্ত্রপূত। আমাদের রাজবংশে বহুকাল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোনোমতেই ঐ কোহালহো আমরা কাছছাড়া করি না। আমাকে এ রোদেই বসে থাকতে হবে।'

ফ্রান্সিস কাপড়টাকে একটা সাধারণ গায়ে দেবার কাপড় ভেবেছিল। বলল—'কাল রাতে তুমি ওটা গায়ে দিয়েছিলে কেন?'

'আমাদের নিয়ম রাজবংশের যে যুদ্ধে যাবে তাকেই এই পবিত্র কোহালহো গায়ে দিয়ে যেতে হবে। কালকে আমি গিয়েছিলাম, তাই যুদ্ধে জয় হয়েছে।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—'তাহলে ত্রিস্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা হেরে গেলে কেন?'

'ওরা হঠাৎ আক্রমণ করেছিল। বাবা পবিত্র কোহালহো গায়ে দিয়ে বেরোবার আগেই বন্দী হন।'

'হুঁ।'

ফ্রান্সিস একটু কৌতূহলী হলো। রেলিঙে মেলে দেওয়া কোহালহোটা দেখতে লাগল। নারকেলের আঁশ থেকে তৈরী মোটা কাপড়। তা'তে ছবির মতো কিছু নক্সা আঁকা। রাজামশাই

কোহালহো ভাঁজ করে গায়ে দেয়। তাই নক্সা বোঝা যায়নি। এখন ভাঁজ খুলে মেলে দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সিস কাছে গিয়ে ভালো করে দেখল কাপড়টা। ওটাতে কিছু ছবির মতো নক্সা আঁকা। তিনটি রঙ তাতে। সাদা, গেরুয়া আর সবুজ।

নক্সা ছবিটা দেখতে একরকম—

ফ্রান্সিস নক্সা ছবিটা দেখল। অতীতের কঙ্কাল দ্বীপের কোনো আদিবাসী ইকাবো এঁকেছে। আনাড়ির হাতে আঁকা নক্সা। বোঝাই যাচ্ছে কাপড়টাই বহুদিনের পুরোনো। রঙ নক্সা সবই অস্পষ্ট। যেদিকে ওটা ভাঁজ করা থাকে সেদিকের রঙ অনেকটা স্পষ্ট।

একটু বেলা হয়েছে তখন। হঠাৎ বিস্কো ছুটতে-ছুটতে ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—'ফ্রান্সিস, শিগগির এসো। ত্রিস্তানরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।'

ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল ডেক-এর সিঁড়ির দিকে। ছুটে ডেক-এর রেলিঙে এসে দাঁড়াল। দেখল, কঙ্কাল দ্বীপ থেকে অনেকগুলো ক্যানো নৌকো ওদের জাহাজের দিকে আসছে। দু'দিক দু'সার ক্যানো নৌকো। মাঝখানে দু'টো নৌকো একটা কাঠের পাটাতন দিয়ে বাঁধা। তার ওপর কাঠের সিংহাসনটা পাতা সেনাপতি বসে আছে। সেনাপতির হাতে তরোয়াল। তার পেছনে দুটি ত্রিস্তান যোদ্ধার হাতেও তরোয়াল। ফ্রান্সিস বুঝল ওদের ফেলে-আসা তরোয়াল ওরা পেয়েছে।

সেনাপতির নৌকো দুটোর পেছনে একটা ক্যানো নৌকো। এখানে ভাইকিং এর পোষাক পরা কারা দু'জন বসে আছে? ফ্রান্সিস চমকে উঠল—একি। ওদেরই দু'জন বন্ধু। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল দু'জনেরই হাত-পা বাঁধা। দুই বন্ধুকে দেখে জাহাজের ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো—।' দূর থেকে বোঝা গেল দুই বন্দী বন্ধু ম্লান হাসল। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে ওরা। যাক, বেঁচে আছে। ফ্রান্সিস এতেই খুশী হলো। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারল না—সেনাপতির মতলবটা কী?

জাহাজের কাছাকাছি এসে সব ক্যানো নৌকো থেমে গেল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—'হ্যারি।' হ্যারি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—'ওদের মতলবটা ঠিক বুঝছি না। সবাইকে বলো তৈরী হতে। অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে ডেক-এ রাখো। কিন্তু ওরা যেন টের না পায়।'

ফ্রান্সিসের নির্দেশমত সবাই তৈরী হলো। ডেক-এ রাখা হলো অস্ত্রশস্ত্র।

একটা ক্যানো নৌকো এগিয়ে এল। দেখা গেল তা'তে দাঁড়িয়ে আছে অল্প অল্প স্প্যানিশ ভাষা বলতে পারে সেই বৃদ্ধটি। ক্যানো নৌকোটা জাহাজের খুব কাছে এল। বৃদ্ধটি চেঁচিয়ে বলল—'যুদ্ধ নয়—বিনিময়—এসেছি।'

'কীসের বিনিময়?' ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'সংবাদ—রাজা, রাজপুত্র মোকা—জীবিত—জাহাজে।'

'কী করে বুঝলেন?'

'কাল রাত্রে—মোকা—যুদ্ধ—শিস দিয়ে নির্দেশ—। তা'হলে রাজাও জীবিত—

জাহাজে।'

বিস্কো চেঁচিয়ে বলল—'রাজা, রাজপুত্র কেউ আমাদের জাহাজে নেই।'

বৃদ্ধ দোভাষীটি সেনাপতিকে সে কথা বলল বোধহয়। সেনাপতি কী বলল। বৃদ্ধটি চেঁচিয়ে বলল— 'সেনাপতি বলেছেন— মিথ্যে বললে – চোখের সামনে বন্দী দু'জন— হত্যা।'

ফ্রান্সিস এবার বিনিময় কথাটার অর্থ বুঝল । বলল— ' বেশ – রাজা আর রাজপুত্র জীবিত । আমাদের জাহাজে আছে ।'

'তা' হলে' – বৃদ্ধ দোভাষী বলল—'রাজা- রাজপুত্রকে দিন— দু'জন বন্দী নিয়ে যান।'

ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল— এই সুযোগ । জীবিত অবস্থায় বন্ধু দু'টিকে ফিরে পেতে গেলে বুদ্ধি খাটাতে হবে । বলল— 'বেশ আমরা রাজি । কিন্তু কথা দিন রাজা ও রাজপুত্রকে আপনারা প্রাণে মারবেন না ।'

কথাটা বৃদ্ধ সেনাপতিকে বলল । সেনাপতি উত্তরে কী বলল । বৃদ্ধ বলল— ' সেনাপতি বলেছেন – আমাদের ব্যাপার— আপনারা বিদেশী— কোনো কথা নেই ।'

' বেশ – রাজপুত্রের সঙ্গে কথা বলি । তারপর বলছি ।' আসলে ফ্রান্সিস ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা ভাবছিল । একটু সময় চাই যার জন্যে ।

ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে মাথা নীচু করে কয়েকবার পায়চারি করল ডেক-এর ওপর। হ্যারি কাছেই ছিল । পায়চারি থামিয়ে বলল –'হ্যারি— উপায় বাতলাও ।'

'রাজা আর রাজপুত্রকে পেলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলবে ।'

'এ তো জলের মতো পরিষ্কার ।'

'ওদের হাত থেকে বন্ধুদের উদ্ধার করতে হবে আবার রাজা-রাজপুত্রকেও বাঁচাতে হবে ।'

'কিন্তু কী করে ।'

'আমি একটা উপায় ভেবেছি ।'

'হুঁ' । বলো ।'

'পরিকল্পনাটা এ'রকম— জাহাজ থেকে দু'টো দড়ি ঝুলবে ।'

'বেশ।'

'একটা দড়ি বেয়ে আমাদের এক বন্ধু জাহাজে উঠে আসবে । অন্য দড়িতে রাজাকে নামিয়ে দেওয়া হবে । তারপর অন্য বন্ধু আর রাজপুত্র।'

'বুঝলাম । তারপর?'

'রাজা আর রাজপুত্র নৌকায় নেমে ওরা কিছু বোঝার আগেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে । কাছেই জাহাজ, ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজ পেরিয়ে ওপাশে ভেসে উঠবে । ওরা রাজা আর রাজপুত্রকে আক্রমণ করার আগেই আমরা ওদের জাহাজে তুলে নেব।"

'সাবাস হ্যারি।' ফ্রান্সিস হেসে হ্যারির কাঁধে এক চাপড় মারল । তারপর দু'জনে চলল রাজা আর রাজপুত্রের কেবিনের দিকে । কেবিনে ঢুকে দেখল রাজা মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে আছে । রাজপুত্র শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে । চোখে মুখে মৃত্যুভীতি । ফ্রান্সিস ওর কাঁধে হাত রাখল । বলল—'বিপদের সময় সাহস হারাতে নেই ।' তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত পরিকল্পনাটা বলল। মোক্যার মুখচোখ উজ্জ্বল হলো। ফ্রান্সিস বলল—

কিছছু ভয় পেও না। আমরা আছি। এছাড়া আমাদের বন্ধুদের বাঁচাবার অন্য কোনো পথ নেই। এখন তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলো। ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজ পেরোতে পারবেন কিনা বলে দেখ।'

মোকা রাজামশাইকে সব বুঝিয়ে বলল। রাজামশাই সব শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে কি সব বলে গেল। মোকা বলল—'বাবা বলছেন—আপনাদের পরিকল্পনা খুব সুন্দর হয়েছে। উনি ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজ পেরোতে পারবেন।'

এ সময় রাজামশাই মোকাকে কিছুক্ষণ ধরে কী বললেন। মোকা বলল—'বাবা বলছেন ভবিষ্যৎ কী ঘটবে জানা নেই—কাজেই উনি আমাকে কোহালহো পরিয়ে অভিষেক করতে চান। জাহাজে তো অনেক ইকাবো আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সামনেই তিনি এই অনুষ্ঠান করবেন।'

'বেশ—'

ফ্রান্সিস বলল—'তোমার বাবাকে ডেক-এ নিয়ে চলো।'

ওরা সবাই ডেকে-এসে দাঁড়াল।

যে সব আহত, আগুনে-পোড়া এবং সুস্থ ইকাবোরা জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিল তারা রাজাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। দু'হাত সোজা ওপরে তুলে মাথা নীচু করে রাজাকে অভিনন্দন জানাল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

রাজা সকলের দিকে একবার তাকিয়ে ইকাবোদের ভাষায় কিছুক্ষণ বলে গেলেন। তারপর নিজের গায়ের কোহালহো মোকার গায়ে পরিয়ে দিলেন। গলায় নারকেলের দড়িটা ফিতের মতো বেঁধে দিলেন।

মোকা রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। উপস্থিত ইকাবোরা খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল। জাহাজের রেলিঙে ঝুঁকে একজন ইকাবো কিছুক্ষণ ধরে নানা সুরে শিস দিল। বোধহয় সাঙ্কেতিক শিস দিয়ে ও কঙ্কাল দ্বীপের ইকাবোদের এই সংবাদ জানাল।

ওদিকে সেনাপতি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। ফ্রান্সিস এত দেরি করছে কেন? ফ্রান্সিস সেটা বুঝতে পারল। এবার ও রেলিঙের ধারে এগিয়ে এল। ও দোভাষী বৃদ্ধকে কীভাবে কেমন করে বন্দীদের জাহাজে তোলা হবে—রাজা আর রাজপুত্রকে নামানো হবে, সব বুঝিয়ে বলতে লাগল।

আর হ্যারি ওদিকে জাহাজের ওপাশে শক্ত কাছি ঝুলিয়ে দিল। সবাইকে তৈরী থাকতে বলল।

ফ্রান্সিসের কথা দোভাষী সেনাপতিকে বুঝিয়ে বলল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সেনাপতি। ফ্রান্সিস সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেনাপতির সম্মতির ওপর সব নির্ভর করছে। একটু পরে সেনাপতি কী যেন বললেন। দোভাষী বলল—'সেনাপতি রাজী হয়েছেন। তবে ওঠা-নামার দড়ি থাকবে পাশাপাশি।'

'বেশ।' ফ্রান্সিস বলল। ওদিকে সেনাপতির একজন দেহরক্ষী হাতের তরোয়াল দিয়ে ভাইকিং বন্দীদের হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

ফ্রান্সিস তখনই শাঙ্কোকে ইশারায় ডাকল। ও কাছে আসতে ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—'আমার কাছে থাকো। আমার কথামত তীর ছুঁড়বে। নিশানা যেন নিখুঁত হয়।'

শাঙ্কো তীর-ধনুক নিয়ে ফ্রান্সিসের আড়ালে এসে দাঁড়াল।

বন্দী দু'জন ভাইকিংদের নিয়ে ক্যানো নৌকোটা একজন ত্রিস্তান যোদ্ধা জাহাজের

গায়ে এসে লাগল।

কাছিতে ফাঁসমত পরিয়ে, তাতে রাজাকে বসিয়ে নামিয়ে দেওয়া হলো আস্তে আস্তে ক্যানো নৌকোর ওপর। অন্য কাছি ধরে বন্দী ভাইকিংটি জাহাজে উঠে এল। জাহাজে নামতেই কয়েকজন ভাইকিং ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল।

এবার রাজপুত্র মোকা। দ্বিতীয় ভাইকিং বন্ধুটিকে তোলা হতে লাগল জাহাজে। ও জাহাজে উঠল। সবাই ওকে ঘিরে ধরল।

মোকা নামতে লাগল। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেনাপতির দিকে। সে কোনো ইঙ্গিত করে কিনা। দেখল, সেনাপতি চুপ করেই বসে আছে। রাজা ও রাজপুত্র দু'জনেই তো এখন তার হাতের মুঠোয়।

মোকা ক্যানো নৌকোতে নেমেই চাপাস্বরে বোধহয় বাবাকে কিছু বলেই পাক খেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজাও ঝাঁপ দিতে গেলেন। কিন্তু একটু দেরি হলো। ততক্ষণে ক্যানো নৌকোয় বসা ত্রিস্তান যোদ্ধাটি কাঠের বর্শা তুলে ছুঁড়ে মেরেছে রাজার বুক লক্ষ্য করে। ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠল—'শাঙ্কো।' শাঙ্কো সঙ্গে-সঙ্গে তীর ছুঁড়ল। তীর গিয়ে লাগল ত্রিস্তান যোদ্ধার ডান কাঁধে। কিন্তু ততক্ষণে বর্শা ছোঁড়া হয়ে গেছে। বর্শা বিঁধেছে রাজার বুকে। ক্যানো নৌকো থেকে গড়িয়ে জলে পড়ে গেলেন। ওখানকার জল লাল হয়ে উঠল। ত্রিস্তান যোদ্ধাটি বাঁ হাতে কাঁধ চেপে নৌকোয় বসে পড়ল। ওদিকে তিন-চারটি ক্যানো নৌকো মোকাকে খুঁজতে লাগল বর্শা উঁচিয়ে। কিন্তু মোকা আর ভেসে উঠল না। মোকা তখন ডুব-সাঁতার দিয়ে জাহাজ পেরিয়ে জাহাজের ওপারে ঝোলানো কাছি ধরে উঠছে। সাত-আটজন ভাইকিং দ্রুত হাতে কাছি টেনে মোকাকে জাহাজে তুলে নিল।

চোখের পলকে এত ঘটনা ঘটে গেল। সেনাপতি কাঠের সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে কী বলে উঠল। সব ত্রিস্তান যোদ্ধারা বর্শা উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—'শাঙ্কো, সেনাপতিকে।' সঙ্গে-সঙ্গে শাঙ্কোর তীর ছুটল। একেবারে সেনাপতির বুকে গিয়ে বিঁধল। নিখুঁত নিশানা। সেনাপতি দু'হাত তুলে উল্টে পড়ল কাঠের পাটাতনের ওপর। তারপর কাতরাতে লাগল।

এরকম কিছু ঘটবে ত্রিস্তানরা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি। ওরা হকচকিয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। তখনই দোভাষী বৃদ্ধটি চিৎকার করে কী বলে উঠল। তারপর তার ক্যানো নৌকোটা কঙ্কালদ্বীপের দিকে চালাতে লাগল।

আর ক্যানো নৌকোগুলোও ওটার পেছনে-পেছনে চলল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে। মারাত্মক আহত সেনাপতিকে নিয়ে ত্রিস্তান যোদ্ধারা ফিরে গেল কঙ্কালদ্বীপে।

* * *

সেদিনটা কাটল। ফ্রান্সিসরা সারাদিনই সজাগ রইল যদি ত্রিস্তানরা ফিরে আক্রমণ করে তার মোকাবিলা করার জন্যে। কিন্তু ত্রিস্তানরা আর এমুখো হলো না।

বাবার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত রাজপুত্র মোকা চুপ করে বসে রইল আর মাঝে-মাঝেই ওর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। ফ্রান্সিসরা ওকে সান্ত্বনা দিল। বলল—'অল্পের জন্যে তোমার বাবাকে বাঁচাতে পারলাম না। যাকগে— তোমাদের দ্বীপ ত্রিস্তানরা দখল করে আছে। আগে ওদের তাড়াতে হবে। এখন ভেঙে পড়লে চলবে না।'

মোকা ওদের কথায় একটু শান্ত হলো।

ফ্রান্সিস বলতে লাগল—ভাইসব আজ রাত্রেই আমরা কঙ্কালদ্বীপে যাবো।

সন্ধেবেলা ফ্রান্সিস সব ভাইকিংদের ডেক-এ জমায়েত হতে বলল।

সন্ধ্যেবেলা সবাই এসে ডেক-এ বসল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'ভাইসব—আজ রাত্রেই আমরা কঙ্কালদ্বীপে যাবো। ত্রিস্তানরা আমাদের দুই বন্ধুর সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছে। ওরা ত্রিস্তান সেনাপতিকে রূপোর নদীর হদিস বলে দেবে এই ভাঁওতা দিয়ে কোনো রকমে নিজেদের জীবন বাঁচিয়েছে। যা হোক—ত্রিস্তানরা ওদের প্রাণে মারেনি। কাজেই ত্রিস্তানরা আমাদের শত্রু নয়। আমরা ওদের ভয় দেখিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাবো। আমরা আগ বাড়িয়ে ওদের হত্যা করবো না। আক্রান্ত হলে তবেই যুদ্ধ করবো।' ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—'এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে বিশ্রাম করে নাও। গভীর রাত্রে আমাদের যাত্রা শুরু হবে।'

সবাই চলে গেল। ফ্রান্সিসের কথামত খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করতে লাগল।

গভীর রাত্রে নৌকোয় করে যাত্রা শুরু হলো।প্রথম নৌকোটায় গেল ফ্রান্সিস, হ্যারি, বিস্কো আর তীর ধনুক নিয়ে শাঙ্কো। বনের মধ্যে নেমে ওরা অন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে রাত্রে চাঁদ অনেক উজ্জ্বল। সমুদ্রে, বনের মাথায় জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। বোধহয় পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়।

পাঁচটা নৌকোয় দফায়-দফায় ভাইকিংরা আর সুস্থ ইকাবো যোদ্ধারা বনের আড়ালে তীরে নামল। ইকাবোদের হাতে কাঠের বর্শা। ভাইকিংরা তরোয়াল, বর্শা নিল। সবাই যখন এল তখন ফ্রান্সিস মোকাকে বলল—'এই বনে অনেক ইকাবো আত্মগোপন করে আছে। তুমি শিস দিয়ে জানিয়ে দাও যে আমরা ওদের বন্ধু শত্রু নই।'

বনের মধ্যে কিছুটা গিয়ে মোকা উবু হয়ে বসে শিস দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ নানা সুরে শিস দিল।

একটু পরেই দেখা গেল অন্ধকারে বনের আড়াল থেকে একজন দু'জন করে কাঠের বর্শা, গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে তৈরি লাঠি নিয়ে ইকাবোরা বেরিয়ে আসছে। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন ইকাবো এসে ওদের দলে যোগ দিল। সকলেই রোগার্ত। কতদিন না খেয়ে আছে কে জানে।

ফ্রান্সিস সবাইকে লক্ষ্য করে চাপাস্বরে বলল—'আমরা বনের মধ্যে দিয়ে যাবো না। ওখানে ত্রিস্তানরা অনেক ফাঁদ পেতে রেখেছে । আমরা চড়াইয়ের ঢাল বেয়ে উঠবো । আমি না বললে কেউ আক্রমণ করবে না ।' ফ্রান্সিস মোকাকে বলল— 'ইকাবোদের কথাটা বলে দাও ।' মোকা ওদের ভাষায় কথাগুলো বলে দিল । ইকাবো যোদ্ধারা মাথা এপাশ-ওপাশ করল । অর্থাৎ ওরা বুঝেছে ।

বন ছেড়ে সবাই চড়াইয়ের ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল । বেশ দূর পর্যন্ত জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছে ।

কিছুটা এগোতে বাঁ দিকে বনের ধারে আগুন জ্বলছে দেখা গেল । ত্রিস্তান যোদ্ধারা ওখানে দল বেঁধে বসে আছে । দ্বীপের বিচিত্র সব পাখি উড়ে-উড়ে আগুনের কাছে আসছে। ওরা সেসব মেরে পুড়িয়ে খাচ্ছে ।

ফ্রান্সিসের নির্দেশমতসবাই হামাগুড়ি দিয়ে ওদের কাছাকাছি গেল । তারপর ওদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ।

ফ্রান্সিস মোকাকে বলল — 'চেঁচিয়ে ওদের বলো যে ওদেব আমরা ঘিরে ফেলেছি। বাঁচতে হলে ওরা যেন অস্ত্রত্যাগ করে ।'

ফ্রান্সিসের নির্দেশে হঠাৎ সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল । ত্রিস্তানরা পাখি মারতে মারতে হঠাৎ দেখল— কারা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে । তখনই মোকা ত্রিস্তানদের ভাষায় বলতে লাগল—' তোমরা শোন । শুধু আমরা, ইকাবোরা নই, আমাদের দলে আছে ভাইকিংরা। এরা দুর্ধর্ষ জাতি । এদের হাতে তরোয়াল থাকলে এদের সঙ্গে যুদ্ধে কেউ পারে না । আমরা মিছিমিছি রক্তপাত চাই না । তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর । আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না ।'

ওদের মধ্যে কয়েকজন বর্শা উঁচিয়ে ধরেছিল । কিন্তু চারদিক তকিয়ে ভাইকিং আর ইকাবো যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেখে বর্শা নামাল । নিজেদের মধ্যে কী কথাবার্তা বলল। তারপর হাতের বর্শাগুলো মাটিতে ফেলে দিতে লাগল । অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই অস্ত্রত্যাগ করল।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল— 'যাও— বর্শাগুলো নিয়ে এসো । পাহাড়ের কোনো গুহায় গিয়ে রেখে এসো ।'

বিস্কো আর কয়েকজন মিলে বর্শাগুলো আনতে গেল ।

হঠাৎ ফ্রান্সিসদের পেছনে একটা বিরাট পাথরের চাঁয়ের আড়াল থেকে আট দশজন ত্রিস্তান যোদ্ধা বর্শা হাতে ছুটে এল । ফ্রান্সিসরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—'লড়াই' ।' ভাইকিংরা কেউ কেউ হঠাৎ এই আক্রমণে আহত হলো। আক্রমণেব প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে ওরা ঘুরে আক্রমণ করল। ত্রিস্তানরা হাতে বর্শা ছুঁড়ে মারছে। পরক্ষণেই নিরস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ছে। ভাইকিংরা সহজেই ওদের ঘায়েল করতে লাগল তরোয়াল ও বর্শা দিয়ে।

লড়াই অল্পক্ষণেই মিটে গেল। কয়েকজন ইকাবো বন থেকে লতাগাছ নিয়ে এল। তাই দিয়ে ত্রিস্তানদের পিছমোড়া করে হাত বাঁধা হলো।

ফ্রান্সিসরা এবার চলল রাজবাড়ি লক্ষ্য করে। চড়াই দিয়ে হেঁটে ওরা ওপরের দিকে চলল। বসতি এলাকা শুরু হলো। ভাইকিং আর ইকাবো যোদ্ধারা ঘরে ঘরে ঢুকতে লাগল। ত্রিস্তানদের বন্দী করে আনতে লাগল। ত্রিস্তানরা বোধহয় ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি

ওরা আক্রান্ত হবে। ফ্রান্সিস আগেই বলেছিল যেন বেশি গোলমাল না হয়। কিন্তু গোলমাল হৈ চৈ চিৎকার কিছু হলো। তা'তেই রাজবাড়ির পাহারাদার ত্রিস্তানরা সাবধান হয়ে গেল। ওরা গাছ-পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

ফ্রান্সিসরা রাজবাড়িতে পৌঁছে দেখল রাজবাড়ি অরক্ষিত পড়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোতে রাজবাড়ির চারপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—'ত্রিস্তানরা নিশ্চয়ই এখানেই আত্মগোপন করে আছে। তোমরা রাজবাড়ির সামনে জড়ো হও আর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখো। খবরদার—অস্ত্র হাত থেকে নামাবে না।' মোকাও এই কথাগুলো ইকাবো যোদ্ধাদের বলল।

রাজবাড়ির সামনে সবাই জড়ো হলো। তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

মোকা, ফ্রান্সিস আর হ্যারি বাড়ির ভেতর ঢুকল। একটা ঘরে দেখল ম্যাকরেল মাছের তেলের একটা প্রদীপ জ্বলছে। তাসক ঘাসের একটা বিছানা। তাতে গাছের নরম ছাল বিছানো। কে একজন শুয়ে আছে।

ফ্রান্সিস দ্রুত ছুটে গিয়ে লোকটার গলায় তরোয়াল চেপে ধরল। দেখল—আহত সেনাপতি। সেনাপতি ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। ফ্রান্সিস তরোয়াল সরিয়ে নিল। মোকাকে বলল—'সেনাপতিকে বলো—ওর দলের প্রায় সবাই বন্দী। আমরা রক্তপাত চাই না। ওরা এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাক।' মোকা সেনাপতিকে ত্রিস্তান ভাষায় সে কথা বলল। সেনাপতি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। বিড়বিড় করে বললো—'আমরা চলে যাবো।'

ঘরের আর এক কোণায় অন্ধকার আর একটা বিছানা ছিল। সেখানে শুয়েছিল দোভাষী বৃদ্ধটি। সে এবার উঠে আলোর কাছে এল। ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে বলল—'সেনাপতি অসুস্থ—গুরুতর। আমাদের সৈন্যদের হত্যা করবেন না। কাল এই দ্বীপ ছেড়ে যাব।

ফ্রান্সিস বলল—'আক্রান্ত না হলে আমরা কাউকে আক্রমণ করি না। ত্রিস্তান যোদ্ধারা কিছু আহত হয়েছে কিন্তু কাউকে আমরা মারিনি। শুধু বন্দী করেছি।'

ঠিক তখনি বাইরে জোর চিৎকার হৈ চৈ শোনা গেল। লুকিয়ে থাকা ত্রিস্তানরা আক্রমণ করেছে। জোর লড়াই চলল বাইরে। বেশ কিছুক্ষণ। আবার চারিদিক নিঃশব্দ। শুধু আহতদের আর্তনাদ মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল।

ফ্রান্সিসদের নির্দেশে সব ত্রিস্তানদের হাত বেধে একটা গুহায় রাখা হল। পূর্বদিকের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। আহত ভাইকিং আর ইকাবোদের নৌকা করে জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সকাল হলো । দোভাষী বৃদ্ধটি ফ্রান্সিসকে এসে বলল-'চিকিৎসক-সেনাপতির চিকিৎসা।'

লুকিয়ে থাকা ত্রিস্তানরা

ফ্রান্সিস তখনই ফার্নান্দোকে জাহাজে পাঠাল। কিছুক্ষণ পরে জাহাজের বৈদ্য এল। সেনাপতির বুকের ক্ষত পরীক্ষা করল । ওষুধ দিয়ে পট্টি বেঁধে দিল । দোভাষী বৃদ্ধ ফ্রান্সিসকে বারবার ধন্যবাদ জানাল ।

একটু বেলা হতে সেনাপতি বৃদ্ধ দোভাষীকে ডেকে কী বলল । বৃদ্ধ ফ্রান্সিসকে এসে বলল– সেনাপতি সুস্থ বোধ করছেন । ত্রিস্থান বন্দীদের ছেড়ে দিন । আমরা রওনা হব ।

ত্রিস্তান বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো । ওরা সবাই সমুদ্রের ধারে এসে জড়ো হলো । সারি সারি ক্যানো নৌকা রাখা হলো । প্রথমে আহতদের নৌকোয় তোলা হল । আহত সেনাপতিকে কয়েকজন কাঁধে করে নিয়ে এল । জোড়াবাঁধা দু'টো ক্যানো নৌকায় পাটাতনে সেনাপতিকে শুইয়ে রাখা হল । সঙ্গে রইল বৃদ্ধ দোভাষীটি । তারপর সবাই একে একে ক্যানো নৌকায় উঠতে লাগল । সবাই উঠলে সারি বেঁধে সব নৌকা চলল দক্ষিণমুখো ত্রিস্তানদের দ্বীপের উদ্দেশ্যে ।

দু' একদিনের মধ্যেই কঙ্কালদ্বীপে জীবন ফিরে এল । যারা বনে লুকিয়েছিল তারা সবাই এল । ইকাবোদের ঘরে ঘরে আবার শান্তি ফিরে এল ।

কঙ্কালদ্বীপে রইল শুধু ফ্রান্সিস আর হ্যারি । সব ভাইকিংরা জাহাজে ফিরে গেল ।

সেদিন শেষরাত । ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন । হঠাৎ কয়েকজন ইকাবো এসে ওদের ঘরের সামনে চিৎকার করে কী বলতে লাগলো । ওদের হাতে মশাল। ফ্রান্সিস আর হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল । ফ্রান্সিস উঠেই শিয়র থেকে একটা তরোয়াল নিল। গাছের ডাল কেটে তৈরী দরজার দিকে এগোল । হ্যারিও একটা তরোয়াল নিল । চলল ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে ।

বুনো লতায় বাঁধা দরজাটা খুলে ফ্রান্সিস বাইরে এল । বলল —কী ব্যাপার? যে ক'জন ইকাবো এসেছে তাদের দেখেই ফ্রান্সিস চিনল এরা রাজবাড়ির পাহারাদার। ওরা ফ্রান্সিসকে হাত পা নেড়ে কী বোঝাতে লাগল । ফ্রান্সিস ওদের একটা কথা বুঝল — বন্দী। আর বুঝল ওরা বারবার রাজা মোকার নাম করছে । ওরা রাজবাড়ির দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল । ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল । বলল— 'হ্যারি মনে হচ্ছে মোকা কোনোভাবে বন্দী হয়েছে। রাজবাড়িতে চলো ।'

দু'জনে রাজবাড়ির দিকে চলল । জ্যোৎস্না বেশী উজ্জ্বল নয় । চারিদিকে নিস্তব্ধ । দু'জনে আগে আগে চলল । পেছনে চলল রাজবাড়ির পাহারাদার ।

ওরা রাজবাড়িতে পৌঁছল । ভেতরে রাজা মোকার ঘরে ঢুকে দেখল পাথরের

ওপর বিছানো তাসক ঘাসের বিছানা ছত্রাখান হয়ে আছে। মোকা নেই। ফ্রান্সিস মৃদু আলোয় চারদিকে দেখ্‌ল। ঘর শূন্য। একপাশে পাথরের ওপর ছড়ানো রয়েছে মোকার গায়ের সেই কোহালহোটা।

তখনই পাহারাদারদের মধ্যে কয়েকজন দু'জন পাহারাদারকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। দু'জনই আহত। তার মধ্যে একজনের আঘাত সাংঘাতিক। তখনই একজন পাহারাদার বারবার 'ত্রিস্তান' এই কথাটা বলতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস ব্যাপারটা বুঝতে পারল। রাতে ত্রিস্তানরা এসে মোকাকে ধরে নিয়ে গেছে। ত্রিস্তানরা আবার আসতে পারে। একথা ওরা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু তাই ঘটল। পাহারাদারটি এবার সমুদ্র তীরের দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল ক্যানো নৌকা চালিয়ে ত্রিস্তানরা এসেছিল। কতক্ষণ আগে ধরে নিয়ে গেছে সেটা পাহারাদারদের বারবার জিজ্ঞেস করেও জানতে পারল না। বলল--'হ্যারি— কিছুই বুঝতে পারছি না। কখন ধরে নিয়ে গেল? ওদের দলেই বা কতজন ছিল? যাগ্‌গে, চলো সমুদ্রের ধারে যাওয়া যাক। যদি ওদের ধরা যায়।'

দু'জনে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর দ্রুত ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। সমুদ্রতীরে যেখানে ত্রিস্তানরা ক্যানো নৌকা নিয়ে এসেছিল, পাহারাদাররা সেখানে ওদের দু'জনকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস তাকাল সমুদ্রের দিকে। ত্রিস্তানদের ক্যানো নৌকার চিহ্নমাত্র নেই। অল্প জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছে দূরে সমুদ্রের বুকে পাতলা কুয়াশার আস্তরণ। তার মানে ধরে নিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে।

ফ্রান্সিস বলল — 'হ্যারি কী করা যায় বলো তো?

'মোকাকে ত্রিস্তানদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে।'

'তার মানে যুদ্ধ।'

'হ্যাঁ প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে।'

'আমি যুদ্ধে রক্তপাত এসব এড়াতে চাইছি।'

'বেশ, সে চেষ্টা করা যাক। ত্রিস্তানরা মোকাকে বন্দী করল কেন—কী ওদের উদ্দেশ্য তা তো আমরা জানি না।'

'ভাবছি, কালকেই জাহাজে নিয়ে ত্রিস্তানদের দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হব।'

'দু' একজন ইকাবোকে সঙ্গে নিতে হবে। ওরা ঠিকনিশানা রেখে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে।'

ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল যখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। হ্যারি আবার

শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমলো না। কী করে মোকাকে উদ্ধার করবে তারই পরিকল্পনা করতে লাগলো। পাখির ডাক শোনা গেল। ভোর হলো।

ফ্রান্সিস বিছানা থেকে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে একটা বুনো আনারস খেল। তারপর চলল রাজবাড়ির দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখল অনেক ইকাবো মেয়েপুরুষ সেখানে জড়ো হয়েছে। কেউ কেউ কাঁদছে। ফ্রান্সিস বুঝল— ওরা সত্যিই মোকাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। ফ্রান্সিসকে দেখে কয়েকজন ইকাবো মেয়েপুরুষ ছুটে এল। ফ্রান্সিসের হাত ধরে কী বলেতে লাগল। ওদের মুখে বারবার 'রাজা মোকা কথাটা শুনে ফ্রান্সিস বুঝল ওরা কি বলতে চায়? ফ্রান্সিস রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সবাইকে শান্ত হবার ইঙ্গিত করল। সকলে চুপ করল। ফ্রান্সিস তখন অঙ্গভঙ্গী করে ত্রিস্তানদের দ্বীপ থেকে কী করে মোকাকে মুক্ত করে আনবে সেটা বোঝাল। ও বারবার 'মোকা' 'ত্রিস্তান' আর 'মুক্তি' এই কথা ক'টার ওপর জোর দিয়ে বলল। ইকাবোরা বুঝতে পারলো ফ্রান্সিস মোকার মুক্তির কথাই বলছে। ওরা আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। হাসতে লাগল। ফ্রান্সিসও হাসল। খুশীই হলো— যাক, ইকাবোরা ওর কথা বুঝতে পেরেছে।

ও তখন পাহারাদারদের সর্দারকে ইঙ্গিতে ডাকল। সর্দার কাছে এল। ফ্রান্সিস ওকে ইঙ্গিতে বোঝাল ওরা জাহাজ চালিয়ে ত্রিস্তানদের দ্বীপে যাবে। সর্দার ওদের নিয়ে যেতে পারবে কিনা। কয়েকবার 'মুক্তি' 'ত্রিস্তান' কথাগুলো শুনে সর্দার মাথা ঝাঁকাল। তারপরে নিজের বুকে বারবার ছুইয়ে ও বোঝাল ও ওদের নিয়ে যেতে পারবে।

সেদিন দুপুরেই ফ্রান্সিস হ্যারি আর পাহারাদারদের নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হলো। নৌকো চালিয়ে ওরা ওদের জাহাজে এসে উঠল। সকলেই ওদের ঘিরে ধরল। ঠিক বুঝল না ফ্রান্সিস হঠাৎ এল কেন? ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে বলল— ভাইসব — কাল রাত্রে ত্রিস্তানরা লুকিয়ে কঙ্কাল দ্বীপে এসেছিল। মোকাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। জানি না ওদের উদ্দেশ্য কি? যা হোক আমরা আজকেই জাহাজ নিয়ে যাচ্ছি যাত্রা করতে ত্রিস্তান দ্বীপ লক্ষ্য করে। একজন ইকাবো সর্দারকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যাবার জন্য। এখন সবাই বিশ্রাম করো। রাত হলেই আমরা যাত্রা করব। মোকাকে মুক্ত করাই

আমাদের উদ্দেশ্য ।'

সব ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো ।' তারপর সবাই যে যার কাজে চলে গেল ।

রাতের খাওয়া - দাওয়া শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ হলো । ফ্রান্সিস আর হ্যারি ইকাবো সর্দারকে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল । ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল— 'নোঙর তোল। পাল খাটাও । বাতাস পড়ে গেছে । দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে যাও ।' মুহূর্তে জাহাজে কর্মব্যস্ততা শুরু হলো । ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হলো । কয়েকজন মাস্তুল বেয়ে উঠে গেল ওপরে। পাল খুলে দিল । ইকাবো সর্দারের নির্দেশমতো জাহাজ চলল দক্ষিণ-পশ্চিম-মুখো। আজ জ্যোৎস্না তেমন উজ্জ্বল নয় । আবছা আলোয় পাতলা কুয়াশা ঢাকা সমুদ্রের ওপর দিয়ে, জাহাজ চলল ঢেউ ভেঙে ।

সারারাত জাহাজ চলল । পরের দিন ভোর ভোর সময়ে মাস্তুলের ওপর নজরদার ভাইকিংটি চেঁচিয়ে বলল— 'ত্রিস্তান দ্বীপ দেখা যাচ্ছে ।'

সকালে সমুদ্রের বুকে কুয়াশার পাতলা আবরণ কেটে গেল । দেখা গেল ত্রিস্তান দ্বীপ। দ্বীপে দুটো পাহাড়ের পাথুরে চূড়া দেখা গেল । পাহাড় দুটো একেবারে ন্যাড়া, সবুজের চিহ্নমাত্র নেই । শুধুই নীচের দিকে গাছগাছালির ভীড় । ফ্রান্সিসের পাশেই দাঁড়িয়েছিল হ্যারি । বলল—'একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছো ?'

'কী?' ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল ।

'ডানদিকের চুড়োটার মাথা ভাঙা ।'

'হ্যাঁ, কেমন চ্যাপ্টা মতো ।'

'ওটা আগ্নেয়গিরির মুখ ।' হ্যারি বলল ।

'এখন বোধহয় মৃত।' ফ্রান্সিস বলল ।

'হতে পারে । তবে সেটা কাছে না গিয়ে বলা যাবে না ।'

ফ্রান্সিসের নির্দেশে জাহাজের পাল নামিয়ে ফেলা হলো । দাঁড়িরা দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল । ঘরঘর শব্দে নোঙর ফেলা হলো ।

সবাইকে ডেক-এ আসতে নির্দেশ দিল ফ্রান্সিস । সবাই ডেক-এ এল । ফ্রান্সিস বলল—'ভাইসব— শুধু আমি আর বিস্কো ত্রিস্তান দ্বীপে যাবো । তোমরা সবাই জাহাজে থাকবে ।' দুচারজন আপত্তি তুলল । বলল— 'তোমরা মাত্র দুজন যাবে । এটা বিপজ্জনক।' ফ্রান্সিস বলল— 'তা ঠিক' । তবে আমি প্রথমে যুদ্ধে জড়াতে চাইছি না । আমরা দুজনেই ওদের হাতে ধরা দেব । ওরা নিশ্চয়ই আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাবে । তখনই জানতে পরবো ওদের উদ্দেশ্য কি? তাছাড়া যাকে মুক্ত করতে যাচ্ছি সেই মোকা কোথায় আছে সেটা জানতে পারবো । এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই ।'

ফ্রান্সিস থামলে হ্যারি বলল— 'যদি তোমাদের কাউকে ওরা মুক্তি না দেয় ?'

তখন তোমরা আমাদের মুক্ত করতে যাবে । তিন দিনের মধ্যে আমরা যদি না ফিরি তখন তোমরা আক্রমণ করবে । ফ্রান্সিস থামল । আর কেউ কোনো কথা বলল না। বোঝা গেল, সকলেই ফ্রান্সিসের পরিকল্পনা মেনে নিল ।

কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস আর বিস্কো তৈরী হয়ে এল । কিছু খাবার আর তরোয়াল নিল সঙ্গে । জাহাজ থেকে ঝোলানো দড়ি বেয়ে বেয়ে দু'জনে একটা নৌকায় নেমে এল। দড়ি খুলে নৌকা ছেড়ে দিল । বিস্কো বৈঠা তুলে নিল । নৌকো বাইতে লাগল ত্রিস্তান

দ্বীপের উদ্দেশ্য । ঢেউয়ের ঘায়ে নৌকা ওঠা-পড়া চলল। পরিষ্কার নীল আকাশ । আকাশ সমুদ্র জুড়ে ঝকঝকে রোদ ।

ত্রিস্তান দ্বীপে যেখানে পৌঁছল সে দিকটায় বড় বড় গাছের জঙ্গল । ফ্রান্সিসের নির্দেশে একটা ফাঁকা জায়গায় ওরা নৌকা ভেড়াল ।

তীরে নেমে একটা বড় পাথরের সঙ্গে নৌকার দড়িটা বাঁধল । তারপর দু'জনে এগিয়ে চলল। কয়েক পা এগিয়েছে তখনই জঙ্গল থেকে একদল ত্রিস্তান যোদ্ধা কাঠের বর্শা হাতে ওদের দিকে ছুটে এল ।দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল । যোদ্ধারা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে সর্দার গোছের একজন ত্রিস্তান ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল ।ফ্রান্সিসরাও কিছুই বুঝল না । ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলে সামনের ঘাসে-ঢাকা জমিতে ফেলে দিল। বিস্কোও ফ্রান্সিসের দেখাদেখি তরোয়াল ফেলে দিল। তখন সর্দার গোছের একটা একজনকে কী বলল। সে ছুটে গিয়ে বনের মধ্যে থেকে একটা লতাগাছ নিয়ে এল। পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে লতা দিয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কোর হাত বাঁধল। তারপর সর্দার চলার ইঙ্গিত করল। ওরা দু'জন সর্দারের নির্দেশমতো হাঁটতে লাগল। একজন এদের তরোয়াল দুটো তুলে নিয়ে চলল।

কিছুটা এগোতেই বসতি এলাকা শুরু হলো। বাড়িগুলো সব কাঠ পাথর আর তাসক ঘাসের তৈরি। বাড়িগুলো থেকে ত্রিস্তান স্ত্রী-পুরুষ বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে এল। দেখতে লাগল বন্দী দু'জনকে।

একটু পরেই চারিদিকে পাথরের দেয়াল-ঘেরা একটা বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। বাড়িটা বড় আর মজবুত। বোঝা গেল এটা রাজার বাড়ি।

পাথরের দেয়ালের মাঝখানে একটা উঠোন মতো। সেখানেই ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। সামনেই গাছের ডাল ফালি করে তৈরী একটা সিংহাসন মতো। তাসক ঘাস আর পাখির বিচিত্র পালক দিয়ে তৈরী একটা বসবার আসন।

একটু পরেই দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় মতো একজন লোক বেরিয়ে এল। উপস্থিত ত্রিস্তানরা সকলেই মাথা নোয়াল। বোঝা গেল ইনিই রাজা। মোকার মতো এই রাজার গায়েও একটা কোহালহো। গলায় একটা বিনুনির মতো বাঁধা। কপালে গালে শরীরে উল্কি আঁকা। হাতে একটা সাপের মতো আঁকাবাঁকা লাঠি।

রাজার পেছনে পেছনে যে বৃদ্ধ লোকটি বেরিয়ে এল তাকে দেখে ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিত হলো। বৃদ্ধটি সেই দোভাষী। অল্প অল্প স্পেনীয় ভাষা বুঝতে পারে বলতেও পারে। সে একপাশের একটা পাথরে বসল। রাজা সিংহাসনে বসলে উপস্থিত সব ত্রিস্তানরা বসল। রাজা হাতের বাঁ লাঠিটা ফ্রান্সিসদের দিকে ইঙ্গিত করে তীক্ষ্ণস্বরে কী বলে উঠলেন। রাজার শরীরের তুলনায় কণ্ঠস্বর ভীষণ সরু।ফ্রান্সিস সেই দোভাষী বৃদ্ধের দিকে তাকাল। বৃদ্ধটি এবার উঠে দাঁড়াল। রাজার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়ে কী বলল। রাজাও কী বললেন। বৃদ্ধটি এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল।

বলল-'মহামান্য রাজা-তোমরা-কেন?' ফ্রান্সিস বলল-'আপনারা অন্যায়ভাবে কঙ্কালদ্বীপের

রাজাকে বন্দী করে এনেছেন। আমরা রাজা মোকার মুক্তির জন্যে এসেছি।' বৃদ্ধটি বলল - 'রাজা - গিয়ানির মন্দির-যত রূপোর থাম-চাই-বিনিময়ে রাজা মোকা-।' ফ্রান্সিস বুঝল রূপোর থামগুলোর ওপরই রাজার লোভ। বলল—

'ঠিক আছে-রাজা মোকার সঙ্গে আমাদের এই নিয়ে কথা বলতে দিন। মোকাকে রাজী করবার চেষ্টা করব।'

বৃদ্ধটি রাজাকে তাই বলল। রাজা কী বলল যেন। কয়েকজন ত্রিস্তান যোদ্ধা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে ধাক্কা দিয়ে চলবার নির্দেশ দিল। দু'জনে নির্দেশমত চলল। ওদিকে রাজসভায় বিচারপ্রার্থী একজনকে রাজা কি যেন বলতে লাগল।

উৎরাই বেয়ে ফ্রান্সিসরা উঠতে লাগল। একবারে ন্যাড়া পাহাড়। শুধু পাথর আর ধুলো। ঘাসও জন্মায়নি সেখানে।

একটি বাড়ির সামনে এসে ত্রিস্তান যোদ্ধারা থামল। পাথর আর তাসক ঘাসের ছাউনির ঘর। খণ্ড খণ্ড ডাল দিয়ে তৈরী দরজা। বুনো লতা দিয়ে বাঁধা। সেই বাঁধন খুলে একজন দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ওরা দুজন ভেতরে ঢুকল। ত্রিস্তান কয়েকজনও ঢুকল।

বাইরের আলো থেকে ঘরে ঢুকে অন্ধকার লাগল। কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ওরা। অন্ধকার চোখে একটু সয়ে এলে দেখল ঘরের মেঝেয় তিনি চারটে কাঠের খুঁটি পোঁতা। ত্রিস্তানরা ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে দুটি খুঁটির কাছে নিয়ে গেল। তারপর বুনো লতা দিয়ে খুঁটির সঙ্গে হাত বেঁধে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

ফ্রান্সিস এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরটা ভাল করে দেখছিল, তখনই নজর পড়ল একটা খাঁটের নীচে বন্দী একজন পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে আছে। ফ্রান্সিস চোখ কুঁচকে তাকাল বন্দীটির দিকে। চমকে উঠল—'আরে মোকা।' মোকাও তখন ফ্রান্সিসের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। এবার ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে হাসল। মোকার চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। বেশ খারাপ হয়ে গেছে চেহারা; ফ্রান্সিস ডাকল—'মোকা?'

'বলুন।' মোকার কণ্ঠস্বরে হতাশা।

তোমার সঙ্গে এ কটা জরুরি কথা আছে।

মোকা কোনো কথা না বলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ত্রিস্তানদের রাজার সঙ্গে কথা হলো। রাজা বলছে তোমাদের গিয়ানির মন্দিরের রূপোর থামগুলো ওকে দিয়ে দিলেই ওরা তোমাকে মুক্তি দেবে।'

'জানি।'

'তুমি রূপোর থামগুলো দিয়ে দিও না।'

মোকা একটু ক্ষণ মাথা নীচু করে রইল। তারপর মুখ তুলল। ফ্রান্সিস সেই স্বল্প আলোয় দেখল মোকার চোখে জল। মোকা ভারী গলায় আস্তে আস্তে বলল—'গিয়ানির পবিত্র মন্দিরের থাম—অসম্ভব। ওগুলো ত্রিস্তানদের দেবার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়।'

ফ্রান্সিস ও রকম উত্তর আশা করেনি। ও বুঝল গিয়ানি দেবতা আর তার মন্দিরের ওপর ইকাবোদের শ্রদ্ধাভক্তি কত গভীর। বলল—'আমাকে মাফ কর মোকা। আমি ঠিক বুঝিনি।' একটু থেমে বলল—'কিন্তু এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার কথাটাও তো ভাববে?'

মোকা ম্লান হাসল। বলল—'আমি নিজে না হয় এই বন্দীদশাতেই মারা গেলাম।

আমার প্রজারা তো বাঁচবে—গিয়ানির পবিত্র মন্দিরও থাকবে।'

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। বুঝল—মুক্তির অন্য কোনো উপায় ভাবতে হবে।

ফ্রান্সিসদের বন্দীদশার দু'দিন কাটল। ত্রিস্তানরা ওদের সারাদিনে দু'বার খাবার দিয়ে যায়। বুনো ফলের তরকারী মতো আর সামুদ্রিক মাছ সেদ্ধ। খিদের জ্বালায় তাই খেয়েছে ওরা। তারপর নারকেলের মালায় চক্ চক্ করে জল খেয়েছে।

সেদিন বিকেলে সেই দোভাষী বৃদ্ধ ত্রিস্তানটি এল। রাজাই নাকি পাঠিয়েছে ফ্রান্সিসদের সিদ্ধান্ত জানতে। ফ্রান্সিস স্পষ্ট বলল—'গিয়ানির দেবতার মন্দিরের থামের বিনিময়ে মোকা বাঁচতে চায় না। বৃদ্ধটি কথা শুনে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস বলল—'রাজাকে গিয়ে বলুন—বিনা শর্তে আমাদের সবাইকে যেন মুক্তি দেন। নইলে আমাদের জাহাজ কাছে আছে। আমার বন্ধুরা তৈরী। কালকের মধ্যে আমাদের মুক্তি না দিলে আমার বন্ধুরা এই দ্বীপ আক্রমণ করবে। তখন আপনারা কেউ বাঁচবেন না।' আমরা ভাইকিং। একমাত্র মৃত্যু হলেই আমরা অস্ত্র ত্যাগ করি তার আগে নয়। রাজাকে বলুন—আমরা অযথা রক্তপাত চাই না।'

বৃদ্ধটি ফ্রান্সিসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

বেশ রাত তখন । ঘরের কোণায় ম্যাকরেল্ মাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছে খুঁটিতে হাত বাঁধা অবস্থাতেই ফ্রান্সিসরা শুয়ে আছে মাটিতে। বিস্কো আর মোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজার বাইরে একটা পাথরের উপর একজন ত্রিস্তান পাহারাদার বসে আছে। ও ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। ফ্রান্সিস দেখল ওদেরই একটা তরোয়াল পাহারাদার কোলের ওপর রেখেছে। ও তরোয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈস্ একবার খোলা হাতে তরোয়ালটা পেলে—হঠাৎ একটা কানফাটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক লাল আলো ঝলসে উঠল বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে মাটি দুলে উঠল। ঘরটা একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল। দরজাসুদ্ধু বাইরের পাথরের দেয়ালটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল পাহারাদারের ওপর। ওর কোল থেকে তরোয়ালটা ছিটকে গেল। মোকা আর বিস্কো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভীষণ দুলে দুলে উঠছে ঘরটা ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে।

বিস্কো চেঁচিয়ে বলল—'ফ্রান্সিস, আমার খুঁটিটা উপড়ে গেছে।

'তাহলে শীগগির ভাঙা দরজার কাছে যাও। আলো এখনও নেভেনি। তরোয়ালটা খুঁজে বের কর। আমাদের বাঁধন কাটো তাড়াতাড়ি।' ফ্রান্সিস দ্রুত বলে গেল।

আবার আলোর ঝলকানি। সেইসঙ্গে গুড় গুড় একটানা শব্দ। আবার মাটি দুলে উঠল। বিস্কো খুঁটিটা থেকে হাতটা খুলে নিল। কোনরকমে টাল সামলাতে সামলাতে ভাঙা দরজার কাছে গেল। প্রদীপের ম্লান আলোয় দেখল পাথরের নীচে তরোয়ালের হাতলটা বেরিয়ে আছে। ও হাতলটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তরোয়ালটা বের করে আনল। তারপর ছুটে এল ফ্রান্সিসদের কাছে। ওদের দু'জনের হাতের বাঁধন কেটে দিল। নিজেরটাও কাটল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল 'বাইরে চলো শীগগির।'

ওরা দ্রুত ছুটতে যাবে তখনই ঘরের একপাশের পাথুরে দেওয়াল শব্দ তুলে ভেঙে পড়ল। ঐ দেয়ালের দিকে ছিল মোকা। মোকা স'রে আসতে আসতেও শেষ রক্ষা হলো না। একটা বড় পাথর গড়িয়ে মোকার ডানপায়ে এসে পড়ল। মোকা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর বসে পড়ল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—'বিস্কো মোকার পায়ের দিকে ধরো।

বিস্কো ছুটে গিয়ে মোকার পায়ের দিকে ধরল। ফ্রান্সিস ধরল ওর মাথার দিক। তারপর সন্তর্পণে ভাঙা দেয়ালের পাথর ডিঙিয়ে ওরা বাইরে চলে এল। ঠিক তখনই সমস্ত ঘরটা শব্দ তুলে ভেঙে পড়ল।

ওরা দু'জনে মোকাকে কাঁধে নিয়ে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে । একবার পেছন ফিরে দেখল—সেই চ্যাপ্টা মাথা পাহাড়টার মাথা থেকে লক্ষ লক্ষ ফুলকির মতো আগুনের ফণা থেকে থেকে ছিটকে উঠছে আকাশের দিকে। সেই আলায় ত্রিস্তান দ্বীপ আলোকিত। বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। পাহাড়ের মাথা থেকে কালো ঘন ধোঁয়া বেরোচ্ছে গল গল করে! আকাশে অনেক দূর উঠে গেছে সেই ধোঁয়া।

পায়ের নীচে ধুলো পাথরভর্তি জমি দুলে দুলে উঠছে। হঠাৎ সামনেই একটা ফাটল দেখা গেল। ফাটল থেকে তোড়ে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওরা ফাটল এড়িয়ে অন্যদিকে ছুটল।

আগ্নেয়গিরির মাথায় আগুনে-আলোর তীব্রতা কখনও বাড়ছে কখনও কমছে। ওরা বসতির কাছে এল। দেখল ত্রিস্তানদের অনেক বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। চিৎকার কান্নাকাটি শোনা গেল। কিছু ত্রিস্তান বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে দেখা গেল। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে আগ্নেয়গিরির দিকে মুখ করে। একবার দু'হাত তুলছে। উবু হয়ে মাটিতে দু'হাত রাখছে। আবার উঠে বসছে।

নেমে আসার পথে এখানে ওখানে ত্রিস্তান যোদ্ধাদের মুখোমুখি পড়ল ওরা। কিন্তু ত্রিস্তান যোদ্ধারা তখন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। ওদের দিকে চাইবার সময় কোথায়

আবার একটা ছোট ফাটল পড়ল। ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওরা লাফিয়ে পার হলো। কাঁধে আহত মোকা। খুব জোরে ছুটতে পারছিল না ওরা।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো সমুদ্রতীরে পৌঁছুল। কিন্তু নৌকো কোথায়? তীর ধরে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের আড়ালে একটা ক্যানো পেল। সেটাতেই উঠল ওরা। মোকাকে সাবধানে গলুইতে শুইয়ে দিল। আগ্নেয়গিরির মাথায় কখনও কখনও আগুনের আলোর তীব্রতা ঝলসে উঠছে। সেই আলোয় ফ্রান্সিস দেখল মোকার ডান পা'টা বেশ জখম হয়েছে। রক্ত পড়ছে। সমুদ্রের জল হাত দিয়ে তুলে ক্ষতের জায়গাটা ধুয়ে দিল। ক্ষতে নোনা জল লাগাতে বোধহয় জ্বালা করে উঠল। মোকাও কঁকিয়ে উঠল। কোনো কথা বলল না।

এবার ফ্রান্সিস সমুদ্রের দিকে তাকাল। আগ্নেয়গিরির আলোয় যতদূর দেখা যাচ্ছে ওদের জাহাজ কোথাও নেই। ফ্রান্সিস বলল—'বিস্কো, আমরা দক্ষিণ ঘেঁষে এসেছি। দ্বীপের ধার ধার দিয়ে এবার উত্তর ঘেঁষে যাবো।'

ফ্রান্সিস নৌকোর গলুইতে বৈঠা খুঁজল। পেল না। তখন নৌকোর ওপর বুক লাগিয়ে শুয়ে হাত দিয়ে জল ঠেলতে লাগল। সমুদ্রে তখন বাতাসের তেজ নেই। শান্ত সমুদ্র। ঢেউও ছোট ছোট। হাত দিয়ে জল ঠেলে নৌকো চালাতে লাগল ফ্রান্সিস। নৌকো দ্বীপ ঘুরে চলল। ফ্রান্সিস ডাকল—'বিস্কোও তুমিও হাত লাগাও" বিস্কো ওর মত শুয়ে পড়ে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগল। নৌকো চলল। কোথাও কোথাও সমুদ্রের জল ভুস্ ভুস্ করে উঠছে। ওরা সেগুলো পাশ কাটিয়ে চলল।

ফ্রান্সিস আগ্নেয়গিরির দিকে তাকাল। দেখল—এবার পাহাড়ের মাথা থেকে গলিত লাভার স্রোত নেমে আসছে। লাল হলুদ ধোঁয়া উঠছে গলিত লাভা থেকে।

ত্রিস্তান দ্বীপের পশ্চিমদিকের বাঁকটা পেরোতেই ওরা অস্পষ্ট দেখল দূরে ওদের

জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে জল ঠেলে ঠেলে ওরা জাহাজের দিকে নৌকো নিয়ে চলল।

ক্যানো নৌকো ঢেউ ভেঙে খুব আস্তে আস্তে চলছে। বিস্কো একবার চিৎকার করে উঠল-ও-হো-হো-।' কিন্তু সেই চিৎকার জাহাজে গিয়ে পৌঁছল না।

হঠাৎ আগ্নেয়গিরিতে আর একবার অগ্ন্যুদ্‌গার ঘটল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জামাটা খুলে উঠে দাঁড়াল। জামাটা হাতে দিয়ে ঘোরাতে লাগল। এবার সমুদ্রে অনেকদূরে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেল। জাহাজে ভাইকিংরা সবাই ডেক্‌-এ এসে দাঁড়িয়ে আছে তখন। হ্যারিকে সবাই জিজ্ঞেস করছিল—'আমরা কী করবো এখন?'

হ্যারি দু'হাত তুলে বলল—'ফ্রান্সিস তিন দিন অপেক্ষা করতে বলেছিল। আমাকে ভাবতে দাও।' আর কেউ কোনো কথা বলল না।

হ্যারি ভুরু কুঁচকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ত্রিস্তান দ্বীপের দিকে। তখনই আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুদাগার হলো। সেই আলোয় হ্যারি নজরে পড়ল ক্যানো নৌকোটা। নৌকোয় দাঁড়িয়ে কে কাপড় নাড়ছে। হ্যারি চীৎকার করে বলল—'ভাই সব, ফ্রান্সিসরা আসছে। ঐ দেখ ক্যানো নৌকো।'

ততক্ষণে অনেকেরই নজরে পড়েছে ক্যানো নৌকোটায়। ওরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল-'ও-হো-হো-।'

ফ্রান্সিস আর বিস্কোও নৌকো থেকে চিৎকার করল—'ও হো-হো-।' ওদের চিৎকার জাহাজ থেকে শোনা গেল না।

নৌকোর আসার গতি দেখে হ্যারির মনে সন্দেহ হলো। এত আস্তে আসছে কেন নৌকোটা? ও কয়েকজন ভাইকিংকে ডাকল। বলল—নৌকো নামাও। ওদের নৌকো নিয়ে এসো।'

তখনই কয়েকজন ভাইকিং দড়ি বেয়ে নেমে এল নৌকোর ওপর। তারপর দু'টো নৌকো চলল ফ্রান্সিসদের নৌকো লক্ষ্য করে।

ভাইকিংরা ফ্রান্সিসদের নৌকোটা ওদের একটা নৌকোর সঙ্গে বাঁধল। তারপর দ্রুত চলল জাহাজের দিকে।

ফ্রান্সিসরা যখন জাহাজের ডেক-এ উঠল তখন বন্ধুদের মধ্যে আনন্দের বান ডাকল যেন। ফ্রান্সিস বিস্কো অক্ষত দেহেই ফেরেনি শুধু মোকাকেও মুক্ত করে এনেছে।

মোকাকে ধরাধরি করে কেবিন ঘরে শুইয়ে দেওয়া হলো। জাহাজের বৈদ্য কাঁচের বোয়ামে ওষুধপত্র নিয়ে এল। মোকার ক্ষত পরীক্ষা করে ওষুধ দিল। মোকা ঘুমিয়ে পড়ল। জাহাজ আবার রওনা হ'ল কঙ্কালদ্বীপের উদ্দেশ্যে।

এবার শুরু হলো ফ্রান্সিসের রূপোর নদী খোঁজা। অনেক অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু রূপোর নদীর হদিস পায়নি। সেই নদী খুঁজে বের করতে হবে।

কঙ্কালদ্বীপে ফ্রান্সিস আর হ্যারি ইকাবোদের দেওয়া একটা ঘরে আস্তানা নিয়েছে। প্রায় সারাদিনই ওরা দ্বীপটা ঘুরে বেড়ায় যদি রূপোর নদীর কোনো হদিস মেলে। দ্বীপটা নেহাৎ ছোট নয়। কাজেই চার-পাঁচ দিন লেগে গেল সমস্ত দ্বীপ ঘুরে ফিরে দেখতে।

বসতি এলাকায় ওরা যখন ঘুরে বেড়ায় ইকাবোরা মাথা নুইয়ে ওদের শ্রদ্ধা জানায়। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ইকাবোদের বাচ্চা ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে। ইকাবোরা খুব খুশী হয়।

সেদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—'চলো গিয়ানির মন্দিরটা দেখে আসি। ওটা ভালো করে দেখা হয়নি।'

দুজনেই বেরোল মন্দিরটার উদ্দেশ্যে।

কঙ্কাল পাহাড়ের মাথার নীচেই দক্ষিণ দিকে সেই মন্দিরটা। এদিকটায় ইকাবোদের বসতি কম। ওরা ঘুরে ঘুরে মন্দিরটা দেখতে লাগল। মন্দিরটা চারকোণা। গাছের ডাল, তাসক ঘাস আর নারকেল পাতা দিয়ে বোনা ছউনি মন্দিরের চারটে চৌকোণা থাম রূপোর। বেশ মোটা রূপোর থামগুলো।

তাছাড়া মন্দিরের সামনে অর্ধগোলাকারভাবে সাজানো ছটা রূপোর থাম। হাত দিয়ে দেখল, বেশ মোটা নিরেট রূপোর তৈরী থামগুলো। তাতে লতাপাতা আঁকা নানা কারুকার্য। ওখানে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস মুখ উঁচু করে পেছনে তাকাল। দেখল কঙ্কালের মাথার পেছনটা। এবার দক্ষিণমুখে তাকাল। দেখল বাঁ দিকে একটা নদী বয়ে চলেছে। জলের রঙ হলুদ। ফ্রান্সিসের মনে পড়ল বন্দীদশা থেকে পালানোর সেই ঘটনা। সেদিন ওরাই পাথরের পাতলা আস্তরণ ভেঙে এই নদীটাকে মুক্তি দিয়েছিল। নদীটা সেই গুহা থেকে বেরিয়েছে।

ডানদিকে শুধু বনজঙ্গল। বনজঙ্গল খুব ঘন নয়। ছাড়া ছাড়া।

মন্দিরের ভেতরে অন্ধকারে দেখল কাঠের খোদাই করা গিয়ানি দেবতার মূর্তি। অনেক ইকাবো এসেছে বুনো ফুল ফল দিয়ে গিয়ানির পূজো দিতে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল।

সন্ধ্যেবেলা বিস্কো এল। বলল—'ফ্রান্সিস, একবার জাহাজে এস।'

'কেন? কী হলো?'

'বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।'

'হুঁ।'

'ওরা আর এখানে থাকতে চাইছে না। অনেকদিন হয়ে গেল—দেশে ফিরে যেতে চাইছে।'

'রাত্রে আমি জাহাজে যাবো। সবাইকে ডেক-এ থাকতে বলবে।'

'বেশ।' বিস্কো চলে গেল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চলল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। পথে ইকাবোদের সঙ্গে দেখা হলে তারা মাথা নুইয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে সম্মান জানাতে লাগল।

রাজবাড়ির ভেতরের ঘরে ঢুকে ওরা দেখল মোকা প্রদীপের আলোয় কী করছে। ওরা কাছে যেতে মোকা হেসে বলল—'আসুন।'

'পা কেমন আছে?'

'ভাল।' মোকা বলল।

ওরা দেখল মোকা ওর গায়ের কোহালহোর মতো একটা কাপড়ে কী আঁকছিল। গাছের ডাল থেঁতো করে তুলির মতো বানিয়েছে। ওরা যে পাথর গুঁড়ো করে রঙ বানায় শরীরে মুখে উল্কি আঁকার জন্য, তেমনি রঙ একটা চ্যাপ্টা পাথরে রাখা। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—'ছবি আঁকছো?'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন ছবিই। জানেন তো আমাদের মুখের ভাষা আছে—কিন্তু আপনাদের মতো কোনো অক্ষর নেই। আপনাদের জাহাজে থাকার সময় কিছু চামড়ার বই

আমি দেখেছি। তখনই ভেবেছি আমাদের ভাষায় লিখিত অক্ষর তৈরী করবো। সেইসব অক্ষর তৈরী করছি।

হ্যারি আর ফ্রান্সিস কথাটা শুনে খুশী হ্লো। হ্যারি মোকার কাঁধেই চাপড় দিয়ে বলল—'এই তো কাজের মতো কাজ। আমি আসবো। এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' মোকা হেসে বলল।

হ্যারি বলল—'অক্ষরগুলো তৈরী করতে খুব কল্পনার আশ্রয় নিও না। তোমরা মুখে গায়ে যে উল্কি আঁকো সেই রূপগুলো দিয়ে অক্ষর তৈরী করো। ইকাবোদের কাছে সেসব সহজবোধ্য হবে। পরিচিত উল্কি র রূপ দেখে ওরা তাড়াতাড়ি অক্ষর চিনতে পারবে।'

'ভালো কথা বলেছেন।' মোকা বলল—'আমি এদিকটা আগে ভাবিনি।'

মোকা আর হ্যারি অক্ষর তৈরীর পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে লাগল। ফ্রান্সিস চুপ করে কিছুক্ষণ ওদের কথা শুনল। তারপর একসময় বলল—'হ্যারি, এখন ওসব আলোচনা রাখো। মোকার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

'বেশ বলো।'

ফ্রান্সিস মোকাকে বলল—'দেখ মোকা, আমরা সারা কঙ্কাল দ্বীপ যথাসাধ্য ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কিন্তু রূপোর নদীর কোন হদিস করতে পারছি না।'

'অনেকেই চেষ্টা করেছে। বাবাও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেউ খুঁজে বের করতে পারেনি। মোকা বলল।

'আচ্ছা—রূপোর নদীর সম্বন্ধে তোমার বাবা কী বলতেন? সত্যিই কি রূপোর নদী ছিল?'

'বাবা বিশ্বাস করতেন যে রূপোর নদী ছিল। বাবা আমাকে একদিন বলেছিলেন যে তিনি নাকি ঠাকুর্দার মুখে শুনেছেন—রূপোর নদী বেরিয়েছে কঙ্কালের জটা থেকে।'

ফ্রান্সিস চমকে উঠলো। কঙ্কালের জটা মানে কঙ্কালের মাথার পেছন দিক। সেদিকে একটা নদী তো ওরাই গুহা থেকে বের করে দিয়েছিল। কিন্তু সে নদীর জলতো হলদেটে। সেটায় কি রূপোর গুঁড়ো আছে? দেখতে হয় তাহলে।

'আর কিছু বলতেন তোমার বাবা?'

'না। শুধু ঐ কথাই একদিন বলেছিলেন।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'দেখুন, ঐ নিয়ে আমি ভাবি না। রূপো তো খাদ্য নয় যে ইকাবোরা খাবে। উত্তরের বন অনেকখানি পুড়ে গেছে। জন্তু-জানোয়ার, পাখি মারা গেছে। কিছু দিনের মধ্যে আমার প্রজাদের খাদ্যাভাব দেখা দেবে। আমি ঐ নিয়েই ভাবছি এখন।'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস খুব খুশী হলো। একজন দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন রাজার মতোই মোকার চিন্তা। ফ্রান্সিস বলল—'তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। চলি।'

দুজনে ফিরে এল।

একটু রাতহতে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নৌকো বেয়ে চলল জাহাজের দিকে। আজকে জ্যোৎস্না আরও উজ্জ্বল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। শান্ত হাওয়া বইছে।

ওরা যখন জাহাজের ডেক-এ উঠল—দেখল সব ভাইকিংরা উপস্থিত। বসে দাঁড়িয়ে

সবাই ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ফ্রান্সিস একবার সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল—'ভাইসব—যাত্রা শুরু করবার আগেই আমি বলেছিলাম অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করবার জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। আমরা এখানে চড়ুইভাতি করতে আসিনি। রূপোর নদী খুঁজে বের করবার সংকল্প নিয়ে এসেছি। অবশ্য কষ্ট লড়াইয়ের দিন শেষ হয়েছে। এখন বুদ্ধির জোরে এগোতে হবে। তার জন্যে তোমাদের প্রয়োজন পড়বে হয়তো। কিন্তু সেটা পরে। এখন তো তোমাদের আনন্দেই দিন কাটছে। তবে অধৈর্য হয়ে উঠছো কেন?' ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোনা কথা বলল না। ফ্রান্সিস আবার বলতে লাগল—'যা হোক আমাদের বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। রূপোর নদীর হদিস পেতে আর দেরী নেই। কব্জির লড়াইয়ের দিন শেষ। এখন বুদ্ধির লড়াই চলছে। এ সময়ে তোমরা 'দেশে যাবো' এই বলে ঝামেলা বাড়িও না। এভাবে আমার মনের একাগ্রতা নষ্ট করো না। এটা আমার আদেশ নয়—অনুরোধ। ব্যাস্—আর আমার কিছু বলবার নেই। ফ্রান্সিস থামল কেউ কোনো কথা বলল না।

হ্যারি বলল—'যদি কারো কিছু বলার থাকে বলো। পরে যেন বাড়ি ফেরার বায়না তুলে ঘোঁট পাকিও না।'

একজন ভাইকিং বলল—'ফ্রান্সিস একটা কথা তুমি কি বিশ্বাস করো রূপোর নদী বলে কিছু আছে?'

'অবশ্যই।' ফ্রান্সিস বলল—'যেমন তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো এটা সত্য, তেমনি রূপোর নদী আছে এটা সত্য।'

'কবে নাগাদ এই রহস্য ভেদ করতে পারবে?' আর একজন ভাইকিং বলল।

'সেটা নির্ভর করছে রহস্যের সূত্রগুলোর ওপর। তবে যতদূর মনে হয় সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এই রহস্যের একটা সমাধানে পৌঁছুতে পারবো।'

আর কেউ কোনো কথা বলল না। সভা ভেঙে গেল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডেকে বলল—'চলো আজকে কঙ্কাল পাহাড়টা ভালো করে দেখবো। ওটার মাথায় ওঠা যায় কিনা সে চেষ্টা করবো। অবশ্য প্রথমে দেখবো হলুদ জলের নদীটা।'

দুজনে বেরোল। সকালের ঝকমকে রোদে-ছাওয়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে চলল। হলুদ জলের নদীটার কাছে এল। ফ্রান্সিস নদীটা ভালো করে দেখতে লাগল। নদীর দুধারে হলুদ রঙের স্তর জমে গেছে। ও কোমরের ফেট্টি থেকে একটুকরো বড়

ন্যাকড়া বের করল। নদীর জল একটা নারকেলের মালা দিয়ে তুলে ন্যাকড়ায় ছাঁকল। বেশ কয়েকবার। দেখা গেল ন্যাকড়ায় হলুদ স্তর জমে আছে। ফ্রান্সিস সেই স্তর আঙুল দিয়ে ঘেঁটে দেখে হতাশার ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ল। ও রূপোর গুঁড়ো আশা করেছিল। দেখল— তেমন কোনোকিছুর চিহ্নমাত্র নেই।

এবার দুজনে চলল কঙ্কাল পাহাড়ের দিকে। চড়াই হয়ে উঠতে লাগল দুজনে। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল। পাহাড়টার মাথাটা নরকঙ্কালের মাথার মতো। চোখের একটা বড় গর্তও তাতে। আর একটা গর্ত অর্ধেকটা আছে। বাকীটা ভেঙে ধসে গেছে। হ্যারি সব দেখতে দেখতে বলল—'জানো, আমার কেমন সন্দেহ, এই মাথার পুরোটাই প্রকৃতির খেয়াল নয়। মোকাদের পূর্বপুরুষরা এই মাথার চোখ দুটো পাহাড় কুঁদে করেছে।'

ফ্রান্সিস ভালো করে দেখল চোখ দুটো। সত্যি সমান দূরত্বে দুটো গহ্বর। প্রকৃতির খেয়াল নাও হতে পারে।

ফ্রান্সিস মাথাটার দিকে তাকাল। তিন দিকই ঢালু। ওঠার উপায় নেই। একমাত্র যে চোখের গর্তটা ধসে গেছে সেখান দিয়েই ওঠা যেতে পারে। সেদিকে পরপর ভাঙা পাথর ছড়ানো। বোধহয় ভূমিকম্পেই এটা হয়েছে।

ফ্রান্সিস পশ্চিম দিকের ঐ ধসা জায়গাটায় এল। ভালো করে ছড়ানো পাথরগুলো দেখল। একটা দুটো করে পাথরে পা রেখে ওপরে উঠতে লাগল। চোখের গর্ত ছাড়িয়ে কপালের কাছে উঠে এল। আর ওঠার উপার নেই। ও লক্ষ্য করল কয়েকটা খোঁদল রয়েছে মাথার দিকে। সেগুলোতে পা রেখে রেখে একসময়ে ফ্রান্সিস বুক দিয়ে ঘষটে ঘষটে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছল। পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে। উত্তর দিকে ইকাবোদের বসতি, কুনহা নদী, বনজঙ্গল সমুদ্র। দূরে ওদের জাহাজ।

এবার বুক চেপে আস্তে আস্তে দক্ষিণমুখো হলো। ঠিক নীচেই গিয়ানির মন্দির। ছ'টা রূপোর থাম। বাঁদিকে হলুদ জলের নদী বয়ে যাচ্ছে। বনজঙ্গল। তার পরেই সমুদ্র। হঠাৎ এই দৃশ্যটা ওকে নাড়া দিল। ও চমকে ভালো করে তাকাল। ঠিক এমনি একটা ছবি ও কোথায় দেখছে। বাঁদিকে হলুদ নদী। সবুজ গাছের নক্সা। সারি সারি। ডানদিকে কী যেন একটা? হ্যাঁ— সাদা রঙের নদী। কিন্তু এখানে সেটা নেই। কোথায় দেখেছি—এমনি নক্সা ছবি? কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজা মোকার গায়ের কাপড়টা — কোহালহো, জাহাজে রোদ্দুরে শুকোচ্ছিল। ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠল—কোহালহো।

হ্যারি নীচ থেকে বলল—'কী হয়েছে?'

ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলল—'রূপোর নদীর রহস্য— ভেদ করেছি। চলো মোকার কাছে।'

ফ্রান্সিস দ্রুত পাহাড়ের মাথা থেকে নামতে লাগল। হঠাৎ খোঁদল থেকে পা পিছলে গেল। পড়তে পড়তেও টাল সামলাল। উত্তেজনায় ওর সারা শরীর তখন কাঁপছে। ও সাবধান হলো। মাথা ঠাণ্ডা করে আস্তে আস্তে নামতে লাগল।

নীচে নেমেই ডাকল—'হ্যারি, শিগগির এসো।' বলে ছুটল রাজবাড়ির দিকে। পেছনে

হ্যারিও ছুটল।

রাজবাড়ির সামনের চত্বরে তখন বিচারসভা বসেছে। মোকা কোহালহো গায়ে দিয়ে কাঠের সিংহাসনে বসে আছে। সামনে একদল ইকাবো দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে মোকার সামনে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'মোকা—এখন তোমার বিচারসভা বন্ধ কর। জরুরি কথা আছে।'

'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস? মোকা বেশ আশ্চর্য হলো।

'বলছি। তুমি ইকাবোদের যেতে বল।'

মোকা ওদের ভাষায় কিছু বলল। ইকাবোরা মোকাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস বলল—'মোকা, মনে হচ্ছে রূপোর নদীর হদিস পেয়েছি।'

মোকার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মোকা জিজ্ঞাসা করলো,—'কোথায় তার হদিস পেলে? যা আমাদের পূর্বপুরুষরা খোঁজ করে পায়নি।'

ফ্রান্সিস বলল,—'সবচাইতে আশ্চর্যের জিনিস কি জানো? রূপোর নদীর হদিশের নক্সা তোমরা বংশপরম্পরায় বহন করে চলেছো।'

ফ্রান্সিস আবার বলল—'মোকা—তোমার গায়ের কোহালহোটা সিংহাসনের ওপর মেলে দাও। ভাঁজ খুলে।'

মোকা আরো আশ্চর্য হলো। তবু ফ্রান্সিস বলছে। কাজেই কোনো কথা না বলে গলায় নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা কোহালহোটা খুলে সিংহাসনের উপর মেলে দিল। সেই নক্সার ছবিটা। কঙ্কাল পাহাড়ের মাথা থেকে ফ্রান্সিস ঠিক এই ছবিটাই দেখেছে। শুধু দুটি জিনিষ নেই । গিয়ানির মন্দিরের একটা থাম আর ডানদিকে নদীর ধারাটা। একটা থাম পাঞ্চোরা চুরি করে নিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—'দেখ তোমরা, আমি ছবির নক্সাগুলোর নাম দিচ্ছি। তাহলেই বুঝতে পারবে।

ফ্রান্সিস একে একে ছবিগুলোর নাম দিতে থাকল। তারপর একসময় নাম দেওয়া শেষ হলো;

ফ্রান্সিসের দেওয়া নাম দিয়ে ছবির নক্সাটা দাঁড়াল এরকম ঃ-

(নক্সা-ছবিটা পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

হ্যারি আর মোকা ঝুঁকে পড়ে নক্সা-ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখল। হ্যারি বলল—'কিন্তু রূপোর নদী কোথায়?'

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—'ডানদিকে যে নদীটা চলে গেছে দেখ ওটা সাদা রঙের আঁকা। ওটাই রূপোর নদী।'

'কিন্তু কোনো নদীই তো ওদিকে নেই।'

'অতীতে ছিল। ভূমিকম্পে বা প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয়ে সেই নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেছে।'

'এখন কী করবে?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'সেই উৎসমুখটা খুলে দিতে হবে। তার জন্যে সকলের সাহায্য চাই। আমরা আর ইকাবোরা মিলে সেই উৎসমুখ খুলে দেব।'

মোকা বলল — ' কিন্তু সেই নদী থেকে কি রূপো পাওয়া যাবে?'

বন রূপোর থাম
হলুদ জলের নদী
রূপোর নদী
গিয়ানির মন্দির
কঙ্কাল পাহাড়ের চূড়া
নারকেলের দড়ি
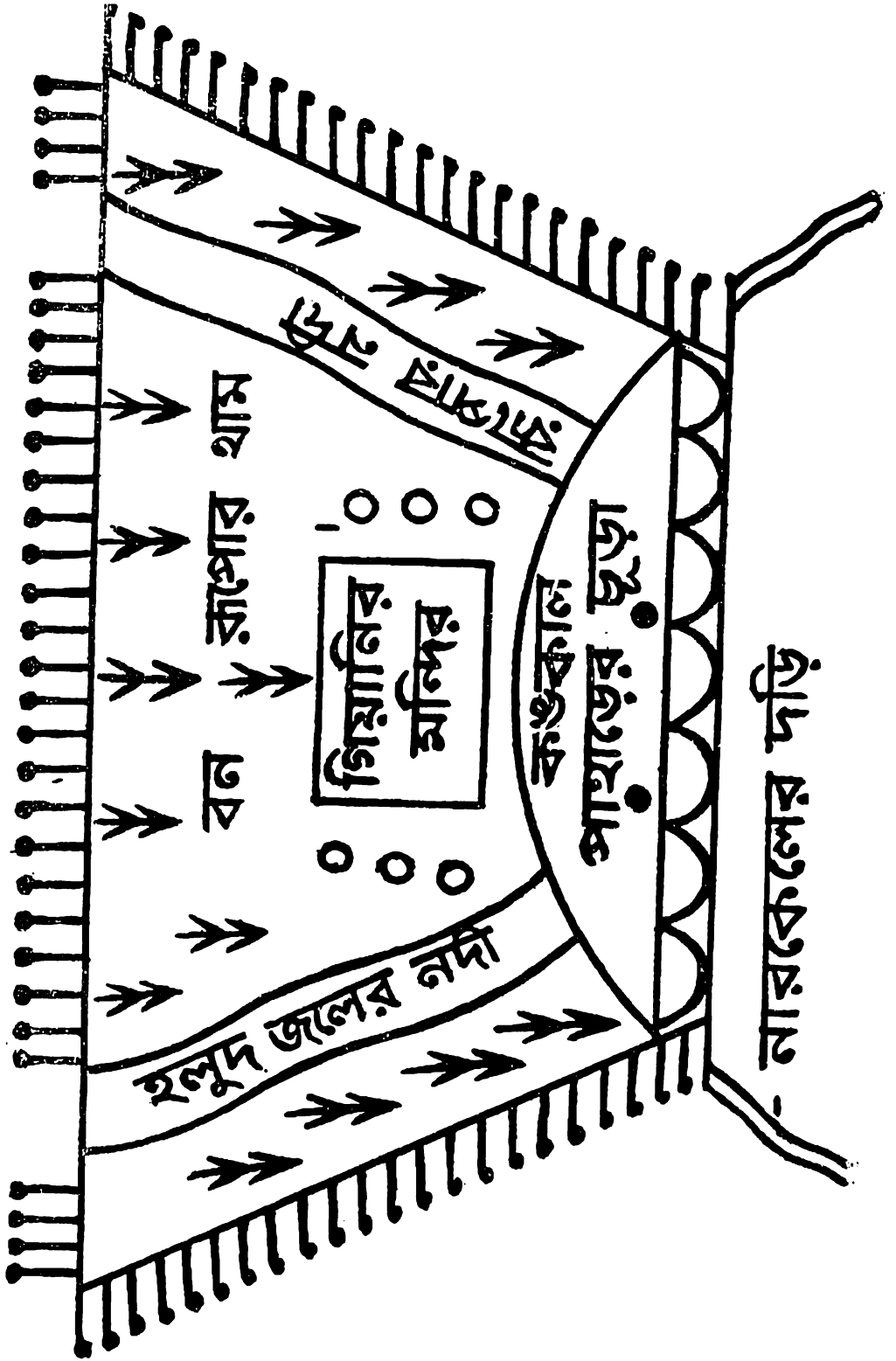
'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারির দিকে ফিরে বলল—'হ্যারি চলো। কঙ্কালের বাঁ চোখের কাছে পশ্চিমদিকে যে ধস দেখা যায় সেদিকটা আমায় খুঁটিয়ে দেখতে হবে। রূপোর নদীর উৎস ওখানেই চাপা পড়েছে।'

দু'জনে উঠল। মোকা বলল—'চলুন, আমিও যাবো।'

ওরা চড়াই পেরিয়ে কঙ্কাল পাহাড়ের মাথার কাছে পৌঁছল। দেখল কঙ্কালের বাঁ চোখের কাছ থেকে পাথরের ধস নেমেছে। ফ্রান্সিস ভাঙা পাথর ধুলোবালির স্তুপ ভালো করে দেখতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল নীচে একটা খুব সরু জলধারা নেমে গেছে। ও বলে উঠল—'দেখ তোমরা—এখানে কোথাও নিশ্চয়ই জমা জলের স্তর আছে। নইলে ঐ সরু ঝর্ণা থাকত না।'

'ঐ সরু ঝর্ণাই অনেকদিন থেকে দেখছি আমরা। তবে মাঝে মাঝে ওটা শুকিয়ে যায়। বলল মোকা।

'হতে পারে।' ফ্রান্সিস বলল—'তবু এই জায়গাই আমাদের খুঁড়তে হবে। হ্যারি—কাল সকাল থেকেই আমরা খোঁড়ার কাজ শুরু করবো। তুমি জাহাজে বন্ধুদের খবর দিয়ে এসো। মোকা—তুমি ইকাবোদের বলো তারা যেন আমাদের সাহায্য করে।'

মোকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ফ্রান্সিস ও জায়গাটায় দাঁড়িয়ে হ্যারি আর মোকাকে কাছে ডাকল। বলল—'ঠিক আমার দৃষ্টি বরাবর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ। কল্পনা কর ঐ নক্সা-ছবির মতো একটা নদী বয়ে গেছে। স্পষ্ট সেই ধারার গতিপথটা দেখতে পাবে। লক্ষ্য করে দেখ, সেই গতিপথে শুধু ধুলোবালি আর পাথর। কোন গাছ জন্মায় নি।

'গাছ জন্মায়নি কেন?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই ওখানে রূপোর স্তর জমেছিল। রূপোর স্তরে গাছ জন্মাবে কী করে? ওপরের মাটিতে কিছু ঘাস জন্মেছে শুধু।'

ওরা ফিরে এল।

সেইদিনই খবরটা রটে গেল—রূপোর নদীর হদিস পাওয়া গেছে। খুঁজে বের করা হবে নদী।

সকাল থেকেই দলে দলে ইকাবো মেয়ে পুরুষ বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জড়ো হলো সেখানে। কিছু পরে হ্যারি ভাইকিংদের জাহাজ থেকে নেমে এল। সঙ্গে আনল গাঁইতি, কুডুল, কাছি আর হাতুড়ি।

ফ্রান্সিস, আর মোকা এসে পড়েছে তখন। ফ্রান্সিস জায়গা নির্দিষ্ট করে দিল।

শুরু হলো পাথরের স্তূপ সরানোর কাজ। ইকাবোরাও হাত লাগাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরের স্তূপ সরাতে দেখা গেল একটা গুহার মুখ। গুহার নীচের দিকটার পাথরের স্তর ভেজা। ফ্রান্সিস বুঝল কাছেই কোথাও জল আছে। সেই জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে জায়গাটা ভিজিয়ে দিয়েছে।

গুহায় ঢুকল ফ্রান্সিস। সঙ্গে বিস্কো আর হ্যারি। বাইরের আলো অল্পই আসছে। বেশ অন্ধকার অন্ধকার ভাব।

একটু এগোতেই ফ্রান্সিস দেখল—একটা বড় গহ্বর নেমে গেছে। ফ্রান্সিস পেছনে দাঁড়ানো বিস্কোকে বলল—'কাছি আর একটা জ্বলন্ত মশাল আনো। কাছিটা ঝুলিয়ে দাও।'

বিস্কো নিয়ে এল সেসব। ফ্রান্সিস মশালটা হাতে নিয়ে ঝোলানো কাছি ধরে ধরে

নামতে লাগল। এক মানুষসমান নামতেই পায়ে ঠেকল একটা পাথরের চাই। ও দেখল এই পাথরের চাঁইটা গহ্বরের মুখটা বুজিয়ে দিয়েছে। হয়তো ওপর থেকে পড়েছিল। পাথরের চাঁইটা ভেজাভেজা। তার মানে নীচে জল আছে।

ফ্রান্সিস মুখ তুলে বলল—'বিস্কো, কয়েকজনকে নামতে বলো। এই পাথরের চাঁইটা ভাঙতে হবে।'

মশালটা পোঁতা হলো পাথরের খাঁজে। ফ্রান্সিস একটা চুনা পাথরের টুকরো দিয়ে চাঁইটার মাঝবরাবর দাগ দিল। সবাইকে বলল—'এই দাগ বরাবর ঘা মারো, যত জোরে পারো।'

পাঁচ ছ'জন কাছি ধরে নামলো। শুরু হলো পাথরের চাইটার ওপর গাঁইতি, কুডুল আর বড় বড় হাতুড়ি চালানো। গাঁইতি কুডুলের ঘা পড়তে লাগল পাথরের ওপর। আগুনের ফুলকি ছিটকোতে লাগল।

একদল পরিশ্রান্ত হলে অন্য দল নামছে। এইভাবে ঘা মারা চলল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল ঘা মারা।

হঠাৎ পাথরের চাঁইটা ফেটে গেল। যারা হাঁতুড়ি গাঁইতি চালাচ্ছিল ওটার ওপর দাঁড়িয়ে তারা কিছু বোঝার আগে পাথরের চাঁইয়ের একটা অংশ ভেঙে পরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তোড়ে জল উঠতে লাগল। মুহূর্তে গহ্বরটা জলে ভরে গেল। যারা গাঁইতি, হাতুড়ি চালাচ্ছিল তারা কাছি ধরে একে একে উঠে এল। জল গুহার মুখ দিয়ে ছুটল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে, আশ্চর্য! জল সাদাটে। পরিষ্কার। গুহা থেকে জল বেরোতে দেখে বাইরে দাঁড়ানো সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

মশাল নিভে গেছে। ফ্রান্সিস প্রায় অন্ধকারে জলভরা গহ্বরটায় নামল কাছি ধরে। এক ডুব দিয়ে দেখল পাথরের চাঁইয়ের একটা অংশ ভেঙে উল্টেযাওয়াতে অন্য পাথরের চাঁইটাও আলগা হয়ে গেছে। ও জল থেকে মুখ তুলল। কিছুক্ষণ শ্বাস নিল। তারপর দম বন্ধ করে আবার ডুব দিল। হাতের কাছিটা সেই আলগা চাঁইটার চারিদিকে বাঁধল। এটা করতে তিন-চারবার ওকে ডুব দিতে হলো জলে। মুক্তোর সমুদ্রে যাবার আগে ও অনেকক্ষণ জলে ডুবে থাকার অভ্যাস করেছিল। সেটা কাজে লাগাল। এবার উঠে এল। সবাইকে বলল—'চলো সব গুহার বাইরে। ওখান থেকে আমরা কাছি ধরে টানবো। চাঁইটা তাহলেই কাত হয়ে যাবে, আরো জল উঠবে তখন। সেই জলের তোড়ের সামনে আমরা হয়তো ভেসে যেতে পারি।'

সবাই গুহার বাইরে এল। শুরু হল কাছি টানা। একটু পরেই পাথরের চাঁইটা কাত হয়ে গেল। বেশ জোরে গুহার মুখ থেকে জলের ধারা বেরিয়ে এল। বাইরে নুড়ি পাথরের ধুলোবালি সব ভাসিয়ে নিয়ে চলল। এবার জলধারা একটা নদীর চেহারা নিল। সবাই গুহার মুখ থেকে সরে দাঁড়াল।

জলে ভেজা কাপড়-চোপড় নিয়ে ফ্রান্সিস একটা পাথরের ওপর বসল। কিন্তু এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে বসে থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। যারা এতক্ষণ গাঁইতি কুড়ুল চালাচ্ছিল তারাও এখানে ওখানে বসে পড়ল, কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ইকাবোরা তখনও আনন্দে হৈ হৈ করছে।

ওদিকে রূপোর নদীর ধারা বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। নুড়ি পাথর ধুলোবালির মধ্যে দিয়ে।

একসময় ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল । হ্যারি এল । ফ্রান্সিস বলল — 'নদীটার জলের রঙ দেখেছো ?'

'হ্যাঁ সাদাই।'

'একটা ন্যাকড়ার জল নিয়ে ছেঁকে দেখ তো কিছু তলানি পড়ে কিনা ।'

কিছুক্ষণ পরে হ্যারি ফিরে এল । হেসে বলল—সাবাস ফ্রান্সিস । তোমার অনুমানই ঠিক । ন্যাকড়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো রূপোর আস্তরন পড়েছে । অবশ্য খুব অল্প।

'হতেই হবে' । ফ্রান্সিস বলল 'দীর্ঘদিন ধরে নদীর নীচে এই স্তর পুরু হয়ে জমত । তাই থেকেই ইকাবোরা রূপো তুলতো ।'

সন্ধ্যে হয়ে গেল । ভাইকিংরা জাহাজে ফিরে গেল । ইকাবোরা নিজেদের বসতিতে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি নিজেদের আস্তানায় ।

পরদিন। একটু বেলা হয়েছে তখন । ফ্রান্সিসের সবে ঘুম ভেঙেছে । হ্যারি উঠে পড়েছে। মুখ ধুচ্ছে ।

হঠাৎ মোকা ছুটতে ছুটতে এল । হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'শিগগির দেখবেন আসুন।'

'কী হয়েছে' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল ।

'রূপোর স্তর পাওয়া গেছে।'

'সত্যি ? হ্যারি চমকে উঠল ।

ফ্রান্সিস হাসল— 'ঐ নদীই আসল রূপোর নদী । কুন্‌হা নয় । ওরা আর দেরী করল না দ্রুত পায়ে চলল নদীর দিকে ।

সত্যিই রূপোর স্তর । নদীর জল ওপরের ছোট পাথর ধুলো-বালি মাটি সরিয়ে দিয়েছে। বড় বড় কিছু পাথর পড়ে আছে । সেসবের আড়ালে নীচে রুপোর স্তর দেখা যাচ্ছে । গুহা সামনেই সেই স্তরটা স্পষ্ট দেখা গেল । প্রায় এক হাত পুরু নিরেট রূপোর আস্তরণ দেখা গেল । তারপর থেকে পাথর জমা । ওগুলোর নীচটা এখনও পরিষ্কার হয়নি।

'এত রূপো ? এ যে কল্পনাতীত ।' মোকা চীৎকার করে বলে উঠল ।

'মোকা—নইলে মন্দিরের অতগুলো থাম নিরেট রূপোর তৈরি হলো কি করে ? ফ্রান্সিস বলল ।

—তবে একটা কথা । তোমাদের কুনহা নদীটা শুকিয়ে যাবে ।

—'বলেন কি ?' মোকা আশ্চর্য হ'ল ।

—হ্যাঁ। কারণ আমার যতদূর মনে হয়— অতীতে কোন সময় কঙ্কাল দ্বীপে প্রচণ্ড ভুমিকম্প হয়েছিল । তাতে রূপোর নদী আর হলুদ জলের নদীর উৎস গলিত লাভা পাথরের ধ্বংসের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল । তখনই সৃষ্টি হয়েছিল কুন্‌হা নদী । অন্য এক উৎস থেকে । এখন রূপোর নদী আর হলুদ জলের নদী মুক্ত হয়েছে । তার ফলে অতীতের কঙ্কাল দ্বীপের ভৌগোলিক বিন্যাস আবার অতীতের রূপ নিয়েছে । কুনহা নদী আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। থাকবে শুধু রূপোর নদী আর হলুদ জলের নদী । অবশ্য এগুলো নামেই নদী । আসলে একটা বড় আকারের ঝর্ণা ।

—আচ্ছা হলুদ নদীতে রুপোর গুঁড়া নেই কেন ? হ্যারি জিজ্ঞেস করল ।

—তার কারণ দু'টো নদীরই উৎস এক হলেও রূপোর নদী রূপোর গুঁড়ো মেশানো পাথরের স্তরের মধ্যে দিয়ে এসেছে । কিন্তু হলুদ জলের নদী এসেছে গন্ধকের স্তরের মধ্য

দিয়ে । তাই নদী দুটোর জলের রংএও পার্থক্য রয়েছে ।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের আস্তানায় ফিরে চলল । ইকাবোরা তখনও রূপোর নদীর দু'ধারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে ।

জাহাজ থেকে ভাইকিংরা আনন্দে হৈ হৈ করে এল । রুপোর নিরেট আস্তরণ দেখে হতবাক । মাঝে মাঝেই ওরা চিৎকার করে উঠতে লাগল—'ও —হো— হো ।'

রাত তখন গভীর । নিজেদের আস্তানা তাসক ঘাস বিছানো বিছানায় ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘুমিয়ে আছে । ঘরটায় ম্যাকরেল মাছের তেলের আলো জ্বলছে ।

হঠাৎ কার ডাক শুনে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল । কান পাতল । ওর বাম ধারে আবার কে ডাকল । বুঝল — মোকা ডাকছে । উঠে বসল । হ্যারি বলল— 'মোকা ডাকছে মনে হচ্ছে ।

—হ্যাঁ ।' ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে পাথুরে মেঝেয় দাঁড়াল ।

— এত রাতে ডাকাডাকি করছে । কী ব্যাপার ?

—'দেখি ।' ফ্রান্সিস বলল ।।

—'তরোয়াল নিয়ে যাও ।' হ্যারি বলল ।

—না-না বিপদের কিছু নেই ।

সিডার গাছের কাঠের তৈরী দরজার পাল্লাটা খুলল ফ্রান্সিস । দরজাটা তখনও সম্পূর্ণ খোলা হয় নি । দু'তিন জন লোক এক ধাক্কায় দরজার সবটা খুলে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । হঠাৎ এই ধাক্কায় ফ্রান্সিস মেঝের ওপর পড়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে দু তিনজন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । উঠে দাঁড় করাল । তারপর হাতদুটো টেনে নিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল । ওদিকে আরো কয়েকজন ছুটে গিয়ে হ্যারির ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ল। হ্যারি কিছু বোঝার আগেই ওর দু'হাত পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলল ।

এবার দরজা দিয়ে মোকা ঢুকল । ঘরের মৃদু আলোতে ফ্রান্সিস দেখল মোকার মুখ ভয় কাতর । মোকার পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে আর একজন লোক ঢুকল। তার মাথায় কাঁচা পাকা বাবড়ি চুল ! মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ। লোকটার কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে চোখদুটো কেমন রহস্যময় । হাসল লোকটা । মোটা গলায় বলল-'ভাইকিং দেশের শ্রেষ্ঠ বীর ফ্রান্সিস -আমাকে চিন্তে পারো? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে । চিনতে দেরী হ'ল না । লোকটা পাঞ্চো । সেই নিজের দেশে সমুদ্রের ধারের এক সরাইখানায় এই পাঞ্চোর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল । এই পাঞ্চোর মুখেই ও প্রথম শুনেছিল-রূপোর নদীর কথা । ফ্রান্সিস বলল-'হ্যাঁ চিনেছি । তুমি পাঞ্চো । পাঞ্চো হাসল ! বলল-'তোমরা সেই বন্দর থেকে জাহাজ চুরি করে পালালে । আমরাও একটা ছোট জাহাজে চড়ে তোমাদের পিছু নিলাম । তোমরা কঙ্কাল দ্বীপে এলে । আমরাও পশ্চিমদিকের জঙ্গলের আড়ালে জাহাজ লুকিয়ে প্রতীক্ষায় রইলাম । ত্রিস্তানদের সঙ্গে যুদ্ধ হল । ত্রিস্তানরা যুদ্ধে হেরে গেল। নিজেদের দ্বীপে চলে গেল । সবই দেখেছি আমরা ।' পাঞ্চো থামল । তারপর বলতে লাগল 'ঠিক জানতাম নদীর হদিশও তুমিই বের করবে যা আমরা কখনই পারবো না । তাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একজন লোক ইকাবোদের পোশাক পরে সব সময় থাকতো । তারপর জানলাম—তুমি রূপোর নদী আবিষ্কার করেছো । ফ্রান্সিস আমি জানতাম একমাত্র তুমিই এই ধাঁধার সমাধান করতে পারবে ।'

—'এখন কী চাও ?' ফ্রান্সিস ক্ষুব্ধস্বরে বলল ।

— এই ঘরে তোমাদের বন্দী করে রাখবো। তোমাদের জাহাজের বন্ধুরা এ কথা জানতেও পারবে না। মোকাকে বন্দী করব না। ওকে সব সময় আমাদের সঙ্গে রাখবো। ইকাবোরা তাদের রাজাকে মুক্তই দেখবে। ওদের মনে কোন সন্দেহ হবে না।

-তারপর ?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

-তারপর আসল কাজ। গিয়ানি মন্দিরের সব কটা রূপোর থাম আমাদের জাহাজে নিয়ে যাবো। রূপোর নদী থেকে যতটা রূপো সম্ভব কেটে নেব। ইকাবোদের মনে কোন সন্দেহ হবে না। ওরা ভাববে রাজাই এসব আমাদের দিচ্ছে। কেউ বাধা দেবে না। ওদিকে তোমাদের জাহাজের বন্ধুরা কিছু বোঝার আগেই আমরা জাহাজ ছেড়ে দেব। দেশে ফিরে তালতাল রূপো বিক্রি করে আমি রাজার হালে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব! পাঞ্চো হা হা ক'রে হেসে উঠল।

— অত সহজে সব কাজ হাসিল করতে পারবে না পাঞ্চো ?

— তুমি বাধা দেবে ?

— আমি তো বন্দী। কিন্তু জাহাজে আমার বন্ধুরা রয়েছে। দু'তিন দিন আমাদের কোন খবর না পেলেই খোঁজ করতে এখানে আসবে। তখন ? তোমরা তো দশ বারো জন। আমরা তিরিশ। পারবে মোকাবিলা করতে ?

— তার আগেই আমরা কাজ হাসিল করবো।' দাড়ি গোঁফের ফাঁকে পাঞ্চো হাসল।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কী ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল-

— কিন্তু পাঞ্চো - রূপোর চেয়েও অনেক দামী জিনিস রয়েছে এই দ্বীপে।' পাঞ্চো স্পষ্ট চমকে উঠল। বলল - 'কী জিনিস ?'

— সোনা।

— সোনা ?' পাঞ্চো লাফিয়ে উঠল। বলল-'তুমি তার খোঁজ জানো ?

— না।

পাঞ্চো একলাফে ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়াল। তরোয়ালের ডগাটা ফ্রান্সিসের কণ্ঠনালীতে চেপে ধরল। দাঁতচাপা স্বরে বলল-' তুমি নিশ্চয়ই জানো। বলো সেই সোনা কোথায় ? ফ্রান্সিস নির্বিকার ভঙ্গীতে বলল-' দেখ পাঞ্চো আমি যদি সেই সোনার হদিস জানতাম তাহলে তোমাকে আগ বাড়িয়ে বলতে যেতাম না।'

—'হুঁ'।' পাঞ্চো তরোয়াল সরিয়ে নিল।— 'কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে এখানে সোনা আছে।

—হ্যাঁ-রূপোর স্তরের মত সোনার স্তর।

—বলো কি!

—হ্যাঁ। তবে সেই ধাঁধার সমাধান মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে।

—কোথায় রয়েছে সেই ধাঁধার সমাধান ?

—ঐ যে — মোকার গায়ে জড়ানো কোহালহোর মধ্যে। পাঞ্চো মোকার গায়ের কোহালহোর দিকে তাকাল। কিছুই বুঝল না। অস্পষ্ট হ'য়ে আসা কিছু নক্সা আঁকা ওটাতে।

—ওটা পেলে তুমি সোনার হদিশ করতে পারবে ?

—চেষ্টা করতে পারি।'

পাঞ্চো মোকার দিকে তাকাল। বলল— 'মোকা— তোমার গায়ের ঐ কাপড়টা খুলে দাও।'

—না । মোকা ঘাড় নাড়ল । বলল—'এটা গিয়ানির মন্ত্রপূত কোহালহো । এটা খুলতে পারবো না ।' পাঞ্চো রুখে উঠল । তরোয়াল উঁচিয়ে মোকাকে বলল— 'এক্ষুণি ওটা খুলে দে । নইলে তোর মাথা কেটে ফেলে ওটা নেব । পাঞ্চোর চোখ দু'টো জ্বলতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল— ওটা না পেলে পাঞ্চো নির্ঘাত মোকাকে হত্যা করবে । 'ফ্রান্সিস ডাকল— 'মোকা' ?

—'কী ?' মোকা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল ।

—কোহালহোটা এর আগেও আমাকে দিয়েছো । এবারও দাও । আমি কোহালহোর পবিত্রতা নষ্ট হ'তে দেব না ।

—কিন্তু—'

—আমি জানি মোকা । কোহালহো তোমরা কখনও হাতছাড়া করো না । সেদিন জাহাজে কোহালহো রোদে শুকাতে দিয়ে তুমি প্রচণ্ড রোদের মধ্যে সারাদিন কোহালহোর সামনে বসে ছিলে । তবু আমার অনুরোধ —আজকে রাতের মত কোহালহোটো আমার কাছে দাও। দেখি ধাঁধার. সমাধান করতে পারি কিনা । পারি বা না পারি— কালকেই তোমার কোহালহো ফিরিয়ে দেব । মোকা মাথা নীচু করে দাড়িয়ে রইল একটুক্ষণ । তারপর গা থেকে কেহালহোটা খুলতে খুলতে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল – 'ফ্রান্সিস— আপনি আমাদের প্রাণে বাঁচিয়েছেন । আপনার কাছে আমি অশেষ ঋণী । শুধু আপনি চাইলেন— তাই এই কোহালহো আপনাকে দিলাম ।

'—তুমি নিশ্চিত থাকো মোকা— এর পবিত্রতা রক্ষা করবো ।' ফ্রান্সিস বলল।

পাঞ্চো এবার সঙ্গীদের হুকুম করল— এই দু'জনকেই দু'টো খুঁটির সঙ্গে বাঁধো ।' ওর সঙ্গীরা এগিয়ে এল । ফ্রান্সিস এবার মোকাকে বলল —মোকা— তোমার কোহালহোটা আমার সামনে মেঝেতে পেতে দাও । আমি ধাঁধার সমাধানটা বের করবো ।'

মোকা গা থেকে কোহালহোটা খুলে ফ্রান্সিসের সামনে রাখলো ।

হঠাৎ মোকা উবু হয়ে শিস দিয়ে উঠল । পাঞ্চো দ্রুত ছুটে এসে মোকার মাথার ওপর তরোয়াল উঁচিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল —'শিস্ দেওয়া বন্ধ কর— নইলে—; মোকা শিস দেওয়া বন্ধ করল । পাঞ্চো বলল— 'তোমাদের শিস্ দিয়ে খবর পাঠানোর ব্যাপারটা আমি জানি । সাবধান— আর শিস দেবে না '। তারপর পাঞ্চো দলের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল—'মোকাকে শিস দিতে দেখলেই মেরে ফেলবে ।' পাঞ্চোর এই হুকুমের অর্থটা সঙ্গীরা বুঝল না । তবে মাথা ঝাঁকিয়ে ওরা বোঝার ইঙ্গিত করল ।

মোকা বলল— 'ফ্রান্সিস- আপনাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম । কিন্তু হ'ল না । আমাকে ক্ষমা করুন ।

'—তুমি এই নিয়ে মন খারাপ করো না মোকা'— ফ্রান্সিস বলল ।

পাঞ্চো বলল – 'ফ্রান্সিস তুমি ধাঁধার সমাধান করবার চেষ্টা কর । সোনা আমার চাই।

—চেষ্টা করবো সমাধান বের করতে ।

—তোমাকে একদিন সময় দিলাম । যদি না পারো— তোমাদের দু'জনকে খতম করে জাহাজে উঠব গিয়ে ! তারপর দেশের দিকে পাড়ি জমাবো । জলদি – সময় নেই ।

পাঞ্চো তার সঙ্গীদের আর মোকাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । বাইরে থেকে ঘরের দরজা ভালো করে বন্ধ করে দিল । ঘরের বাইরে বারান্দায় পাঞ্চোর এক

সঙ্গী তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল।

পাঞ্চো ওরা চলে যেতে চারিদিক নিস্তব্দ হয়ে গেল।

এবার হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল— 'তুমি ঠিক জানো আর একটা সোনার স্তর আছে এই দ্বীপে?'

—পাগল হয়েছো। আর কিছু নেই এই দ্বীপে।

— তাহ'লে তুমি সোনার স্তরের কথা বললে কেন?

—'এবার সেটা বুঝবে।'

এই ব'লে ফ্রান্সিস খুঁটির সঙ্গে বাঁধা শরীরটা উঁচু করে তুলে বসল। বলল। হ্যারি- এবার আলোটা আমার বাঁধা হাত দুটোর কাছে তোমার পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে এস।

হ্যারি পা বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে আলোটা ফ্রান্সিসের বাঁধা হাত দু'টোর দিকে এগিয়ে আনতে লাগল। আলোটা একটা মাটির পাত্র। তাতে তেল ভরা। পলতে করা হয়েছে গাছের পাতলা আঁশ দিয়ে।

ফ্রান্সিস বলল— 'হ্যারি— যদি পাঞ্চোকে বলতাম আলোটা আমার কাছে এনে দাও তাহলে ওর সন্দেহ হ'ত। ও কিছুতেই আলোটা কাছে রাখতে দিত না। কিন্তু ঐ ধাপ্পাটা দিতেই ও কোন আপত্তি করল না। এবার দেখ।

ফ্রান্সিস এবার দঁড়ি বাঁধা হাত দু'টো আলোর শিখার ওপর রাখল। বাঁধা দড়িটা পুড়তে লাগল। সেইসঙ্গে ফ্রান্সিসের হাতের কব্জিও। কিন্তু ফ্রান্সিস দাঁত চেপে কব্জি পোড়ার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলো। আস্তে আস্তে দড়িটা পুড়ে যেতে লাগল। বেশ কিছুটা পুড়ে যেতেই ফ্রান্সিস দুহাতে হ্যাচকা টান দিল। পোড়া দড়ি ছিড়ে গেল। ফ্রান্সিস এক লাফে উঠে দাঁড়াল। দু'হাতের কব্জি তখন পুড়ে কালো হয়ে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। ছুটে গেল বিছানার কাছে। শিয়রের কাছে রাখা তরোয়ালটা নিল। তরোয়ালটা নিয়ে এল হ্যারির কাছে। দ্রুত হাতে তরোয়াল ঘষে হ্যারির হাতের বাঁধন খুলে ফেলল। হ্যারিও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিছানায় শিয়রের পাশ থেকে ওর তরোয়ালটা তুলে নিল।

ফ্রান্সিস চিৎকার করতে লাগল—' পাহারাদার শিগগির এসো — ঘরে আগুন লেগেছে। আগুন-আগুন।' পাহারাদার তাড়াতাড়ি ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকল। দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্সিস। ও ডান পা'টা বাড়িয়ে দিল। ফ্রান্সিসের পায়ে হোঁচট খেয়ে পাহারাদার উবু হয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালের বাঁট দিয়ে পাহারাদারের ঘাড়ে মারল। লোকটা আর মেঝে থেকে উঠল না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—'হ্যারি শিগগির —ছোটো।' বলেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে ঘরটার বাইরে চলে গেল। পেছনে হ্যারিও এল। দু'জন ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে।

অন্ধকার রাত। আকাশে অজস্র তারা। সমুদ্রের দিক থেকে জোরালো হাওয়া বইছে।

ফ্রান্সিস ধ্রুবতারাটা দেখে নিল। তারপর দিকটা ঠিক রেখে ছুটল উত্তর- পূর্ব মুখে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে গাছগাছলির গায়ে ওদের নৌকো বাঁধা আছে। নৌকা খুঁজে বের করে নৌকো চড়ে জাহাজে উঠবে গিয়ে।

দু'জনে অন্ধকার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছুটল।

সমুদ্রের ধারে বনজঙ্গলের কাছে যেসময় পৌঁছল তখন পুব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য উঠতে বেশী দেরী আর নেই।

'ফ্রান্সিস সমুদ্রের ধারের জংলা এলাকাটায় ওদের নৌকা দুঁটো খুঁজতে লাগল। আশ্চর্য! একটা নৌকোও নেই। ফ্রান্সিস বুঝল— এসব পাঞ্চোর কাজ। নৌকাগুলো লুকিয়ে রেখেছে কোথাও যাতে ফ্রান্সিসরা ওদের জাহাজের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে না পারে।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল— 'হ্যারি পাঞ্চো নিশ্চয় সব নৌকা লুকিয়ে রেখেছে। আমাকে সাঁতার কেটে জাহাজে যেতে হবে। তুমি পারবে না অত কষ্ট করতে। তুমি বনের আড়ালে লুকিয়ে থাকো। আমি বন্ধুদের নিয়ে আসছি।'

—বেশ তো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস সমুদ্রের জলে ঝাপ দিল। আগুনে পোড়া দুহাতের কব্জিতে সমুদ্রের নোনা জল লাগতে অসহ্য জ্বালা করে উঠল। ওর মুখ দিয়ে চাপা আর্তস্বর বেরিয়ে এল। তবু ফ্রান্সিস দুহাতে জলকেটে সাঁতরে চলল জাহাজের দিকে।

আকাশটা অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। দুরে জাহাজটা দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস সাঁতরে চলল। তখনই সূর্য উঠল পূর্ব আকাশে। খুবই পরিচিত দৃশ্য। তবুও আজকে বড় ভাল লাগল সূর্য ওঠা দেখতে। বন্দীজীবন থেকে মুক্তি, বন্ধুদের কাছে যাচ্ছে এসবের জন্যও ওর মন খুশী আজকে।

সাঁতরে চলল ফ্রান্সিস। সকালের রোদ ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে। জাহাজ আর বেশী দুরে নয়। অনেকখানি সাঁতরে আসতে হলো ওকে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে শরীর। হাতের কব্জি জ্বলছে। সমুদ্রের নোনা জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

একসময় জাহাজের কাছে এসে পৌঁছল। ঝোলানো দড়ি দড়া ধ'রে উঠতে গেল। কিন্তু শরীর আর বইছে না। হাতে জোর পাচ্ছে না যে দড়ি ধরে উঠবে।

ফ্রান্সিস দড়ি ধরে হাঁপাতে লাগল। বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে চিৎকার করে ডাকাল — বিস্কো।' কিন্তু কেউ শুনতে পেরেছে বলে মনে হল না। আবার পর পর দুবার ডাকল 'বিস্কো বিস্কো।'

এবার রেলিঙ ধ'রে কে মুখ বাড়িয়ে দেখল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল — 'দড়ির মই নামাও।' ভাইকিংটি এবার ফ্রান্সিসকে চিনতে পারলো। ও ছুটল। সবাইকে খবর দিতে। একটু পরেই সবাই এসে জড়ো হ'ল রেলিঙের ধারে। তাড়াতাড়ি দঁড়ির মই নামিয়ে দিল। ফ্রান্সিস দড়ির মই বেয়ে বেয়ে জাহাজে উঠে এল।

সবাই এসে ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তখনও হাঁপাচ্ছে। বিস্কো বলল - 'ফ্রান্সিস কী হয়েছে? সব শুনে বিস্কো বলল—'হ্যারির কোন বিপদ হবে নাতো?'

—না। ওকে বনের আড়ালে রেখে এসেছি।

—তাহলে এখন কী করবে?

—লড়াই— পাঞ্চোর দলের সঙ্গে।

সবাই চিৎকার ক'রে উঠল—'ও-হো-হো-হো—'

জাহাজের বদ্যিকে খবর পাঠানো হল। বদ্যি এল। ফ্রান্সিসের আগুনে পোড়া দু'হাতের কব্জিতে ওষুধ লাগিয়ে দিল। জ্বালা যন্ত্রণা কমল।

ফ্রান্সিস সবাইকে বলল— 'আমি ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নেব। এর মধ্যে সবাই তৈরী

হয়ে নাও ।'

ঘন্টাখানেক কাটল । সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে এল । ফ্রান্সিসও খেয়ে দেয়ে তৈরী তখন ।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল নৌকো নিয়ে । মাত্র দুটো নৌকো রয়েছে । বাকী তিনটে নৌকো তো কঙ্কাল দ্বীপে রয়েছে । পাঞ্চো লুকিয়ে রেখেছে সেগুলো ।

ফ্রান্সিস বলল— 'দুটো নৌকোতেই আমরা দফায় দফায় দ্বীপে যাবো । বিস্কোকে বলল— 'বিস্কো— হ্যারির জন্যে খাবার নিয়ে যেও ।'

প্রথম দফায় ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে গেল ।

ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে সবাই কঙ্কালদ্বীপের সমুদ্রতীরের বনের মধ্যে জড়ো হল । হ্যারি এর মধ্যেই খেয়ে নিল ।

বিস্কো বলল— 'এখন আমরা কোথায় যাবো ? গিয়ানির মন্দির । পাঞ্চো ওর দল নিয়ে নিশ্চয়ই এখানে আছে । রূপোর থামগুলো চুরীর মতলব ওর ।' ফ্রান্সিস বলল ।

ওরা পাহাড়ের সবুজ ঘাসে-ভরা ঢাল দিয়ে উঠতে লাগল ।

এক সময় কঙ্কালের মাথার কাছে এসে পৌঁছল সবাই । ফ্রান্সিস নীচে তাকিয়ে দেখল ওর অনুমানই ঠিক বেশ কিছু শক্ত সমর্থ ইকাবোকে দিয়ে পাঞ্চো রূপোর থাম তোলাচ্ছে। দুটো থাম তোলা হয়েছে । পাথুরে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে থাম দুটো । বাকীগুলো তোলবার চেষ্টা চলছে ।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল 'দুভাগে ভাগ হয়ে সবাই নীচে নামো । ওদের কাছাকাছি গিয়ে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। আমি না বললে কেউ আক্রমণ করবে না।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেয়ে দু'দল ভাইকিং দুপাশ থেকে নামল । তারপর গিয়ানি মন্দিরের পেছনের দিকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

তখনই একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে ফ্রান্সিস দেখল একটু দূরে মোকা একটা পাথরের ওপর বসে আছে। অসহায় মোকা দেখছে ওর চোখের সামনে পাঞ্চোর দল রূপোর থামগুলো তুলছে ।

ফ্রান্সিস মোকাকে ডাকতে গিয়ে সাবধান হল । মোকার ঠিক পেছনেই তলোয়ার হাতে পাঞ্চোর দলের একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ।

ফ্রান্সিস তখন একটা পাথরের

তলোয়ার হাতে ছুটে এল পাহারাদারটা

নুড়ি হাত দিয়ে কুড়িয়ে নিল । তারপর ছুঁড়ল মোকার দিকে । মোকার গায়ে নুড়িটা লাগতেই মোকা এদিকে ফিরে তাকাল । দেখল— ফ্রান্সিস পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে । মুক্ত ফ্রান্সিসকে দেখে ওর চোখমুখ খুশিতে উজ্জ্বল হল। পাহারাদারটা দেখল সেটা । সে-ও ওদিকে তাকাল । ফ্রান্সিস পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়বার আগেই পাহারাদার ওকে দেখল । তলোয়ার হাতে ছুটে এল পাহারাদারটা। কাছাকাছি আসতেই বিস্কো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । দু'জনে জড়াজড়ি করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে অনেকটা নীচে নেমে এল । বিস্কোই আগে উঠে দাঁড়াল । পাহারাদারটা উঠে দাঁড়াতে গেল । তার আগেই বিস্কো তরোয়াল চালাল ওর ডান হাত লক্ষ্য করে । তরোয়ালের ঘা লাগল ওর ডান কাঁধে । তরোয়াল ফেলে লোকটা কাটা কাঁধ বাঁ হাতে চেপে ধরল । তারপর শুয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল ।

এবার ফ্রান্সিস হাতের তরোয়াল উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল ।—'সবাই নেমে চলো — গিয়ানির মন্দিরের দিকে।'

ভাইকিংরা দ্রুতপায়ে পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে আসতে লাগল । এবার পাঞ্চোর নজরে পড়ল ফ্রান্সিসরা । ইকাবোরা থাম তোলার কাজ বন্ধ রেখে তাকিয়ে রইল সেই দিকে । পাঞ্চো আর তার সঙ্গীরা তরোয়াল উঁচিয়ে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে গেল ।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিস দুহাত তুলে নির্দেশ দিল 'থামো' ।

ভাইকিংরা পাঞ্চোর দলের মুখোমুখি দাঁড়ালো ।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল । শাঙ্কো তীরধনুক হাতে ফ্রান্সিসের পাশে এসে দাঁড়াল ।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল -- 'পাঞ্চো তুমি ভাইকিংদের বীরত্বের কথা জানো । আমরা তোমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি । সংখ্যায় আমরা তোমাদের দ্বিগুণ । যদি প্রাণের মায়া থাকে— তাহলে এক্ষুনি অস্ত্র ত্যাগ কর ।'

—না — সবগুলো রূপোর থাম আমার চাই ।

—পাঞ্চো— ভালো করে ভেবে দেখো —একবার লড়াইতে নামলে তোমরা কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না ।

—আমরা পরোয়া করি না ।

—বেশ— তাহ'লে তুমিই আমাদের লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করলে । ফ্রান্সিস বলল ।

ঠিক তখনই গিয়ানি মন্দিরের পুরোহিত পাগলের মত ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা রূপোর থাম জড়িয়ে ধরল । পাগলের মত চিৎকার করে কী বলতে লাগল ও কাঁদতে লাগল । পাঞ্চো ছুটে গিয়ে পুরোহিতের মাথার বেণী ধরে এক হ্যাচকা টান দিল । পুরোহিত থাম ছেড়ে পাথুরে মাটিতে ছিটকে পড়ল । পাঞ্চো পুরোহিতের মাথার ওপর তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল । —পাঞ্চো ? ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল । পাঞ্চো ফ্রান্সিসের দিকে রক্তচক্ষু

মেলে একবার তাকাল শুধু । পুরোহিত এই ফাঁকে মাটি থেকে উঠে পালাতে গেল । পাঞ্চো আবার ওর মাথার বেণী টেনে ধরল । ফ্রান্সিস বলে উঠল—'শাঙ্কো-চালাও তীর ।' ওর পাশে দাঁড়িয়ে শাঙ্কো তৈরীই ছিল । সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্চোর বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল । নিখুঁত নিশানা। তীরটি ঠিক পাঞ্চোর বুকে গিয়ে বিঁধল । পাঞ্চো ঠিক তখনই তরোয়াল চালাল । কিন্তু তরোয়ালের কোপ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল । পুরোহিতের মাথায় কোপ লাগল না । শুধু ওর মাথার বেণীটা কেটে গেল । পাঞ্চো তরোয়াল ফেলে দিল । দুহাত বুকে চেপে ধরে তীরটা টেনে ধরল এক হ্যাঁচকা টানে তীরটা টেনে খুলে ফেলল । ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল । পাঞ্চো টলতে টলতে পাথুরে মাটিতে গড়িয়ে গেল । দেহটা নড়াচড়া করল কয়েকবার। তারপর স্থির হয়ে গেল ।

দলের সর্দারের ঐ মৃত্যু দেখে দলের বাকী সঙ্গীরা ভয়ার্ত চোখে চারিদিকে তাকাতে লাগল । তারপর এক পা করে পিছোতে পিছোতে ছুটতে শুরু করল পেছনের দিকে । ওরা ছুটল দ্বীপের উত্তরদিককার সমুদ্রতীরের দিকে । ফ্রান্সিস বলে উঠল — বিস্কো -শিগগির ছুটে যাও । ফেরাও ওদের । ওদিকে বালিয়াড়িতে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা । ওদিক দিয়ে সমুদ্র নামলে কেউ বাচবে না ওরা ।'

বিস্কো ছুটল পাঞ্চোর সঙ্গীদের পেছনে পেছনে । চীৎকার করে বলতে লাগল — ওদিকে যেওনা । ফিরে এসো । কোন ভয় নেই। কিন্তু কে কার কথা শোনে । ওরা ছুটে চলল মৃত্যু —সৈকতের দিকে ।

এত কাণ্ড ঘটে গেল । ইকাবোরা সবাই অবাক হয়ে সব ঘটনা দেখল ।

মোকা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল । ও কাঁদতে লাগল । ফ্রান্সিস হেসে বলল —'কান্না থামাও । তোমার প্রজাদের সাহস দাও । এখন কান্নার সময় নয় । মোকা শান্ত হ'ল। তারপর ইকাবোদের দিকে তাকিয়ে ওদের ভাষায় কী বলে গেল । ইকাবোরা একে একে ফ্রান্সিসের সামনে এসে মাথা নীচু ক'রে সম্মান জানিয়ে গেল ।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস মেঝেয় বিছানো কোহালহোটা তুলে নিয়ে মোকার গায়ে পরিয়ে দিল । মোকা বলল ঃ

—'আপনি যে বললেন সোনার স্তর আছে —কোহালহোর নক্সা থেকে তা খুঁজে বের করবেন ।'

ফ্রান্সিস হেসে বলল— এ সব গপপো ফেঁদেছিলাম পালাবার ফন্দী করতে । তোমাদের দ্বীপে আর দামী কিছু নেই । তুমি হতাশ হলে তাই না ?

—না ফ্রান্সিস, আমি খুব খুশী হলাম । যদি রূপো সোনা আরো থাকত তবে সব লুঠে নিতে কত জলদস্যু খুনী ডাকাত আসত এই দ্বীপে । আমার প্রজাদের জীবনে অশান্তি নেমে আসত । খুন জখম রক্তপাতে দ্বীপ কলুষিত হ'ত । তার চেয়ে এই ভাল । রূপো যা পাব তাই দিয়ে শুধু গিয়ানি মন্দিরের থাম বসিয়ে যাব । সবই উৎসর্গ করবো দেবতার

উদ্দেশ্যে।'

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল— 'সত্যি মোকা— তোমার মত আমি খুব কমই দেখেছি। একজন আদর্শ রাজা তুমি ।' একটু চুপ ক'রে থেকে বলল— 'সভ্যজগৎ থেকে কতদূরে এই কঙ্কাল দ্বীপ ।অথচ কত প্রগতিশীল তোমার মন; তোমার চিন্তা ।ভাবলে অবাক হ'তে হয় । মোকা কথা বলল না ।মৃদু হাসল শুধু ।তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

—তোমার হাত কেমন আছে ? হ্যারি জিজ্ঞেস করল ।

—এখন একটু ভালো ' বিছানায় বসতে বসতে ফ্রান্সিস বলল ।

— তবে ফেরা যাক কী বলো? হ্যারি বলল ।

—হ্যাঁ তবে আর একটা কাজ রয়েছে ।

—আবার কি কাজ?

—আমাদের নৌকা তিনটে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। তাছাড়া পশ্চিম সমুদ্রতীরের দিকে একবার যেতে হবে ।

—কেন ?

—পাঞ্চো ওর দলবল নিয়ে একটা ছোট জাহাজে চড়ে এসেছিল ।ওদিকেই পাঞ্চোর জাহাজটা কোথাও লুকানো আছে । সেটা খুঁজে বের করতে হবে ।

—পাঞ্চোর সঙ্গীরা বাধা দিতে পারে ।

—হ্যারি, ওঁরা কেউ বেচে নেই ।

—বলো কি ?

—হ্যাঁ উত্তর সমুদ্র তীরের দিকে পালিয়েছিল ওরা । ওখানে সমুদ্রে কেউ বেঁচে ফেরে না ।জাহাজটা এখন খালি ।হয়তো দু একজন পাহারাদার থাকলেও থাকতে পারে।

—জাহাজ নিয়ে কি করবে তুমি ? হ্যারি জানতে চাইল ।

—মোকাকে দেব ।তাহলে ত্রিস্তানদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে ।

—এখনই বেরুবে ?

—হ্যাঁ ।চলো - বেলা থাকতে থাকতে জাহাজটা খুঁজে বের করতে হবে ।

—চলো ।

দু'জনে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বেরুলো ।চলল পশ্চিমমুখে ।সমুদ্রতীরের দিকে। ঘন জঙ্গল ওদিকটায় ।ফ্রান্সিস একটা বিরাট উঁচু সীডার গাছের মাথায় উঠল ।তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা গাছের ডালপাতার ফাঁকে একটা কাঠের মাস্তুলের মত ।ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এল ।

দু'জন মিলে নোঙর খুলল।

নীচে মাটিতে নামতে হ্যারি বলল—'কী? কিছু হদিশ পেলে?'

—হ্যাঁ, চলো।

দিক ঠিক ক'রে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল দু'জনে। গভীর জঙ্গল। পচা পাতার স্তূপ জ'মে আছে গাছগুলোর নীচে। পা ফেললে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। গাছের নীচে অন্ধকার। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও রোদের ভাঙা ভাঙা টুকরো যেন। ওর মধ্যে দিয়েই চলল দু'জনে। ফ্রান্সিস নিশানা ঠিক ক'রে চলছিল।

কিছুক্ষণ পরেই দেখল একটা সামুদ্রিক খাঁড়ি দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেই খাঁড়িতে একটা ছোট্ট জাহাজ নোঙর করা। জাহাজটার কাছাকাছি আসতে দেখল ওদের নৌকো তিনটে দড়ি দিয়ে জাহাজটার সঙ্গে বাঁধা।

জাহাজে ওঠার জন্যে একটা কাঠের পাটাতন ফেলা ছিল। পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে ওরা জাহাজটায় উঠল। জাহাজের ডেক, কেবিনঘর, দাঁড়ঘর, রসুইঘর সবে ঘুরে বেড়াল ওরা। কেউ নেই জাহাজটায়। ছোট জাহাজ। তবে খুব মজবুত।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি এসো নোঙর খুলতে হবে।

দুজনে মিলে নোঙর খুলল। হ্যারি দাঁড় ঘরে চলে গেল। দাঁড় টানতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল গাছপালার এলাকা ছাড়াতে না পারলে পাল খাটানো যাবে না। তাই ও দাঁড়ঘরে গেল। দু'জনে মিলে দাঁড় বাইতে লাগল। একটু পরেই জাহাজটা চলতে শুরু করল। যেতে যেতে খাড়ি ছেড়ে সমুদ্রে এসে পড়ল।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস নিপুণ হাতে দড়ি দড়া ঠিক ক'রে পাল খাটিয়ে দিল। পালে হাওয়া লাগতেই পাল ফুলে উঠল। জাহাজ দ্রুত ছুটল।

ওদের জাহাজ যেদিকে ছিল নতুন পাওয়া জাহাজটা সেই দিকে নিয়ে এল। তারপর দ্বীপের ধারে নিয়ে এল। তারপর জাহাজটার নোঙর ফেলল।

তখন বিকেল। ফ্রান্সিস ও হ্যারি জাহাজ থেকে পাটাতন ফেলল। তারপর দ্বীপে নামল। চলল রাজবাড়ির দিকে।

রাজবাড়িতে মোকার সঙ্গে দেখা হ'ল। ফ্রান্সিস বলল—মোকা আমাদের সঙ্গে চলো। একটা জিনিস দেব তোমাকে।

—'কী?' মোকা বেশ অবাক হ'ল কথাটা শুনে।

—'চলোই না।' ফ্রান্সিস তাগাদা দিল।

—'বেশ চলুন।'

সমুদ্রের ধারে এসে ছোট্ট জাহাজটা দেখে মোকা কিছুই বুঝতে পারল না। এই জাহাজ তো ওরা আগে দেখেনি। কোত্থেকে এল এই জাহাজ। ফ্রান্সিস মোকার মনের অবস্থা বুঝল। বলল—মোকা এই জাহাজটা তোমাকে দিলাম।

মোকা নির্বাক। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস তখন ওকে সমস্ত ঘটনাটা বলল। এবার মোকা বুঝল পাঞ্চোরা এই জাহাজে চড়েই এসেছিল। আজ ওরা কেউ বেঁচে

নেই।

মোকা জাহাজটায় উঠল ঃ কেবিন ঘর, দাঁড়ঘর সব ঘুরে ঘুরে দেখল। আনন্দে ওর চোখে জল এসে গেল। বলল—'ফ্রান্সিস আপনি আবার আমাদের বাঁচালেন। আর খ্রিস্তানদের ভয় করি না। ওরা যদি আবার আক্রমণ করে এই জাহাজই সেই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারবে। আপনার কাছে আমরা চিরঋণী হ'য়ে রইলাম।' ও আবেগে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি মোকাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের আস্তানায় যখন ফিরে এল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।

পরদিন দুপুরে খেতে বসে ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি—জাহাজে খবর পাঠাও। বিদায় কঙ্কাল দ্বীপ। এবার দেশে ফেরা।'

'কিছু রূপো নিয়ে যাবো না?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'নাঃ।' ফ্রান্সিস বলল—'রাজাকে অনেককিছু এনে দিয়েছি। এবার আর নাই বা কিছু নিয়ে গেলাম।'

বিকালে মোকা এল। জিজ্ঞেস করল—'আপনারা কি আজই যাচ্ছেন?'

'না, কালকে জাহাজ ছাড়বো।' ফ্রান্সিস বলল।

'একটা অনুরোধ ছিল আমার।'

'বলো।'

'আপনাদের ঋণ কোনোভাবেই শোধ করতে পারবো না, তাই বলছিলাম—মন্দিরের দু'টো রূপোর থাম যদি আপনারা গ্রহণ করেন।'

'কী বলছো মোকা? তোমাদের দেবতার পবিত্র থাম।'

'আমি সর্দারদের সঙ্গে কথা বলেছি। সবাই সম্মতি দিয়েছে। পুরোহিতও বলেছে—এতে কোনো পাপ হবে না। পরে দু'টো থাম তৈরী করে দিলেই হবে।'

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বুঝে উঠতে পারল না কী বলবে। হ্যারি বলল—'নাও ফ্রান্সিস। মোকা এত করে বলছে। তাছাড়া এই থাম দু'টো হবে ইকাবোদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন;

—'বেশ'—ফ্রান্সিস বলল।

পাঞ্চো যে দু'টো থাম খুঁড়ে তুলেছিল—সে দু'টো পাশাপাশি রাখা হ'ল।

জল দিয়ে থামের তলায় লেগে থাকা মাটি ধোয়া হলো। নারকেল ছোবড়া দিয়ে ঘষে উজ্জ্বল করা হলো থাম দুটো। লতাপাতা পশুপাখি খোদাই করা থাম দুটো সুন্দর লাগল দেখতে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল। মোকাকে পুরোহিত কী বলল। মোকা ফ্রান্সিসকে বলল—'পুরোহিত বলছে—এগুলো পবিত্র থাম। এই দুটোতে যেন কারো পা না লাগে। এগুলো কোনো কারণেই গলাবেন না বা বিক্রি করবেন না।'

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—'নিশ্চিন্তে থাক। এই থামের পবিত্রতা আমরা রক্ষা করবো।'

বেশ ভারী থাম। দু'দল ইকাবো কাঁধে করে দুটো নিয়ে চলল সমুদ্রতীরের দিকে। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও চলল সেই সঙ্গে। সবার সামনে পুরোহিত বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে চলল।

সমুদ্রতীরে থাম দুটো নামানো হলো। একটু সমস্যা দেখা দিল। কী করে থাম দুটো জাহাজে তোলা যায়।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে পাঠাল জাহাজের গায়ে বাঁধা সবগুলো নৌকো নিয়ে আসতে। হ্যারি একটা নৌকো চালিয়ে জাহাজে গেল। কয়েকজন ভাইকিং নৌকোগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই এল।

ফ্রান্সিস নৌকোগুলো পরপর সাজাল। মোটা কাছি দিয়ে নৌকোগুলো পরস্পর বাঁধলো। তারপর ইকাবো আর ভাইকিংরা মিলে থাম দুটো সেই নৌকোয় বাঁধা সারির ওপর আস্তে আস্তে রাখল। খুব ভারী থাম দুটোর ভারে নৌকোগুলোর অনেকটা জলে ডুবে গেল। থাম দুটো এবার নৌকোগুলোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। থাম দুটোর আর গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রইল না।

ভাইকিংরা বৈঠা হাতে নৌকোয় উঠল। এবার ফ্রান্সিসের বিদায় নেবার পালা। মোকা ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণ ঐভাবেই রইল। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ফ্রান্সিস এবার জড়ো হওয়া ইকাবো নারীপুরুষ শিশুদের দিকে তাকাল। সবাই নির্বাক তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিসের দিকে। দু'একজন চোখ মুছছিল। ফ্রান্সিসেরও মনটা খারাপ হয়ে গেল। ম্লান হেসে ও হাত নেড়ে বলল—' বিদায় ভাই বোনেরা ইকাবোরা কোনো কথা বলল না। একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিস নৌকোয় গিয়ে উঠল। হাতে বৈঠা তুলে নিল। দড়িবাঁধা নৌকোর বহর চলল জাহাজের দিকে। নৌকোর ওপর থাম দুটো।

জাহাজের কাছে পৌঁছে ও পেছন ফিরে তাকাল। দেখল ইকাবোরা তেমনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জাহাজে উঠল সবাই। দড়ি বেঁধে থাম দুটো তোলা হলো জাহাজে। নৌকোগুলো বাঁধা হলো জাহাজের সঙ্গে।

ডেকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—'নোঙর তোল। পাল তুলে দাও। দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে যাও। বাতাসের তেমন জোর নেই।'

'সব ভাইকিংরা চীৎকার করে উঠল একসঙ্গে—ও—হো—হো।' তারপর সবাই যে যার কাজে লাগল।

ঘড় ঘড় শব্দে নোঙর উঠল। পাল খাটানো হলো। জলে দাঁড় পড়তে লাগল—ছপ্—ছপ্।

একটা পাক খেয়ে জাহাজ চলল। সরে সরে যেতে লাগল কঙ্কাল দ্বীপ। কিছুক্ষণ পরেই আর দেখা গেল না কঙ্কাল দ্বীপ। এখন চারিদিকে শুধু অথৈ জল।

জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস তখনও কঙ্কাল দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনও ওর মন বিষণ্ণ।

—সমাপ্ত—

উৎসর্গ

বিশ্ববরেণ্য শ্রীসত্যজিৎ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের আরো ফ্রান্সিস কাহিনী

ফ্রান্সিস সমগ্র ১ম
ফ্রান্সিস সমগ্র ২য়
সোনার ঘণ্টা
হীরের পাহাড়
মুক্তোর সমুদ্র
তুষারে গুপ্তধন
রূপোর নদী
মণিমাণিক্যের জাহাজ
চিকামার দেবরক্ষী
চুনী পান্নার রাজমুকুট
সাহারার রহস্য
সর্পদেবীর গুহা
সোনার শেকল

বিষাক্ত উপত্যকা
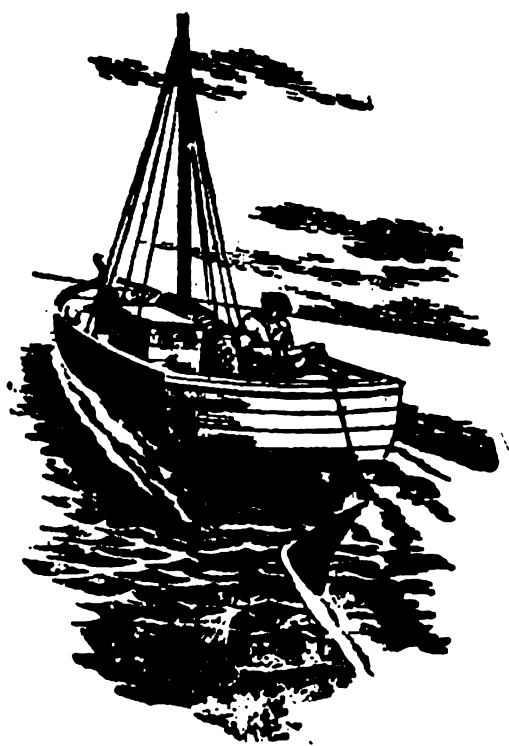
বিষাক্ত উপত্যকা

কঙ্কাল দ্বীপ থেকে ফ্রান্সিসদের জাহাজ যাত্রা শুরু করল স্বদেশের দিকে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্সিস আর ওর অভিন্নহৃদয় বন্ধু হ্যারি। ফ্রান্সিস ভাবছিল কঙ্কাল দ্বীপের বর্তমান রাজা মোকার কথা। মন খারাপ লাগছিল ওর। উপহার হিসেবে মোকা ওদের দুটো বিরাট রূপোর থাম দিয়েছে। জাহাজের ডেকের ওপরেই থাম দুটো রেখে দিয়েছে ওরা। দিন রাত নিয়ম করে পাহারা দেওয়া চলছে। আফ্রিকা থেকে হীরের খণ্ড নিয়ে আসার সময় ওরা নির্মম জলদস্যু লা ব্রুশের পাল্লায় পড়েছিল। আবার যাতে ওরকম কোনো বিপদ না হয় তার জন্যে রাত জেগেও পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে।

জাহাজ চলেছে। নির্মেঘ আকাশ। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে। জাহাজ সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে দ্রুত চলেছে। দাঁড় বাওয়া বন্ধ। জাহাজের কাজও নেই তেমন। ভাইকিংরা জাহাজে এখানে ওখানে বসে শুয়ে আড্ডা দিচ্ছে। এবার রূপোর থাম নিয়ে যাচ্ছে।

দেশবাসীকে অবাক করে দেবে। সেই সব গল্প, দেশ বাড়ির গল্প এসব চলছে।

বিকেল হলো। পশ্চিমাকাশে লাল টকটকে সূর্য অস্ত গেল। মনে হলো যেন সূর্যটা সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউয়ের মধ্যে ডুবে গেল।

সাত আট দিন কেটে গেছে। জাহাজ চলেছে ফ্রান্সিসদের দেশের দিকে।

সেদিন বিকেল হয়ে এসেছে। ভাইকিংরা এখানে ওখানে গল্প করছে। হঠাৎ মাস্তুলের মাথায় বসে থাকা নজরদারের চিৎকার শোনা গেল—ডাঙা দেখা যাচ্ছে—বাঁ দিকে। ভাইকিংরা সবাই এসে মাস্তুলের নিচে জড়ো হলো। একজন ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারি দুজনেই ডেকে উঠে এল। জাহাজটা তখন ডাঙার অনেকটা কাছে চলে এসেছে। দেখা গেল ডাঙাটা পাথুরে। এক ফোঁটা সবুজ নেই কোথাও। সমুদ্র থেকে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। গেরুয়া রঙের পাহাড়। পাথর ধুলোবালির রঙও গেরুয়া। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি তোমার কী মনে হয়? এটা কি একটা দ্বীপ না দেশ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—এখানে তো খাবার জলও পাবো বলে মনে হয় না। পাশ কাটিয়ে চলে যাই কী বলো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, মিছিমিছি এখানে জাহাজ ভিড়িয়ে কী হবে। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে জাহাজ চালককে সেই নির্দেশই দিতে যাবে, তখনই মাস্তুলের মাথা থেকে নজরদার চেঁচিয়ে বলে উঠল—একটা সাদা কাপড় মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে।

এবার ফ্রান্সিস আর হ্যারি ভালো করে তাকাল। জাহাজটা তখন অনেক কাছে চলে এসেছে। দেখল—পাহাড়ের গায়ে একটা গুহামতো কী দেখা যাচ্ছে। তার সামনে একটা গাছের মোটা ডাল পোঁতা। ডালের মাথায় এক টুকরো সাদা কাপড় বাঁধা। হাওয়ায় উড়ছে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল-সাদা কাপড়টা দেখেছো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তো ওখানে মানুষ আছে। আর লক্ষ্য করে দেখ—ওটা শুধু কাপড় নয়। একটা ছেঁড়া সাদা জামা।

—হুঁ। হ্যারি বলল—তার মানে বুনো মানুষ না, সভ্য মানুষই কেউ আছে। এখন একদল মানুষ আছে না একজন আছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

—যাহোক—সাদা জামাটা খুঁটিতে বাঁধা হ'য়েছে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কী করবে এখন?

—একজনই থাক আর একদলই থাক—ওদের তো উদ্ধার করতেই হবে। জাহাজ ভেড়াতে বলো।

জাহাজটা ঐ পাহাড়গুলোর কাছে নেওয়া যাবে?

—কিন্তু ভেড়াবে কোথায়? উঁচু উঁচু পাথর সব। তা ছাড়া সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অন্ধকারে একটা অজানা অচেনা জায়গায় নামা কি ঠিক হবে? হ্যারি বলল।

—তাহলে জাহাজ এখানেই থামাতে বলি। কাল সকালে যা করার করবো।

—সেটাই ভালো হবে।

পরদিন। সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস ডেকে এসে দাঁড়াল। জাহাজ-চালককে বলল—তোমার কী মনে হয়—জাহাজটা ঐ পাহাড়গুলোর কাছে নেওয়া যাবে?

—হ্যাঁ—যাবে। কারণ পাহাড় গুলো খাড়া উঠে গেছে। কিন্তু এদিক দিয়ে ঐ পাহাড়ে নামা যাবে না।

—কিন্তু আমাদের তো ওখানে যেতে হবে।

—পাহাড়গুলোর ওপাশটা দেখা যাক।

—তাহলে তাই কর।

জাহাজ চলতে শুরু করল। গেরুয়া রঙের পাহাড়গুলোর ওপাশে জাহাজটা আসতেই দেখা গেল একটা সমভূমি মতো রয়েছে। তবে অসমান। পাথর ধুলোয় এবড়ো খেবড়ো। তবে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে।

জাহাজটা সেই জায়গার অনেকটা কাছে নিয়ে আসা হলো। তারপরেই ডুবো পাথর। জাহাজ যাবে না। জাহাজ থেকে পাটাতন ফেলা হলো। পাটাতন পাথুরে জমি পর্যন্ত গেল না। ওটুকু জলে হেঁটে যেতে হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—আমি শাঙ্কোকে নিয়ে আগে যাচ্ছি। কী ব্যাপার দেখে আসি।

—তোমরা মাত্র দুজন যাবে। যদি কিছু বিপদ হয়?

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। শাঙ্কো এলে বলল—যাও তীর ধনুক নিয়ে এসো। আর এক টুকরো লাল কাপড়।

একটু পরেই শাঙ্কো তীর-ধনুক হাতে এলো। পাটাতনে পা রেখে রেখে দুজনে তীরের কাছে এলো। বাকিটুকু জলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। দুজনেই জলে নামল। কোমর অব্দি জলে ডুবে গেল। শ্যাওলা ধরা পেছল পাথরের ওপর পা রেখে ওরা এগিয়ে গেল। তারপর তীরে উঠল।

ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকাল। আশ্চর্য! সব পাথরের রঙ গেরুয়া। অন্য কোনো রঙের পাথর নেই। এবার ওরা পাথরের টুকরো ছড়ানো জায়গা দিয়ে চলল। একটু এগোতেই পাহাড়ে ওঠার মতো পথ পেল। বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো। সেগুলোর ওপর পা রেখে রেখে উঠতে লাগল। রোদ বেশ চড়া। সমুদ্রের হু হু হাওয়া বইছে বলেই ওরা ঘামছে না। পাথরগুলো এর মধ্যেই তেতে উঠেছে।

উঠতে উঠতে একসময় গুহাটা যে পাশ থেকে দেখেছে সেইদিকে চলে এল। এখানে পাথর কম। গুহাটা দেখা গেল। গুহা পর্যন্ত গেরুয়া রঙের ধুলোটে পথ।

এক সময় গুহার সামনে এল। দেখল—গাছের ডালে বাঁধা সাদা জামাটা শতছিন্ন। গেরুয়া ধুলোমাখা। তাতে নীল হলুদ সুতোর কাজ করা।

ওরা এবার গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো তীর ধনুক বাগিয়ে ধরল।

আস্তে আস্তে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস গুহার মধ্যে ঢুকতে লাগল। পেছনে তীর উঁচিয়ে শাঙ্কো। বাইরের তীব্র রোদ থেকে এসেছে। একটু এগোতেই অন্ধকার। কিছুই নজরে পড়ছে না। ফ্রান্সিস অল্পক্ষণ দাঁড়াল। শাঙ্কোও দাঁড়াল। অন্ধকারটা চোখে একটু স'য়ে আসতেই দেখল একটু দূরে শুকনো ঘাসের একটা বিছানা। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। খালি গায়ে একটা মানুষ সেই বিছানায় শুয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে একজন শ্বেতকায় মানুষ। এখন অবশ্য রোদে জলে পুড়ে গায়ের রঙ ঘোর তামাটে।

ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—আপনি কে? কোনো সাড়া শব্দ

নেই। ফ্রান্সিসের কণ্ঠস্বর গুহাটায় প্রতিধ্বনিত হলো। ফ্রান্সিস আবার বলল—আপনার নাম কী? লোকটি নিশ্চুপ। শরীরে কোনো সাড়া নেই। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো আস্তে বলল—মরে টরে যায়নি তো?

—বুঝতে পারছি না।

ফ্রান্সিস বিছানাটার পাশে এসে বসল। লোকটার ডান হাতটা তুলে নিল। হাতটা একেবারে ঠাণ্ডা নয়। নাড়ী দেখল। নাড়ী চলছে ক্ষীণ ভাবে। বুকে কান পাতল। দুর্বল হৃৎপিণ্ডের শব্দ। তাহলে বেঁচে আছে। ফ্রান্সিস এদিক ওদিক তাকাল। দেখল পাথুরে মেঝেয় একপাশে একটা মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িটার কাছে গেল। দেখল তাতে জল ভরা। আরো কয়েকটা হাঁড়িকুড়ি রয়েছে। কালো পোড়া। ও হাতে জল নিল। এগিয়ে এসে লোকটার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল। বারকয়েক জলের ঝাপটা দেবার পর হঠাৎ কয়েকবার পিট পিট করে লোকটা চোখ খুলল। তারপর মাথাটা আস্তে আস্তে এপাশ ওপাশ করল। এতক্ষণে ফ্রান্সিস অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দেখল লোকটা মধ্যবয়স্ক। মাথায় লম্বা চুল। মুখে বড় বড় দাড়ি গোঁফ।

ফ্রান্সিস এবার ঝুঁকে লোকটার কানের কাছে মুখ এনে পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—আপনি কে?

খুব ক্ষীণস্বরে দুর্বলকণ্ঠে লোকটা বলল—বা-রিন থা-স।

—আপনি কি অসুস্থ?

—হ্যাঁ। বারিনথাস ক্ষীণকণ্ঠে পোর্তুগীজ ভাষায় বলল।

—আপনি এখানে কী করে এলেন?

—সে অ-নে-ক কথা। আ-আ-মি-বারিনথাস—আর কথা বলতে পারল না। ভীষণভাবে কাশতে লাগল। কাশির ধমকে বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কাশি একটু কমতে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—আপনি কতদিন এখানে আছেন?

বারিনথাস আস্তে আস্তে ডান হাতটা তুলল। কাঁপা কাঁপা আঙুল তুলে গুহার দেয়ালটা দেখাল। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট দেখল গেরুয়া পাথরে দেয়ালে কতকগুলো টানা টানা দাগ। বোঝা গেল দিনের হিসেব। ফ্রান্সিস ওকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করল না। বুঝলো কথা বললে লোকটা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো, একে জাহাজে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এ অবস্থায় নেওয়া যাবে না। তুমি এক কাজ করো। জাহাজের বদ্যিকে ডেকে আনো। চিকিৎসা চলুক। একটু সুস্থ হলে তখন নিয়ে যাবো।

শাঙ্কো চলে গেল বদ্যিকে ডাকতে।

জাহাজ থেকে বদ্যি ওষুধপত্র নিয়ে এল। মৃতপ্রায় বারিনথাসকে পরীক্ষা করে বলল—অসুখ তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। অনাহারে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ভালো হয়ে যাবে।

বদ্যি কোনো রকমে ওষুধ খাওয়ালো। বদ্যি চলে গেল। ফ্রান্সিস বারিনথাসের জন্যে জাহাজ থেকে পোশাক কম্বল পাঠিয়ে দিল।

দিন তিনেক চিকিৎসা চলতে বারিনথাস অনেকটা সুস্থ হলো। ফ্রান্সিস বারিনথাসের

সঙ্গে কথা বলে এইটুকু জানতে পারল—ও জাতিতে স্প্যানিশ। তবে পোর্তুগীজ ভাষা ভালোই জানে। স্পেনদেশের রাজধানী মাদ্রিদে সে থাকতো। রাজসভার এক গণ্যমান্য অমাত্যের বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজ করত।

বারিনথাস এখন সুস্থ। কয়েকজন ভাইকিং বারিনথাসকে ধরে ধরে জাহাজে নিয়ে এল। আসার সময় বারিনথাস ঘাসের বিছানার তলা থেকে একটা চামড়ায় বাঁধানো বড় খাতা নিয়ে এল। খাতাটা দেখে ফ্রান্সিস বেশ অবাক হলো। কী আছে ওটাতে যে বারিনথাস অনেক যত্নে ওর কাছে রেখে দিয়েছে।

দিন দশেক কাটল। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা তাগাদা দেয়। বলে, এখানে পড়ে থেকে কী হবে? চলো দেশে ফিরি। কিন্তু ফ্রান্সিসের মন তখন বারিনথাসের বলা একটা কথাই ভাবছে। বারিনথাস একবারই কথাটা বলেছিল। বলেছিল—বিষাক্ত উপত্যকার নাম শুনেছো?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলেছিল—না। বারিনথাস আস্তে আস্তে বলেছিল—তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। সব তোমাকে বলবো। শরীরটা ভালো হোক।

এই বিষাক্ত উপত্যকার কথা শুনেই ফ্রান্সিস উৎসুক হয়েছিল। কোথায় এই বিষাক্ত উপত্যকা? কী আছে ওখানে? নামটাও বা এরকম কেন? ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে নিজের ঔৎসুক্য চেপে রাখল। বন্ধুদের ডেকে বলল—আর কয়েকটা দিন। বারিনথাস সুস্থ হলেই জাহাজ ছাড়বো।

একদিন রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—চলো বারিনথাসকে দেখে আসি।

বারিনথাসের কেবিনঘরে ঢুকল ওরা। দেখল বারিনথাস আয়নায় দেখে দেখে চুল আঁচড়াচ্ছে। ওদের ঢুকতে দেখে আয়না চিরুনি রেখে বসল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসতে বসতে বলল—তারপর এখন কেমন আছো বন্ধু?

—ভালো। বারিনথাস হাসল। হ্যারিও বসল।

—আচ্ছা—বিষাক্ত উপত্যকা ব্যাপারটা কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

বারিনথাস একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শিয়রের কাছে রাখা সেই চামড়ার বইটা বের করল। বলল—এই বইটা দেখ।

ফ্রান্সিস বইটার পাতা ওল্টালো। প্রাচীন বই। সাদাটে চামড়ায় লেখা। ফ্রান্সিস লেখার ভাষাটা কিছুই বুঝল না। হ্যারিকে দিল। হ্যারি উল্টেপাল্টে দেখে বলল—মনে হচ্ছে কোনো প্রাচীন ভাষায় লেখা।

—ঠিকই ধরেছেন—এটা প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় লেখা। এই বইটা পড়বার জন্যে আমি অনেক কষ্টে ঐ ভাষাটা শিখেছি। তারপর বইটা পড়েছি। একটু থেমে বলল—বইটা পেয়েছিলাম অদ্ভুতভাবে। মাদ্রিদে রাজপ্রাসাদের পাঠাগারে। সেখানে নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে যেতাম। আগেই বলেছি আমি গৃহশিক্ষকতা করতাম। তখনই ঐ পাঠাগারে একবাক্স পুরোনো বই পুঁথির মধ্যে এই বইটা পাই। সব বইই তো হাতে লেখা। মোটামুটি সব বইয়ের লেখকের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই বইটার লেখকের নাম নেই। বইটার নাম 'ন্যাভিগেশিও'। সেন্ট ব্রেণ্ডন নামে একজন ধর্মযাজকের সমুদ্রযাত্রা নিয়ে লেখা। নানা দ্বীপ নানা জায়গায় গিয়েছিল

সেন্ট ব্রেণ্ডন। একবার আয়ার্ল্যাণ্ডের অনেক পশ্চিমে এক অজানা দেশে পৌঁছেছিল। সেই দেশের নাম স্ত্রোমো। রাজধানীর নাম তুলা। সেই দেশে সেই রাজধানীতে আমি গিয়েছিলাম।

—কোথায় সেই দেশ? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—এখান থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে গেলে আট দশ দিনের পথ।

—তাহলে এটা একটা দ্বীপ নয়?

—না, এটা একটা দেশের পূর্বভাগ। একটু থেমে বারিনথাস বলতে লাগল—ন্যাভিগেশিও বইটাতে এসবের একটা অতীত ইতিহাসও লেখা আছে। সেটা বলছি।

বারিনথাস বলতে লাগল—পশ্চিমের দিকে অ্যাজটেক সভ্যতার পত্তন করেছিল একদল রেড ইণ্ডিয়ান। সেই উপজাতির নাম ছিল তলতেক উপজাতি। যে সাম্রাজ্য তারা গড়েছিল তা এক গৃহযুদ্ধে ভেঙে যায়। সেই গৃহযুদ্ধের মধ্যে যারা বেঁচেছিল কালহুয়াকান নামে এক উপজাতি—নেতার নেতৃত্বে তারা অরো পূর্বদিকে সরে আসে। এদের আরাধ্য দেবতার নাম কোয়েতজালকোয়াত্তি। সংক্ষেপে—কোয়েতজাল। এই দেবতা নাকি তাদের আদেশ দিয়েছিল—যে উপত্যকায় দেখবি একটা পাথরের ওপর ফণিমনসা গাছ সেখানেই তোরা বসতি স্থাপন করবি। কালহুয়াকানের নেতৃত্বে সেই তলতেক উপজাতির দল মহামূল্যবান হীরে চুনি পান্না দামী পাথর আর প্রচুর সোনা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে খুঁজতে বেরোয় কোথায় আছে সেই উপত্যকা যেখানে পাথরের চাঁইয়ের ওপর রয়েছে ফণিমনসার গাছ। দীর্ঘ বারো বছর তারা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াল সেই উপত্যকার খোঁজে। দলের কত লোক মারা গেল, কিন্তু অন্বেষণ চলল। অবশেষে ওরা এসে পৌঁছল এই স্ত্রোমো নামে জায়গাটায়। এখানেই তারা দেখল একটি উপত্যকা যেখানে একটি মাত্র পাথরের উপর একটা ফণিমনসার কাঁটাছাওয়া গাছ। ওদের যাযাবরবৃত্তি শেষ হলো। এখানেই কালহুয়াকান বসতি স্থাপন করল। রাজধানীর নাম তুলা। কোয়েতজাল দেবতার বড় মন্দির তৈরি করল পাথর গেঁথে। দেবতার মূর্তি কাঠ দিয়ে তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করল। বারিনথাস থামল। বইটা খুলে একটা আলগা পাতা বের করল। বলল—এই দেখ কোয়েতজাল দেবতার ছবি।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি দেখল ছবিটা।

—কিন্তু এ তো গেল ইতিহাস। বিষাক্ত উপত্যকা কী? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

বারিনথাস হাসল। বলল—আর একটু ইতিহাস আছে। সব বলছি। একটু থেমে বলতে লাগল—কালহুয়াকানের নেতৃত্ব সেই দল যে মহামূল্যবান হীরে পান্না চুনি প্রচুর সোনা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বেরিয়েছিল সে সবের কী হলো? ন্যাভিগেশিও বইটিতে তার হদিস নেই। কিন্তু ইঙ্গিত আছে। কালহুয়াকান নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন, সবাই তাকে রাজা বলে মেনে নিল। এখন সেই প্রচুর ধনসম্পত্তি কোথায় লুকিয়ে রাখা যায় এই নিয়ে রাজা কালহুয়াকান খুব চিন্তায় পড়লেন। এই সময়েই সেন্ট ব্রেণ্ডন সেই দেশে গিয়ে হাজির হলেন। রাজা কালহুয়াকান তাঁর কোনো ক্ষতি করলেন না। দু একটা ছোটখাট যুদ্ধে ব্রেণ্ডন-এর পরামর্শ নিলেন

তিনি। সেসব যুদ্ধে সেই পরামর্শেই জিতলেন। এবার ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে ব্রেগুন-এর পরামর্শ চাইলেন। ব্রেগুন সমস্ত দেশ, ধারেকাছের গুহা-গহ্বর পাহাড়ের ঢাল সব তন্নতন্ন করে দেখলেন। কিন্তু সেই ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা পেলেন না।

একটু থেমে বারিনথাস বলতে লাগল—অবশেষে ব্রেগুন এলেন বিষাক্ত উপত্যকায়। উপত্যকাটি কোয়েতজাল মন্দিরের পেছনেই। কাছের পাহাড়ের ঢাল থেকে একটা ছোট্ট ঝর্ণা নেমে এসেছে এই উপত্যকায়। খুব ক্ষীণ সেই জলধারা যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। সেই ঝর্ণার জল সাংঘাতিক বিষাক্ত। দূর থেকে দেখেছি সেই জলের রং গাঢ় সব্জে। সেই জল জমে জমে সমস্ত উপত্যকাটিতে বিষাক্ত হয়ে গেছে। সেখানে সবসময় কুয়াশা জমে থাকে। সমস্ত উপত্যকাটি ঘাসের চিহ্ন মাত্র নেই। সব্জে শ্যাওলার মতো স্তর জমে আছে। সেই স্তরে মানুষ বা জন্তু জানোয়ার পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া বেরোয়। সেই সঙ্গে তীব্র কটু গন্ধ আর মানুষ বা জন্তু-জানোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। কোনো তলতেক ভুলেও ওদিকে যায় না। তাই ঐ উপত্যকার নাম বিষাক্ত উপত্যকা। বারিনথাস থামল। একটু হাঁপাতে লাগল।

—ব্রেগুন কী করলেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

বলছি। বারিনথাস বলল—ঐ বিষাক্ত উপত্যকার মাঝখানে আছে একটি পাথরের চাঁই আর তার ওপর একটা ফণিমনসার গাছ। সেই গাছটা যে কী করে বেঁচে আছে এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার। তার চেয়েও আশ্চর্য বিষাক্ত উপত্যকায় সবুজ কাঠির মতো এক ধরনের ছোট ছোট গাছ আছে। তাতে গাঢ় বেগুনী রঙের ফুল ফুটে থাকে। সেই ফুল যদি কেউ শোঁকে সে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায়। মরে যায় না। কয়েক ঘন্টা পর সুস্থ হয়, কিন্তু তার ঘ্রাণশক্তি চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়ে যায়।

—তারপর? ফ্রান্সিস আগ্রহ সহকারে বলল।

—ন্যাভিগেশিও বইটিতে লেখা আছে ব্রেগুন রাজাকে ঐ বিষাক্ত উপত্যকাতেই ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজা নাকি তাই করেছিলেন। কিন্তু কী করে সেই ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তা লেখক লেখেননি। তারপর ব্রেগুন আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরে এসেছিলেন। সেখানেই মারা যান। কিন্তু বিষাক্ত উপত্যকায় রক্ষিত সেই ধনভাণ্ডারের কোনো হদিস তিনি কাউকে দিয়ে যেতে পারেননি।

—এটা কত দিন আগের কথা? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—প্রায় দুশো বছর।

—এখনো কি ঝর্ণাটা থেকে বিষাক্ত জল পড়ে?

—হ্যাঁ, তবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে।

—সেই পাথরের চাঁই ফণিমনসার গাছ এখনো আছে?

—হ্যাঁ। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

—উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পাথরের ওপর ফণিমনসার গাছের কাছে যাওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়? অসম্ভব।

—আচ্ছা পরে তো অনেকে রাজা হয়েছে, তারা কেন এই গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করেনি?

—করেছে, কিন্তু ঐ বিষাক্ত উপত্যকা! প্রথম রাজা কালহুয়াকান এরপর যারাই রাজা হয়েছে সবাই কালহুয়াকান পদবীটা তাদের নামের সঙ্গে ব্যবহার করত। এই রীতি এখন পর্যন্ত সব রাজাই মেনে এসেছেন। এখন যে রাজা তারও পদবী কালহুয়াকান।

—আপনি তো ঐ দেশে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। ব্রেগুনের ন্যাভিগেশিও বইটি পড়েই আমার ঔৎসুক্য জাগে। মাদ্রিদ থেকে বেরিয়ে পড়ি এই স্ত্রোমো রাজ্যের উদ্দেশে। বেশ কটা জাহাজ বদলে একদিন এই গেরুয়া পাহাড় এলাকায় এসে নামলাম। কয়েকদিন সেই গুহাটাতে রইলাম। তারপর গেরুয়া পাহাড়ের ওপাশের সবুজ তৃণভূমি থেকে যাত্রা করেছিলাম স্ত্রোমো দেশের উদ্দেশে।

—পায়ে হেঁটে? হ্যারি জানতে চাইল।

—না, ঘোড়ায় চড়ে।

—ঘোড়া পেলেন কোথায়?

—গেরুয়া পাহাড়ের ওপাশে সবুজ তৃণভূমির কথা বললাম, সেখানে অনেক বুনো ঘোড়া আর বুনো ভেড়া চরে বেড়ায়। একটা বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানিয়ে তার পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম।

তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—দিন আট দশেক পরে স্ত্রোমো দেশে পৌঁছলাম। আগেই বলেছি ওখানে তলতেক উপজাতির বাস। ওরা ভেড়ার চামড়ার ফুলপ্যাণ্ট মতো পরে। ওরা তুলোর চাষ জানে। প্রায় সমতল স্ত্রোমো দেশের মাটি কালো। তুলোচাষের খুব উপযোগী। তুলো থেকে সুতীর পোশাক বানিয়ে ওরা ব্যবহার করে। ওদের বাড়িঘর বলে কিছু নেই, বংশ পরম্পরায় চামড়ার তাঁবুতে বাস করে। তাঁবু ছিঁড়ে গেলে সারিয়ে নেয়। শুধু কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরটা পাথর গেঁথে তৈরি।

—ঐ দেশে গিয়ে আপনি বিপদে পড়েননি?

—প্রথমে কয়েকবার বিপদে পড়েছিলাম। তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। ওরা নাহুয়াতল ভাষায় কথা বলে। ঐ ভাষার কয়েকটা শব্দ আমি শিখেছিলাম। তারই সাহায্যে কথা দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে সৈন্যদের বললাম—আমাকে রাজা কালহুয়াকানের কাছে নিয়ে চল। ওরা আমাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজাকে অনেক কষ্টে বোঝালাম যে আমি ব্রেগুন-এর বংশধর। ব্রেগুন নামটা ওদের কাছে পরিচিত। ব্রেগুন প্রথম রাজা কালহুয়াকানের পরামর্শদাতা ছিলেন এটা রাজা জানতেন। আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম। আমার স্বাধীন চলাফেরায় আর কোনো বাধাই রইল না।

—কিন্তু আপনি গিয়েছিলেন কেন? হ্যারি বলল।

বারিনথাস হাসল—এখনও বুঝতে পারলে না?

—সেই গুপ্ত ভাণ্ডার উদ্ধার করতে তাই কি না? ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক তাই। কিন্তু দীর্ঘ দশ বারো বছর চেষ্টা করেও সেই ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারিনি। তবে সেই দেশটার সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে গুপ্ত ভাণ্ডার আছে ঐ বিষাক্ত উপত্যকার মধ্যে যে পাথরের ওপর ফণিমনসার গাছ আছে ওখানেই।

—কিন্তু—ফ্রান্সিস বলল—একটা কথা ভেবেছেন কি সেই বিষাক্ত জলের উপত্যকার মধ্যে ব্রেগুন বা রাজা কালহুয়াকান কী করে গুপ্ত ভাণ্ডার রেখে এলেন?

—আমার মনে হয় দুশো বছর আগে ঐ উপত্যকাটা হয়তো অতটা বিষাক্ত হয়ে ওঠেনি।

—তাহলে তো পরবর্তীকালে রাজারা সহজেই গুপ্ত ভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারতেন। ফ্রান্সিস বলল।

বারিনথাস একটু ভাবল। বলল—হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো।

—আমার মনে হয় ওখানে পৌঁছবার এবং ফিরে আসার নিরাপদ কোনো পথ আছে। হয়তো বিষাক্ত উপত্যকার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বরাবর কোনো পথ চলে গেছে। সেই পথে গিয়েই ধনভাণ্ডারে রেখে আসা হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই পথ বিষাক্ত জলে ডুবে যায়। পাথরের ওপর ফণিমনসার গাছের কাছে আর তারপরে কেউই যেতে পারে নি। ফ্রান্সিস বলল।

বারিনথাস কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর মাথা তুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। ফ্রান্সিস তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান।

হ্যারি হেসে বলল—ফ্রান্সিসের বুদ্ধি আর সাহসের কাহিনী নিয়ে আমাদের দেশের চারণকবিরা গান বেঁধেছে। গ্রামে গ্রামান্তরে সেই কাহিনী ওরা গেয়ে বেড়ায়।

—বলো কি!

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল —থাক ওসব কথা। আপনি বিশ্রাম করুন। পরে কথা হবে।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি নিজেদের কেবিন ঘরে চলে এল।

তখন রাত হয়েছে। ফ্রান্সিস জাহাজের ডেকে পায়চারি করছে। সমুদ্রের হু হু হাওয়ায় ওর মাথার চুল এলোমেলো হচ্ছে। মাথার ওপর নির্মেঘ আকাশ। পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। চাঁদ উজ্জ্বল। চাঁদের নরম

ফ্রান্সিস জাহাজের ডেকে পায়চারি করছে।

আলো পড়েছে গৈরিক পাহাড়ে, সমুদ্রে।

এ সময় হ্যারি ডেকে উঠে এল। ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, ভাইকিং বন্ধুরা তো দেশে ফেরার জন্যে উদগ্রীব। কী করবে এখন?

—এখন দেশে ফেরা হবে না।

—কিন্তু ওরা কি শুনবে?

—শুনতে হবে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—তলতেকের দেশ স্ত্রোমোতে যাব। কালহুয়াকান রাজাদের গুপ্তধন উদ্ধার করতে হবে।

—পারবে?

—ওখানে সব দেখেশুনে তবে বুঝতে পারবো।

—তুমি কি এজন্যে, বারিনথাসের সাহায্য নেবে?

—হ্যাঁ—তা তো নিতেই হবে। ওর সঙ্গে এই নিয়ে কালকে কথা বলবো। ও কেন ফিরে এলো, একা, একা গুহায় পড়ে রইল, এসব এখনও শোনা হয়নি।

—তাহলে আগে কথাবার্তা বলে তারপর সিদ্ধান্ত নাও।

—বেশ, তাই হবে।

পরদিন। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বারিনথাসের কেবিনঘরে এল। বারিনথাস তখন ন্যাভিগেশিও বইটা পড়ছিল। ওদের দেখে বই বন্ধ করে উঠে বসল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ওর বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বলল—এখন কেমন বোধ করছেন?

—খুব ভালো।

—আমাদের স্ত্রোমো দেশে নিয়ে যেতে পারবেন?

—এ্যাঁ? বারিনথাস বেশ চমকে উঠল।

—শুনুন—আমি স্থির করেছি আমরা কয়েকজন ঐ দেশে যাবো। আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। প্রথম রাজা কালহুয়াকানের ধনসম্পদ আমরা খুঁজে বের করবো।

—অসম্ভব। বারিনথাস মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল—আমি দীর্ঘ পনেরো বছরের আপ্রাণ চেষ্টাতেও পারিনি।

—আমি এখুনি অসম্ভব বলতে রাজী নই। ফ্রান্সিস বলল—ওখানে যাবো। সব দেখবো তারপর ভাববো। যদি বুঝি অসম্ভব, তখনই অসম্ভব বলবো। তবে একটা কথা জানবেন—একটা ক্ষীণ সূত্র থাকেই যেটা ধরে চিন্তা করে সমাধান বের করা যায়।

—দেখবেন চেষ্টা করে। বারিনথাস বলল।

—এবার বলুন তো আপনি তুলা থেকে চলে এলেন কেন?

—সে অনেক ব্যাপার। আমি যে সেই গুপ্ত ভাণ্ডারের খোঁজে আছি এটা কী করে রাজা টের পেয়ে গেল। আমাকে তখন থেকে চোখে চোখে রাখতে লাগল। আমি এর মধ্যে তলতেক উপজাতির রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আমি নাহুয়াতল ভাষাও অনর্গল বলতে পারি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও গুপ্তধনের হদিস করতে পারলাম না। যা হোক—কী যে দুর্বুদ্ধি হলো আমার। সেনাপতির দলে ভিড়ে গেলাম। সেনাপতি ষড়যন্ত্র করেছিল রাজাকে সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করতে।

সেনাপতি অনেক মূল্যবান মুক্তো মণিমাণিক্য দেবার লোভ দেখিয়ে আমাকে দলে টানল। কিছু অনুগামী সৈন্য নিয়ে সেনাপতি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। রাজা কালহুয়াকান নিষ্ঠুর হাতে সেই বিদ্রোহ দমন করলেন। বিদ্রোহী সেনাপতি ও সৈন্যদের সঙ্গে আমিও বন্দী হলাম। এখন তলতেক উপজাতিদের একটা ধর্মীয় রীতি প্রচলিত আছে, প্রতি তিন মাস অন্তর অমাবস্যার রাতে ওরা কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরে নরবলি দেয়। অন্য উপজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যাদের বন্দী করা হয় তাদেরই বলি দেওয়া হয়। মৃতদেহগুলি ছুঁড়ে ফেলা হয় বিষাক্ত উপত্যকায়। যে সব বিদ্রোহীদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের বলি দেওয়া হতে লাগল। আমার ভাগ্যেও মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু তার আগেই বহু কষ্টে আমি পালালাম। পালিয়ে চলে এলাম এই গৈরিক পাহাড়ের আস্তানায়। গুহার বাইরে একটা গাছের ডাল পুঁতে ছেঁড়া জামাটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। যদি কোনো জাহাজযাত্রীদের নজরে পড়ে। আমাকে উদ্ধার করে। বারিনথাস কথা শেষ করে একটু হাঁপাতে লাগল।

—হুঁ। শুনুন—আমরা যাবো। আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন? ফ্রান্সিস বলল।

—পারবো বৈ কি। কিন্তু আপনাদের জীবনের নিরাপত্তা আমি দিতে পারবো না। উল্টে রাজা কালহুয়াকান আমাকে হাতের কাছে পেলে মেরে ফেলবে।

—ঠিক আছে। সে সব সমস্যার মোকাবিলা আমরাই করবো। ফ্রান্সিস বলল—ব্যাপারটা কি জানেন। জীবনে দুঃসাহসিকতা আমি পছন্দ করি। তাই আমি সমুদ্রযাত্রা করি, দ্বীপে দেশে ঘুরে বেড়াই। যে কোনো কঠিন কাজ করতে আমি ভালোবাসি। প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্ত ধনসম্পদের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। কিন্তু সেটা উদ্ধার করবার জন্য নিজের বুদ্ধি সাহস সব কাজে লাগাতে আমি আগ্রহী। বলতে পারেন এটাই আমার জীবন-দর্শন। অবশ্যই এ ব্যাপারে আমার বন্ধুরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে।

—আপনার কথাগুলো আমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগছে। গুপ্তধনের ওপর কোনো লোভ নেই অথচ সেটা উদ্ধার করতে আগ্রহী—এটা ঠিক বুঝলাম না।

হ্যারি হেসে বলল—ফ্রান্সিসের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হোক তাহলেই ওর মনটাকে বুঝবেন।

—আচ্ছা চলি। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও উঠল।

জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াল দু'জনে। হ্যারি বলল—তাহলে কী স্থির করলে? তলতেকদের দেশে যাবে?

—যাবো বৈকি।

—কিন্তু বন্ধুরা কি সব রাজী হবে? বাড়ি ফেরার জন্যে সবাই মুখিয়ে আছে।

—সে সব আমি বুঝিয়ে বলছি। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সবাইকে ডেকে উপস্থিত থাকতে বলো।

—বেশ।

সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়া বেশ তাড়াতাড়িই সারল সব ভাইকিংরা। ফ্রান্সিস রাতে সভা ডেকেছে। সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে। কেন সভা ডেকেছে ফ্রান্সিস

সেটা এ-কান ও-কান হতে হতে সবাই জেনে গেল। ফ্রান্সিস আবার নতুন এক অভিযানে যাবে। কিন্তু খবরটা সত্যি কিনা সেটা ফ্রান্সিসের মুখে শোনার জন্যে সবাই ডেকে এসে জড়ো হলো।

একটু পরেই ফ্রান্সিস এল। সঙ্গে হ্যারি। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওপরে মেঘহীন আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলছে। সমুদ্রের শোঁ শোঁ হাওয়া আর ঢেউয়ের মৃদু গর্জন। এ ছাড়া চারদিকে কোনো শব্দ নেই।

এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে দিন আট দশেকের পথ

ফ্রান্সিস একবার সবার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলতে লাগল ভাইসব, এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে দিন আট দশেকের পথ। তারপর একটা দেশ। নাম স্ত্রোমো। রাজধানীর নাম তুলা। সেখানে আছে এক উপত্যকা। নাম বিষাক্ত উপত্যকা। নাম শুনেই বুঝতে পারছো সেই উপত্যকা কত মারাত্মক। বিষাক্ত জলাভূমি ওটা। কোনো প্রাণী ঐ উপত্যকায় পড়লে মুহূর্তে তার মৃত্যু হয়। এই জলাভূমির মাঝখানে রয়েছে একটা পাথরের চাঁই আর একটা ফণিমনসার গাছ। আর এখানেই রয়েছে তলতেক উপজাতির প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তধন। ফ্রান্সিস একটু চুপ করল। তারপর বলতে লাগল—ভাইসব, ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডার আমরা খুঁজে বের করবো। সেইজন্যে আমি হ্যারির সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছি আমরা তিনজন—আমি হ্যারি আর আমাদের তীরন্দাজ শাঙ্কো ঐ গুপ্তধন উদ্ধারে যাবো। ফ্রান্সিস চুপ করল। কেউ কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব, তোমাদের কিছু বলবার থাকলে বলো।
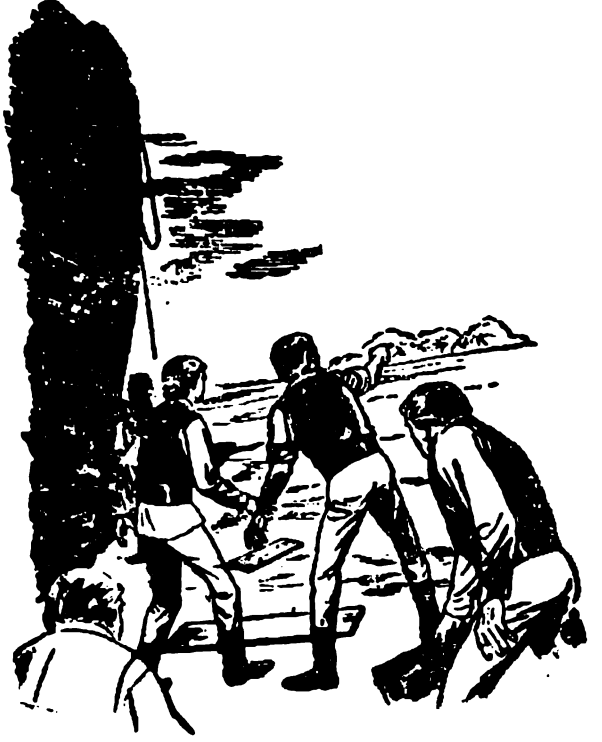
একজন ভাইকিং বলল—তোমরা ফেরা না পর্যন্ত তো আমরা দেশে ফিরতে পারবো না।

—হ্যাঁ, তোমাদের এখানেই থাকতে হবে।

—কিন্তু ফ্রান্সিস, বিস্কো বলল—আমরা অনেকদিন দেশ ছাড়া। আমাদের মনের অবস্থাটা একবার বিবেচনা করো।

—বিস্কো, তুমি আমাকে জানো। আমাকে সংকল্পচ্যুত করা কঠিন। [illegible] যখন স্থির করেছি—যাবোই। তোমরা জাহাজ নিয়ে চলে [illegible] আরামে দিন কাটাও।

—কিন্তু তোমরা তিনজন?

—আমরা স্ত্রোমো যাবো। এখনই বলতে পারছি না গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারবো কিনা। পারি বা না পারি ফিরে এসে এখানে থাকবো। কোনো জাহাজ নিশ্চয়ই পাবো। তখন দেশে ফিরে যাবো।

বিস্কো চেঁচিয়ে উঠলো—না, তোমাদের রেখে আমরা দেশে ফিরে যাবো না।

সব ভাইকিং চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো—।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—আমি গর্বিত যে তোমাদের মতো বন্ধু আমি পেয়েছি। ঠিক আছে। তাহলে দু'একদিনের মধ্যে আমরা রওনা হবো।

এবার হ্যারি বলল—আমরা কী ভাবে যাবো?

—বারিনথাস আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ও সঙ্গে থাকলে দোভাষীর কাজটা ও চালাতে পারবে।

—কিন্তু ভুলে যেও না ফ্রান্সিস—বারিনথাস পলাতক বন্দী। ও রাজা কালহুয়াকানের সুনজরে নেই।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল মাথা নিচু করে। তারপর বলল—কথাটা ঠিকই বলেছো। ঠিক আছে, আগে স্ত্রোমোতে চলো তো, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবো।

সভা ভেঙে গেল। ভাইকিংরা সব কথাবার্তা বলতে বলতে কেবিনে চলে গেল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারির কেবিনে এল। ওর হাতে ন্যাভিগেশিও বইটা। হ্যারি বলল—বইটা দেখলে?

—হ্যাঁ। প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা। পড়তে তো পারবো না। তবে কোয়েতজাল দেবতার ছবিটা ভালো করে দেখেছি। 'আচ্ছা হ্যারি' ফ্রান্সিস বইটা হ্যারির সামনে এগিয়ে ধরল। একেবারে শেষ পাতাটা দেখিয়ে বলল—দেখ তো, এই শেষ ক'টা লাইন কেমন অন্যভাবে সাজানো বলে মনে হচ্ছে না—যেন ছড়া বা কবিতার মতো।

হ্যারি মনোযোগ দিয়ে জায়গাটা দেখল। বলল—তোমার অনুমান সত্যি। এটা আগের লেখা গদ্যের মতো নয়, মনে হচ্ছে ছড়া জাতীয় কিছু।

—হ্যারি চলো, বারিনথাসের সঙ্গে এই নিয়ে কিছু কথা বলবো।

দু'জনে যখন বারিনথাসের কেবিনঘরে ঢুকল, বারিনথাস তখন একটা ভাঙা আয়নায় মুখ দেখছে। ওদের দেখে আয়নাটা রেখে দিল। দু'জনে বসল।

—আপনার বইটা।

বারিনথাস বইটা নিয়ে বিছানায় রাখল।

ফ্রান্সিস বলল—বইটা ভালো করে দেখলাম। আচ্ছা, দেবতা কোয়েতজালের মূর্তিটা একটু অদ্ভুত না?

—কেন বলো তো?

—কোয়েতজালের হাত দু'টো পেছনে। এরকম দেবমূর্তি বড় একটা দেখা যায় না।

—এটা তোমার নজরে পড়েছে তাহলে? হ্যাঁ ঠিকই—দেবমূর্তির হাত দুটো পেছনে।

মুখটা কঙ্কাল।

—হ্যাঁ, কোয়েতজালের জীবন ও মৃত্যুর দেবতা।

—মূর্তিটা কত বড়?

—একজন সাধারণ মানুষের উচ্চতার সমান।

—একটা কথা—ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিছানা থেকে বইটা নিয়ে বারিনথাসের হাতে দিল। শেষ পাতাটা বের করে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—এটা কী লেখা বলুন তো?

বারিনথাস হাসল। বলল—এটা একটা উদ্ভট ছড়া। মাথামুণ্ডু বোঝার উপায় নেই।

—তবু—ছড়াটা অনুবাদ করে বলুন তো?

—ছড়াটা কিন্তু ল্যাটিন ভাষায় লেখা নয়। তলতেক উপজাতির মুখের ভাষা নাহুয়াতল—সেই ভাষায় লেখা। স্পেনীয় বর্ণমালায়।

—আপনি তো ঐ ভাষা জানেন। অনুবাদে অর্থ বলুন।

বারিনথাস বলল—ঠিক অক্ষর সাজিয়ে অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায়—

অদ্ভুত অদ্ভুত!
ব্রেগুনের ছড়া!
পা আছে হাত নেই
মাথা
এক হাত পিঠে বাঁধা
টল্‌মল্ টল্‌মল্
অতল তল অতল তল।
এক হাত ধূলিময়
মুখ নয় কথা কয়
আঙুল তুলে হে—
কোন ভুলে হে—
পাথরেতে মনসা গাছ
কিম্ভুত কিম্ভুত!

ছড়াটা শেষ হতে ফ্রান্সিস বলল—ছড়াটা আর কয়েকবার বলুন।

বারিনথাস বার পাঁচেক ছড়াটা বলল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগ দিয়ে ছড়াটা শুনল।

একটু পরে হ্যারি বলল—কিছু বুঝলে?

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল—নাঃ। তবে এই ছড়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রেগুনের এই ছড়াটা অর্থহীন উদ্ভট নয়। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারবো দেবমন্দির—মূর্তি—বিষাক্ত উপত্যকা-রাজবাড়ি দেখার পর। মোট কথা, ওদেশে গেলে। এবার ফ্রান্সিস বারিনথাসের দিকে তাকাল—আচ্ছা, একটা ব্যাপার। যাজক ব্রেগুন রাজাকে ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিলেন তো?

—হ্যাঁ।

—এই জন্যে নিশ্চয়ই ব্রেগুন তলাতেক সৈন্যাদের বা অন্য লোকদের সাহায্য

(এটা কী লেখা বলুন তো?)

নিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, বইটিতে লেখা আছে ব্রেগুন সেনাপতি ও সৈন্যদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

—তাহলে তো তাদের এই গুপ্ত ভাণ্ডারের হদিশ জানার কথা।

—কিন্তু ব্রেগুনের পরামর্শে রাজা কালহুয়াকান সেই সেনাপতি ও সৈন্যদের বিষাক্ত উপত্যকায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

—রাজা নিজেও কি জানতেন না? তিনি তো তাঁর বংশধরদের বলে যেতে পারতেন।

—এখানেই ব্রেগুন আর ধর্মযাজকের মতো নির্লিপ্ত থাকেননি। তিনি একটা চাল চেলেছিলেন। তিনি ধনসম্পদের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। রাজাকে বলেছিলেন—আমি দেশে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনাকে জানাব কীভাবে আমি ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছি। রাজাও ওকে বিশ্বাস করে দেশে যেতে দিয়েছিলেন। ব্রেগুনের মতলব ছিল দেশে ফিরে আরও লোকজন নিয়ে সেই ধনভাণ্ডার চুরি করবে। দেশে নিয়ে যাবে। কিন্তু ব্রেগুনের এই আশা অপূর্ণই থেকে গেছে। বয়েসও হয়েছিল। কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তখনই ন্যাভিগেশিও গ্রন্থের লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ব্রেগুন লেখককে তাঁর সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বিভিন্ন দ্বীপ দেশের কাহিনী, স্ত্রোমো দেশের কাহিনী মুখে মুখে বলেছিলেন। লেখক সেই কাহিনী লিখেছিল। তারপর ব্রেগুন মারা গেলেন। রাজা কালহুয়াকানের আর জানাই হলো না সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিস।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে—ফ্রান্সিস বলল—একমাত্র ব্রেগুনই জানতেন কোথায় এবং কীভাবে লুকোনো আছে সেই ধনভাণ্ডার।

—ঠিক তাই। বারিনথাস বলল।

—এবার বলুন তো, কীভাবে যাবো আমরা? হ্যারি বলল।

—এই পাহাড়ের ওপাশে আছে বহুদূর বিস্তৃত সবুজ ঘাসের প্রান্তর। সেখানে অনেক বুনো ঘোড়া ভেড়া চরে বেড়ায়। সেই ঘোড়া ধরতে হবে। পোষ মানাতে হবে। সেসব ঘোড়ার পিঠে মোটা কাপড়ের জীন বাঁধতে হবে। তারপর সেইসব ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে, বারিনথাস বলল।

ফ্রান্সিস বলল—এ তো সময়সাপেক্ষ।

—হ্যাঁ, দিনকয়েক ঘোড়াগুলোকে পোষ মানাতেই যাবে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—তাহলে কালকেই আমরা ঐ প্রান্তরে যাবো। ঘোড়া ধরতে পোষ মানাতে আপনি কিন্তু সাহায্য করবেন।

নিশ্চয়ই করবো।

—চলি।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি চলে গেল।

পরদিন দুপুরে বারিনথাসকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো চলল সবুজ প্রান্তরের উদ্দেশে। বারিনথাস সঙ্গে নিল লম্বা দড়ি। গোল করে পাকানো। ফ্রান্সিস বলল—দড়ি নিলেন ঘোড়া বাঁধবার জন্যে?

—হ্যাঁ। দ্যাখো দড়ি দিয়ে ফাঁস তৈরি করেছি। এই ফাঁসকে বলে ল্যাসো। বুনো ঘোড়ার গলায় ফাঁস ছুঁড়ে বাঁধতে হয়। শিখে গেলে তোমরাও পারবে।

গৈরিক পাহাড়ের পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে ওরা পাহাড়টা পার হলো। ফ্রান্সিস দেখল, দূরে বিস্তৃত সবুজ ঘাসের প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছড়ানো ছিটানো পাথর।

ওরা এক সময় প্রান্তরের মুখে এসে দাঁড়াল। দেখল অনেক বুনো ঘোড়া ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। বারিনথাস ঘোড়াগুলোর দিকে যেতে যেতে বলল—আমার ঘোড়াটাও এই দলের মধ্যে আছে।

বারিনথাস ঘোড়াগুলোর কাছে যেতেই ঘোড়াগুলো এদিক ওদিক সরে গেল। বারিনথাস তীক্ষ্ণস্বরে শিস্ দিল। দেখা গেল একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেটার পিঠে মোটা কাপড়ের জিন বাঁধা। মুখে দড়ির লাগাম। বারিনথাস আস্তে আস্তে ঐ ঘোড়াটার কাছে গেল। ঘোড়াটার চোয়ালের কাছে চোখের কাছে আলতো চাপড় মেরে মেরে আদর করতেই ঘোড়াটা চি-হিঁ-হিঁ করে ডেকে উঠল। বারিনথাস তখন মাটি থেকে একটা বেশ বড়সড় পাথর তুলে ল্যাসোর অন্য প্রান্তে বাঁধল। তারপর পেটের কাছে নিয়ে লাফিয়ে ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসল। তাকে ছোটাল বুনো ঘোড়াগুলো যেখানে ঘাস খাচ্ছিল সেইদিকে। মুহূর্তে বারিনথাস বুনো ঘোড়ার দঙ্গলের একেবারে কাছে পৌঁছে গেল। বুনো ঘোড়াগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুট লাগাল। বারিনথাস একটা গায়ে সাদা ছিট ছিট ছুটন্ত ঘোড়ার পেছনে ছুটল। বুনো ঘোড়াটা ছুটছে। বারিনথাস পেছনে পেছনে ছুটল। এবার বারিনথাস হাতের দড়িটা শূন্যে ঘোরাতে লাগল। ঘোরাতে ঘোরাতে একসময় ছুঁড়ে দিল সাদা ছিট ছিট ঘোড়াটার গলায়। মুহূর্তে ল্যাসোর ফাঁস জড়িয়ে গেল ঘোড়াটার গলায়। বারিনথাস এবার বাঁ হাতে কোলের কাছে ধরা দড়ি বাঁধা পাথরটা মাটিতে ফেলে দিল। বুনো ঘোড়াটা দড়ি বাঁধা পাথর টানতে টানতে ছুটল। বারিনথাস এবার নিজের ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল। বুনো ঘোড়াটার গতি তখন অনেক কমে গেছে। আরো কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করল ঘোড়াটা। তারপর ক্লান্ত হয়ে আস্তে আস্তে একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বারিনথাস বুনো ঘোড়াটার কাছে এল। ল্যাসোর দড়িটা ধরে টানতে টানতে ফ্রান্সিসদের দিকে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল ক্লান্ত বুনো ঘোড়াটার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে।

বারিনথাস নিজের ঘোড়া থেকে নামল। বুনো ঘোড়াটার চোখের কাছে চোয়ালে আলতো চাপড় মেরে আদর করতে লাগল। ঘোড়াটা শান্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল। বারিনথাস লাগাম জিন ছাড়াই এক লাফে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা ছুটল। কিন্তু জোরে নয়। ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওটা। বারিনথাস এপাশ ওপাশ ঝাঁকুনি খেতে খেতে বসে রইল। কখনো ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরল, কখনো ঘোড়াটার ঘাড়ের লম্বা লম্বা কেশর টেনে ধরল। ঘোড়াটাকে কিছুক্ষণ ছুটিয়ে বারিনথাস তার পিঠ থেকে নামল। তারপর ওটার গলায় দড়ি পরিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এল ফ্রান্সিসদের কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এটা আর দু'একদিনের

মধ্যেই পোষ মেনে যাবে। তোমরা দু'জন আমার পুরোনো ঘোড়াটায় চড়ে যাবে।

বারিনথাস এবার ঘোড়া দু'টোকে দড়ি দিয়ে পাথরের একটা খণ্ডের সঙ্গে বেঁধে রাখল। তিনজনে এরপর গেরুয়া পাহাড় পেরিয়ে জাহাজে ফিরে এল।

পরের দু'তিনদিন ধরে বারিনথাস নতুন ঘোড়াটাকে পোষ মানাল। ঘোড়াটা শান্ত হলো। বারিনথাস ঘোড়াটার মুখে দড়ির লাগাম পরাল—পিঠে মোটা কাপড়ের জিন বাঁধল।

রওনা হবার দিন এসে গেল। সেদিন সকাল থেকেই ফ্রান্সিস খুব ব্যস্ত। জল, ময়দা, খাবার দাবার, ঘোড়ার খাদ্য ছোলা সব জড়ো করল। তরোয়াল, তীর ধনুক, বর্শাও নিল। জাহাজ থেকে গেরুয়া পাহাড়ে নামল। বারিনথাস বারবারই বলছিল—আরো ঘোড়া পোষ মানিয়ে বেশি লোক নিয়ে চলো। কিন্তু ফ্রান্সিস রাজী হয়নি।

চার পাঁচজন ভাইকিং বন্ধু ওদের মালপত্র বয়ে নিয়ে চলল।

তখন দুপুর। ওরা ঘাসের প্রান্তরে এসে পৌঁছল। দু'টো ঘোড়া পাথরে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। বারিনথাস নতুন ঘোড়াটার পিঠে উঠল। হ্যারি ওর পেছনে বসল। বন্ধুরা কিছু মালপত্র ঘোড়াটার পিঠের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিল। পুরোনো ঘোড়াটার পিঠে উঠল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। বন্ধুরা ঐ ঘোড়ার পিঠেও বাকী মালপত্র ঝুলিয়ে দিল।

যাত্রা শুরু করার আগে ফ্রান্সিস বন্ধুদের উদ্দেশে বলল—তোমরা সজাগ থেকো। রুপোর থামদু'টো পাহারা দিও। যদি আমাদের কোনো বিপদ হয় তোমাদের এখানে খবর পাঠাবো। তবে আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। কাজেই বিপদে পড়ার আশঙ্কা নেই। এবার তোমরা জাহাজে ফিরে যাও।

ফ্রান্সিস ঘোড়া ছোটাল। বন্ধুরা হাত নেড়ে বিদায় জানাল। তারপর জাহাজে ফিরে এল।

সন্ধ্যে নাগাদ একটা পাহাড়ী এলাকায় এল ফ্রান্সিসরা। রাতে পথ চলা যাবে না। একটা বড় ঝাঁকড়া পাতাঅলা গাছের নিচে ওরা ঘোড়া থেকে নেমে বসল। আজ রাতের মতো এখানেই আশ্রয়। বিশ্রাম।

চক্‌মকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাল শাঙ্কো। রান্না করল শাঙ্কো। খাওয়া দাওয়া সেরে ঘোড়া দুটোকে গাছের সঙ্গে বাঁধল। একটা পাত্রে জল ছোলা খেতে দিল। ঘাসের ওপর কম্বল পেতে ওরা শুল। ফ্রান্সিস বাদে ওরা তিনজন ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও উঁচু গাছটার ঝুপসি ডালপাতার দিকে তাকিয়ে রইল। চারদিকে অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষ চলছে বোধহয়। নানা চিন্তা মাথায়। স্ত্রোমো কেমন দেশ। কোনো বিপদ হবে কিনা। গুপ্তধন শেষপর্যন্ত উদ্ধার করা যাবে কিনা। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে আবার সব বাঁধা ছাঁদা করে ঘোড়ার পিঠে উঠল ওরা। বারিনথাস রওনা হবার সময়ই বলল, ঘোড়া জোরে ছুটিও না। কোনো কারণে ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়লে সর্বনাশ। এই পথে ঘোড়াই একমাত্র সম্বল। তাই ওরা ঘোড়া জোরে ছোটাচ্ছিল না।

বিচিত্র প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে ওরা চলল। কোথাও উঁচু পাহাড়। কোথাও গভীর

খাদ। অনেক নিচে রুপোলি ফিতের মতো পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। কোথাও লালরঙের ধুলোর প্রান্তর। তার মধ্যে ছড়ানো পাথর। ঘোড়া ছুটছে। পেছনে উঠছে লাল ধুলোর ঝড়। কোথাও পেয়েছে ছোট নদী। ঘোড়াগুলো পেট ভরে জল খেয়ে নিয়েছে। ওরাও জল খেয়েছে। চামড়ার থলেয় জল ভরে নিয়েছে।

তিন চার দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিস বারিনথাসকে বলল—চলো, রাতেও আমরা এগিয়ে যাই। আমার বন্ধুরা বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। কাজেই বেশি দেরি করতে পারবো না।

বারিনথাস রাজী হলো। ওরা রাতেও ঘোড়া ছোটাতে লাগল।

পাঁচদিনের দিন বিকেলে ওরা সবুজ গাছগাছালিভরা একটা জায়গায় এল। দেখলে দূরে দূরে কয়েকটা পাথরের বাড়িঘর। কোন কোন বাড়ি রোদে পোড়া ইঁটে তৈরী। এদিকে ওদিকে তুলো গাছের ক্ষেত। বাড়ির সামনে মেয়েরা দাঁড়িয়ে বসে আছে। বাচ্চা ছেলেপুলেরা এদিকে ওদিকে খেলছে। সবাই অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল।

বারিনথাস ঘোড়া থামাল। ফ্রান্সিসও ঘোড়া থামাল। বারিনথাস বলল—স্ত্রোমো দেশ শুরু হলো। এরা তলতেক উপজাতির মানুষ।

সেই রাতটা ওখানেই একটা গাছের নিচে ওরা রইল। বারিনথাস কাছাকাছি কোনো তলতেক-এর তাঁবু থেকে খরগোশের মাংসের ঝোল নিয়ে এল। কয়েকদিনের পর ভালো খাবার পেট ভরে খেল সবাই। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠেই সব গোছগাছ করে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো।

দুপুরের দিকে ওরা রাজধানী তুলায় পৌঁছল। দূর থেকে পাথরে গড়া বাড়ি চোখে পড়ল। বারিনথাস বলল—ঐ বাড়িটাই কোয়েতজাল দেবতার মন্দির। মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছতে বারিনথাস আঙুল দিয়ে মন্দিরের পেছনে একটা উপত্যকা মতো নিচু জায়গা দেখাল। বলল—এটাই হচ্ছে বিষাক্ত উপত্যকা।

—একটু ভালো করে দেখতে হয়। কথা বলে ফ্রান্সিস ঘোড়া থেকে নামল। উপত্যকার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। বারিনথাস ঠিকই বলেছে। ঐ দুপুরেও জায়গাটায় কুয়াশা ছড়িয়ে আছে। যেন ধোঁয়া উঠছে। জলের রঙ সঠিক বোঝার উপায় নেই। জলাভূমি মতো। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু আশ্চর্য—কাঠি কাঠি ঘাসের মতো গাছ আছে আর তাতে অজস্র গাঢ় বেগুনি রঙের ফুল ফুটে আছে। উপত্যকাটার একপাশে একটা উঁচু পাহাড় উঠে গেছে। অন্যপাশে কোয়েতজাল দেবতার পাথরের মন্দির।

বারিনথাস আঙুল উঁচিয়ে বলল—ঐ দেখ, পাথরে ফণিমনসার গাছ।

ফ্রান্সিস দেখল সত্যিই উপত্যকাটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা কালো পাথর। তার ওপর একটা ফণিমনসার গাছ।

তুলা নামেই রাজধানী। তেমন কিছু জমজমাট জায়গা নয়। তুলার চারপাশে এক মানুষ উঁচু পাথুরে দেয়াল। বোধহয় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। পাথরের বাড়িঘর এলাকাটায়। এখানে বেশি সংখ্যক লোকজনের বাস। পাথরের দেয়ালের বাইরে বাজার মতো বসেছে। লোকজন কেনাকাটা করছে। মেয়ে পুরুষ

সকলের গায়েই মোটা সুতোর পোশাক। নানা বিচিত্র রঙের পোশাক সেসব। পোশাক থেকে সুতোর ঝালর ঝুলছে। এমন সময় দেখা গেল একদল সৈন্য এগিয়ে আসছে। সৈন্যদের গায়ে কোনো পোশাক নেই। পরনে পা পর্যন্ত ঢাকা এক ধরনের পোশাক। খালি গায়ে মুখে লাল হলুদ সবুজ উল্কি আঁকা। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি। তাতে অনেক পাখির পালক গোঁজা। সৈন্যদের হাতে লোহার ছুঁচোলোমুখ বর্শা।

সৈন্যরা এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। বারিনথাস ডান হাত ওপরে তুলে নাহুয়াতল্ ভাষায় কী বলে গেল। সৈন্যদের মুখে হাসি দেখা গেল। কথাটা শুনে ওরা খুশি হয়েছে বোঝা গেল। সকলে সরে গেল।

ফ্রান্সিস ফিসফিস্ করে বলল—হ্যারি ওদের এত খুশি হবার কারণ কী?

—বোধহয় বারিনথাস বলল, আমরা বন্ধু, শত্রু নই। তাছাড়া বারিনথাস পলাতক বন্দী। অথচ ও বেশ নির্ভয়েই সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলল। আত্মগোপনের কোনো চেষ্টাই করল না।

বারিনথাসের পিছু পিছু ওরা চলল। কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরের পাশে একটা পাথরের বাড়ি। ছাউনিটা এই এলাকায় যে লম্বা লম্বা ঘাস হয় তাই দিয়ে তৈরি। বারিনথাস বলল—এটা রাজবাড়ি। চলো—সব আগে রাজার সঙ্গে দেখা করার নিয়ম।

যেতে যেতে ফ্রান্সিস বলল—বারিনথাস তোমার বাড়ি কোনটা?

বারিনথাস আঙুল দিয়ে রাজবাড়ির ডানপাশে একটা পাথরের বাড়ি দেখাল।

রাজবাড়িতে ঢুকল ওরা ঘোড়া থেকে নেমে। আলো থেকে অন্ধকার ঘরে ঢুকে ওরা প্রথমে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধকার সয়ে আসতে দেখল একটা তুলো কাপড়ের আসনে জাগুয়ারের চামড়ার ওপর রাজা বসে আছেন। খাড়া নাক। গায়ের রঙ তামাটে। মাথায় পাখির পালকের মুকুট। কপালে হলুদ কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। রাজা ফ্রান্সিসদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

বারিনথাস দু'হাত ওপরে তুলে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মাথা মেঝের ওপর রাখল। উঠে বসল। তারপর নাহুয়াতল্ ভাষায় কী বলে গেল। রাজার মুখে হাসি ফুটল। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে ডাকল হ্যারি।

হ্যারি চাপাস্বরে বলল—লক্ষ্য করেছি—কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

—বারিনথাস বলেছিল রাজা ওকে পেলে মেরে ফেলবে। এখন দেখছি রাজা ওর কথা শুনে খুব খুশী। ওকে কিছু বলছে না।

এবার রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী বলল। বারিনথাস দোভাষীর কাজ করতে লাগল। তাতে রাজা ও ফ্রান্সিসের কথাবার্তা এইরকম দাঁড়াল।

রাজা—তোমরা জানো তোমাদের এখানে কেন আনা হয়েছে?

ফ্রান্সিস—আমাদের আনা হয়নি। আমরা নিজেরাই এসেছি।

রাজা—কেন?

ফ্রান্সিস—প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তধন বের করবো তাই।

রাজা—সেই গুপ্তধন কোথায় আছে জানো?

ফ্রান্সিস—না। তবে শুনেছি বিষাক্ত উপত্যকার মাঝখানে।

রাজা—বিষাক্ত উপত্যকা কেমন জায়গা জানো?

ফ্রান্সিস—জানি।

রাজা—পারবে গুপ্তধন উদ্ধার করতে?

ফ্রান্সিস—আগে সব দেখি শুনি তারপর বলতে পারবো।

রাজা (হেসে)—যদি ততদিন বাঁচো।

ফ্রান্সিস—তার মানে?

রাজা—কোয়েতজাল দেবতা যেমন জীবনের দেবতা তেমনি মৃত্যুরও দেবতা।

ফ্রান্সিস বারিনথাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—এসব কথার মানে কী?

—রাজার মেজাজের কিছু স্থিরতা নেই। ভুলে যাও এসব কথা।

ফ্রান্সিস দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। দেখল—ঘরের দরজার কাছে দু'জন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে দ্রুত বলে উঠল—হ্যারি শাঙ্কো—পালাও—আমার পেছনে।

ফ্রান্সিস এক লাফে দরজার কাছে চলে এল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো। দরজায় পাহারাদার সৈন্য কিছু বোঝবার আগেই ফ্রান্সিস দু'জনকেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর এক লাফে বাইরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো। ঠিক তখনই দরজার পাহারাদার একজন উঠে দ্রুত হাতে বর্শা ছুঁড়ল। বর্শা গিয়ে বিঁধল ফ্রান্সিসের বাঁ পায়ে। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে এক টানে বর্শাটা খুলে ফেলল। গলগল করে রক্ত ছুটল। ফ্রান্সিস বসে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল। ছুটতে যাবে দেখল ততক্ষণে রাজবাড়ির পাহারাদার সৈন্যরা ওদের ঘিরে ফেলেছে। ফ্রান্সিস আবার দু'হাতে পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল। শাঙ্কো তখন তীর ছোঁড়ার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বলে উঠল—শাঙ্কো, ধনুক নামাও। এখন লড়াই নয়।

শাঙ্কো ধনুক নামাল। হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসের পায়ের জখমের জায়গার ওপরে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল—যদি রক্তপড়া বন্ধ করা যায়। রক্ত পড়া একটু কমল বটে কিন্তু একেবারে বন্ধ হলো না।

এর মধ্যে রাজা কালহুয়াকান বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে বারিনথাস। রাজা চিৎকার করে বারিনথাসকে কী বললেন। বারিনথাস ফ্রান্সিসদের কাছে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল—পালাতে গিয়ে ভুল করলে। রাজার রাগ বাড়িয়ে দিলে। এবার চলো গারদ ঘরে। ওখানেই থাকতে হবে কয়েকদিন।

—কয়েকদিন কেন?

—সেটাও কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝবে। বারিনথাস হেসে বলল।

ফ্রান্সিস এক ঝটকায় দ্রুত উঠে দাঁড়াল। রাজার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল—আমাদের নিয়ে কী করতে চান?

রাজা একবার ফ্রান্সিসদের দিকে ক্রুদ্ধ নজরে তাকিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। বারিনথাস হেসে বলল—তাহলে এবার আসল কথাটা বলি। আর চারদিন পর অমাবস্যা পড়বে। সেই রাতে কোয়েতজাল দেবতার বেদীতে তোমাদের বলি দেওয়া হবে।

তিনজনেই ভীষণভাবে চমকে উঠে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বারিনথাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে এইজন্যেই তুমি আমাদের প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তধনের লোভ দেখিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—আমার আরো বন্ধুদের আনতে বলেছিলে?

—ঠিক তাই। আমার কাজই এই। রাজা আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন একটি চুক্তিতে—তিন মাস অন্তর অমাবস্যার রাতে নরবলি দেবার জন্যে আমি মানুষ যোগাড় করে আনবো। আমিও এ কাজে রাজী হলাম এইজন্যে যে আমি তাহলে এখানে থাকতে পারবো। গুপ্তধন খুঁজতে পারবো। তারপর একদিন গুপ্তধন উদ্ধার করে নিয়ে পালাতে পারবো।

—কিন্তু গেরুয়া পাহাড়ের গুহায় গিয়েছিলে কেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

ওটা আমার ফাঁদ পাতার জায়গা। গুহার বাইরে ছেঁড়া জামা ঝুলিয়ে রাখি, জাহাজ এলে জাহাজের লোকেরা সেই সংকেত দেখে আমাকে উদ্ধার করে। আমি গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে জাহাজের লোকদের এখানে নিয়ে আসি। তাদের বলি দেওয়া হয়। রাজাও আম ‍ ওপর খুশি হয়। আমিও নিশ্চিন্তমনে গুপ্তধন খুঁজি।

—এর আগেও নিরীহ ‍ানুষদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছো?

—হ্যাঁ, তবে এর আগেরবারগুলোতে দশ পনেরো জন করে এনেছি। এবার তোমরা তিনজন মাত্র। বোধহয় কয়েদ রয়েছে কিছু।

ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আস্তে আস্তে বলতে লাগল—বারিনথাস, মৃত্যুর মুখ থেকে তোমাকে আমরা ফিরিয়ে এনেছি, ওষুধ দিয়েছি, সেবা-শুশ্রূষা করে তোমাকে সুস্থ করেছি। খাদ্য দিয়েছি, আশ্রয় দিয়েছি। যে পোশাকটা পরে আছো সেটাও আমরাই দিয়েছি। বদলে আমাদের হত্যা করবার জন্যে নিয়ে এলে! কী অকৃতজ্ঞ! কী সাংঘাতিক মানুষ তুমি!

নির্বিকার বারিনথাস বলল—নইলে গুপ্তধন খুঁজবো কী করে।

ফ্রান্সিস বলল—আমাদের ভাগ্যে যাই ঘটুক তোমাকে একটা অনুরোধ করে যাই—এমন কাজ আর করো না। এতে মানুষ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাবে। আমরা জানোয়ারেরও অধম হয়ে যাবো।

বারিনথাস হাসল শুধু।

বারিনথাস সৈন্যদের উচ্চস্বরে কী আদেশ করল। সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের টেনে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। তখনো ওর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে। হ্যারি চলতে চলতে বলল—ফ্রান্সিস, বারিনথাসকে ওষুধ দেবার কথা বলবো?

—[illegible]া, ওরকম একটা জঘন্য প্রকৃতির মানুষের কোনো সাহায্য আমি চাইবো না।

—[illegible] এত রক্ত পড়ছে—তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে।

—[illegible]রের দিক থেকে, মনের দিক থেকে নয়। হ্যারি, আমরা লড়াই করবো মনের [illegible]রে

ঘরটা রাজবাড়ির দক্ষিণ কোণায়। দেওয়ালগুলো পাথর গেঁথে তৈরি। তখনও ফ্রান্সিসদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়নি। অবশ্য তরোয়াল তীর ধনুক হাতে থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সিস তখন লড়াই করার কথা নিজে ভাবছিল না। ও আহত। ওদিকে সৈন্যরা সংখ্যায় জনা দশেক। এই অবস্থায় একবার লড়াইয়ে নামলে ওরা তিনজন বাঁচবে না। বরং বন্দী করে রাখলে পরে পালানোর উপায় বার করা যাবে। বুদ্ধি খাটিয়ে সেই কাজটিই করতে হবে। এখন ওরা যা করতে চাইছে সেটা মেনে নেওয়াই ভালো।

উলুধ্বনির মতো এক অদ্ভুত শব্দ করতে লাগলো।

ওরা কয়েদ ঘরের কাছাকাছি চলে এসেছে ঠিক তখনই দু'জন অশ্বারোহী সৈন্যদের কাছে এসে থামল। অশ্বারোহী সৈন্য দু'জন ঘোড়া থেকে নামল। সৈন্যদের কাছে এসে ওরা হাত পা নেড়ে ওদের ভাষায় কী বলল। সৈন্যটি বর্শা উঁচিয়ে মুখ হাত দিয়ে থাবড়াতে থাবড়াতে উলুধ্বনির মত এক অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। তারপর শব্দ থামিয়ে ছুটল ঐ শহরের চারপাশে গাঁথা পাথুরে দেয়ালের দিকে।

শুধু যে দু'জন সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল সেই দু'জন রইল। তারা সামনের একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঘোড়া দুটো বাঁধতে লাগল। তখনই ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—'হ্যারি-শাঙ্কো'—এই সুযোগ। ঘোড়া দুটো বাঁধবার আগেই ঘোড়া দু'টো ছিনিয়ে নিতে হবে। একটায় আমি অন্যটায় শাঙ্কো আর হ্যারি তুমি জল্‌দি।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ছুটে গিয়ে সৈন্য দু'টোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্য দু'জন ভাবতেও পারে নি যে ওরা এভাবে আক্রান্ত হবে। ফ্রান্সিস একজন সৈন্যের ঘাড়ে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে ঘা মারল। সৈন্যটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো অন্য সৈন্যটার মাথা দু'হাতে ধরে গাছের গায়ে ঠুকে দিল। ঐ সৈন্যটাও গাছের গোড়ায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আহত পা নিয়েও লাফিয়ে একটা ঘোড়ার পিঠে উঠল। তরোয়ালটা কোমরে গুঁজল। লাগাম হাতে নিয়ে ঘোড়ার পেটে পা দিয়ে জোরে খোঁচা মারল। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে ছুটল। শাঙ্কোও ততক্ষণে আর একটা ঘোড়ায় উঠে পড়েছে। হ্যারিও সেই ঘোড়ার পিঠের সামনের দিকে লাফিয়ে শাঙ্কো বাঁ হাতে হ্যারিকে সামনে বসিয়ে নিয়ে ঘোড়া ছোটাল।

একটু পরেই তুলা শহরের পাথুরে দেয়াল ছাড়িয়ে ওরা বাইরের প্রান্তরে চলে এল। দেখল তলতেক সৈন্যরা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। হয়তো অন্য কোন উপজাতির সৈন্যদের সঙ্গে। ওরা দেখল দু'দলের কিছু সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করছে। বাকিরা মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। ফ্রান্সিস দ্রুত দেখে নিল অন্য উপজাতির যোদ্ধারা অনেকেই বন্দী হ'য়েছে। উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন যোদ্ধা মাটিতে পড়ে আছে আহতদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। তবে তলতেক যোদ্ধারা প্রায় জয়ের মুখে। অন্য উপজাতির লোকেরা ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছে।

কয়েকজন তলতেক সৈন্য ফ্রান্সিসদের দেখল। ঘোড়া চালাতে চালাতে শাঙ্কো বলল—'ফ্রান্সিস কোনদিকে?' ফ্রান্সিস বলে উঠল—বাঁ দিকে—ঐ পাহাড়ের দিকে।' বিষাক্ত উপত্যকাকে বাঁ পাশে রেখে ওরা উত্তরের পাহাড়টা লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল।

এতক্ষণে যে কজন তলতেক সৈন্য ফ্রান্সিসদের দেখেছিল তারা বুঝল যে বন্দীরা পালাচ্ছে। এবার ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে ফ্রান্সিসদের ধাওয়া করল। কিন্তু ফ্রান্সিসরা ততক্ষণে অনেকটা চলে গেছে।

ফ্রান্সিস ঘোড়া ছোটাচ্ছে। কিন্তু খুব একটা দ্রুত ঘোড়া ছোটাতে পারছে না। বর্শা বেঁধা বাঁ পাটা অসাড় লাগছে। তবু ও প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাতে লাগল। কারণ ততক্ষণে ফ্রান্সিস দেখেছে পেছনে কিছু দূরে তলতেক সৈন্যরা ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে শাঙ্কো ব'লে উঠল, 'ফ্রান্সিস—সৈন্যরা আসছে।

—হ্যাঁ দেখেছি। ঘোড়া ছোটাও। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে ওরা। পেছনে তলতেক সৈন্যরা। ফ্রান্সিস ওর বাঁ পাটা দেখল। রক্ত পড়ছে তখনও। ঘোড়ায় চড়ার ঝাঁকুনিতে রক্ত বেশী বেরোচ্ছে। পা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বেশ দুর্বল লাগছে শরীরটা। শাঙ্কো আর হ্যারি তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস একটু পেছনেই পড়ে গেল। শাঙ্কো ঘোড়ার চলার গতি কমালো। ফ্রান্সিসদের কাছাকাছি পিছিয়ে এল। ফ্রান্সিস আহত। ঘোড়া থেকে যদি পড়ে যায়? এতে তলতেক সৈন্যদের সঙ্গে ওদের ধ'রে ফেলবে। ওর নিজের এই আহত শরীর। পারবে কি তলতেক সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই চালাতে?

তলতেক সৈন্যদের সঙ্গে ওদের দূরত্ব আরো কমে এল। তলতেক সৈন্যদের মধ্যে একজন লোহামুখ বর্শা ছুঁড়ল। সেটা ফ্রান্সিসদের থেকে বেশ দূরে এসে মাটিতে গেঁথে গেল।

একটা ঘাসে ঢাকা উপত্যকার মধ্যে একটা পায়ে চলা রাস্তার ওপর দিয়ে ওরা ছুটছে তখন। শাঙ্কো আর হ্যারির ঘোড়া আগে ছুটছিল। উৎরাইটা পেরোতেই হঠাৎ শাঙ্কো দেখল—সামনে গভীর খাদ। খাদের অনেক নীচে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখের রাশ প্রাণপণে টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠল—'ফ্রান্সিস সামনে খাদ। থামো।' ফ্রান্সিস তখন ঠিক ওদের পেছনে। শাঙ্কোর কথাটা কানে যেতে ফ্রান্সিসও প্রাণপণে ঘোড়ায় রাশ টেনে ধরল। ঠিক খাদের মুখে ওরা থেমে গেল।

ফ্রান্সিস দেখল—নদীর খাদটার ওপর দিয়ে একটা দড়ির সেতু বাঁধা। শক্ত পাকানো দড়ি দিয়ে তৈরী সেতুটা। এপারে সেতুটা দুটো মোটা কাছির মত দড়ি দিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা। দেখল ওপারে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কাছি দুটো টান টান বাঁধা। মাঝখানে সেতুটা হাত পাঁচেক দড়ির জাল বোনা। ওটার ওপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে পার হওয়া যায়। অনেক নীচে দেখল ছোট্ট পাহাড়ী নদী এঁকে বেঁকে চলেছে। খাদটার দুপাশের পাহাড়ে ঘন বন। নীচেও দুপাশে অনেকটা জায়গায় বন জঙ্গল। দড়ির সেতুটা দিয়ে মানুষ হেঁটে যেতে পারে। কিন্তু ঘোড়া যেতে পারবে না।

ফ্রান্সিস পেছনে তাকাল। একজন ঘোড়সওয়ার তলতেক সৈন্য অনেক কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল কী করবে এখন। হঠাৎ মনে একটা চিন্তা ধাক্কা দিল। হ্যাঁ—এ ছাড়া উপায় নেই। ফ্রান্সিস ঘোড়া থেকে নামল। শাঙ্কো আর হ্যারিও নামল। ফ্রান্সিস বলল—'শাঙ্কো—সামনেরটার মোকাবিলা আমি করছি। তুমি পেছনেরগুলোকে ঠেকাও।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে তীর ধনুক হাতে নিল। নিশানা করল পেছনের একজন সৈন্যকে। ছুঁড়ল তীর। নিখুঁত নিশানা। ঘোড়াসুদ্ধু সৈন্যটা লাফিয়ে উঠে মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। তীরটা ওর বুকে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিন চারজন সৈন্য ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল।

এদিকে খুব কাছে এগিয়ে আসা সৈন্যটা ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে দ্রুত সরে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট বর্শাটা একটা পাথরের গায়ে লেগে ছিট্‌কে পড়ল। পাথরের গায়ে আগুন ছিটকোল। ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে চালাল সৈন্যটার ডান উরু লক্ষ্য করে। উরু কেটে রক্ত ছুটল। সৈন্যটা চিৎকার করে দু'হাতে আহত উরুটা চেপে ধরল। ও তখন বুঝতে পারে নি সামনে খাদ, দড়ির সেতু। লাগাম ছাড়া হতেই ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। পড়ল গিয়ে দড়ির সেতুটার ওপর। প্রচণ্ড জোরে দুলে উঠল সেতুটা। দড়িতে পা আটকে ঘোড়াটা কাত হয়ে গেল। সৈন্যটা লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে গেল। কিন্তু পারল না। ঘোড়াটা পাক খেল। ঘোড়াসুদ্ধ সৈন্যটা ছিট্‌কে পড়ল। গভীর খাদের শূন্যতার মধ্যে দিয়ে নীচে পড়তে লাগল। মৃত্যুমুখী সৈন্যটা ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল। সেই চীৎকারের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ের গায়ে গায়ে। ঘোড়া আর সৈন্যটা আছড়ে পড়ল অনেক নীচে পাহাড়ী নদীটার ওপর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। সৈন্যটার অন্তিম চীৎকার তখনও খাদের দু'পাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ওদিকে শাঙ্কো তীর মেরে আর একটা সৈন্যকে ঘায়েল করছে। বাকী কয়েকজন সৈন্য এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দেখল—ঐ সৈন্যদের পেছনে আরো সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে ধুলো উড়িয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস নদীখাদের দিকে তাকাল। দড়ির জালের সেতু। লোক চলাচলের জন্য। শক্ত দড়ির জাল। ওপারে যাওয়া যায়। কিন্তু লাভ নেই। পেছনে আরো সৈন্য আসছে। এখন লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। একমাত্র উপায় দড়ির সেতুটা কেটে

ফেলা। কিন্তু ওপারে গিয়ে সেতুর দড়ি কাটার সময় নেই। সৈন্যরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। দড়ির সেতুটাও কাটতে হবে আবার সৈন্যরা এসে পৌঁছোবার আগে ওপরে পৌঁছতে হবে। কিন্তু কীভাবে? ফ্রান্সিস একটু আগেই সেটা ভেবে রেখেছিল। সেইভাবেই কাজ শুরু করতে হবে। তার আগে ও নদীখাদটার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল সেতুটা ছিঁড়ে ফেলে ওপারে নীচে গিয়ে কোথায় লাগবে। দড়ির সেতুটার মোটামুটি মাপটা ভেবে নিয়ে দেখল দড়ির সেতুর এই মাথাটা যেখানে ঝুলে গিয়ে লাগবে সেখানে ঝোপ আর জঙ্গল। ও নিশ্চিত হল। ওদের আহত হবার ভয় নেই। ও ফিরে এসে দাঁড়াল। দড়ির সেতুর যে মোটা কাছি দু'টো একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল সেখানে। দেখল তলতেক সৈন্যরা তীরের আক্রমণের ভয়ে সন্তর্পণে গতি কমিয়ে এগিয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—'হ্যারি শাঙ্কো শিগগির এই কাছিটা কাটো।' বলেই ও কাছির একটায় তরোয়ালের কোপ দিল। হ্যারিও তরোয়াল দিয়ে ঘা দিল। তরোয়ালের কোপে দড়ির ছিবড়ে বেরিয়ে গেল। শাঙ্কো তীর ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে কোমরে গোঁজা ছুরিটা বের করল। বলল—ফ্রান্সিস সেতুটা কাটতে চাইছো কেন?

সেতুটা কেটে এদিকের কাছি দুটো ধরে আমরা ঝুলে পড়বো। ঝুল খেয়ে ওপারের খাদের নীচের দিকে ঝোপ জঙ্গলে গিয়ে পড়বো। তারপর দড়ির সেতু বেয়ে ওপরে উঠে পালাবো। দড়ির সেতু ছেঁড়া হলে তিলতেক সৈন্যরা নদীখাত পেরোতে পারবে না।

শাঙ্কো হেসে বলল—'সাবাস সাবাস'। শাঙ্কো ওর ছোরা দিয়ে ঘষে ঘষে একটা কাছি কেটে ফেলল। অন্য কাছিটা তখন প্রায় কাটা হ'য়ে গেছে। ফ্রান্সিস তারোয়াল কোমরে গুঁজল। হ্যারিও তরোয়াল কোমরে গুঁজল। ফ্রান্সিস বলল—কাছি আর দড়ির জাল ধ'রে ঝুলে পড়। হ্যারি আর শাঙ্কো খাদের মুখের কাছে কাটা কাছি আর জাল ধ'রে ঝুলে পড়ল। ফ্রান্সিসও ছুটে এসে ঝুলে পড়ল। ঠিক তখনই দু'জন তলতেক সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এল ওদের ধরতে। কিন্তু ততক্ষণে তিনজনের ভারে অন্য অল্প কাটা কাছিটাও ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া দড়ির সেতু ধ'রে ঝুলে নেমে তিনজন ওপারে পাথুরে দেয়ালের নীচের দিকে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল।

তলতেক সৈন্যরা নদীখাতের মুখে দাঁড়াল। নীচে তাকিয়ে দেখল ফ্রান্সিসরা তলায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝুলছে। সৈন্যরা ভাবতেও পারেনি ফ্রান্সিসরা এভাবে ওদের হাত থেকে পালাবে। তলতেক সৈন্যরা নদীখাদ-এর পাশ দিয়ে এদিক-ওদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেখে এল। না ঃ নদীখাদ পার হবার কোন উপায় নেই। সৈন্যরা কিছুক্ষণ ওখানে বিশ্রাম নিল। তারপর দল বেঁধে চলে গেল।

ছেঁড়া কাছি দড়ি ধ'রে ঝুলে নেমে ফ্রান্সিস হ্যারি শাঙ্কো ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল। তা'তে ওদের হাত পা ছড়ে গেল। ফ্রান্সিসের আহত পায়েও একটা গাছের ডাল লাগল। আবার ঘা খাওয়া জায়গাটা থেকে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু ফ্রান্সিস দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগল। যাক্—মৃত্যুর হাত থেকে তো বাঁচা গেছে। পায়ের ক্ষত শুকিয়ে যাবে। কিন্তু রাজা কালহুয়াকানের কয়েদ ঘরে বন্দী হ'লে

জীবিত অবস্থায় আর ওরা বেরিয়ে আসতে পারতো না।

ফ্রান্সিস নীচের দিকে তাকালো। ছোট আঁকাবাঁকা নদীটা অনেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যে উচ্চতায় ওরা দড়ির সেতু ধ'রে ঝুলছে সেখান থেকে হাত ফস্কে নীচে পড়লে ওদের শরীর গুঁড়িয়ে যাবে। নদীটার জলস্রোতে অনেক বড় বড় পাথরের বাধা। তীব্র গতিতে ব'য়ে যাওয়া নদীর জল সেই পাথরগুলোতে ঘা খাচ্ছে। জল ছিট্‌কে উঠছে। তাই শব্দও হচ্ছে। ফ্রান্সিস স্পষ্ট সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

এ সময় হঠাৎ হ্যারি ব'লে উঠল—ফ্রান্সিস —'আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে।' ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি তুমি নীচের দিকে তাকিও না।' তারপর বলল—'হ্যারি শাঙ্কো—এবার দড়ির ফোকরে হাত-পা ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধ'রে ওপরের দিকে উঠতে থাকো।' ফ্রান্সিস প্রথম কিছুটা উঠে দেখাল কী ভাবে উঠতে হবে। হ্যারি আর শাঙ্কো সেভাবে উঠতে লাগল। উঠতে বেশ কষ্টই হচ্ছিল। একদিকে নদীখাদের শূন্যতা অন্যদিকে তীব্র হাওয়া। দড়ির সেতুটা দোল খেতে লাগল।

আস্তে আস্তে ওরা উঠতে লাগল। একসময় ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি এখন কেমন আছো?' হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'একটু ভালো। কিন্তু ফ্রান্সিস আর কতটা উঠতে হবে? ফ্রান্সিস মাথা উঁচু ক'রে দেখল। বলল—'আর কিছুটা। কোন দিকে তাকিও না। শুধু উঠতে থাকো। সামনে দড়ির দিকে তাকিয়ে থাকো।'

আবার আস্তে আস্তে সেতুর দড়ির জালে হাত পা রাখতে রাখতে ওরা উঠতে লাগল। হ্যারি কোনদিকে তাকাচ্ছিল না।

হঠাৎ দড়ির জাল শেষ। সামনেই একটা বড় পাথর। এবার টান দেওয়া দু'টো কাছি বেয়ে বেয়ে ওরা পাথরটার ওপর টেনে-হিঁচড়ে শরীরটাকে নিয়ে উঠল। পা রাখল পাথরটায়। শাঙ্কো আর হ্যারি তখনও হাঁপাচ্ছে। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। ফ্রান্সিসও পরিশ্রান্ত। তবে শাঙ্কো আর হ্যারির মত কাহিল হ'য়ে পড়েনি। ওকে দুর্বল ক'রে দিচ্ছিল পায়ের ক্ষতের যন্ত্রণাটা।

পাথরটার ওপর বসল তিনজনে—ভীষণ হাঁপাতে লাগল। পশ্চিম দিলে নদী খাদের কোনাকুনি সূর্য দিগন্তের অনেক কাছে নেমে এসেছে। সন্ধ্যে হ'তে খুব দেরী নেই। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস—এ আমরা কোথায় এলাম?

—কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু বিশ্রাম ক'রে চলো হাঁটতে থাকি।'

—কোনদিকে?' শাঙ্কো বলল।

—ঐ উত্তরদিকে। ফ্রান্সিস আঙুল তুলে দেখাল। ও দিকে দেখা গেল গম্ভীর বনাঞ্চল।

—কিন্তু ওদিকে কোথায় যাবো? শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বলল—'একটু বুদ্ধি খাটাও শাঙ্কো। এই পাথরটার ওপাশে তাকিয়ে দেখ—একটা অস্পষ্ট পায়ে চলা পথ। তার মানে এখান দিয়ে দড়ির সেতু পেরি লোকজন যাতায়াত করে। এই অস্পষ্ট পথটা ধ'রে যদি আমরা বনের মধ্যে এগোতে থাকি নিশ্চয়ই মানুষজনের বসতি পাবো। সেটা বনের মধ্যেও হ'তে

বনের শেষেও হ'তে পারে।'

—'কিন্তু সেই মানুষজন তো আমাদের সঙ্গে শত্রুতাও করতে পারে।'—হ্যারি বলল।

—সেটাই স্বাভাবিক হ্যারি। ফ্রান্সিস বলল—'আমরা বিদেশী বিধর্মী' আমাদের এরা কেউ ডেকে খাদ্য ও আশ্রয় দেবে না। যদি দেয় ভালো, না দিয়ে আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার জন্য লড়াইয়ে নামতে হবে। অবশ্য যদি ওরা সংখ্যায় অল্প হয়। সংখ্যায় বেশী হ'লে বনের আড়ালে আড়ালে পালাবো।

পাথরের ওপর ব'সে তিনজনে একটু জিরিয়ে নিল। ফ্রান্সিসের পায়ের ক্ষতস্থান থেকে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস বেশ দুর্বল বোধ করছে। কিন্তু হাত পা ছেড়ে বিশ্রাম করার সময় এখন নয়। সামনে এগোনো ছাড়া উপায় নেই। পেছনের সেতু তো ওরা কেটে ফেলেছে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল—'চলো ঐ বনের দিকেই যাওয়া যাক। লোকালয় নিশ্চয়ই পাবো। কারণ এই পথটা দিয়ে লোক চলাচল করে।' হ্যারি আর শাঙ্কোও উঠে দাঁড়াল। হ্যারি বলল, 'ফ্রান্সিস তুমি পারবে হাঁটতে? কতটা হাঁটতে হয় কে জানে।' ফ্রান্সিস হাসল—'না পারলে চলবে কেন। শাঙ্কো বলল—'আমরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাবো?

—না-না। চলো।' ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। হ্যারি আর শাঙ্কো চলল। হ্যারি বলল—'এখন আমাদের দুটো জিনিস দরকার। ফ্রান্সিসের চিকিৎসা আর খাদ্য। আশ্রয় না জুটলেও ক্ষতি নেই। গাছতলায় শুয়ে পড়বো।

ওরা যখন বনের কাছে পৌঁছল তখনও সন্ধ্যে হয়নি। কিন্তু বনের বিরাট বিরাট গাছগাছালি আর ঝোপের নীচে এর মধ্যেই অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। এতক্ষণ ওরা যা লক্ষ্য করেনি এবার সেটা লক্ষ্য করল। বনের সমস্ত গাছের লতার পাতা শুকিয়ে হলুদ হ'য়ে গেছে। গাছ লতার শুকনো পাতা নীচে মাটিতে স্তূপ হ'য়ে জমে আছে। অনেক গাছ-গাছালিতে একটা পাতাও নেই। শুকনো আঁকাবাঁকা ডাল উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে শুকনো গরম হাওয়া ছুটে আসছে। শুকনো ডাল পাতায় শব্দ তুলছে। ওরা তিনজনেই অবাক হ'য়ে শুকনো বনটার দিকে তাকিয়ে রইল। তখনই হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এখানে প্রচণ্ড খরা চলছে। বোধহয় কয়েক বছর এদিকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। তাই বনটার এই অবস্থা।

ফ্রান্সিস বলল—'ঠিকই বলেছো। অনাবৃষ্টির জন্যেই এই অবস্থা। এখন সমস্যা হ'ল এই বনে বা ধারে-কাছে যারা থাকে তাদের তো শোচনীয় অবস্থা। আশ্রয় ও খাদ্য পাওয়া যাবে কি?

—'চলো এগিয়ে যাই তো। দেখা যাক অবস্থাটা।' হ্যারি বলল।

ওরা বনের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল। একে অন্ধকার। তার ওপর জমে থাকা শুকনো পাতায় হাঁটু অব্দি ডুবে যাচ্ছে। কাজেই চলার গতি কমে গেল। তবু চলল ওরা। রাত নামার আগে যদি একটা আশ্রয়, কিছু খাদ্য জল পাওয়া যায়। শুকনো ঝরা পাতার ঢিবির ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে চলল। ফ্রান্সিসের কষ্ট হ'তে লাগল সবচেয়ে বেশী। একে কাটা ঘা তার ওপর শুকনো ডালপাতার ঘষটানি।

যন্ত্রণা মাঝে মাঝে অসহ্য হ'য়ে উঠছে। তবু ফ্রান্সিস দাঁত চেপে কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। ও যদি শারীরিক কষ্ট বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করে তা'হলে হ্যারি শাঙ্কো দু'জনেই অস্থির হ'য়ে পড়বে। কাজেই ফ্রান্সিস নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। নিজের জ্বালা যন্ত্রণার কথা বলল না।

হঠাৎ দু'পাশের শুকনো পাতায় জোরে শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফেলে ডাকল—'হ্যারি—শাঙ্কো।' হ্যারিও ততক্ষণে তরোয়াল কোমর থেকে খুলে ফেলেছে। শাঙ্কোও তীর ধনুক নিয়ে তৈরী। বুনো জন্তু-জানোয়ারের আশঙ্কাই করছিল ওরা। কিন্তু বুনো জন্তু-জানোয়ার নয়। ঝরা পাতায় শব্দ তুলে জমাট অন্ধকারের মত একদল মানুষ ওদের ঘিরে ধরল। অন্ধকারে ফ্রান্সিসরা অনুমান করতে পারল না ওরা সংখ্যায় কত। মুহূর্তে লোকগুলো ওদের বুকের কাছে বর্শা উঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর তরোয়াল নামাল। চেঁচিয়ে বলল—'হ্যারি শাঙ্কো—লড়াই নয়।' হ্যারি তরোয়াল নামাল। শাঙ্কো তীর ধনুক নামাল।

লোকগুলোর মধ্যে একজন বর্শা হাতে এগিয়ে এল। ওদের ভাষায় চীৎকার ক'রে কী বলল। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। চুপ ক'রে রইল। সেই সবার সামনে এগিয়ে আসা লোকটা নিজের লোকদের দিকে ফিরে কী বলল। দু'তিনজন এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের পিঠে বর্শার খোঁচা দিয়ে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল। পেছনে লোকগুলো। শুকনো পাতায় জোর মড়্মড়্ শব্দ উঠল। সবাই চলল।

শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল—'এরা কী করতে চায় আমাদের নিয়ে?'

—'কিছুই বুঝছি না।' ফ্রান্সিস বলল।

—এদের হাতে মশাল-টশাল থাকলে তবু এদের ভালোভাবে জানতে পারতাম।

—পাগল হয়েছো শাঙ্কো।' হ্যারি বলল—'এই শুকনো খটখটে বনে মশাল তো দূরের কথা এককণা আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়লে সমস্ত বন জ্বলে যাবে।

—দেখাই যাক না কোথায় নিয়ে যায়। একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়াল ওরা। এবার ফ্রান্সিসরা লোকগুলোকে দেখল। তলতেকদের মতই মোটা সূতীর কাপড় গায়ে কোমরে। মাথায় কাপড়ের ফেট্টি। তা'তে পালক গোঁজা। হাতে বর্শা। বোঝা গেল এরা যোদ্ধা। প্রান্তরের পরেই দেখা গেল—পাথরের বাড়িঘর। ছাতগুলো পাথরের না। ঘাস পাতার। তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে।

এই যোদ্ধাদের আসতে দেখে বাড়িঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। তাদের হাতে মশাল। স্ত্রীলোক, বৃদ্ধরা এই যোদ্ধাদের ঘিরে ধরল। তাদের ভাষায় নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। যোদ্ধারা ঐ ভীড়ের মধ্যে পথ ক'রে ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। যেতে যেতে যোদ্ধারা ভীড় ক'রে আসা লোকজনদের কী বলতে লাগল। দু একজন স্ত্রীলোক চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। অন্যদের চোখমুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেল। ফ্রান্সিসরা বুঝল কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু ঠিক বুঝল না এখানকার মানুষগুলো এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'ল কেন? কী জানতে চাইছে ওরা?

ফ্রান্সিসদের নিয়ে যোদ্ধার দল একটা বড় পাথরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

বাড়িটার সামনে পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি উঠে গেছে। সবাই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। একটা বিরাট দরজা সামনে। এব্ড়ো খেব্ড়ো কাঠের দরজা। দরজার কাঠ ভালো ক'রে চাঁছা হয়নি। দরজার দু'দিকে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। বর্শা হাতে দু'জন দ্বারী দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢুকল ওরা।

পাথরে বাঁধানো মেঝে। বিরাট লম্বাটে ঘর। দু'দিকে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখা গেল ঘরের শেষ দিকে একটা কাঠের সিংহাসন। রঙ্‌-বেরঙের মোটা কাপড়ে ঢাকা। পাল্‌কের গদী। যোদ্ধাদের দলনেতা ফ্রান্সিসদের সিংহাসনের সামনে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস আস্তে বলল, বোধহয় রাজার বাড়ি—এটা রাজ দরবার।'

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।' হ্যারিও গলা নামিয়ে বলল।

যোদ্ধারা সবাই পিছিয়ে দাঁড়াল। সামনে রইল শুধু দলনেতা।

একটু পরেই ও পাশের পাথরের থামের দিক দিয়ে একজন ঢুকল। তার পরনে নানারঙের জমকালো পোশাক। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি। তাঁতে নানারকম রঙীন পাখির পালক গোঁজা। বোঝা গেল ইনিই রাজা। ততক্ষণে সব যোদ্ধারা দলপতি দু'হাত সামনে মেলে মেঝেয় হাঁটুগেড়ে মাথা নিচু করল। রাজা আস্তে আস্তে গিয়ে সিংহাসনে বসলেন। এবার সবাই উঠে দাঁড়াল।

রাজা মৃদু হাসলেন। ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বললেন—তোমরা—বিদেশী?

ফ্রান্সিস রাজাকে দেখছিল। রাজার বয়েস হয়েছে। চোখে মুখে বয়েসের ছাপ পড়েছে। তবে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। এই বয়েসেও শরীর ঋজু। চলাফেরা বসায় বেশ স্বচ্ছন্দ।

রাজা একটুক্ষণ ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদিকে যোদ্ধাদের দলনেতা তাদের ভাষায় কী ব'লে যেতে লাগল। দলনেতা থামল। রাজা মৃদু হাসলেন। ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বললেন—তোমরা—বিদেশী?' ফ্রান্সিস এটা ভাবেনি। ও ভাবছিল কী ক'রে রাজাকে সব কথা বলবে। এখন রাজা স্পেনীয় ভাষা বলায় ও একটু চমকাল। খুশীও হ'ল যে রাজা স্পেনীয় ভাষা জানেন। রাজা বললেন—'আমাকে সম্মান।' ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'হ্যারি শাঙ্কো—একটু মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাও। তিনজনেই একটু মাথা নুইয়ে আবার সোজা করল। রাজা বললেন—'শুনলাম কেন এসেছো?' ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে স্পেনীয় ভাষায় সব কথা বলল। রাজা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন—'বারিনথাস—স্পেনীয় ভাষা শিখিয়েছে। বারিনথাস মন্দ—। তুলার

রাজা—কালহুয়াকান—ছোটভাই। বারিনথাস—ভাইর মন বিষিয়ে—আমাকে দেশত্যাগী। এখানে নতুন রাজ্য স্থাপন—চোলুলা। আমি রাজা হুয়েমাক।' যোদ্ধাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—'আমার প্রজা শ্রদ্ধা করে—ভালোবাসে।' একটু থেমে রাজা বললেন—'আজ তুলায়—যুদ্ধ হ'য়েছে—আমার যোদ্ধা—কালহুয়াকানের যোদ্ধা—ফলাফল এখনও জানি না।' ফ্রান্সিস বলল, 'রাজা হুয়েমাক আমরা পালাবার সময় যুদ্ধক্ষেত্রের কাছ দিয়েই এসেছি। দেখেছি আপনার সৈন্যদলকে যুদ্ধ করতে। কিন্তু—'

—কিন্তু? রাজা হুয়েমাক সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালেন।

—কিন্তু আপনার সৈন্যরা বোধহয় হেরে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আস্তে আস্তে মাথা নিচু করলেন। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুললেন। তাঁর দু'চোখ ছলছল করছে। ভারী গলায় বললেন—

—মারা গেছে? সবাই?

—না-না। ফ্রান্সিস ব'লে উঠল—'অনেক যোদ্ধাকে আমরা আত্মরক্ষার জন্যে স'রে যেতে দেখেছি।'

—কিন্তু কেউ ফিরল না—এখনও।' রাজা বিষণ্নস্বরে বললেন।

এবার ফ্রান্সিস সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। যে যোদ্ধারা শুকনো বনের মধ্যে ছিল ওরা অপেক্ষা করছিল যারা যুদ্ধে গেছে তাদের জন্যে। হয়তো সেই যোদ্ধারা আহত হয়ে ফিরে এলে এরা তাদের জায়গায় যেতো। কিন্তু ফ্রান্সিসরা দড়ির সেতু কেটে ফেলেছিল। তাই পরাজিত যোদ্ধারা কেউ এই পথে ফিরতে পারেনি। সেইজন্যে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা স্ত্রীলোকেরা এই যোদ্ধাদের ঘিরে সাগ্রহে জানতে চাইছিল সেই যোদ্ধারা কেউ ফিরছে কি না। এই যোদ্ধারা বলেছিল কেউ ফেরে নি। তাই স্ত্রীলোকদের মধ্যে কান্নার রোল উঠেছিল। ফ্রান্সিস বলল—রাজা হুয়েমাক—আপনাকে আমি বলেছি একটা পাহাড়ি নদী পেরিয়ে আমরা এসেছি।

—পুয়েবেলা নদী। রাজা বললেন।

—নদীটার ওপর দিয়ে কীভাবে এসেছি বলিনি। নদীটার ওপর একটা দড়ির সেতু ছিল। আমরা সেটা কেটে ফেলে—ঝুলতে ঝুলতে এপারে এসেছি। সেতুটা নেই তাই আপনার সৈন্যদল আসতে পারেনি।

রাজা বললেন—'সেতু নেই—অনেক ঘুরে—আসবে। দেরী হবে। প্রজারা ভালোবাসে—তুলা থেকে নির্বাসিত—আমি—সঙ্গে এসেছে—আমার সন্তানতুল্য—কোয়েতজাল রক্ষা করবেন।' রাজা মাথা নীচু করলেন।

ফ্রান্সিস একটু নিশ্চিন্ত হ'ল। কথায় ও ব্যবহারে বোঝা যাচ্ছে রাজা হুয়েমাক মানুষটা ভাল। ওদের কোন ক্ষতি করবে না। এতক্ষণে ফ্রান্সিস পায়ের যন্ত্রণার তীব্রতা অনুভব করল। ও পায়ের দিকে তাকাল। দেখল চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে। ফ্রান্সিস রাজার দিকে তাকিয়ে বলল—'রাজা হুয়েমাক—আমি খুব অসুস্থ—একটু বিশ্রাম করতে চাই।' রাজা বললেন—'কী অসুখ?' হ্যারি ব'লে উঠল—'পালাতে গিয়ে আমার বন্ধুর পায়ে বর্শা বিঁধেছে।' হ্যারি নীচু হ'য়ে ফ্রান্সিসের পায়ের ক্ষতস্থান দেখাল। রাজা দ্রুত কী ব'লে উঠলেন।

দু'জন যোদ্ধা বেরিয়ে গেল। রাজা বললেন—'বদ্যি—চিকিৎসা বসো'। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মেঝেতেই ব'সে পড়ল। আহত পা'টা অসাড় লাগছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। হ্যারিও ওর পাশে বসল।

একটু পরেই মোটা মত একটা লোক এল। লোকটা তখনও বেশ হাঁপাচ্ছে। বোধহয় রাজার ডাক পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। ওর হাতে একটা পুঁটুলি। বোঝা গেল বদ্যি।

বদ্যিকে হ্যারি ফ্রান্সিসের পায়ের ক্ষতস্থানটা দেখাল। বদ্যি পুঁটুলিটা পাশে রেখে ব'সে পড়ল। ক্ষতস্থানটা ভালো ক'রে দেখল। তখনও ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। এবার বদ্যি পুঁটুলি খুলল। দুটো চ্যাপ্টামত পাথর বের করল। সে দু'টো মেঝেয় রেখে পুঁটুলি থেকে দু'টো ছোট গোল শুকনো ফল বের করল। তারপর বের করল একটা কাঠের মুখঢাকা পাত্র। ফল দুটো একটা চ্যাপ্টা পাথরে রেখে অন্য পাথরটা দিয়ে চেপে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ফেলল। এবার কাঠের পাত্র থেকে একটা তেলের মত জিনিস গুঁড়োটায় ঢালল। মাখাল। তারপর ওটা নিয়ে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের ক্ষতস্থানে চেপে চেপে লাগিয়ে দিতে লাগল। ওষুধটা লাগাতেই ফ্রান্সিস যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। সবটা ওষুধ লাগাতেই ফ্রান্সিসের জ্বালা যন্ত্রণা অনেক কমে গেল। একটা ঠাণ্ডা ভাব ক্ষতস্থানটায়। ফ্রান্সিস বদ্যির দিকে তাকিয়ে হাসল। বদ্যিও হাসল। তারপর সব জিনিসপত্র পুঁটুলিতে ভরল। উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। তারপর চলে গেল। রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—'এই যোদ্ধারা—অনুগামী—ননোয়াক্লা—তোমাদের বিশ্রাম—ব্যবস্থা—করবে।' রাজা যোদ্ধাদের দলনেতাকে কী বললেন। দলনেতা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে আস্তে ধ'রে ধ'রে তুলল। ফ্রান্সিসের ডান হাতটা নিজের কাঁধে দিয়ে হ্যারি আর শাঙ্কোকে পেছনে পেছনে আসতে ইঙ্গিত করল। দলনেতা ফ্রান্সিসকে ধ'রে নিয়ে চলল।

ওরা রাজবাড়ির বাইরে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামল। তারপর ডানদিকে চলল। এদিকেও একটা পাথরের সিঁড়িওলা বাড়ি। ফ্রান্সিসরা ঠিক বুঝল না এটা কীসের বাড়ি। হ্যারি দলনেতাকে ইঙ্গিতে বাড়িটা দেখিয়ে জানতে চাইল এটা কী। দলনেতা কী ব'লে গেল। তার মধ্যে কোয়েতজাল কথাটা ওরা বুঝল। তার মানে এখানেও জীবন ও মৃত্যুর দেবতা কোয়েতজালের মন্দির আছে।

বেশ কয়েকটা বড় পাথরের ঘর বাড়ি ছাড়িয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দলনেতা থামল। বাড়ির দরজাটা চ্যালা কাঠের। দলনেতা গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। ভেতরে ঢুকল। ফ্রান্সিসরাও ভেতরে ঢুকল! একজন সৈন্য একটা মশাল জ্বেলে ঘরের পাথুরে দেয়ালের খাঁজে রাখল। দেখা গেল ঘরটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। একপাশে শুকনো ঘাসের বিছানা। তার ওপর মোটা সুতীর কাপড় বিছানো।

দলনেতা ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের জানাল এই ঘরেই ফ্রান্সিসরা থাকবে। ওদের খাবারদাবার এই ঘরে নিয়ে আসা হবে। এখানেই ওরা খাবে থাকবে। দলনেতা তার সৈন্যদের নিয়ে চলে গেল। শুধু একজন সৈন্যকে রেখে গেল ফ্রান্সিসদের দেখাশোনা করার জন্যে।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে হ্যারিকে দিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘাসের বিছানায় বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। হ্যারি ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর তুলনায় বরাবরই দুর্বল। হ্যারিও খুব ক্লান্তিবোধ করছিল। ও বিছানায় পা ছড়িয়ে বসল। শাঙ্কোও বসল। ফ্রান্সিস ক্লান্তস্বরে বলল—'হ্যারি—রাজা হুয়েমাকের সব কথা বুঝলে?'

—হ্যাঁ—কিছু কিছু বোঝা গেল। আগে হুয়েমাক কালহুয়াকান উপাধি নিয়ে তুলার রাজা ছিলেন। বারিনথাস ওঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ছোটভাইকে সেই ষড়যন্ত্রে সঙ্গী করে নেয়। তারপর ছোটভাই তলতেক সৈন্যদের রাজা হুয়েমাকের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। অবশ্যই তাকে সাহায্য করে বারিনথাস। রাজা হুয়েমাক তার অনুগত ননোয়াক্কা যোদ্ধাদের নিয়ে তুলা থেকে পালিয়ে আসেন এই চোলুলায়। নতুন বসতি গড়ে তোলেন অনুগত যোদ্ধা আর প্রজাদের নিয়ে। তুলায় রাজা হন তাঁর ছোটভাই রাজ পরিবারের প্রচলিত পদবী কালহুয়াকান নামে পরিচিত হন। ফ্রান্সিস বলল—'তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছো কী ঘটেছিল। তবে এই সবকিছুর পেছনে কলকাঠি নেড়েছে বারিনথাস। তাই রাজা হুয়েমাক বলেছিলেন—'বারিনথাস মন্দ যদিও এই বারিনথাসের কাছে উনি স্পেনীয় ভাষা শিখেছেন।' শাঙ্কো বলল— 'তাহ'লে তো এই চোলুলায় অধিবাসীরাও তলতেক উপজাতির লোক।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছো। তবে এখানে রাজা হুয়েমাকের অনুগামী যোদ্ধাদের নাম ননোয়াক্কা।' ফ্রান্সিস বলল।

একটু রাত হ'তেই দু'জন লোক ফ্রান্সিসদের ঘরে এল। চীনেমাটির থালায় খাবার নিয়ে এল ওরা। একটা মাটির বড় হাঁড়িতে ক'রে জল। খাবার হচ্ছে ভুট্টার রুটি, কীসের মাংস, ধান টিয়া টমেটো। তিনজনে আস্তে আস্তে খাওয়া শেষ করল। তিনজনেরই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। জল খেতে গিয়ে মুস্কিল হ'ল। জলের পরিমাণ কম। তিনজনে খাওয়ার পর আর সামান্য জল রইল। শাঙ্কো ইঙ্গিতে হাঁড়ি তুলে জল চাইল। লোক দু'টি মাথা নাড়ল। বোঝা গেল আর জল দিতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে এই জলেই আমরা চালিয়ে নেব।' লোক দু'টো এঁটো বাসনপত্র নিয়ে চলে গেল।

ঘরের কোনায় অনেক বড় বড় শুক্‌নো ঘাস জড়ো করা ছিল। সেসব এনে ছড়িয়ে পেতে বিছানাটা বড় করা হ'ল। তার উপর কাপড় পেতে তিনজনে শুয়ে পড়ল। হ্যারি ডাকল-'ফ্রান্সিস?'

—হুঁ। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে পাশ ফিরল।

—এখন কেমন আছো?' হ্যারি বলল।

—অনেকটা ভালো।

—খাওয়া দাওয়া তো মোটামুটি ভালোই কিন্তু খাবার জল এত কম দিচ্ছে কেন? হ্যারি বলল।

—হ্যারি—সেতু পেরিয়ে আসার সময় মনে আছে একটা বনের মধ্যে দিয়ে আমরা এসেছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—একেবারে শুকনো পাতা ঝরা বন।

—তার মানে দীর্ঘকাল এই চোলুলায় বৃষ্টি হচ্ছে না। দেখনি পাথরের বাড়ি ঘরগুলোয় কেমন ধুলোটে আস্তরণ পড়ে গেছে। তাই এই অঞ্চলে জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। হয়তো অনেক দূর থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। ধারে কাছের ঝর্ণাগুলো বোধহয় শুকিয়ে গেছে।

—ঠিক বলেছো।' হ্যারি বলল।

অনেক রাত তখন। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও কান পেতে রইল। বেশ কয়েকটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ এসে বাইরের প্রান্তরটায় থামল। লোকজনের হাঁক ডাক শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে বাইরে লোকজনের ছুটোছুটির শব্দ পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস উঠে বসল। মশালের আলোয় দেখল হ্যারি আর শাঙ্কো নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠল। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার কাছে গেল। দরজার হুড়কো খুলল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল চাঁদের নিস্তেজ আলোয় সামনের খোলা জায়গাটায় অনেক লোকজন জড় হ'য়েছে। অনেকের হাতে মশাল। অনেকে মশাল হাতে ছুটোছুটি করছে। আহত লোকজনের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। তা'হলে তুলার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যোদ্ধারা ফিরে এসেছে।

ঘুম ভেঙে হ্যারি আর শাঙ্কো এসে ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়াল। হ্যারি বলল—কী ব্যাপার?

—তুলাতে যুদ্ধ হচ্ছিল আমরা দেখে এসেছিলাম। এদিকে ফেরার পথের দড়ির সেতুটা আমরা কেটে দিয়েছিলাম। তাই ননোয়াল্কা যোদ্ধারা অনেক ঘুরে পুয়েবেলা নদী পেরিয়ে এসেছে। অনেকেই যুদ্ধে আহত। যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরার পথেও অনেকে মারা গেছে বোধহয়।' ফ্রান্সিস বলল।

—আমার খুব চিন্তা হ'য়েছিল আবার কোন ঝামেলায় পড়লাম।' হ্যারি বলল।

—চলো আমরা যতটা পারি ওদের সাহায্য করি।' ফ্রান্সিস বলল।

ওরা তিনজনে লোকজনের ভীড়ের দিকে গেল। দেখল একজন স্ত্রীলোক একজন মৃত ননোয়াল্কা যোদ্ধার বুকের ওপর পড়ে পাগলের মত কাঁদছে। আরো কয়েকজন স্ত্রীলোক বুক চাপড়ে কাঁদছে। তাদের স্বামীপুত্র বা আত্মীয়স্বজন কেউ হয়তো ফিরে আসেনি।

কোয়েতজাল মন্দিরের সামনের পাথরের সিঁড়ির ওপর আহতদের শুইয়ে দেওয়া হ'য়েছে। রাজবদ্যি তার শিষ্য বদ্যিদের নিয়ে আহতদের চিকিৎসা করছে। ওর দম ফেলার ফুরসত নেই।

ফ্রান্সিসরা দেখে আশ্চর্য হ'ল রাজা হুয়েমাক সঙ্গে কয়েকজন গণ্যমান্য সঙ্গী নিয়ে ঘুরে ঘুরে আহতদের দেখছেন। কাউকে উৎসাহিত করছেন কাউকে সমবেদনা জানাচ্ছেন। রাজার গায়ে রাজকীয় পোশাক নেই। রাতে যে সাধারণ পোশাক পরে ঘুমিয়েছিলেন তাই পরেই চলে এসেছেন। রাজার সঙ্গী একজন রাজার সঙ্গে চলতে চলতে কী ব'লে যাচ্ছিল। ঐ সঙ্গীটি বোধহয় সেনাপতি। রাজাকে হয়তো যুদ্ধের বিবরণ দিচ্ছিল। রাজা শুনছিলেন আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছিলেন।

ফ্রান্সিসরা আহতদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একজন আহত ননোয়াক্কা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী বলল। ফ্রান্সিসরা বুঝল না। তখন যোদ্ধাটি ইঙ্গিতে ওকে তুলে বসিয়ে দিতে বলল। শাঙ্কো সেটা বুঝতে পেরে দ্রুত গিয়ে যোদ্ধাটিকে বসিয়ে দিল। লোকটি তখন হাতের ইঙ্গিতে জল খেতে চাইল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো যাও আমাদের ঘর থেকে জলের হাঁড়িটা নিয়ে এসো।' শাঙ্কো দ্রুত ছুটে গিয়ে জলের হাঁড়িটা নিয়ে এল। পিপাসার্ত আহত যোদ্ধাটি সাগ্রহে জল খেল। ওকে জল খেতে দেখে চারপাশের আহত যোদ্ধাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল—'মাজাপান—মাজাপান।' ফ্রান্সিসরা কথাটার অর্থ বুঝল না। কিন্তু অন্য আহতদের তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে জলের হাঁড়িটার দিকে ইঙ্গিত করছে দেখে বুঝল—ওরা মাজাপান মানে পানীয় জল চাইছে। ফ্রান্সিস জলের হাঁড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু কয়েকজনকে জল দিতেই হাঁড়ির জল শেষ হ'য়ে গেল। তখনও আহতদের মধ্যে গুঞ্জন চলছে—'মাজাপান মাজাপান।' ফ্রান্সিস অসহায় দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছে তখনই দেখল রাজা হুয়েমাক ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল, 'রাজা—আহতরা জল চাইছে।' রাজা চিন্তাগ্রস্ত মুখে বললেন—জানি—নিরুপায়—বহুদিন—বৃষ্টি নেই—খরা —ঝর্ণা সরোবর—শুকনো—অনেক দূরে—ঝর্ণা—জল—আনতে গেছে।' ফ্রান্সিস বলল—'রাজা এই সমস্যাটার কথা আহত ননোয়াক্কাদের বলুন। ওরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত—।' রাজা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন—'স্বাভাবিক—ঘোড়ার পিঠে শুয়ে রাজপথ হেঁটে—আহতরা এসেছে—।' কথাটা শেষ ক'রে রাজা নাহুয়াত্‌ল ভাষায় সেনাপতিকে কী বললেন। সেনাপতি চীৎকার ক'রে কী ব'লতে লাগল। তার মধ্যে রাজা হুয়েমাক কথাটা ফ্রান্সিসরা বুঝল। সব চীৎকার কান্নাকাটি থেমে গেল। শুধু মৃদু গোঙানির শব্দ শোনা যেতে লাগল। রাজা হুয়েমাক সিঁড়িগুলোর মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দু'হাত ওপরে তুলে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বক্তৃতার মত বললেন নাহুয়াত্‌ল ভাষায়। রাজার কথা এতক্ষণ সবাই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনল। রাজার বক্তৃতা শেষ হ'লে আবার সবাই নিজের কাজ করতে লাগল। বোঝা গেল রাজা হুয়েমাক যুদ্ধ, জলের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এসব নিয়েই বলেছেন।

তখনই একজন ঘোড়সওয়ার সেখানে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। তার পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা আর একটা ঘোড়া। সেটার পিঠে একটা বেশ বড় পীপে। বোঝাই গেল জলের পীপে। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। মাটির আর চীনেমাটির বাটি নিয়ে অনেকে এগিয়ে এল। পীপে থেকে জল বিতরণ শুরু হ'ল। রাজা হুয়েমাক তখনও সঙ্গীদের নিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বাকী রাতটুকু এখানেই থাকবেন। আহতদের মধ্যে জল বিতরণ শুরু হ'ল। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল 'রাত আর বেশি নেই। চলো—যতটুকু পারা যায় ঘুমিয়ে নি।' তিনজনে নিজেদের ঘরে ফিরে এল। শুয়ে পড়বার আগে ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি—হুয়েমাক একজন আদর্শ রাজা।'

—ঠিক বলেছো। যুদ্ধে হেরে গেছেন তবু নিজের কর্তব্যে অটল।' হ্যারি বলল।

—তুলনায় কালহুয়াকান একটা নরপশু।' ফ্রান্সিস বলল।

—অবশ্যই।' হ্যারি বলল।

দু'তিনদিন শুয়ে ব'সে কাটাল ওরা। ফ্রান্সিস সম্পূর্ণ সুস্থ না হ'লে আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। শাঙ্কোও বেশ অধৈর্য হ'য়ে উঠল। সেদিন বলল—'চলো ফ্রান্সিস আমরা জাহাজে ফিরে যাই।'

ফ্রান্সিস বলল—'তোমার ইচ্ছে হ'লে চলে যেতে পারো। আমরা যাবো না।'

—কী করবে এখন?' শাঙ্কো বলল।

—সুস্থ হ'য়ে আবার তুলায় যাবো। প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তধনভাণ্ডার খুঁজে বের করবো।

—মাথা খারাপ? তুলায় গেলেই ওরা আমাদের বন্দী করবে। তারপর কোয়েতজাল মন্দিরে বলি দেবে।' শাঙ্কো বলল।

—বুদ্ধি খাটিয়ে সব করতে হবে। গুপ্তধন উদ্ধার করবো আবার আমাদের কোন ক্ষতি হবে না ঐ ভাবেই কাজ সারতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

—আমার এরকম নিষ্কর্মার মত বসে থাকতে ভালো লাগছে না। আমি শিকার করতে যাবো। শাঙ্কো তীরধনুক গোছাতে গোছাতে বলল।

—বেশ যাও। কিন্তু সাবধান কালহুয়াকানের সৈন্যদের হাতে যেন ধরা পড়ো না।' ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো তীরধনুক নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এভাবেই দিন কাটতে লাগল। শাঙ্কো কোনদিন সকালে কোনদিন বিকেলে বনে জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়ে যায়। রাজবৈদ্যর চিকিৎসায় ফ্রান্সিস এখন সুস্থ। বাঁ পায়ে আগের মতই জোর পাচ্ছে।

সেদিন সন্ধে থেকেই আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হ'ল। রাত হ'তেই ঝ'ড়ো হাওয়া শুরু হ'ল। গভীর রাত। ফ্রান্সিসরা ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ শুরু হ'ল বজ্রপাত। প্রচণ্ড জোর শব্দে বাজ পড়তে লাগল। তারপরই শুরু হ'ল বৃষ্টি। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল।

বাইরে লোকজনের চীৎকার হৈ হল্লা আরম্ভ হ'ল। হ্যারিও ঘুম ভেঙে উঠে বসল। হ্যারি বলল—'কী ব্যাপার বলো তো?

—বুঝলে না—এতদিন পরে বৃষ্টি এল। তাই ওরা আনন্দ করছে।'

—চলো তো দেখি।' হ্যারি বলল।

দু'জনে দরজা খুলে দাঁড়াল। দেখল অন্ধকারে স্ত্রী পুরুষ বাচ্চা কাচ্চা সবাই বৃষ্টিতে ভিজছে। নাচছে কয়েকজন ওরই মধ্যে নাকি গলায় গান গাইছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ওদের নাচতে দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন কী সব বাজনা নিয়ে এল। কচ্ছপের খোল দিয়ে তৈরী বাজনা। একটা হাড়ের কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। তালে তালে নাচছে সবাই। লোকগুলো যেন পাগল হ'য়ে উঠেছে। কতদিন পরে বৃষ্টি হ'ল কে জানে।

রাজপ্রাসাদের পাথরের দরজার কাছে দু'জন জ্বলন্ত মশাল হাতে এসে দাঁড়াল। তাদের পেছনে পেছনে রাজা হুয়েমাক এসে দাঁড়ালেন। রাজাকে দেখে নৃত্যরত নারীপুরুষের আনন্দ দ্বিগুণিত হ'ল। রাজা হুয়েমাক দু'হাত নেড়ে নেড়ে ওদের উৎসাহিত করতে লাগলেন।

বেশ কয়েকদিনের গুমোট গরমের পর বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল—দরজা খোলা থাক। ঘরটা ঠাণ্ডা হোক। দু'জন দরজা থেকে চ'লে এল। শুয়ে পড়ল। বাইরে তখনও দাপাদাপি নাচানাচি চলছে। ফ্রান্সিস বলল—'বুঝলে হ্যারি—এরাও তলতেক উপজাতি। নাহুয়াত্‌ল ভাষায় কথা বলে।'

—তা তো হবেই। এরা আর রাজা হুয়েমাকের অনুগত ননোয়াক্লা যোদ্ধারা তো তুলাতেই ছিল। রাজা হুয়েমাকের সঙ্গে ওরাও দেশত্যাগ করেছিল। কাজেই ভাষা তো এক হবেই।

দু'জনে আর কোন কথা হ'ল না বাইরে আনন্দ উল্লাস তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। বৃষ্টিও থেমে গেছে। আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে শুধু।

পরদিন সকালে শাঙ্কো তীরধনুক নিয়ে শিকার করতে বেরিয়ে গেল। শাঙ্কো প্রতিদিনই বুনো মুরগী নীল কতিঙ্গা পাখি, লাল চামচ ঠোঁট পাখি শিকার ক'রে আনে। পাখীর মাংস খাওয়া হয় আর চোলুলার লোকেরা ভীড় ক'রে আসে কতিঙ্গা পাখির, লাল চামচঠোঁট পাখির পালক নিতে। এসব পাখির পালক খুব দামী আর তলতেকরা মাথায় গুঁজে গর্ব অনুভব করে।

সেদিন দুপুর হ'য়ে গেল শাঙ্কো শিকার থেকে ফিরল না। ফ্রান্সিস আর হ্যারি তখনও ভাবল শাঙ্কো এখুনি আসবে। কিন্তু দুপুর পেরিয়ে বিকেল হ'তে চলল শাঙ্কো তখনও ফিরল না। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই চিন্তায় পড়ল। এত দেরী হবার কথা তো নয়।

সন্ধের সময় দু'জন ননোয়াক্লা যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের ঘরে এল। কী বলতে লাগল। হ্যারি ওদের বলল—কোথায় যাবো? রাজা হুয়েমাকের কাছে? রাজা হুয়েমাক কথাটা শুনে যোদ্ধা দু'জন মাথাটা বারবার ঝাঁকাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—' চলো রাজার কাছেই যাওয়া যাক। এদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

দু'জন যোদ্ধার সঙ্গে ওরা দু'জন রাজার পাথরের প্রাসাদে এল। ভেতরে ঢুকল। দেখল রাজা হুয়েমাক কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। রাজসভার গণমান্য ব্যক্তিরাও রয়েছেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হ'ল। রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—' তোমাদের বন্ধু—পুয়েবেলা নদীর সেতুর কাছে কালহুয়াকানের সৈন্যরা ধ'রেছে—চারজন ননোয়াক্লা যোদ্ধাকেও —ধরে নিয়ে গেছে—তুলাতে।

ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই ভীষণভাবে চমকে উঠল। শাঙ্কোকে ধ'রে নিয়ে গেছে? দু'জনেই পরস্পরের মুখের দিকের তাকাল।

—কখন ধ'রে নিয়ে গেছে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'দুপুরে।' রাজা বললেন। ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না কী করবে। ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—'কিন্তু পুয়েবেলা নদীর সেতু তো আমরা কেটে দিয়ে এসেছিলাম।'

—'কালহুয়াকান—সৈন্যরা—সেতু কাঠের করেছে—পাকাপোক্ত—আমরা জানতাম না।' রাজা বললেন।

—'তা'হলে তো কালহুয়াকান যে কোন সময় আপনার রাজ্য আক্রমণ করতে পারে।' হ্যারি বলল।

—পারে—আমরা তৈরী—লড়াই হবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি সে তো পরের কথা। এখন শাঙ্কোকে মুক্ত করার কথা ভাবো।'

—'তা তো বটেই। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিনা কী করবো?' হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস মাথা নীচু ক'রে দু'তিনবার পায়চারী করল। হ্যারি জানে গভীরভাবে ফ্রান্সিস যখন কিছু ভাবে তখন পায়চারী করে। হঠাৎ ফ্রান্সিস রাজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল।—'একমাত্র উপায় আমাদের ধরা দেওয়া।'

—'মানে?' রাজা সপ্রশ্নদৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—আমি আর আমার বন্ধু কালহুয়াকান সৈন্যদের হাতে ধরা দেব। ওরা আমাদের নিশ্চয়ই কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। আমাদের বন্ধুকেও নিশ্চয়ই ওখানেই রেখেছে। পরে বুদ্ধি করে কয়েদখানা থেকে পালাবো।' ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে?' রাজা বললেন।

—পারতেই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলল—দেখ—পারো কিনা। রাজা বললেন।

ওরা দু'জন মাথা একটু নীচু ক'রে রাজাকে সম্মান জানিয়ে চলে এল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুল দু'জনে। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস ধরা দেওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—'এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।' ফ্রান্সিস বলল।

—কালহুয়াকানের সৈন্যরা তো আমাদের মেরেও ফেলতে পারে।

—পারে কিন্তু যাতে মেরে না ফেলে তার জন্য বরাবর রাজা কালহুয়াকান ও বারিনথাসের কাছে আমাদের নিয়ে যেতে বলবে। তাহ'লেই ওরা আর মারবে না।

তাছাড়া কোয়েতজালের কাছে বলি দেবার জন্য ওদের তো মানুষ দরকার। বলি দেবার জন্যেই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।'

—হুঁ তা ঠিক। তাহ'লে কবে ধরা দেবে?' হ্যারি বলল।

—কালকেই। দেরী করা চলবে না।

—যদি শাঙ্কোকে এর মধ্যেই মেরে ফেলে থাকে? হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। ডান হাতটা বাড়িয়ে মশালের আগুনের কাছে রেখে বলল—'তাহলে এই আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—রাজা কালহুয়াকান আর বারিনথাস দু'জনকেই আমি হত্যা করবো। তারপর আমার মৃত্যু হোক—কোন দুঃখ থাকবে না আমার।

হ্যারি আর কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস বিছানায় শুল। শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভাবতে লাগল। এক সময় ওর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়েই ওরা দুজন তৈরী হ'তে লাগল। কোমরের ফেটিতে তরোয়াল গুঁজল। রাজা হুয়েমাক ওদের দু'জনকে দুটো সূতীর মোটা চাদর দিয়েছিল। সেদুটো গায়ে জড়াল। তারপর ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দু'চারজন ননোয়াল্কা সৈন্য এগিয়ে এল। রাজার আদেশ—ওদের ফ্রান্সিসদের সঙ্গে যেতে

হবে। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে ওদের সঙ্গে যেতে নিষেধ করল। তারপর প্রান্তর পেরিয়ে ওরা দু'জন সেই শুকনো পাতাঝরা বনের দিকে চলল।

বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে দু'জনে। শুকনো গাছপালা ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলল ওরা। দিন কয়েক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তবু গাছপালা সতেজ হয়নি। সেই শুকনো মরা মরা।

শুকনো বন শেষ হ'ল ওরা দু'জনে সেতুর কাছে এল। সত্যিই সেতুটা বেশ পাকাপোক্ত করা হয়েছে। গাছের ডাল ফালা ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে বেশ শক্ত সেতু তৈরী করা হয়েছে। হ্যারি বলল—এর ওপর দিয়ে ঘোড়ার চড়ে যাওয়া যাবে?

—না—তবে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে আর কালহুয়াকান চোলুলা আক্রমণ করলে এভাবেই ঘোড়া পার করবে।

ওরা হেঁটে সেতু পার হ'ল। এখন কালহুয়াকানের রাজত্ব শুরু হ'ল।

কিছুদূর এগোতেই দূর থেকে নজরে পড়ল কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ধুলো উড়িয়ে আসছে। হ্যারি বলল—'মনে হচ্ছে কালহূয়াকানের সৈন্যদল।' ফ্রান্সিস বলল—'তাই মনে হচ্ছে।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা ওদের কাছে এসে পড়ল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে দেখেই ওরা ঘোড়ার গতি কমাল। কাছে এসে ওরা ঘোড়া থামাল। নাহুয়াত্‌ল ভাষায় ওরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল। ওদের মধ্যে থেকে দাড়ি গোঁফ ওলা একজন ঘোড়া থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়াল। বাকী সৈন্যরা বর্শা উঁচিয়ে তৈরী হ'ল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—হ্যারি—তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই কোমরে গোঁজা তরোয়াল বের ক'রে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর দু'হাত তুলে দাঁড়াল। দলনেতার দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস দু'টো কথা বার বার বলতে লাগল—রাজা 'কালহূয়াকান' আর 'বারিনথাস'। দলনেতা কী বুঝল কে জানে। ও হাত তুলল। সৈন্যরা বর্শা নামাল। দলনেতা হাত নামিয়ে চেঁচিয়ে কী বলল। একজন সৈন্য জিনের সঙ্গে বাঁধা দড়ি দলনেতার দিকে ছুঁড়ে দিল। দলনেতা দড়িটার একটা মাথা নিয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারির দু'হাত বাঁধল। তারপর দড়ির অন্য মাথাটা হাতে নিল। তরোয়াল দু'টো মাটি থেকে তুলে নিয়ে একজন ঘোড়সওয়ারের হাতে দিল। তারপর সে নিজের ঘোড়ায় উঠল। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে দড়ির অন্য মুখটা বাঁধল।

তারপর দলনেতা ঘোড়া চালাল। অন্য সৈন্যরাও ঘোড়ায় চড়ে চলল। ওদের পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস ও হ্যারি হাত বাঁধা অবস্থায় হাঁটতে লাগল।

দলনেতা কী ব'লে উঠল। একজন ঘোড়সওয়ার সৈনিক দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তুলার দিকে চলে গেল।

ঘোড়া চালাতে চালাতে দলনেতা কী একটা বলে উঠল। অন্য সৈন্যরা হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দলনেতা ঘোড়ার গতি বাড়াল। হাত বাঁধা দড়িতে টান পড়ল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দৌড়াতে লাগল। দলনেতা ঘোড়ার গতি আরো বাড়াল। অন্য সৈন্যরাও সেই সঙ্গে ঘোড়ার গতি বাড়াল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘোড়ার অত দ্রুত

গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। দলনেতা ওদের দুজনকে হাতে দড়িবাঁধা অবস্থায় মাটির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। ধুলো মাটি আর পাথুরে জায়গা দিয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারির শরীর হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে চলল। সৈন্যরা হো হো হাসতে লাগল।

একটা ছুঁচালো পাথরে ফ্রান্সিসের ঘা খাওয়া বাঁ পাটা লাগল। ওখানকার ক্ষতটা শুকিয়ে গিয়েছিল। এখন ছুঁচালো পাথরের ধাক্কায় জায়গাটা কেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল। যন্ত্রণায় ফ্রান্সিসের প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়ার মত অবস্থা। দাঁত চেপে ও যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। হ্যারি এমনিতেই শরীরের দিক থেকে বরাবর দুর্বল। ও যেন এই হিঁচড়ানি আর সহ্য করতে পারছিল না। ওদের দু'জনেরই কনুই হাঁটু ভীষণ ভাবে ছড়ে গেছে। পোশাক ছিঁড়ে গেছে। সমস্ত শরীর ধুলোয় ভর্তি হ'য়ে গেছে। ফ্রান্সিস ওর মধ্যেই মাথা উঁচু ক'রে দেখল বিষাক্ত উপত্যকার কাছে চলে এসেছে ওরা। সেই পাথরের ওপর ফণী-মনসার গাছ। তারপরেই তো কোয়েতজালের মন্দির। ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বলে উঠল—হ্যারি—এসে গেছি। আর একটু সহ্য কর।

এবার দলনেতা ঘোড়ার গতি অনেক কমিয়ে দিল। অন্য সৈন্যরাও গতি কমাল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। ধুলোয় লাল শতছিন্ন পোশাক, ছড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। দেখল বারিনথাস ওর পাথরের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় আগেই ওকে ঘোড়সওয়ার দিয়ে খবর পাঠানো হ'য়েছে। বারিনথাস কী একটা ব'লে উঠতে ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ল। বারিনথাস ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে গেল। হেসে বলল—'পুরোনো বন্ধুরা যে। বলেছিলাম কিনা—পালিয়ে বাঁচবে না।' ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই ভীষণ হাঁপাচ্ছিল। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। হ্যারি বলল—বারিনথাস, আমরা ধরা পড়িনি। ইচ্ছে ক'রে ধরা দিয়েছি।—তাই নাকি? খুব ভালো হ'ল। কয়েদ-ঘরে জনা চারেক ননোয়াল্কা সৈন্য রয়েছে। তোমাদের এক বন্ধুও রয়েছে। এবার কোয়েতজাল দেবতার পুজো খুব ধুমধাম ক'রে হবে। অনেক বলি হবে।' ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই এত কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও হাসল। যাক—শাঙ্কো বেঁচে আছে।

বারিনথাস চীৎকার ক'রে কী ব'লে উঠল। দলপতি আবার ওদের টেনে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে বলল—বারিনথাস—রাজা কালহুয়াকান আর তলতেক

যোদ্ধাদের বলে দাও—আজ থেকে ওরা আমাদের শত্রু হ'ল। পশুর মত যেভাবে আমাদের মাটিতে পাথরে হিঁচড়ে এনেছে—এই অমানুষিক অত্যাচার আমরা কোনদিন ভুলবো না। এই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ আমরা নেব।' বারিনথাস হেসে বলল—'প্রতিশোধের কথা ভাবতে ভাবতেই তোমাদের জীবন শেষ হ'য়ে যাবে। রাজা কালহুয়াকানের কয়েদঘর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ পালাতে পারেনি।'

—'দেখা যাক।' ফ্রান্সিস বলল।

তলতেক সৈন্যরা ওদের দু'জনকে টেনে নিয়ে চলল কয়েদঘরের দিকে। একসময় কয়েদ ঘরের সামনে পৌঁছল ওরা। কোয়েতজাল মন্দিরের কাছেই কয়েদঘর।

দরজার দু'পাশে দু'জন পাহারাদার সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিসদের সৈন্যরা বন্দী করে নিয়ে আসছে দেখে একজন পাহারাদার কাঠের দরজার হুড়কোমতো লম্বা কাঠটা খুলে নিল। দরজা খুলে গেল। সৈন্যরা ধাক্কা দিয়ে ফ্রান্সিসদের ঘুরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দু'জনেরই হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। সৈন্যরা চলে গেল। বারিনথাস বলল—পালাবার চেষ্টা করো না। করলে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—ঐ দশা হবে।

ফ্রান্সিস আলো থেকে অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। এইবার অন্ধকার ভাবটা চোখে সয়ে এল। দেখল দু'জন লোককে কড়িকাঠে দু'পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি দেখল দু'টো কাঠের খুঁটিতে হাত পা বাঁধা অবস্থায় শাঙ্কো নির্জীবের মত পড়ে আছে। পাহারাদার দু'জন এবার ফ্রান্সিস ও হ্যারির হাত পা দড়ি দিয়ে দু'টো কাঠের খুঁটির সঙ্গে বাঁধল। ফ্রান্সিস বা হ্যারি কারোরই তখন এতটুকু শক্তি নেই যে পাহারাদারদের বাধা দেবে।

বারিনথাস বলল—'তোমাদের বন্ধুকে তো পেলে। সন্ধের দিকে খবর নিতে আসবো।' বারিনথাস যাবার সময় পাহারাদার দু'জনকে নাহুয়াতল্ ভাষায় কী ব'লে গেল। পাহারাদার দু'জন ঘরের বাইরে গেল। তারপর কাঠের হুড়কো টেনে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

গারদ ঘরের দরজা খোলা হ'ল, নতুন বন্দীদের আনা হ'ল, বাঁধা হ'ল অথচ শাঙ্কো মাথা নিচু ক'রেই রইল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল না।

ফ্রান্সিস ক্লান্তস্বরে ডাকল—'শাঙ্কো।' ডাক শুনে শাঙ্কো চমকে উঠল। এ তো ফ্রান্সিসের গলা। ও মাথা তুলে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। প্রায় অন্ধকারেও ফ্রান্সিসদের চিনল। ও দুর্বল কণ্ঠে বলল—'ফ্রান্সিস হ্যারি তোমাদের বন্দী করেছে এরা?

—না। আমরা নিজেরাই ধরা দিয়েছি।' হ্যারি আস্তে আস্তে বলল। শাঙ্কো এবার দেখল—ফ্রান্সিস আর হ্যারির পোশাক ছেঁড়া ফোড়া। মুখে মাথায় সারা গায়ে পাহাড়ী লাল ধুলো মাটি। ও অবাক হ'য়ে গেল। শাঙ্কো বলল—' তোমাদের এ অবস্থা হ'ল কী ক'রে?'

—পরে বলবো সব। এখন ভীষণ ক্লান্ত। ফ্রান্সিস দুর্বলস্বরে বলল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো—এই দুজন ননোয়াক্লা যোদ্ধাকে ঝুলিয়ে রাখা হ'য়েছে কেন?

—'ওরা রাজা কালহুয়াকানকে অপমান করেছিল।' শাঙ্কো বলল।

হ্যারি খুঁটির সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই শুয়ে পড়ল। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে

পড়েছে ও। ফ্রান্সিস একবার হ্যারির দিকে তাকাল। কিছু বলল না। এবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সার সার কয়েকটা খুঁটি পোঁতা মেঝেয়। কোণার দিকে দু'জন খুঁটির সঙ্গে ওদের মতোই হাত পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। মাথার ওপর লম্বা লম্বা ঘাস পাতার ছাউনি। তার নীচে গাছের মোটা মোটা ডালের কড়ি বরগা। সেই কড়ি বরগা থেকে দু'জনকে মাথা নিচু অবস্থায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর জানেন ওরা বেঁচে আছে কিনা। চারপাশের দেয়াল পাথরের।

হ্যারির দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনল—ফ্রান্সিস, আমরা বোধহয় বাঁচবো না। পালাবার উপায় নেই।

—হ্যারি, ফ্রান্সিস বলল—এখনি ভেঙে পড়ো না। এখনও চারদিন সময় আছে হাতে। মৃত্যুর ভাবনা না ভেবে পালানোর উপায় ভাবো।

শাঙ্কো বলল—এখান থেকে কি পালানো সম্ভব?

—দু'একদিন যেতে দাও। ওদের পাহারা দেবার পদ্ধতিটা দেখি। তখন ভেবে দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

পায়ের ক্ষতস্থানে অসম্ভব ব্যথা। ব্যথা বেড়েই চলছে যেন। ফ্রান্সিস পায়ের ক্ষতস্থানের দিকে তাকাল। দেখল তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে।

তখন দুপুর। হুড়কো টেনে দরজা খুলে একজন পাহারাদার ঢুকল। বড় একটা মাটির পাত্রে যবসেদ্ধ। কয়েকটা ছোট ছোট মাটির পাত্র প্রত্যেক বন্দীর সামনে রাখল। যবসেদ্ধ দিল। সেদ্ধ মাছ দিল আর বুনো আলুর ঝোল। তারপর প্রত্যেকের হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফ্রান্সিস বলল—কিছ্ছু ফেল না। পেট পুরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও।

পাহারাদার সৈন্যটি ঝুলন্ত বন্দী দু'জনকে খাইয়ে দিল। ঘরের এক কোণায় রাখা বিরাট জালার মতো পাত্র থেকে জল এনে সবাইকে খাওয়াল। তারপর একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে দেখল অন্য পাহারাদারটি উঠোনে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। এই সুযোগে ও ওর মাথার মোটা ফেট্টিটা খুলে ফেলল। নিচু হয়ে ফ্রান্সিসের পায়ের ক্ষতস্থানে শক্ত করে বেঁধে দিল। তারপর সবার হাত আগের মতো বেঁধে দিয়ে এঁটো বাসনপত্তর নিয়ে দ্রুত চলে গেল। অন্য পাহারাদারটি এসে হুড়কো টেনে দরজা বন্ধ করে দিল।

ক্ষতস্থানে কাপড় বাঁধা পড়ায় ফ্রান্সিস একটু আরাম পেল। ব্যথাটাও অনেকটা কমল। ফ্রান্সিস হেসে মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি, দেখ বারিনথাসও মানুষ—এই পাহারাদারটাও মানুষ! অথচ দু'জনের কত পার্থক্য।

সন্ধে হলো। দরজা খুলে সেই পাহারাদারটা ঢুকল। মাথায় ফেট্টি বাঁধা নেই। একটা মশাল নিয়ে এসেছিল সেটা দরজার ওপরে পাথরের খাঁজে বসিয়ে রেখে গেল।

মশালটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফ্রান্সিস হঠাৎ চমকে উঠে বসল। ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চাপাস্বরে বলল—হ্যারি, তুমি মৃত্যুর কথা বলছিলে, আমি তোমাকে নতুন জীবনের কথা বলছি।

—তার মানে? হ্যারি অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—আজ রাত্রেই আমরা মুক্তি পাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে?

—দেখতেই পাবে। এখন শুধু বারিনথাসের আসার অপেক্ষা।

—বারিনথাস মুক্তি দেবে আমাদের?

—না, মুক্তির উপায় করে দেবে।

হ্যারি চিন্তিত হলো। ফ্রান্সিসের জ্বর আসেনি তো? প্রলাপ বকছে যেন। ও বলল—ফ্রান্সিস, তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—আমার কথা প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে তাই না?

—হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। হ্যারি আর কোনো কথা বলল না।

একটু রাতে বারিনথাস এল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—এসো, মুক্তিদূত এসো।

—কাছে এসো, তোমার কানে কানে বলবো, গুপ্তধন উদ্ধারের হদিস।

—ঠিক। বারিনথাস লাফিয়ে উঠল। প্রায় ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিসের মুখের কাছে কান নিয়ে এল। মুহূর্তে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল ফ্রান্সিস। বারিনথাসের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল। বারিনথাস এক ঝট্‌কায় সরে গেল। রাগে উত্তেজনায় ও থরথর করে কাঁপতে লাগল। চিৎকার করে পাহারাদারদের ডাকল। পাহারাদার দুজন এক লাফে ঘরে ঢুকল। বারিনথাস চিৎকার করে কী হুকুম দিল। পাহারাদার দু'জন ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। তারপর ফ্রান্সিসকে টেনে দাঁড় করাল। হাতের বাঁধন খুলে দিল। একজন লাফিয়ে কড়িকাঠে উঠল। তারপর দুজনে মিলে ফ্রান্সিসকে কড়িকাঠ থেকে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে দিল। দু'হাত বেঁধে দিল। ফ্রান্সিস এইবার হো হো করে হেসে উঠল। বারিনথাস চিৎকার করে বলল—এইবার তোর মরণ। মর তুই—।

ফ্রান্সিস এবার হাসি থামিয়ে বলল—বারিনথাস, আমার তো মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। তোমাকে একটা শেষ অনুরোধ করবো। রাখবে?

—এই তো, এবার বুঝেছো তো আমাকে অপমানের ফল কী?

—বুঝলাম বৈ কি। তা শেষ অনুরোধ আমার। আমাদের দুটো তরোয়াল আর ধনুকবাণ ছোরা এই ঘরে রেখে যাও।

—কেন?

—মরেই তো যাবো, মরবার আগে অস্ত্রগুলো দেখতে দেখতে মরতে চাই। আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ অস্ত্রগুলোর সঙ্গে।

—ভালো—ভালো। বারিনথাসের হুকুমে পাহারাদাররা ফ্রান্সিসদের তরোয়াল, শাঙ্কোর ধনুকবাণ ছোরা ঐ ঘরের মেঝেয় রেখে গেল।

—আর একটা কথা। ফ্রান্সিস বলল—আগুনকে নাহুয়াত্‌ল্ ভাষায় কী বলে?

—ওমেতে।

—শেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে। ফ্রান্সিস হাসল।

বারিনথাস চলে গেল। হুড়কো টেনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

হ্যারি এতক্ষণ অবাক হয়ে এইসব অদ্ভুত ঘটনা দেখছিল। একটা কথাও বলতে পারেনি। এইবার ভাবল যে বর্শাটা ফ্রান্সিসের পায়ে বিঁধেছিল তাতে কি বিষ মাখানো ছিল? সেই বিষে কি ফ্রান্সিসের মাথায় গোলমাল হলো? গভীর দুঃখে হ্যারির বুক ভেঙে যেতে লাগল। বাল্যবন্ধু ফান্সিস—শেষে তার এইভাবে মৃত্যু হবে? ও ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল একবার। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হ্যারিকে কাঁদতে দেখে শাঙ্কোর চোখেও জল এল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি, কেঁদো না। পায়ের ক্ষত ছাড়া আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু হ্যারি তবু চাপা শব্দে কাঁদতে লাগলো। পাহারাদার ওদের রাতের খাবার দিয়ে গেল। খাওয়া হলে পাহারাদার চলে গেল।

রাত বাড়ল। হঠাৎ ফ্রান্সিস নিজের শরীরটাকে দোলাতে লাগল। দোলা বাড়তে লাগল। একবার একটা জোরে দুলুনি দিয়ে মশালের কাছে কাঠের কড়ি কাঠ দু'হাতে ধরে ফেলল। ঐ অবস্থায় ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দড়ি দিয়ে বাঁধা হাত দু'টো মশালের আগুনের কাছে নিয়ে আসতে লাগল। খুশিতে হ্যারি চাপাস্বরে বলে উঠল—ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—চুপ।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হাতবাঁধা দড়িটা মশালের আগুনের ওপর রাখল। দড়িটা পুড়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসের হাত দু'টোতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগছে। কালো হয়ে যাচ্ছে হাতের ঐ জায়গাটা। দড়িটা আগুনে কিছু পুড়তেই ফ্রান্সিস এক হ্যাঁচকা টানে দড়ি খুলে ফেলল। আবার ঝুলতে লাগল।

একটু দম নিয়ে শরীরটা বেঁকিয়ে ওপরের দিকে হাত বাড়িয়ে ঝোলানো দড়িটা ধরল। তারপর আস্তে আস্তে দু'হাত তুলে ওপরের কড়িকাঠটা ধরে ফেলল। শরীরের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কড়িকাঠটায় উঠে বসে পড়ল। দু'হাত নামিয়ে পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল। কড়িকাঠ থেকে ঝুলে মেঝেয় নামল। আস্তে যাতে কোনো শব্দ না হয়। মেঝে থেকে নিজের তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর একে একে সকলের হাত পায়ে দড়ির বাঁধন কেটে দিল। ননোয়াক্কা যোদ্ধারা মুক্তি পেয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। হ্যারি তরোয়াল তুলে নিল। শাঙ্কো তীর-ধনুক আর ছোরাটা নিল।

এইবার ফ্রান্সিস ঘরের চারদিকে তাকাল। দেখল এক কোণায় শুকনো ঘাসের বিছানামতো। ও একটানে মশাল খুলে নিল। ছুঁড়ে ফেলল ঘাসের বিছানাটার ওপর। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—সবাই 'ওমেতে' বলে চেঁচিয়ে ওঠো। তিনজন মিলে চিৎকার করে উঠল—'ওমেতে' 'ওমেতে'। চিৎকার চলল। ননোয়াক্কা যোদ্ধারাও গলা মেলাল।

দরজা খুলে দু'জন পাহারাদার ঢুকল। আগুন দেখে ওরা হতবুদ্ধি। যোদ্ধারা পাহারাদার দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল ঘুঁষি মেরে দুজনকেই মেঝেয় ফেলে দিল। কিল ঘুষি খেয়ে দুজন পাহারাদারই অজ্ঞান হয়ে গেল। ফ্রান্সিস উপকারী পাহারাদারটিকে আঘাত করতে চায়নি। কিন্তু এখন যা হবার তা হয়ে গেছে। যোদ্ধারা এক ছুটে পালিয়ে গেল।

ওদিকে আগুন কয়েদঘরের ঘাসের ছাউনিতে লেগে গেল। কালো ধোঁয়া উঠতে

লাগল। ধোঁয়া আগুন দেখে তলতেকদের বাড়িতে বাড়িতে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। তলতেকরা ছুটে আসতে লাগল। আগুনের আভায় আকাশ লাল হয়ে গেল। সৈন্যরাও জলের জন্যে ততক্ষণে ছুটোছুটি শুরু করেছে।

এই সুযোগে ফ্রান্সিসরা বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাজবাড়ির দিকে ছুটল। পেছনে হ্যারি ও শাঙ্কো। কিছুটা এগিয়ে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো, তুমি বারিনথাসের বাড়ি চেন তো?

—হ্যাঁ সেদিন ও দেখিয়েছিল।

—যে করেই হোক বারিনথাসকে ধরে রাজবাড়িতে নিয়ে এসো। একেবারে রাজার শোবার ঘরে। আমরা ওখানে থাকবো।

শাঙ্কো লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেল।

দু'জনে রাজবাড়িতে ঢুকল। দেখল পাহারাদার সৈন্যরা কেউ নেই। সবাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত। শুধু একজন সৈন্য রাজার শোবার ঘরের দরজায় পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস সোজা সৈন্যটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পায়ে ক্ষত। হাত দু'টোও অক্ষত নেই। তবু ফ্রান্সিস দমল না। ফ্রান্সিস বর্শাটা আমূল বিঁধিয়ে দিল সৈন্যটার বুকে।

রাজার শোবার ঘরে ঢুকে দেখল রাজা ঘাস-বিছানো গদির মতো বিছানায় বসে আছেন। বাইরের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে বোধহয় ঘুম ভেঙে গেছে। ফ্রান্সিস একছুটে গিয়ে রাজার বুকের ওপর তরোয়াল চেপে ধরল। রাজা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে ফ্রান্সিস ও হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রান্সিস বুঝল রাজাকে কোনো কথা বলে লাভ নেই। কিছুই বুঝবেন না উনি। বারিনথাসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ওদিকে শাঙ্কো খুঁজে খুঁজে বারিনথাসের বাড়ি পেল। দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়ল। দেখল এত গোলমাল হৈ-চৈয়ের মধ্যেও বারিনথাস ঘাসের বিছানায় গুড়িশুড়ি মেরে ঘুমিয়ে আছে। শাঙ্কো ওকে ধরে জোরে ধাক্কা দিল। বারিনথাস লাফিয়ে উঠে বসল। চেঁচিয়ে বলে উঠল—কে? কে?

শাঙ্কো কোমর থেকে ছোরাটা খুলে ওর পিঠে ঠেকাল। ছোরাটায় চাপ দিয়ে বলল—রাজবাড়িতে চলো।

—কেন?

—দরকার আছে। যদি যেতে যেতে কোনো চালাকি করো ছোরাটা আমূল ঢুকিয়ে দেব।

—না—না—চলো যাচ্ছি।

বারিনথাস বিছানা থেকে নেমে বাড়ির বাইরে এল। শাঙ্কো ওর পিঠে ছোরা ঠেকিয়ে ওকে প্রায় ঠেলে নিয়ে চলল। লোকজনের ছুটোছুটি চ্যাঁচামেচি তখনও চলছে। তবে গারদঘরে আগুন অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে।

বারিনথাস আর শাঙ্কো রাজার শয়নঘরে ঢুকল। দেখল ফ্রান্সিস রাজার বুকে তরোয়াল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে হ্যারি। বারিনথাস তো এই দৃশ্য দেখে অবাক। ফ্রান্সিস হেসে বলল—বারিনথাস এসো। খুব আশ্চর্য হয়েছো তাই না?

—না—মানে—তোমরা কী করে—

—সেসব পরে হবে। তুমি রাজাকে বলো আমার হুকুমে এখন তাঁকে চলতে হবে। নইলে তরোয়াল বুকে বিঁধিয়ে দেব।

বারিনথাস নাহুয়াতল্ ভাষায় রাজাকে সে কথা বলল। রাজা দুবার জোরে মাথা নাড়লেন। বারিনথাস বলল—রাজা বিপদ বুঝতে পেরেছেন এবং তোমার হুকুম শুনতে রাজী হয়েছেন।

ফ্রান্সিস বলল—এবার তুমি বাইরে যাও। রাজবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব সৈন্য পাহারাদারদের বলো—রাজা কালহুয়াকানের হুকুম, তোমরা সবাই অস্ত্রত্যাগ কর। তারপর বাইরের প্রাচীরের ওপাশে চলে যাও। রাজার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ ভেতরে ঢুকবে না। শাঙ্কোকে বলল—বারিনথাসকে নিয়ে বাইরে যাও। পিঠের ওপর ছোরা ঠেকিয়ে রাখবে। যদি বোঝ অন্যরকম কিছু বলছে সঙ্গে সঙ্গে ওকে হত্যা করবে।

শাঙ্কো বারিনথাসকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরের বারান্দায় নিয়ে এল। তখন আগুন নিভে গেছে। হৈচৈ থেমে গেছে। সৈন্য পাহারাদার নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে।

বারিনথাস চিৎকার করে নাহুয়াতল্ ভাষায় ওদের লক্ষ্য করে কী বলতে লাগল। শাঙ্কো তীক্ষ্ণচোখে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা কী করে লক্ষ্য রাখল। দেখল সৈন্যরা হাতের বর্শা মাটিতে রেখে দিতে লাগল। মাথা নুইয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বোধহয় রাজার আদেশকে সম্মান জানাল। তারপর প্রাচীরের ওপাশে চলে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব সৈন্য পাহারাদার চলে গেল।

বারিনথাসকে নিয়ে শাঙ্কো রাজার শয়নকক্ষে ফিরে এল। সব কথা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস বলল—বারিনথাস, আমি রাজার সঙ্গে কথা বলবো তুমি দোভাষীর কাজ কর।

—বেশ।

রাজা ও ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো।

ফ্রান্সিস—রাজা কালহুয়াকান, আপনার বংশের প্রথম রাজা যে ধনসম্পত্তি এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন তার ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। কিন্তু আমি বুদ্ধির খেলা পছন্দ করি। সেই ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যাজক ব্রেন্ডনের পরামর্শমতো। আমি সেই ধনসম্পদ উদ্ধার করবার চেষ্টা করবো। এই জন্যে আপনার সাহায্য চাই। আপনি সাহায্য করবেন কী?

রাজা—নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু যা কেউ পারেনি। আপনিও পারবেন না।

ফ্রান্সিস—চেষ্টা করতে দোষ কি। কাল থেকে আপনাকে ও বারিনথাসকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গুপ্তধনের অনুসন্ধান শুরু করবো। আপনি রাজী?

রাজা—হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস—তাহলে আজকে বাকী রাতটুকু আমরা বিশ্রাম করবো। ঘুমুবো। কাল থেকে কাজে নামবো।

রাজা—বেশ।

ফ্রান্সিস—আমি আহত। আমার চিকিৎসার জন্যে একজন বদ্যি ডেকে দিন। ক'টা দিন আমাকে সুস্থ থাকতে হবে।

রাজা—বেশ ব্যবস্থা করছি।

বারিনথাসই একজন রাজভৃত্যকে ডেকে নিয়ে এল। রাজা তাকে কী বললেন। রাজভৃত্য একটু পরেই একজন খুব রোগা লম্বামতো লোককে ধরে নিয়ে এলো। লোকটার মুখে দাড়ি গোঁফ। গলায় নানারঙের পাথরের মালা। গায়ে তুলোর কম্বলের মতো। বিচিত্র বর্ণের নক্সা আঁকা তাইতে। বোঝা গেল বদ্যি। হাতে কয়েকটা চোঙ্। ফ্রান্সিসের হাত পা দেখল। মাথা নাড়ল। তারপর পায়ের ক্ষতস্থানে কাপড়ের ফেট্টি খুলে কয়েকটা পাতা চেপে বেঁধে দিল। ফ্রান্সিস একটু আরাম পেল। হাতের কব্জিতে আঠামতো মলম লাগাল। তারপর চলে গেল।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি রাজার শোবার ঘরের পাশে শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের শরীরটা দুর্বল লাগল। ভীষণ ক্লান্তিতে ও ঘুমিয়ে পড়ল। শাঙ্কো তীর-ধনুক হাতে রাজাকে আর বারিনথাসকে পাহারা দিতে লাগল।

পরদিন দুপুর নাগাদ ফ্রান্সিসের শরীরে ব্যথা শুরু হলো। ফ্রান্সিস বুঝল ওর জ্বর হয়েছে। কিন্তু আসল কাজ এখনো বাকী। এখন শরীরের কথা ভাববার সময় নেই।

রাজা ও বারিনথাসকে সামনে রেখে ওরা কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরে ঢুকল। পাথরে গড়া মন্দির। ভেতরটা একটু অন্ধকার অন্ধকার।

কোয়েতজাল দেবতার মূর্তির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। মূর্তিটার উচ্চতা এক মানুষ সমান। কাঠ কুঁদে কুঁদে বিচিত্র কাজ মূর্তির গায়ে। হাত দুটো পেছনে। ফ্রান্সিস বারিনথাসকে বলল—তোমার ব্রেন্ডনের বইয়ের শেষে যে ছড়াটা লেখা সেটা মনে আছে?

—সমস্ত বইটাই আমার মুখস্থ।

মূর্তিটার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রান্সিস বলল—ছড়াটা বলো তো।

বারিনথাস বলতে লাগল—

অদ্ভুত—অদ্ভুত
ব্রেন্ডনের ছড়া।
পা আছে হাত নেই।
মাথা ঠিক খাড়া।
এক হাত পিঠে বাঁধ্
টল্‌মল্ টল্‌মল্
অতল্ তল্ অতল্ তল্।

—থামো। ফ্রান্সিস বলে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে মূর্তিটার পেছনে দাঁড়াল। দেখল মূর্তিটার কাঁধের কাছ থেকে একটা পাড়অলা কালো কাপড় ঝুলছে। তবে কাপড়টা একেবারে জীর্ণ। এখানে ওখানে ছোপ লাগা। ফেঁসে গেছে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পেছন দিয়ে পাথরের বেদিটায় উঠল। মূর্তির কাপড়টা হাত বাড়িয়ে খুলতে যাবে—রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন। কী যেন বললেন। ফ্রান্সিস

দাঁড়িয়ে পড়ল। বারিনথাস বলল—রাজা বলছেন ওটা দেবতার পবিত্র গাত্রাবরণ। তুমি বিধর্মী। ছোঁবে না।

—তাহলে রাজাকেই বলো গাত্রাবরণটা খুলে দিক।

বারিনথাস রাজাকে সেই কথা বলল। রাজা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। সাবধানে দেবতার গাত্রাবরণটা খুলে ফেললেন। সকলেই চম্‌কে উঠল। এ কী? কোয়েতজাল দেবমূর্তির পেছনে রাখা দু'টো হাতই ভাঙা। মুহূর্তে ফ্রান্সিস দেবমূর্তির পিঠের কাছে ঝুঁকে পড়ল। দেখল—মূর্তির ডান হাতটা পিঠের কাছে একটা লোহার কড়ার সঙ্গে বাঁধা ঝুলছে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল—হ্যারি, ছড়াটার যে অর্থ আমি করেছি তাতে এই খানেই হাতটা থাকার কথা। ও বারিনথাসকে বলল—রাজাকে বলো এই হাতটা ভাঙা ডানহাতে বসিয়ে দিক।

বারিনথাস রাজাকে সেইকথা বলল। রাজা তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন ভাঙা হাতটার দিকে। বারিনথাসের কথামত রাজা মূর্তির পিঠ থেকে হাতটা খুলে নিলেন। তারপর মূর্তির ভাঙা হাতটায় বসিয়ে দিলেন। ঠিক খাপে খাপে লেগে গেল।

ফ্রান্সিস চারপাশে তাকিয়ে দেখল বেদীর কাছে কয়েকটা শুকনো মালা পড়ে আছে। ও একটা মালা তুলে নিল। ফুলগুলো খুলে ফেলে মোটা সুতোটা বের করল। রাজার দিকে এগিয়ে ধরে ইশারায় হাতটা বেঁধে দিতে বলল। রাজা তাই করলেন। তারপর বেদী থেকে নেমে এলেন।

ফ্রান্সিস সুতো দিয়ে জোড়া দেওয়া হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আওড়াতে লাগল—টল্‌মল্‌ টল্‌মল্‌—অতল্‌ তল্‌ অতল্‌ তল্‌। মূর্তির হাতের আঙুলগুলো পরস্পর আবদ্ধ এবং করতল প্রসারিত। নিচের মেঝের দিকে। ফ্রান্সিস তখনও বলছে—অতল্‌ তল্‌—অতল্‌ তল্‌। মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কী নির্দেশ দিচ্ছে জোড়া লাগানো ডান হাতটা? মেঝে কেন কালো আর সাদা পাথরে বাঁধানো? অবশ্য পাথরগুলো অমসৃণ। তবু রঙের বৈষম্য কেন?

জ্বর বেড়েছে ফ্রান্সিসের। সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপছে। কানের দুপাশ ঝিমঝিম করছে। ফ্রান্সিস শরীরের এই অবস্থাকে আমল দিল না। হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল। আর সবাই অবাক চোখে ফ্রান্সিসের কাণ্ডকারখানা দেখছে। শুধু হ্যারি অচঞ্চল। ও বুঝতে পারছে সমাধানের কোনো সূত্র ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই পেয়েছে।

ফ্রান্সিস মেঝের চারদিকে দৃষ্টি বোলাতে লাগল। দেখল মূর্তির প্রসারিত ডান হাত সোজাসুজি কয়েকটা সাদা পাথরের দিকে নির্দেশ করছে যেন। তার চারদিকে অন্য পাথরগুলো কালো। অন্য পাথরগুলো ছোটবড় এলোমেলো বসানো। কিন্তু সাদা পাথরগুলো অনেকটা চৌকোনো ধরনের আর যেন বেশ যত্নে বসানো।

ফ্রান্সিস এক লাফে দাঁড়াল। বলল—হ্যারি, আমার পদক্ষেপ নির্ভুল। এই সাদা পাথরগুলো তুলতে হবে। তার জন্যে লোক দরকার। আমরা ক'জন পারবো না। কী করা যায় বলো তো।

—তাতে আমরা বিপদে পড়তে পারি।

—তার ব্যবস্থাও করতে হবে। হ্যারি বারিনথাসের দিকে তাকাল। বলল—তুমি প্রাচীরের ওপাশ থেকে পাঁচজন সৈন্যকে ডেকে নিয়ে এসো। ওরা যেন লোহার কুড়ুল নিয়ে আসে। তোমার পেছনে ছোরা হাতে শাঙ্কো থাকবে। বেচাল দেখলে তোমাকে হত্যা করবে। কী? পারবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—কেন নয়। তবে গুপ্তধনের অর্ধেক আমাকে দিতে হবে।

—আগে তো উদ্ধার করি। হ্যারি হেসে বলল।

বারিনথাসের পেছনে ছোরা হাতে শাঙ্কো চলল

অসুস্থ ফ্রান্সিস মেঝের ওপর বসে পড়ল। ওর ভয় হতে লাগল জ্বরের ঘোরে ও না অজ্ঞান হয়ে যায়।

একটু পরেই কুড়ুল হাতে পাঁচজন তলতেক সৈন্য মন্দিরে ঢুকল। পেছনে বারিনথাস। তার পেছনে শাঙ্কো।

হ্যারি এক লাফে গিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। হাতের তরোয়ালের চকচকে ফলাটা রাজার গলায় ঠেকিয়ে বলল—বারিনথাস, সৈন্যদের বলো—যদি ওরা আমাদের আক্রমণ করে তাহলে ওদের রাজা আমার হাতে মারা যাবে।

এদিকে সৈন্যরা রাজাকে দেখে মাথা নোয়াল। শ্রদ্ধা জানাল। বারিনথাস হ্যারির কথাগুলো ওদের বলল। ওরা চুপ করে শুনল।

এবার ফ্রান্সিস উঠল। সৈন্যদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। সৈন্য পাঁচজন এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আকারে ইঙ্গিতে ওদের বোঝাল—সাদা পাথরগুলোর খাঁজে খাঁজে কুড়ুলের কোপ মেরে পাথরগুলোকে তুলতে হবে। সৈন্যরা মাথা ঝাঁকাল। তারপর সাদা পাথরগুলোর খাঁজে কুড়ুলের ঘা দিতে লাগল। জোর ঠকঠক শব্দ উঠল মন্দিরে। রাজা ও বারিনথাস অবাক চোখে দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ কুড়ুলের ঘা চলল। দু'তিনটে সাদা পাথর আল্‌গা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল সেদিকে। ওরা পাথর ক'টা তুলে ফেলতেই ফাঁক দেখা গেল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—সরে যাও সব।

সৈন্যরা কিছু না বুঝে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। একজন সৈন্য একটা সাদা

পাথর নিচু হয়ে সরাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা ওর হাত থেকে পড়ে গেল। ও অজ্ঞান হয়ে ঐ ফোকরের মধ্যে মাথা রেখে গড়িয়ে পড়ল। বারিনথাস চিৎকার করে তলতেকদের ভাষায় বলল—উঠে এসো সব। সৈন্যরা এক লাফে সরে এল। যে সৈন্যটা পড়ে গিয়েছিল সে ততক্ষণে মরে গেছে।

কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল সবাই। বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে সৈন্যদের কাজ শুরু করতে বলল। আবার কুড়ুলের ঘা চলল। সাদা পাথর সব ক'টা তুলে ফেলল ওরা। নিচে অন্ধকার। সৈন্যটার মৃতদেহ তুলে মেঝেয় রাখা হলো।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো, শীগগির মশাল জ্বেলে আনো। মন্দিরেরই পাথরের খাঁজে চারটে মশাল ছিল। শাঙ্কো চক্‌মকি ঠুকে জ্বালল সব কটা। নিজে একটা নিল। বাকি তিনটে ফ্রান্সিস হ্যারি ও বারিনথাসকে দিল।

ফ্রান্সিস গর্তের মুখে এসে মশাল ধরল। দেখল পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠল—হ্যাবি সুড়ঙ্গ। আমরা সাফল্যের মুখে।

সবাই এগিয়ে এল।—অবাক হয়ে দেখল সুড়ঙ্গের মুখে সিঁড়ি।

প্রথমে ফ্রান্সিস তারপর একে একে সবাই নামতে লাগল। বিস্মিত রাজার মুখে কোনো কথা নেই।

কিছুটা নামতেই দেখল সুড়ঙ্গটা টানা চলে গেছে। ফ্রান্সিস দিক্‌নির্ণয় করে বুঝল সুড়ঙ্গটা বিষাক্ত উপত্যকার নিচে দিয়েই চলে গেছে।

সুড়ঙ্গের গায়ে এবড়ো খেবড়ো পাথরের গাঁথুনি। বোঝাই যাচ্ছে মানুষের হাতে তৈরি। সুড়ঙ্গে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। ঐ ধুলোর মধ্যে দিয়েই ওরা চলল। মশালের আলোয় চারিদিকে তাকাতে তাকাতে ওরা সুড়ঙ্গপথে চলল। দশ বারো পা এগোতেই দেখল বাঁদিকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির মাথায় গোলমত মুখ। পাথর-কুচির ঢাকনা দেওয়া। তাতে গুঁড়ো পাথরের প্রলেপ।

হ্যারি বলল—ঐ উঁচু মুখটাতেই কি পাথর আর ফণিমনসার গাছ?

—না। ফ্রন্সিস বলল—মনে রেখো, কোয়েতজাল দেবতার বাঁ হাতটা এখনো পাইনি।

ওরা কথা বলছে তার মধ্যেই বারিনথাস একটা কুড়ুল হাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের সেই গোল মুখমতো জায়গাটা লক্ষ্য করে উঠতে লাগল। হ্যারি চিৎকার করে ডাকল—বারিনথাস, এখনো আমরা হদিস পাইনি। নেমে এসো।

ফ্রান্সিস বলল—কোনো লাভ নেই ওকে ডেকে। ও এখন গুপ্তধনের লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ওকে বাধা দিতে গেলে ও তোমাকেই মেরে ফেলবে।

ততক্ষণে বারিনথাস ঐ মুখটার কাছে পৌঁছে গেছে। পাগলের মতো এলো। পাথাড়ি কুড়ুলের ঘা মারতে শুরু করল। একটু পরেই কুচি পাথর পড়তে শুরু করল। তারপরই গাঢ় সবুজ রঙের বিষাক্ত জলের ধারা। জলের ধারা প্রথমেই পড়ল বারিনথাসের মুখে, শরীরে, বারিনথাসের শরীর থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। সতীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করে বারিনথাস সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে ধুলোর মধ্যে পড়ে গেল। দু'একবার ঝাঁকুনি খেয়ে বারিনথাসের দেহ স্থির হয়ে গেল। তখনও বিষাক্ত

জলের ধারা নামছে। তবে পরিমাণে বেশী নয়।

এদিকে বারিনথাসের এই ভয়াবহ মৃত্যু দেখে রাজা ও সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেল। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ রাজা ছুটলেন সুড়ঙ্গ থেকে বেরোবার সিঁড়ির দিকে। তার পেছনে সৈন্যরাও হাতের কুড়ুল ফেলে দিয়ে ছুটল। শাঙ্কো ধনুকে তীর পরাল। ওদের দিকে নিশানা করল। ফ্রান্সিস ডান হাত তুলল—শাঙ্কো, তীর ছুঁড়ো না। ওদের যেতে দাও।

রাজা ও সৈন্যরা পালিয়ে গেল। শাঙ্কো ধনুক নামাল।

হ্যারি বলল—ঐ বিষাক্ত জলে সুড়ঙ্গ ভেসে যাবে না তো?

অনেক দিন লাগবে। দেখছো না এক হাঁটু ধুলো, সব জল শুষে নেবে। ফ্রান্সিস বলল—তবু আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

—এখন কী করবে?

—দেবমূর্তির আর একটা হাত খুঁজতে হবে। চলো সুড়ঙ্গর শেষ পর্যন্ত দেখি।

আবার চলল তিনজনে। ধুলোর মধ্যে তিনজনেরই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবে অসুস্থ ফ্রান্সিসের কষ্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তবু ও তা বুঝতে দিল না। বাঁ পাটা টেনে টেনে দাঁতে দাঁতে চেপে ও হাঁটতে লাগল।

একটু এগিয়ে আবার পাথরের সিঁড়ি। ওপরে সেই গোলমতো জায়গাটা পর্যন্ত উঠে গেছে। ওরা দাঁড়াল না। হাঁটতে হাঁটতে সুড়ঙ্গের শেষ পর্যন্ত গেল। আবার পাথুরে সিঁড়ি উঠে গেছে। ওপরটায় সেই গোলমতো জায়গা।

সুড়ঙ্গ শেষ। ফ্রান্সিস বলল—দেখা যাচ্ছে তিনটি সিঁড়ি আছে। তিনটি সিঁড়ির মাথায় গোলমতো জায়গা। একটা তো দেখা গেল। বিষাক্ত উপত্যকার জল বেরিয়ে এল। বাকী রইলো দু'টি। কুড়ুলের ঘা দিয়ে পরীক্ষা করবার উপায় নেই। আস্তরণ ভেঙ্গে বিষাক্ত জল নেমে আসতে পারে। কাজেই আগে দেখতে হবে কোন গোল জায়গাটায় ঘা মারবো। একটু থেমে বলল—হ্যারি, ছড়ার পরের অংশটা বলো তো।

হ্যারি বলতে লাগল—

> এক হাত ধূলিময়
> মুখ নয় কথা কয়
> আঙুল তুলে হে—
> কোন ভুলে হে—
> পাথরেতে মনসা গাছ
> কিম্ভূত কিম্ভূত।

ফ্রান্সিস বলল—চলো ফেরা যাক। মশালগুলো ভালো করে ধরো। তোমরা চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলো। আমিও দেখছি।

ওরা ফিরে আসতে লাগল। তখনই হঠাৎ ফ্রান্সিসের মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখের সামনে দুলতে লাগল সুড়ঙ্গের পাথুরে দেওয়াল, ধুলোর ঢিবি, সিঁড়ি, সিঁড়ির মাথায় গোলমত জায়গাগুলো। ধুলোর ওপর গড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে ফ্রান্সিস কোনরকমে পাশের পাথুরে দেওয়ালে হাত রেখে নিজেকে সামলাল। ধুলোর ওপর দিয়ে ছুটে

এসে শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে ধরে ফেলল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—আর নয়। এখন পালাই চলো। তোমার শরীরের যা অবস্থা তাতে তোমার চিকিৎসা এখুনি প্রয়োজন। নইলে তোমাকে বাঁচানো যাবে না।

—কিন্তু এতটা এগিয়ে মানে আর একটামাত্র সূত্র। তাহলেই সব রহস্যের সমাধান।' ফ্রান্সিস ক্লান্তস্বরে বলল।

—'না ফ্রান্সিস—এখন আমরা পালিয়ে গেরুয়া পাহাড়ে চলে যাবো।' শাঙ্কো বলল।

—না-না—চোলুলা যাবো। চিকিৎসা হবে, বিশ্রাম নেব—সুস্থ হয়ে আবার আসবো শেষ সূত্রটা সমাধানের জন্যে।' ফ্রান্সিস খুব দুর্বলকণ্ঠে বলল।

—বেশ-এখন ভাবছি সুড়ঙ্গের বাইরে বেরুলে রাজা কালহুয়ানের সৈন্যরা যদি আক্রমণ করে? হ্যারি বলল।

—যে ক'জন সৈন্য এখানে নেমেছিল তারা বারিনথাসের ভয়াবহ মৃত্যু দেখেছে। এতক্ষণে অন্য সৈন্যরা সে খবর পেয়েছে। আমার তো মনে হয় ভয়ে ওরা কেউ ধারে কাছে নেই। তবু শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে তুমি সামনে থাকো।' কথাগুলো বলে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। যন্ত্রণায় ওর মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভালো করে তাকাতে পারছে না পর্যন্ত।

ওরা আস্তে আস্তে মন্দিরের চত্বরে ওঠার সিঁড়ির কাছে গেল। প্রথমে উঠতে লাগল শাঙ্কো তীর ধনুক বাগিয়ে। তারপরে ডানহাতে খোলা তরোয়াল আর বাঁ হাতে ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে হ্যারি উঠতে লাগল।

মন্দিরের চত্বরে উঠে ওরা দেখল কোথাও কোন সৈন্যের চিহ্নমাত্র নেই। আস্তে আস্তে কোয়েতজালের মূর্তির কাছে এল ওরা। দেখল একা রাজা কালহুয়াকান দেবমূর্তির বেদীর কাছে মাথা নীচু করে বসে আছে। দুহাত ওপরে তোলা। রাজা ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না। মুখে বিড় বিড় করে কী বলছে।

ওরা আস্তে আস্তে মন্দিরের বাইরের দিকে চলল। শাঙ্কো চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল। ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলল। নিজেকে ওর এত ক্লান্ত এত দুর্বল মনে হচ্ছিল যে পারলে ওখানেই শুয়ে পড়ে।

মন্দিরের বাইরে এল ওরা। মন্দিরের সিঁড়ি, সামনের প্রাঙ্গণ কোথাও কোন সৈন্য বা পাহারাদার কেউ নেই। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—'শাঙ্কো এই সুযোগ। শিগগির তিনটে ঘোড়া জোগাড় কর।'

শাঙ্কো ধনুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে, তীরগুলো কাঁধের খাপে রেখে ছুটে গেল। লোকেরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে তখনই দেখল আগুনেপোড়া গারদঘরের ওপাশে তিন চারটে ঘোড়া একটা খুঁটিতে বাঁধা। ঘোড়াগুলোর পিঠে খড়ভরা মোটা কাপড়ের জিন। শাঙ্কো ছুটে গেল। দড়িগুলো খুঁটি থেকে দ্রুতহাতে খুলে নিল। তারপর তিনটে ঘোড়াকে টানতে টানতে মন্দিরের সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল। প্রথমে হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে একটা ঘোড়ায় তুলে দিল। তারপর কোমরে তরোয়াল গুঁজে হ্যারি আর একটা ঘোড়ার পিঠে উঠল। শাঙ্কোও দ্রুত অন্য ঘোড়ার পিঠে উঠল। এখানে ওখানে তলতেক স্ত্রীপুরুষরা জটলা করছিল। ওরা শুধু তাকিয়ে

তাকিয়ে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। কেউ কোন কথা বলল না। ওরা বোধহয় বারিনথাসের অপমৃত্যুর কথা আলোচনা ক'রছিল।

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল তিনজনে। প্রাচীরের বাইরে এল। দেখল তলতেক সৈন্যরা বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, গল্পগুজব করছে। ওরা ফ্রান্সিসদের ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে দেখল। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। কারণ তখনও ওরা রাজার আদেশ পায়নি।

বাঁদিকে বিষাক্ত উপত্যকাকে রেখে ওরা উত্তর দিকে পুয়েবেলা নদীর সেতুর উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছোটাল। একটা বিস্তৃত প্রান্তরে এসে পড়ল। ফ্রান্সিস কষ্ট করে পেছনে তাকাল। না তলতেক সৈন্যরা পিছু ধাওয়া করেনি। ফ্রান্সিস এতক্ষণ শরীরের জ্বর যন্ত্রণা দাঁত চেপে সহ্য করছিল। আর পারল না। মাথাটা ব্যথায় ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন। হঠাৎ চোখের সামনে সাদা রঙের ফুলকি মত দেখল। অবসাদে শরীর ছেড়ে দিল। ছিটকে পড়ল ঘোড়া থেকে।

হ্যারি আর শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামাল। নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। দু'জনে ধরাধরি ক'রে তুলল ফ্রান্সিসকে। ফ্রান্সিসের ঘোড়াটা ওরা ছেড়ে দিল। শাঙ্কো নিজে ঘোড়ায় উঠল। নীচে থেকে হ্যারি ফ্রান্সিসের প্রায় অচেতন শরীরটা শাঙ্কোর সামনের দিকে ঠেলে ধরল। শাঙ্কো দু'হাতে ফ্রান্সিসকে ওর সামনে তুলে নিল। হ্যারি ওর ঘোড়ায় উঠল। ঘোড়া ছোটাল আবার। শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে বাঁ হাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল। ডান হাতে লাগাম ধরল। ঘোড়া ছোটাল।

ফ্রান্সিসের যেন মনে হ'ল শরীরটা খুব হাল্‌কা হ'য়ে গেছে। কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই আর। ও যেন স্বপ্ন দেখতে লাগল—ওদের বাড়ির সেট এ সেই নীল ফুলের গাছটা। গেট এ দাঁড়িয়ে আছে ওর বাবা আর মারিয়া। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মা যেন বাগান থেকে ছুটে আসছে। চারদিকে উজ্জ্বল রোদ। দুরন্ত হাওয়া বইছে। ও যেন ঘোড়ায় চড়ে ওদের দিকে চলেছে। ওর শরীরটা দুলছে। বাবা-মারিয়া ও দূরে মা—হাসছে। ফ্রান্সিস এগিয়ে চলেছে। আস্তে আস্তে।

সামনেই পুয়েবেলা নদীর সেতু। শাঙ্কো আর হ্যারি ঘোড়া থামাল। শাঙ্কো ঘোড়া থেকে নামল। তারপর ফ্রান্সিসকে ঘোড়ার ওপর শুইয়ে দিল। ফ্রান্সিসকে ধ'রে ধ'রে ঘোড়াটাকে আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে সেতুটা পার হ'ল। হ্যারিও ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে সেতু পার করাল।

তারপর আবার ঘোড়ায় চড়ল দু'জনে। যখন ওরা সেই শুকনো পাতাঝরা বনে ঢুকল তখন বিকেল হয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তবু বনের গাছ-গাছালি ঝোপঝাড় সব শুকিয়ে আগের মত হয়ে গেছে। বনের গাছ-গাছালি লতাপাতার মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালানো যায় না। দু'জনে ঘোড়া থেকে নামল। বনের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এল। বন শেষ হল। ঘোড়া চালিয়ে ওরা চোলুলায় ঢুকল। ওদের পাথরের ঘরটার সামনে এসে থামল। হ্যারি দেখল চোলুলার অনেক স্ত্রী-পুরুষ ছুটে আসছে। হ্যারি আর শাঙ্কো দুজনেই তখন ভীষণ পরিশ্রান্ত। ওরা দুজনে ঘোড়া থেকে নামল। ধরাধরি করে ফ্রান্সিসের অচেতন দেহটা ওরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাল। নিয়ে চলল ঘরের মধ্যে। ঘরে

ঢুকে ঘাসের বিছানায় ফ্রান্সিসকে শুইয়ে দিল। ফ্রান্সিসের কপালে হাত দিল হ্যারি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসের পাশে শুয়ে পড়ল। হ্যারি চোখ বুজল। শুনতে পাচ্ছে দরজার কাছে দাঁড়ানো স্ত্রী-পুরুষরা ওদের ভাষায় কী বলাবলি করছে। একজন ননোয়াক্লা যোদ্ধাই বোধহয় চীৎকার ক'রে হ্যারিদের কী জিজ্ঞেস করল। হ্যারির কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ও বুঝতেও পারল না কী জিজ্ঞেস করছে। ক্লান্ত স্বরে হ্যারি বলল—রাজবৈদ্যকে ডাকো। কিন্তু ওর কথা কেউ ভালো শুনতেও পেল না আর শুনলেও বুঝতো না।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে হ্যারি জানে না। হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকজনদের চ্যাঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেল। সবাই স'রে দাঁড়াল। রাজা হুয়েমাক ঘরে ঢুকলেন। কাছে এসে বিছানায় বসলেন। আস্তে আস্তে বললেন—'বন্ধুরা—শরীর ভালো নেই?' হ্যারি রাজার গলা শুনে কষ্ট ক'রে উঠে বসল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। ক্লান্তস্বরে বলল—'ফ্রান্সিস ভীষণ অসুস্থ। রাজবৈদ্যকে ডাকুন।' রাজা দরজার দিকে তাকিয়ে কী ব'লে উঠলেন। একজন ননোয়াক্লা যোদ্ধা ছুটে চলে গেল। তাঁর মুখ গম্ভীর হ'ল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন—'তোমরা?'

—আমরা ভালো। শুধু ভীষণ ক্লান্ত আমরা।' হ্যারি বলল। রাজা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'বিশ্রাম—খাবার—।' তারপর বললেন—'চারজন ননোয়াক্লা যোদ্ধা—বন্দী ছিল।'

—ওরা পালিয়েছে—চ'লে আসবে।' হ্যারি বলল।

রাজা হাসলেন। বললেন—'আমার সন্তান।'

তারপর রাজা হুয়েমাক চ'লে গেলেন।

একটু পরেই রাজবৈদ্য এল। ফ্রান্সিসের কপালে গলায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করল। তার আগের মতই শুক্‌নো ফল গুঁড়িয়ে ওষুধ তৈরী করল। ওষুধের লেই লাগিয়ে দিল ফ্রান্সিসের পায়ের কাটা জায়গায়। ফ্রান্সিস একটু কুঁকিয়ে উঠল। তারপর রাজবৈদ্য ফ্রান্সিসকে হ্যারির শাঙ্কোর ছড়ে যাওয়া কনুই হাঁটু জল ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে আঠামত ওষুধ লাগিয়ে দিল। তারপর হ্যারিকে চারটে কালো কালো বড়ি দিল। ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে খাইয়ে দিতে বলল। রাজবৈদ্য চ'লে গেল।

দু'জন পাহারাদার ওদের খাবার দিয়ে এল। ঘরে মশাল জ্বালিয়ে দিল। রাত হ'ল। হ্যারি ইঙ্গিতে ওদের খাবার রেখে খেতে বলল। ওরা খাবার-জল রেখে চ'লে গেল।

রাত বাড়তে লাগল। হ্যারির ক্লান্তি অনেকটা দূর হ'য়েছে। কনুই হাঁটুর জ্বালাও অনেকটা কমেছে। শাঙ্কোও উঠে বসল। ওরও শরীর ভালো লাগছে এখন। হ্যারি ফ্রান্সিসের কপালে হাত দিল। জ্বর কমেছে অনেক। তখনই ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর চোখ মেলে তাকাল। হ্যারি ডাকল—'ফ্রান্সিস?'

—'উঁ?' ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে হ্যারির দিকে তাকাল।

—'এখন শরীর কেমন লাগছে।?' হ্যারি বলল।

—ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল 'ভালো। আচ্ছা আমার কী হয়েছিল?'—

—সে সব কথা পরে হবে খন। তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? হ্যারি বলল।

—ভীষণ। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা খাবার রেখে দিয়েছি। খাবে এসো। হ্যারি বলল।

তিনজনেই খেতে বসল। পাখির মাংসের ঝোল। বীন, টম্যাটোর তরকারি। ভুট্টার রুটি। তিনজনেরই খিদে পেয়েছিল। পেট পুরে খেল। জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। তিনজনেই ক্লান্ত। এদিকে ফ্রান্সিসকে সুস্থ দেখে হ্যারি আর শাঙ্কো নিশ্চিন্ত হল। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। ফ্রান্সিস শুধু জেগে রইল। মনে পড়ল—তুলার কোয়েতজাল মন্দির—দেবমূর্তি ভাঙা হল—সুড়ঙ্গ—সিঁড়ি—গোলমত ফোকর। কিন্তু গুপ্তধন খুঁজে বার করা যায়নি। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন চারেক কাটল। রাজবৈদ্যর চিকিৎসায় ফ্রান্সিস এখন অনেকটা সুস্থ। তবে শরীরের দুর্বলতা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। হ্যারি ও শাঙ্কো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু ঘরে বসে থাকতে শাঙ্কোর ভালো লাগে না। ও শিকার করতে যেতে চায়। কিন্তু ফ্রান্সিস ওকে যেতে দেয় না। একবার বিপদে পড়েছে। অনেক কষ্টে ওকে মুক্ত ক'রে ফিরিয়ে এনেছে। আবার কিছু হ'লে? ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলেছে—আরো তীর তৈরী কর। হয়তো পরে কাজে লাগবে। শাঙ্কো দু'বেলা তাই করে। বেশ কিছু তীর তৈরী ক'রেছে এর মধ্যে।

রাজা হুয়েমাক প্রতিদিন ফ্রান্সিসদের ঘরে আসেন। ওদের খোঁজখবর নেন। নানা কথা হয়। সেদিন সকালে ফ্রান্সিসকে বললেন—'চলো—আমার পড়ার ঘর তোমাকে দেখাবো। ফ্রান্সিস বেশ আগ্রহ বোধ করল। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতে ভালোও লাগে না।

রাজার সঙ্গে ফ্রান্সিস চলল। লম্বা লম্বা পাথরবাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে ওরা কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরে ঢুকল। এখানে প্রতিদিন দেবতার পুজো হয়; ফ্রান্সিস দেখল এখানকার কোয়েতজালের মূর্তিটাও তুলার মন্দিরের মূর্তির মতই। উচ্চতাও প্রায় এক। মূর্তির বেদীতে বুনো ফুল ফুলের মালা ছড়ানো।

রাজা হুয়েমাক মূর্তির সামনে কিছুক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসল। দু'হাত ওপরে তোলা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তুলার রাজা কালহুয়াকান—নরবলি—পূজা—আমি মানি না—মনে করি—কোয়েতজাল শুধু জীবনের দেবতা—মৃত্যুর নয়। ফ্রান্সিস রাজা হুয়েমাকের এই মনোভাবের মনে মনে প্রশংসা করল। রাজা বললেন—এখানে কয়েদ ঘর নেই—মানুষ সৎ—বিশ্বাস করি।

মন্দিরের পাশেই একটা বড় ঘর। ফ্রান্সিসকে নিয়ে রাজা সেই ঘরে ঢুকলেন। সাদাসিদে ঘর। কয়েকটা লম্বাটে পাথরের ওপর কিছু চামড়াবাঁধা বই। ফ্রান্সিস বইগুলো খুলে দেখল ভেড়ার সাদা চামড়ার পাতা। হাতে লেখা বই। ভাষা স্পেনীয়। পাথরের ওপর একটা চীনে মাটির দোয়াত কালি। পাশে মোটা ঘাস কেটে তৈরী কলম। পাশে কয়েকটা ভেড়ার সাদা চামড়া। বোঝা গেল এই কালি কলম চামড়ায় লেখা হয়। রাজা বললেন—এই ঘরে পড়ি—লিখি।

—'বইগুলো কোথায় পেলেন?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—বারিনথাস—প্রথমে ভালো—পরে মন্দ। স্পেনীয় ভাষা—শিখেছি। রাজা বললেন।

—'এখন আপনি কী পড়েন—কী লেখেন?' ফ্রান্সিস বলল।

—স্পেনীয় ভাষার অক্ষরে—নাহুয়াত্‌ল ভাষা—তৈরী—চেষ্টা।

ফ্রান্সিস শুনে খুব খুশী হ'ল। বলল—সত্যি আনন্দের কথা। আপনি সত্যি আপনার প্রজাদের কথা ভাবেন।

—প্রজা—সন্তান। বিদেশের জ্ঞান-চাই। রাজা বললেন। তারপর বললেন—

—স্পেনীয় অক্ষর লেখ। রাজা একটা সাদা চামড়া এগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস কলম দিয়ে স্পেনীয় বর্ণমালা লিখে দিল। রাজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। জোরে পড়লেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—

—আপনি স্পেনীয় ভাষা মোটামুটি শিখেছেন।

—আরো ভালো—শেখাবেন? রাজা বললেন।

—ঠিক আছে—আমি যতটুকু জানি শেখাবো। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা খুশীর হাসি হাসলেন। বললেন—কাল সকাল—।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস পরদিন থেকে সকালে রাজার ঘরে আসতে লাগল। ও রাজাকে আরো ভালোভাবে স্পেনীয় ভাষা শেখাতে লাগল। নিজেও নাহুয়াত্‌ল্ ভাষা শিখতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে রাজা হুয়েমাক স্পষ্ট স্পেনীয় ভাষা বলতে শিখলেন। ফ্রান্সিস মোটামুটি নাহুয়াত্‌ল্‌ভাষা শিখল।

সেদিন দুপুরের দিকে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘরে রয়েছে। ঘরের দরজায় বসে শাঙ্কো লোহার ফলা দিয়ে তীর তৈরী করছে। হঠাৎ দেখল একজন ননোয়াল্কা যোদ্ধা শুকনো বনটা থেকে বেরিয়ে ছুটে রাজবাড়ির দিকে আসছে আর চীৎকার করে কী বলছে। শাঙ্কো বুঝল একটা কিছু হয়েছে। ও ছুটে ফ্রান্সিসের কাছে গেল। বলল ফ্রান্সিস একজন যোদ্ধাকে বনের দিক থেকে দৌড়ে আসতে দেখলাম—বোধহয় কিছু হয়েছে।

—যোদ্ধাটা কোথায় গেল?

—রাজবাড়িতে।

তিনজনেই দরজায় এসে দাঁড়াল। সত্যি একটা কিছু হয়েছে। লোকজন ছুটোছুটি করছে। সকলের মুখেই ভয়।

ঠিক তখনই রাজবাড়ি থেকে একজন ননোয়াল্কা যোদ্ধা ছুটতে ছুটতে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিস এই যোদ্ধাটাকে চেনে। দেখা হলেই এই যোদ্ধাটা হাসে। রাজা হুয়েমাক এই দেহরক্ষী যোদ্ধাটিকে দিয়েই বরাবর ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠায়। আজকে যোদ্ধাটি কিন্তু হাসছে না। বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ফ্রান্সিসকে কিছু বলল। ফ্রান্সিস এখন নাহুয়াত্‌ল্ ভাষা একটু বোঝে। রাজা ডাকছেন—এটুকু বুঝল। ও বলল—আমি আসছি।

ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে এসে রাজপ্রাসাদে ঢুকল। দেখল রাজদরবারে গণ্যমান্যরা বসে আছেন। রাজা হুয়েমাক কাঠের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দুটিচোখে দুশ্চিন্তা। রাজা ফিরে তাকিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখলেন। অনেক পরিষ্কার স্পেনীয় ভাষায় বললেন—'ফ্রান্সিস রাজা কালহুয়াকান আমার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। ওরা

ভোরবেলা একটা একটা করে ঘোড়া পুয়েবেলা নদীর সেতুর ওপর দিয়ে পার ক'রে এপারে এসেছে। তারপর পদাতিক সৈন্যরা এসেছে। শুকনো বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসা অসুবিধে। তাই বনের পাশ দিয়ে অনেক দূরে ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্যদল আসছে। পেছনে পদাতিক সৈন্যরা। বিকেলের মধ্যেই এসে পড়বে।"

—তাহলে আপনার সৈন্যদের তৈরী হ'তে বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে আদেশ আমি দিয়েছি—আমার সন্তানতুল্য প্রজাদের ভাগ্যে যা ঘটবে আমার ভাগ্যেও তাই ঘটুক।

—আপনার উপযুক্ত সিদ্ধান্তই আপনি নিয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল—

'ভাবছি যুদ্ধ না ক'রে সন্ধির প্রস্তাব করবো কিনা।' রাজা বললেন।

'তা'তেও আপনি বা আপনার প্রজারা রেহাই পাবে না।'

'কালহুয়াকানের মত নরপশু সন্ধির প্রস্তাব মানবে না। বলি দেবার জন্যে অনেক বন্দী পাবে। এতেই ওর আনন্দ।' ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক বলেছো। মরতে যখন হবেই তখন লড়াই ক'রেই মরবো। রাজা বললেন। তারপর রাজা নাহুয়াত্‌ল্ ভাষায় গণ্যমান্যদের নিজের সিদ্ধান্তের কথা বললেন। গণ্যমান্যরা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মাথা নীচু করে রাজাকে সম্মান জানিয়ে চলে গেলেন। ফ্রান্সিস বলল—'মহামান্য রাজা—আপনার এই বিপদে আমরা মাত্র তিনজন কী সাহায্য আর আপনাকে করতে পারবো। তাছাড়া—আমি নিজে এখনো সুস্থ নই। আমার বন্ধুরা থাকলে—যাকগে দেখি কী করতে পারি। ফ্রান্সিস মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে চলে এল।

ফ্রান্সিস নিজেদের ঘরে ফিরে এল। হ্যারি আর শাঙ্কোকে সব বলল। হ্যারি বলল—কিন্তু তোমার যা শরীরের অবস্থা—

—না তরোয়াল নিয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারবো না। তুমিও খুব সুস্থ নও। এক শাঙ্কো।' ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল—'এবার বুঝলে কেন তোমাকে অনেক তীর তৈরী করতে বলেছিলাম।'

ফ্রান্সিস বিছানার ধার থেকে তরোয়াল তুলে কোমরে গুঁজল। হ্যারিও তরোয়াল নিল। শাঙ্কো ধনুক নিল। কাঁধের খাপে অনেক তীর নিল।

ওরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ঠিক তখনই একদল ননোয়াল্কা যোদ্ধা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়িয়ে গেল বনের বাঁদিক লক্ষ্য করে। সামনের প্রান্তরে পদাতিক সৈন্যরা সারি বেঁধে দাঁড়াতে লাগল।

ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল আর নাহুয়াত্‌ল্ ভাষায় ভেঙে ভেঙে বলতে লাগল—খাদ্য নাও—শুকনো বনে—পালিয়ে যাও।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই নারী শিশু বৃদ্ধারা হাতে খাবারের পুটুলি নিয়ে শুকনো বনের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। সন্ধের আগেই চোলুলা জনহীন হ'য়ে গেল।

সন্ধের সময়ই—কালহুয়াকানের অশ্বারোহী সৈন্যরা চোলুলায় পৌঁছল। পদাতিক ননোয়াল্কা সৈন্যরা যুদ্ধ করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে কালহুয়াকানের পদাতিক

একটা পাথরের বাড়ির আড়াল থেকে এতক্ষণ শাঙ্কো নিখুঁত নিশানায় তীর ছুঁড়ে বেশ কিছু কালহুয়াকানের ঘোড়সওয়ার সৈন্য মেরেছে। কিন্তু অন্ধকার নেমে এল তখনই। অন্ধকারে শাঙ্কো নিশানা ঠিক করতে পারল না। ও তীর ছোঁড়া বন্ধ করল। অনর্থক তীর নষ্ট করল না।

ননোয়াক্লা যোদ্ধারা বীরের মত কালহুয়াকানের অশ্বারোহী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। কিন্তু কালহুয়াকানের পদাতিক সৈন্যরা আসতে ননোয়াক্লা যোদ্ধাদের প্রতিরোধ ভেঙে গেল। তারা হেরে যেতে লাগল। আহত আর মুমূর্ষুদের আর্তনাদে প্রান্তর ভরে উঠল। পরাজিত ননোয়াক্লা সৈন্যদের দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে বন্দী করা হ'ল। প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল।

ওদিকে রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা রাজপ্রাসাদে ঢুকল। রাজসভার গণ্য মান্যদের বন্দী করা হ'ল। রাজা হুয়েমাকের দেহরক্ষীরা যখন লড়াই করছে তখন রাজা ছুটে এলেন। বললেন—'তোমরা পালাও। আমি একা লড়াই করবো।' করলেনও তাই। তাঁর বাঁ কাঁধে বর্শা বিঁধল। আহত হ'য়ে তিনি প্রাসাদের সিঁড়ির ওপর পড়ে গেলেন। আহত রাজা হুয়েমাক বন্দী হলেন।

যুদ্ধে রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা জিতল। ওরা মুখে হাতের থাবড়া দিয়ে শব্দ করতে লাগল। চীৎকার করতে লাগল। তারপর জনশূন্য বাড়িগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুঠপাট চলল অবাধে।

যুদ্ধজয়ী রাজা কালহুয়াকান একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে ব'সে এসব দেখছিলেন। এবার ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। কালহুয়াকানের পরনে রাজবেশ। দু'কানে অলঙ্কার। গলায় দামী পাথরের মালা। তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সোজা গিয়ে রাজা হুয়েমাকের সিংহাসনে বসলেন। সঙ্গে ছিল গণ্যমান্যরা। তারা মাথা নীচু ক'রে সম্মান জানিয়ে রাজা কালহুয়াকানের সামনে দাঁড়াল। রাজা কালহুয়াকান রাজসভাগৃহের চারদিকে তাকাতে তাকাতে হা হা ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ হ'ল। রাজা হুয়েমাককে চোলুলা থেকে তাড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। রাজা হুয়েমাকের এই রাজধানী চোলুলা দখল করার কল্পনাও তাঁর অনেকদিনের।

বিজয়ী কালহুয়াকানের সৈন্যদের বিজয়োল্লাস আস্তে আস্তে স্তিমিত হ'য়ে রাত বাড়তে লাগল।

ফ্রান্সিসরা নিজেদের ঘরে ফিরে এল। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছে সবে তখনই শুনল দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ। নিশ্চয়ই কালহুয়াকানের সৈন্যরা। এই ঘরের দরজা বন্ধ দেখে ধ'রে নিল ভেতরে মূল্যবান কিছু আছে। দরজায় ধাক্কা দেওয়া চলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দ্রুত বিছানা থেকে উঠল। তরোয়াল হাতে নিল। ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালটা মেঝেয় চেপে নিভিয়ে ফেলল। ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেল। শাঙ্কোও উঠে দরজার হুড়কোটা খুলে দিয়েই দ্রুত পিছিয়ে এল। চার-পাঁচজন রাজা কালহুয়াকানের সৈন্য এক ধাক্কায় দরজা খুলে ঢুকল। প্রথম সৈন্যটার বুকে লাগল

ক'রে হ্যারি তরোয়াল চালাল। সৈন্যটির বর্শা হাতেই রয়ে গেল। ঘাড়ে গভীর ক্ষত নিয়ে সে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। পরের সৈন্যটি অন্ধকারেই বর্শা ছুঁড়ল। বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। ফ্রান্সিস এক লাফে এগিয়ে এসে সৈন্যটার বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। সৈন্যটা দু'হাত শূন্যে তুলে চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। পরেরটাকে ঘায়েল করল শাঙ্কোর ছোঁড়া তীর। আহত সৈন্যটা দোর গোড়াতেই পড়ে গেল। পরের সৈন্যটি আর ভয়ের চোটে ঘরেই ঢুকল না। এক লাফে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ফ্রান্সিসরা ধরাধরি ক'রে মৃত সৈন্যদের দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঘরে ফিরে হ্যারি আর শাঙ্কো বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে থেকেই বলল—ঘরের দরজা বন্ধ ক'রো না। তাহ'লেই কালহুয়াকানের সৈন্যরা ভাববে এ ঘর লুঠ হ'য়ে গেছে। আর ঢুকবে না।' শাঙ্কো তীর ধনুক পাশে রেখে শুয়ে পড়ল। হ্যারি তরোয়াল হাতে বিছানায় ব'সে রইল। ফ্রান্সিস বলল—'তোমরা সজাগ থেকো—আমি একটু ঘুরে আসছি।

—এত রাতে কোথায় যাবে?' হ্যারি জানতে চাইল।

—রাতেই সুবিধে। এক্ষুনি আসছি।' ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার বাইরে এল। সাবধানে চারিদিকে অন্ধকারে নজর রেখে চলল প্রাসাদের সিঁড়ির দিকে। দেখল এখানে ওখানে আগুন জ্বেলে কালহুয়াকানের সৈন্যরা হৈ হৈ করে খাওয়া দাওয়া করছে। সেই আলোয় দেখল কোয়েতজাল মন্দিরের সিঁড়িতে আহত ননোয়াক্লা সৈন্যরা শুয়ে বসে আছে। প্রান্তরে হাতবাঁধা বন্দীরা সারি বেঁধে বসে আছে। ওরই মধ্যে সেই রাজবৈদ্যকে দেখল ফ্রান্সিস। রাজবৈদ্য সঙ্গে দুজন বৃদ্ধকে নিয়ে আহত সৈন্যদের চিকিৎসা করছে। সঙ্গী বৃদ্ধের হাতে ওষুধের দুটো থলি। রাজবৈদ্য নিচু হয়ে একজন ননোয়াক্লা সৈন্যর ক্ষতে ওষুধ লাগাচ্ছে তখনই একজন কালহুয়াকানের সৈন্য রাজবৈদ্যের দিকে বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এল। বর্শা ছোঁড়ার আগেই ফ্রান্সিস সৈন্যটার বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিল। সৈন্যটা বর্শা ফেলে মাটিতে উবু হয়ে পড়ে গেল। রাজবৈদ্য উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস রাজবৈদ্যকে চাপাস্বরে ভাঙা ভাঙা নাহুয়াত্‌ল্‌ ভাষায় বলল—রাজা হুয়েমাক—খুঁজছি—কোথায়? রাজবৈদ্য মাথা নাড়ল। ও জানে না।

ফ্রান্সিস আবার অন্ধকারে সাবধানে চলল। সামনেই কোয়েতজালের মন্দির। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল এই ডামাডোলের মধ্যে রাজা হুয়েমাককে পাওয়া যাবে না।

তাছাড়া তিনি এতক্ষণে বন্দী। কালহুয় কানের সৈন্যরা নিশ্চয়ই তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। অথচ রাজাকে একটা নির্দেশ দিতেই হবে। কী ক'রে এই নির্দেশটা রাজা হুয়েমাকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়? আচ্ছা চিঠি পাঠালে কেমন হয়? ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে কোয়েতজালের মন্দিরে ঢুকে পড়ল। একপাশে রাজার পাঠকক্ষ। এখানে শত্রুসৈন্যরা নেই। মন্দিরে আর পাহারা দেবার কী আছে। ফ্রান্সিস অন্ধকারে পা টিপে টিপে পাঠকক্ষে ঢুকল। দেখল মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে একটা ভেড়ার সাদা চামড়া টেনে নিল। দোয়াতের কালিতে কলম ঢুকিয়ে লিখল—

মহানুভব রাজা হুয়েমাক—

একটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছি। আপনি রাজা কালহুয়াকানকে বলবেন সব বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে আপনি হেঁটে শুকনো বন পেরিয়ে প্রথমে পুয়েবেলা নদীর সেতুর কাছে যাবেন। আপনাদের পেছনে—আসবেন রাজা কালহুয়াকান ও তাঁর সৈন্যরা। আপনি রাজা কালহুয়াকানকে প্রতিশ্রুতি দেবেন যে আপনি নিজে বা কোন বন্দী পালাবে না। শুকনো বনে আত্মগোপনকারী সবাইকে ডেকে নিয়ে যাবেন। বনে কেউ যেন না থাকে।

ইতি ফ্রান্সিস।

চিঠিটা লিখে ফ্রান্সিস পাঠকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। এখন চিন্তা এই চিঠি হুয়েমাকের কাছে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। রাজা হুয়েমাককে কোথায় রাখা হ'য়েছে কে জানে। রাজা হুয়েমাকের এখানে কোন কয়েদ ঘরও নেই। অগত্যা কাল সকালে চেষ্টা করতে হবে।

ফ্রান্সিস সতর্কভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে এল। হ্যারি শাঙ্কো দু'জনেই জেগে ছিল। ফ্রান্সিস ঢুকতেই হ্যারি বলল—তোমার কোন বিপদ হয়নি তো?

না। শত্রুসৈন্যরা আর এখানে এসেছিল? ফ্রান্সিস বলল।

—না। রাত বেশী নেই। শুয়ে পড়।' হ্যারি বলল।

ওরা বিছানায় শুল বটে। কিন্তু ভালো ঘুম হ'ল না কারোরই। রাতে খাওয়া হয়নি। ভোরেই উঠে পড়ল ওরা। খিদেও পেয়েছে। আবার সকালের আলোয় দেখল রাজবৈদ্যর একজন সঙ্গী যাচ্ছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শুনুন। বৃদ্ধটি থামল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ফ্রান্সিসকে দেখতে পেল। এগিয়ে এসে দোর গোড়ায় দাঁড়াল। ফ্রান্সিস হাতের ভঙ্গী করে বলল—'খাবার।' বৃদ্ধটি হাসল। তারপর চলে গেল।

—ও কি খাবার আনতে পারবে? শাঙ্কো বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধটি ফিরে এল। হাতে একটা পুঁটুলি। ঘরে ঢুকে পুঁটুলি খুলে খাবার বের করল। সেই ভুট্টার রুটি। বুনো ফলের তরকারি। খিদের জ্বালায় তিনজনেই উবু হ'য়ে বসে খেতে লাগল। বৃদ্ধটি হাসতে লাগল। তিনজন ক্ষুধার্তকে খাইয়ে বৃদ্ধটি খুশীই হয়েছে বোঝা গেল। খাওয়ার পর চীনেমাটির পাত্রগুলো নিয়ে যাচ্ছে তখন ফ্রান্সিস ভাঙা ভাঙা নাহুয়াতল ভাষায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলল—রাজা হুয়েমাক কোথায়?

বৃদ্ধটি দরজার কাছ থেকে আঙুল তুলে দেখাল। ফ্রান্সিসরা দেখল—রাজপ্রাসাদের সিঁড়ির ওপর রাজা হুয়েমাক হাতবাঁধা অবস্থায় বসে আছেন। রাজবৈদ্য রাজার কাঁধের ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধটি একনাগারে কী ব'লে গেল। ফ্রান্সিস মোটামুটি বুঝল। বলল—'জানো, কালরাতে রাজা হুয়েমাককে রাজবৈদ্য চিকিৎসা করতে চেয়েছিল। রাজা রাজি হননি। বলেছেন—আমার প্রজাদের আগে চিকিৎসা কর। তারপর আমাকে। তাই এখন সকালে চিকিৎসা হচ্ছে।' হ্যারি বলল 'সত্যি—এরকম মানুষ কম দেখা যায়।' বৃদ্ধটি চলে গেল। ফ্রান্সিস ভাবল, এই সুযোগ। রাজাকে চিঠিটা দিয়ে আসি। কিন্তু দেখল—দু'জন শত্রুসৈন্য রাজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বর্শাহাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্য উপায় ভাবতে হবে। তখনই দেখল শাঙ্কো ওর তীরগুলো খাপে গুছিয়ে রাখছে। ফ্রান্সিস ডাকল—'শাঙ্কো শিগগির তীর ধনুক নিয়ে এসো।' বিপদ আঁচ ক'রে শাঙ্কো তীর ধনুক বাগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল 'ভয় নেই।' তারপর শাঙ্কোর হাত থেকে তীরটা নিল। চিঠিটা কোমরবন্ধনী থেকে বের করল। চিঠিটা একটা তীরের ফলায় জড়ালো। তারপর রাজা হুয়েমাক যে ওদের যে নতুন পোশাক পরতে দিয়েছিল তারই ঝুল থেকে সুতো ছিঁড়ে নিল। তীরের ফলার সঙ্গে চিঠিটা বেঁধে দিল। তারপর তীরটা শাঙ্কোর হাতে দিয়ে বলল—'ঐ দেখ রাজা হুয়েমাক সিঁড়িতে বসে আছে। ঠিক তীর ছুঁড়ে রাজার সামনে চিঠিটা ফ্যালো। পারবে তো?' শাঙ্কো মাথা ঝাঁকাল। তারপর নিশানা ঠিক ক'রে শাঙ্কো তীরটা ছুঁড়ল। ঠিক রাজা হুয়েমাকের পায়ের কাছে তীরটা পড়ল। রাজা দু'একবার এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর বাঁধা হাতদু'টো বাড়িয়ে তীরটা তুলে নিলেন। সুতোর বাঁধন খুলে চিঠি বার করলেন। খুব মন দিয়ে বারকয়েক পড়লেন। এতক্ষণ ফ্রান্সিস রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাকিয়ে ছিল। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—যাক রাজাকে নির্দেশটা দিতে পেরেছি।' রাজার পাহারাদার একজন দেখল রাজা চিঠি পড়ছে। পাহারাদারটা মুখ নামিয়ে দেখল চিঠিটা। স্পেনীয় ভাষায় লেখা। ও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না। তবু চিঠিটা ছিনিয়ে নিল। রাজার এতক্ষণে বারকয়েক পড়া হ'য়ে গেছে। চিঠিটা নিয়ে পাহারাদার সৈন্যটি রাজপ্রাসাদে ঢুকল। দেখল রাজা কালহুয়াকান সিংহাসনে হাত পা গুটিয়ে শুয়ে আছেন। সৈন্যটি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চিঠিটা রাজার হাতে দিল। তারপর কী ব'লে গেল। বোধহয় কী করে চিঠিটা পেয়েছে তাই বলল। রাজা কালহুয়াকান সিংহাসনে উঠে বসলেন। চিঠিটা পড়বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই পড়তে পারলেন না। তখন চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন। সৈন্যটি চ'লে এল।

পাথরের সিঁড়িতে রাজা হুয়েমাক ব'সে আছেন।

একটু পরেই একজন সৈন্যদের দলনেতা ঘোড়ায় চড়ে সিঁড়ির কাছে এল। দু'তিনজন সৈন্য এগিয়ে গেল। দলনেতা তাদের কী বলল। তারা খুব হাসাহাসি করল। একজন ছুটে গিয়ে একটা লম্বা দড়ি নিয়ে এল। ফ্রান্সিস ঘরের দরজার আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করছিল। সৈন্যটা দড়ির একটা প্রান্ত আহত রাজা হুয়েমাকের হাতে বাঁধল। ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি দেখে যাও। ওরা যে খেলা আমাদের সঙ্গে খেলেছিল সেই একই খেলা খেলছে রাজা হুয়েমাকের সঙ্গে। হ্যারি শাঙ্কো দু'জনেই

এগিয়ে এল। দেখতে লাগল দরজার আড়াল থেকে।

রাজা হুয়েমাকের হাতে দড়ি বেঁধে সৈন্যটি দড়ির অপর প্রান্ত ঘোড়সওয়ার দলনেতার হাতে দিলে। দলনেতা দড়িতে এক হ্যাঁচকা টান দিল। রাজা হুয়েমাক কিছু ভাবছিলেন। চম্‌কে উঠে দাঁড়ালেন। দলনেতা ঘোড়া চালাতে লাগল। দড়িবাঁধা রাজাও হাঁটতে লাগলেন ঘোড়ার পেছনে পেছনে। হঠাৎ দলনেতা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিতেই আহত রাজা মাটিতে পড়ে গেলেন। দলনেতা মাটিতে ধুলোয় হিঁচড়ে নিয়ে চলল রাজাকে। শত্রুসৈন্যরা উল্লাসে চীৎকার করতে লাগল। রাজাকে হিঁচড়ে নিয়ে দলনেতা ঘোড়াটাকে ঐ মাঠের মত জায়গাটায় পাক খাওয়াতে লাগল। রাজার পোশাক ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। সারা গায়ে ধুলো। কাঁধে বর্শার জখম। তবু রাজা নিঃশব্দে এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বেদনায় দুঃখে ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। ও চোখ বন্ধ ক'রে বলল—'শাঙ্কো—মারো ঐ ঘোড়সওয়ারকে।' শাঙ্কো বলল—'অত দূরে তীর যাবে না।'

—ফ্রান্সিস তারপর খুব নিবিষ্টমনে তাকিয়ে ঘোড়সওয়ারকে দেখল। ঐ তো—সেই দাড়িগোঁফওলা দলপতি। বলল—'হ্যারি—' সেই লোকটা না?

—হ্যাঁ।' হ্যারিও দেখতে দেখতে বলল।'

—শাঙ্কো—পাথরের বাড়ির আড়ালে আড়ালে কাছে চ'লে যাও।

ঐ নরপশুটাকে হত্যা করা চাই।' শাঙ্কো বিছানা থেকে কাপড়টা নিয়ে গা মাথা ঢাকল। তীর ধনুক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাথরের বাড়িগুলোর আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল। সব সৈন্যরা তখন ঐ কাণ্ড দেখতে ব্যস্ত। খুব মজা পাচ্ছে। শাঙ্কোর দিকে কারো চোখ পড়ল না। শাঙ্কো মন্দিরের সামনে পাথরের সিঁড়ির একপাশে মাথা নীচু ক'রে বসে পড়ল। তারপর ধনুক বাগিয়ে ধরল। একটার বেশী তীর ছোঁড়া যাবে না। কাজেই নিশানা নিখুঁত হ'তে হবে। একটু সময় নিল শাঙ্কো' তারপর তীর ছুঁড়ল। নির্ভুল নিশানা। তীরটি দলনেতার বুক ভেদ করল। দু'হাত ওপরে তুলে সে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে মন্দিরের ওপাশে চলে গেল। এক মুহূর্ত। সৈন্যরা তখনও ভাবছে কী হ'ল? তারপরই অনেকে ছুটে গেল দলনেতার দিকে। আর কিছু সৈন্য এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। কে তীর ছুড়ল? কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না ওরা। গা মাথা কাপড়ে ঢাকা শাঙ্কো ততক্ষণে ঘরে চ'লে এল। ওদিকে কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে দলনেতা মারা গেল। রাজা হুয়েমাক মাটি থেকে উঠলেন। টলতে টলতে হাঁটতে লাগলেন। ওভাবেই হাঁটতে হাঁটতে কোনরকমে এসে পাথরের সিঁড়িতে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পায়ের পোশাক তখন ছিন্নভিন্ন, রক্ত ধুলোয় ভরা সারা শরীর।

কিছুক্ষণ পরে রাজা হুয়েমাক উঠে বসলেন। পাহারাদার যে সৈন্যটি রাজা কালহুয়াকানের কাছে চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন—ওদের রাজা কোথায়? সৈন্যটি বলল—সিংহাসনে ব'সে আছেন। রাজা হুয়েমাক রাজপ্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর পা কাঁপছে তখনো। ফ্রান্সিস দরজার আড়াল থেকে সব দেখছিল।

কিছু সময় গেল। রাজা হুয়েমাক ফিরে এলেন। আবার সিঁড়িটায় বসলেন।

বেলা বাড়তে লাগল। ওদিকে রাজবৈদ্যর দুই বৃদ্ধ সঙ্গী কোত্থেকে ভুট্টার রুটি তরকারি বিরাট কাঠের পাত্রে ক'রে নিয়ে এসেছে। বন্দী ননোয়াল্কা যোদ্ধাদের খাইয়ে দিল। আহতদেরও খেতে দিল। রাজা হুয়েমাকও খেলেন। তবে সামান্য নিলেন।

রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা একটা জাগুয়ার শিকার ক'রে আনল। জাগুয়ারের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কাটল। আগুন জ্বেলে তাই পুড়িয়ে খেতে লাগল। খাওয়া দাওয়া হ'তে হ'তে আরও বেলা হ'ল।

রাজপ্রাসাদ থেকে রাজা কালহুয়াকান বেরিয়ে এলেন। সিঁড়িতে বসা রাজা হুয়েমাককে কী বললেন। রাজা হুয়েমাক উঠে দাঁড়িয়ে বন্দী যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন।—'আমার সন্তানতুল্য প্রজারা—সর্ব প্রথমে আমি যাবো। তারপর তোমরা আসবে। আমরা আগে ঐ শুকনো বন পেরিয়ে পুয়েবেলা নদীর সেতুর কাছে গিয়া অপেক্ষা করবো। তারপর রাজা কালহুয়াকান ও তার সৈন্যদল আসবেন কিন্তু সাবধান কেউ পালিয়ে যাবে না। আমার প্রতিশ্রুতির মূল্য তোমরা দেবে ঐ বিশ্বাস আমার আছে।' রাজা থামলেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—রাজা হুয়েমাক এই কথাগুলো আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন। উনি জানেন যে আমরা এই ঘরেই থাকি।'

রাজা হুয়েমাক প্রান্তরে নামলেন। এগিয়ে চললেন বনের দিকে। পেছনে বন্দীরা আসতে লাগল। বনের কাছে এসে রাজা চেঁচিয়ে কী বলতে লাগলেন। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট শুনে বলল—' রাজা ঠিক ঠিক আমার নির্দেশ পালন করছে। বনের আত্মগোপনকারী সব প্রজাদের তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য বলছেন।

রাজা হুয়েমাক বন্দীদের নিয়ে শুকনো বনে ঢুকলেন। শুকনো গাছগাছালি ঝরাপাতার বনের নীচে তখনও একটু অন্ধকার রয়েছে। রাজার নির্দেশে একজন বন্দী চেঁচিয়ে রাজার কথাগুলো বলতে বলতে চলল। বনের আড়াল আবডাল থেকে স্ত্রীলোক-বৃদ্ধ-ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসে বন্দীদলের সঙ্গে চলল। কিছু আহত যোদ্ধাও এসে যোগ দিল। ছেলেমেয়ে কোলে মায়েরাও এসে যোগ দিল।

একসময় বন শেষ হ'ল। রাজা হুয়েমাক তাঁর প্রজাদের নিয়ে পুয়েবেলা নদীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ওদিকে রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরাও তৈরী হ'ল। সবার আগে দু'টো ঘোড়া রাখা হ'ল। প্রথম সাদা ঘোড়াটায় রাজা কালহুয়াকান উঠলেন। রাজপ্রাসাদ থেকে একটা লম্বাটে কালো কাঠের সিন্দুক কয়েকজন সৈন্য কাঁধে ক'রে নিয়ে এল। পেছনের ঘোড়াটার পিঠে বাক্সটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসরা সবই দেখছিল। বাক্সটা দেখে ফ্রান্সিস বলল—'বাক্সটায় নিশ্চয়ই রাজা হুয়েমাকের ধনসম্পত্তি আছে।'

এবার রাজা কালহুয়াকানের সৈন্য ঘোড়াগুলোকে লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে চলল। পদাতিক সৈন্যরা হেঁটে চলল।

রাজা কালহুয়াকান বনে ঢুকলেন। কিন্তু ঘোড়া থেকে নামলেন না। দু'তিনজন

সৈন্য কুড়ুল হাতে সামনের গাছপালার ডাল পাতা কাটতে কাটতে চলল। পথ পরিষ্কার হ'তে লাগল। রাজা কালহুয়াকান ঘোড়ার পিঠে চড়ে চললেন। পেছনের বাক্স পিঠে ঘোড়াটাও চলল পেছনে পেছনে।

সব সৈন্যদের নিয়ে রাজা কালহুয়াকান বনের মধ্যে দিয়ে চললেন।

ফ্রান্সিস ঘর থেকে দেখল প্রান্তর জনশূন্য। ও আগেই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। ঘরের কোনা থেকে দু'টো তেলে-ভেজা মশাল নিল। সঙ্গে চকমকি পাথর। ব'লে উঠল—হ্যারি শিগগির চলো, শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে এসো।

তৈরী হয়ে ওরা ঘরের বাইরে এল। তারপর দ্রুত ছুটল বনের দিকের মন্দিরের সিঁড়িতে শুয়ে থাকা বসে থাকা ননোয়াক্লা যোদ্ধারা ওদের ছুটে যেতে দেখে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল।

বনের কাছাকাছি পৌঁছল ওরা। ফ্রান্সিস উঁচু হয়ে বসল। একটু ধুলো মাটি থেকে নিয়ে হাত উঁচু করে আস্তে আস্তে ফেলল। দেখল ধুলোগুলো উত্তর দিকে ঘেঁষে পড়ল। তার মানে হাওয়া উত্তরমুখী। ফ্রান্সিস বলে উঠল—এটাই চাইছিলাম। তারপর ফ্রান্সিস চকমকি ঠুকে একটা মশাল জ্বালাল। অন্য মশালটা থেকে তেলে ভেজা কাপড়ের টুকরো ছিঁড়ে নিল। একটা তীরের ফলায় জড়ালো। জ্বলন্ত মশাল থেকে তীরের ফলায় জড়ানো কাপড়ে আগুন লাগাল। জ্বলন্ত তীরটা শাঙ্কোর হাতে দিয়ে বলল—' এই তীরটা বনের পেছন দিকে ছোড়ো।' এইবার হ্যারি ও শাঙ্কো বুঝতে পারল, হ্যারি হেসে বলল—'সাবাস ফ্রান্সিস।' শাঙ্কো দ্রুত হাতে তীর ছুঁড়ল। জ্বলন্ত তীর উড়ে গিয়ে বনের পেছন দিককার গাছগাছালিতে গিয়ে পড়ল। শুকিয়ে যাওয়া গাছগাছালিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেল। তারপর আবার তীরে কাপড় জড়াল ফ্রান্সিস। আবার আগুন লাগাল। বলল—এবার যত দূরে পারো তীর ছোঁড়ো।' আবার আগুন মুখে তীর ছুড়ল। প্রায় বনের মাঝামাঝি পড়ল। ওখানেও আগুন লেগে গেল। উত্তুরে হাওয়ার মুখে আগুন ছড়াতে লাগল। তারপর শাঙ্কো দ্রুতহাতে আরো আগুনজ্বালা তীর ছুঁড়ল। সমস্ত বনেই আগুন লেগে গেল। বনে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ওদিকে আগুন আর ধোঁয়ার বেড়াজালে পড়ে গেল কালহুয়াকানের সৈন্যরা। কালহুয়াকান নিজেও। পাগলের মত সৈন্যরা বনের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। কিন্তু চারদিকেই আগুন আর ঘন ধোঁয়া। আগুন ছড়াতে লাগল। উঁচু উঁচু গাছগুলোকে পেঁচিয়ে আগুনের কুণ্ডুলী ওপরের দিকে উঠতে লাগল।' রাজা কালহুয়াকান ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। পালাতে গেলেন। কিন্তু কোনদিকে পালাবেন? চারদিকেই আগুন আর গাঢ় ধোঁয়া। বনের মাথায় আকাশে ধোঁয়া কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠতে লাগল। দু'তিনজন সৈন্য ঘোড়ার পিঠে উঠে আগুনের বলয় পার হ'তে গেল। কিন্তু ঘোড়াসুদ্ধু পুড়ে মরল। প্রাণভয়ে ভীত ঘোড়াগুলো পাগলের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের নীচেও অনেক সৈন্য মারা পড়ল। আগুনের শিখা ওপরে আকাশের দিকে অনেকটা উঠে গেল। বিকেলের আকাশে বন থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে লাগল।

রাজা হুয়েমাক সেতুর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার প্রজাদের নিয়ে। সকাই অবাক

চোখে বনের মাথায় ধোঁয়া আগুন দেখতে লাগল। রাজা হুয়েমাক ধোঁয়া উঠতে দেখে আগেই বুঝেছিলেন শুকনো বনে আগুন লেগেছে। আরো বুঝলেন ফ্রান্সিসই আগুন লাগিয়েছে আর এইজন্যেই তাঁকে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল। রাজা মৃদু হেসে মনে মনে ফ্রান্সিসকে অজস্র ধন্যবাদ জানালেন।

আগুন বনের দুদিকে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। এই পুয়েবেলা নদীর সেতুর কাছে দাঁড়িয়েও বন্দী আর চোলুলার লোকজনদের গায়ে আগুনের উত্তাপ এসে লাগল। রাজা হুয়েমাক চেঁচিয়ে বললেন—'সেতুর ওপারে চলো।' সবাই সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে ওপারে চলে গেল। একজন ননোয়াল্কা যোদ্ধা এরমধ্যেই দাঁত দিয়ে কামড়ে হাতের বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছিল। সে ছুটে রাজার হাতের বাঁধা দড়ি খুলে দিল। রাজা নিজেই তখন যোদ্ধাদের হাতের বাঁধন খুলে দিতে লাগলেন। সব বন্দীরা মুক্ত হ'ল। সবাই ওখানেই পাথরে মাটিতে ব'সে পড়ল। জ্বলন্ত বনের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্ধে হ'ল। কিন্তু জ্বলন্ত বনের আগুনের আভায় বহুদূর দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল।

বনের আগুন থেকে মাত্র দু'জন সৈন্য পালিয়ে আসতে পেরেছিল। একজন বনের বাইরে এসেই মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল। অন্যজন মাটিতে শুয়ে রইল মড়ার মত। তারও বাঁচার আশা নেই।

ওদিকে ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো বনের ধার থেকে স'রে এসে প্রান্তরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস সেই ভীষণ অগ্নিলীলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল—'এই আগুন থেকে একজনেরও বাঁচার আশা নেই। আমাদের ওপর রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যদের পশুর মত অত্যাচারের প্রতিশোধ তাহ'লে নিতে পারলাম। উফ্—আমার ঘুম পাচ্ছে চলো।'

ফ্রান্সিসরা ঘরে ফিরে এল। ফ্রান্সিসের শরীরের দুর্বলতা তখনও কাটেনি। ও ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং একটুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। গত রাতে কারোর ঘুম হয়নি। হ্যারি আর শাঙ্কোও শুয়ে পড়ল।

রাত বাড়তে লাগল। বনের আগুনের তেজও কমে আসতে লাগল। শেষ রাতের দিকে আগুন অনেকটা স্তিমিত হ'য়ে এল।

ওদিকে রাজা হুয়েমাক তাঁর প্রজাদের নিয়ে পুয়েবেলা নদীর সেতুর ওপাশে ব'সে রইলেন। আগুনে পোড়া বনের ওপর দিয়ে চোলুলায় ফেরা অসম্ভব। সারারাত কাটল।

ভোর হ'ল। ঘুম ভেঙে গেছে। তখনও ফ্রান্সিস শুয়ে ছিল। হ্যারি ডাকল—'ফ্রান্সিস—কী করবে এখন?'

—'রাজা হুয়েমাক আর তার প্রজাদের চোলুলায় ফিরিয়ে আনবো।'—'কিন্তু বনের আগুন এখনও সম্পূর্ণ নেভেনি। বন ঘুরে আসতে গেলে বহু দূর ঘুরে আসতে হবে। নিদ্রাহীন ক্ষুধার্ত মানুষগুলো কি পারবে?' হ্যারি বলল।

এর মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি ওদের খাবার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—'চলো, আগুনের অবস্থাটা দেখে আসি।'

তিনজনে ঘরের বাইরে এল। চলল আগুনে পোড়া বনের দিকে। বনের কাছে এসে দেখল তখনও বনের কোন কোন জায়গা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কিন্তু কিছু পোড়া কালো গাছ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মাটির ওপর স্তূপাকার শুকনো পাতা পুড়ে গেছে। কিন্তু তখনও ওসব জায়গায় ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। কী করে পোড়া বন পার হওয়া যায়? কী ক'রেই বা রাজা হুয়েমাকের কাছে যাওয়া যায়? শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস রাজা হুয়েমাকের আর তার প্রজাদের বিপদ কিন্তু এখনও কাটেনি।

এর মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি ওদের খাবার দিয়ে গেল।

—ও কথা বলছো কেন? হ্যারি জিজ্ঞাস করল।

—ভেবে দেখ—রাজা কালহুয়াকান হয়তো সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে আসেনি। কিছু সৈন্য রাজধানী তুলাতে হয়তো রয়েছে। তারা আগুনের খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই। এর মধ্যে তারা রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যদের কী হ'ল নিশ্চয়ই জানতে আসবে। ওরা সশস্ত্র হ'য়েই আসবে। পুয়েবেলা সেতুর কাছে নিশ্চয়ই রাজা হুয়েমাক ও তার নিরস্ত্র সৈন্য লোকজনদের দেখবে। তখন তারা আক্রমণ করলে কেউ বাঁচবে না।' ফ্রান্সিস মন দিয়ে শাঙ্কোর কথাগুলো শুনল। বলল— 'তুমি ঠিক বলেছো। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজা হুয়েমাক আর তাঁর প্রজাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কী ক'রে?' হ্যারি এতক্ষণ একটা ভাঙা পাথরের বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ ওর মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। ও বলল—'আচ্ছা ফ্রান্সিস—একটা কাজ করলে হয় না? ঐ ভাঙা বাড়িটা থেকে পাথরের টুকরো এনে যদি পোড়া বনের মধ্যে পেতে আমার এগিয়ে যাই তাহলে বনের শেষে পৌঁছোতে পারবো না? ভেবে দেখ— পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে আমাদের পা পোড়ার কোন ভয় নেই। রাজা হুয়েমাক আর তার প্রজারাও ঐ পাথরের ওপর পা রেখে চ'লে আসতে পারবে।' ফ্রান্সিস হেসে বলল—'সাবাস হ্যারি। হ্যাঁ এটা সম্ভব। তবে ঐ ভাঙা বাড়িতে যত পাথরের খণ্ড পাবো তা'তে কি সবটা বন পেরুনো যাবে?

—কাজটা তো শুরু করি—এগিয়ে তো যাই তারপর দেখা যাবে। হ্যারি বলল।

তিনজনেই কাজে লেগে পড়ল। ফ্রান্সিস বনের ধারে দাঁড়াল। শাঙ্কো ভাঙা বাড়িটা থেকে পাথরের খণ্ড তুলতে লাগল। দিতে লাগল হ্যারির হাতে। হ্যারি

সেটা এনে ফ্রান্সিসকে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস পোড়া বনের মধ্যে সেগুলো পাততে লাগল। ফাঁক ফাঁক ক'রে। তারপর পাতা পাথরে পা দিয়ে বনের মধ্যে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর পর জায়গা পরিবর্তন করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। আস্তে আস্তে বনের মধ্যে বেশ দূরে এগিয়ে গেল ওরা। তখন বেলা হ'য়েছে। ফ্রান্সিসরা পাতা পাথরে পা রেখে রেখে ফিরে এল। দেখল দু'তিনজন আহত ননোয়াক্লা যোদ্ধা উঠে এসে ওদের কাজকর্ম দেখছে। ফ্রান্সিস ভাঙা ভাঙা ওদের ভাষায় বলল—'পারবে সাহায্য করতে? আমরা বিশ্রাম করবো।' যোদ্ধাদের মধ্যে একজন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর তিনজন যোদ্ধাই ফ্রান্সিসদের মত পাথর পাতার কাজে লেগে পড়ল। ফ্রান্সিসরা একটু বিশ্রাম নিল। তারপর আবার কাজে লেগে পড়ল।

দুপুর হ'ল। বৃদ্ধ লোকটি খাবার নিয়ে এল। খাবার খেয়ে আবার সবাই কাজ শুরু করল।

বিকেলের আগেই ওরা পোড়া বনের প্রায় শেষে পৌঁছে গেল। কিন্তু আর পাথর নেই। ভাঙা বাড়ির পাথর শেষ হ'য়ে গিয়েছিল আগেই। এখান ওখান থেকে আরো পাথর জোগাড় করেছে, কিন্তু আর ভাঙা পাথর পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস হেঁটে হেঁটে শেষ পর্যন্ত এল। ভালো ক'রে দেখল আর একটুখানি গেলেই পোড়া বন শেষ। ও দেখল এখানকার আগুন নিভে গেছে। রাজা হুয়েমাক ওদের কাঁচা চামড়ার জুতো মত দিয়েছিল। ফ্রান্সিসের পায়ে সেই জুতো। ও পোড়া পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে বাকিটুকু পেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিসের দেখাদেখি হ্যারি শাঙ্কো আর আহত যোদ্ধারাও বাকিটুকু হেঁটে পার হ'য়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিসরা চলল রাজা হুয়েমাকের খোঁজে। পুয়েবেলা নদীর সেতু পেরিয়েই দেখল প্রজাদের নিয়ে রাজা বসে আছেন।

ফ্রান্সিসদের দেখে রাজা হুয়েমাক বেশ আশ্চর্য হলেন। ওরা আগুনে পোড়া বন পার হ'ল কী ক'রে। সব আগুন তো এত তাড়াতাড়ি নিভে যাবার কথা না? রাজা হুয়েমাক কিন্তু ভীষণ খুশী হলেন। উঠে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিসরা কাছে আসতেই ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজার ছেঁড়া পোশাকে তখনও ধুলো রক্ত লেগে রয়েছে। হ্যারি শাঙ্কো যোদ্ধারা সবাই মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা বললেন—'ফ্রান্সিস তোমরা পোড়া বন পেরিয়ে এলে কী ক'রে?'

—'পাথর ফে ন ফেলে পাথরের ওপর হেঁটে হেঁটে পার হ'য়েছি। আপনাদেরও সেভাবেই পার হ ত হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' ফ্রান্সিস বলল।

—কেন?

রাজা কালহুয়াকানের কিছু সৈন্য হয়তো তুলায় আছে। ওরা রাজার খোঁজে এদিকে আসতে পারে। যে কোন মুহূর্তে। কাজেই আর দেরী করবেন না। আপনি প্রজাদের সেভাবেই নির্দেশ দিন। এদিকে ফ্রান্সিসদের আসতে দেখে সবাই এদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রাজা হুয়েমাক সকলের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন, 'পোড়া বন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হ'তে। রাজার কথা শেষ হ'তে সবাই ছুটল পোড়া বনের দিকে। সবার আগে বাচ্চা কোলে

মায়েদের তারপর স্ত্রীলোকেরা, বাচ্চারা, বৃদ্ধবৃদ্ধারা রওনা হ'ল। যোদ্ধারা গেল তারপর। সবশেষে রাজা ও ফ্রান্সিসরা।

ওরা বনের মাঝামাঝি এসেছে তখনই দেখল দক্ষিণ দিক থেকে ধূলো উড়িয়ে একদল অশ্বারোহী ছুটে আসছে। বোঝাই গেল কালহুয়াকানের যে সৈন্যরা তুলাতে ছিল তারাই রাজার খোঁজে এসেছে। সৈন্যদল পুয়েবেলা সেতুর কাছে এসে দাঁড়াল। এবার একটা একটা ক'রে ঘোড়া হাঁটিয়ে পার করতে হবে। ওরা বোধহয় সেইজন্যেই তৈরী হ'তে লাগল। ওরা তখনও জানে না রাজা কালহুয়াকান তাঁর সমস্ত সৈন্যসহ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। বোঝা গেল ফ্রান্সিসদের আশঙ্কাই সত্য।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। সবাই একে একে চোলুলা নগরে ফিরল। আহত রাজা হুয়েমাক এত অত্যাচার দুশ্চিন্তা পরিশ্রম সহ্য করতে পারলেন না। রাজপ্রাসাদের প্রবেশ করবার আগেই পাথরের সিঁড়ির ওপর প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি রাজাকে ধ'রে ফেললেন। প্রায় অচেতন রাজাকে সিঁড়ির ওপর শুইয়ে দিল। হ্যারিকে বলল—শিগগির রাজবৈদ্যকে ডেকে আনো। হ্যারি কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর রাজবৈদ্যকে পেল। তার হাত ধরে টেনে সঙ্গে আসার জন্যে ইঙ্গিত করল। রাজবৈদ্য এল। প্রায় অচেতন রাজার কাছে বসল। পুঁটুলি থেকে ওষুধপত্র বের করল। রাজার কাঁধের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। রাজার কাছেই ব'সে রইল। ওদিকে রাজা হুয়েমাকের প্রজারা যে যার লুঠ হয়ে যাওয়া বাড়িতে ফিরল। চীনেমাটির বাসনকোসন যা পেল জড়ো করল। শুকনো কাঠ দিয়ে উনুন ধরিয়ে রাতের রান্না শুরু করল। পুরো একটা রাত আর একটা দিন উপবাসী হ'য়েছে। সবাই ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা হুয়েমাক একটু সুস্থ হলেন। উঠে বসলেন। ফ্রান্সিসরা রাজাকে ধরাধরি ক'রে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এল। শয়নঘরে এনে রাজাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। পাহারাদার দু'জন সৈন্যকে ঐ ঘরে রেখে ফ্রান্সিসরা নিজেদের ঘরে চলে এল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস রাজার খোঁজ নিতে গেল। দেখল রাজা যাস তার পালকের বিছানায় বসে আছেন। অনেকটা সুস্থ এখন। ফ্রান্সিসকে দেখে হেসে বললেন—'তোমাদের কাছে আমি আর আমার প্রজারা চিরকালের জন্যে ঋণী রইলাম।' ফ্রান্সিস বলল—'ওসব থাক। একটা জরুরী কথা আপনাকে বলতে এসেছি।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—'আপনার প্রাসাদ থেকে রাজা কালহুয়াকান একটা কাঠের সিন্দুকমত নিয়ে যাচ্ছিল। কী ছিল ঐ সিন্দুকে?' রাজা শান্তস্বরে বললেন—'জানতাম, আমার ঐ দামী অলঙ্কার হীরে মুক্তো কালহুয়াকান লুঠ ক'রে নিয়ে যাবেই।'

—'কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস—নিয়ে যেতে পারেনি। এখন ঐ সিন্দুক নিশ্চয়ই বনের মধ্যে পড়ে রয়েছে। হয়তো সোনা রূপার অলংকার সব আগুনের তাপে গলে গেছে। তবে হীরে মুক্তো দামী পাথর এসব নিশ্চয় রয়েছে।' ফ্রান্সিস বলল।

—কী হবে ওসব অলঙ্কার মণিমুক্তো দিয়ে। রাজা বললেন।

—ও কথা বলবেন না। ফ্রান্সিস বলল—'ভবিষ্যতে আপনার প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজন পড়বে।'

—ও কি আর উদ্ধার করা যাবে?

—কেন যাবে না। আমরাই উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—'বেশ—দেখ চেষ্টা ক'রে।' রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস ঘরে ফিরে এল। রাত একটু বাড়তেই চোলুলার অধিবাসীদের আনন্দ গান নাচ হৈ হল্লা শুরু হ'ল। ওরা বোধহয় ভাবতেও পারেনি এভাবে বন্দী জীবন থেকে, অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে। ফ্রান্সিসরা দরজায় দাঁড়িয়ে মশালের আলোয় আলোকিত প্রান্তরে চোলুলার অধিবাসীদের নাচ দেখতে লাগল। গান শুনতে লাগল।

পরদিন ভোরেই খবর রটে গেল যে রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা আক্রমণ করতে আসছে। ননোয়াল্কা যোদ্ধাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কয়েকজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এসে ডাকাডাকি করতে লাগল। ফ্রান্সিসরা উঠে পড়ল। বাইরে এসে শুনল আক্রমণের কথা।

ফ্রান্সিস হ্যারি তরোয়াল নিল। শাঙ্কো নিল তীরধনুক। ওরা প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। ননোয়াল্কা যোদ্ধারাও ততক্ষণে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পোড়া বনের ছাই উড়িয়ে কিছুক্ষণ পরেই কালহুয়াকানের সৈন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ল। প্রান্তরে আসতেই শুরু হ'ল লড়াই। ওরা সংখ্যায় বেশি ছিল না। ওরা হয়তো ভেবেছিল ওদের দেশের অন্য সৈন্যদেরও এখানে পাবে। এসেই দেখল ওদের দেশের একজন সৈন্যও নেই। ওরা বেশ দমে গেল। ননোয়াল্কা সৈন্যরা মরণপণ লড়াই করতে লাগল। শাঙ্কো তীর ছুঁড়ে একটার পর একটা শত্রু সৈন্যকে ঘায়েল করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা হার স্বীকার করল। জনাদশেক বন্দী হ'ল। বেশ কিছু মারা গেল। বাকীরা ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। চোলুলার অধিবাসীরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে চীৎকার হৈ-হল্লা শুরু করল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাজা হুয়েমাক যুদ্ধজয়ের সংবাদ শুনলেন। কোয়েতজাল দেবতাকে স্মরণ ক'রে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল—চলো—রাজা হুয়েমাকের সেই সিন্দুকটা খুঁজতে হবে।

ওরা পোড়া বনের কাছে এল। ফ্রান্সিস ঠিক যেখান দিয়ে রাজা হুয়েমাক ঢুকেছিল সেই জায়গাটা লক্ষ্য করল। সেখান দিয়েই ফ্রান্সিস ঢুকল। পেছনে হ্যারি শাঙ্কো আর কয়েকজন ননোয়াল্কা যোদ্ধা।

পোড়া বনের মধ্যে কিছুটা গেল ওরা। ফ্রান্সিস প্রত্যেককে একটা ক'রে পোড়া গাছের ভাঙা ডাল নিতে বলল। তাই দিয়ে ছাইয়ের গাদা সরিয়ে সরিয়ে সবাই সেই সিন্দুকটা খুঁজতে লাগল। এক জায়গায় ছাই সরিয়ে হ্যারিই প্রথম দেখতে পেল—সিন্দুকটার পুড়ে যাওয়া কোণাটা। হ্যারি চীৎকার ক'রে ডাকল—'ফ্রান্সিস এই যে সিন্দুকটা।' সবাই ছুটে এল। দেখল সিন্দুকটা সবটা পুড়ে যায়নি। আধ-পোড়া অবস্থায় পড়ে আছে। তবে দেখা গেল ফ্রান্সিস যা বলেছিল তাই হ'য়েছে। সোনা রূপার অলঙ্কার চাকতি সব গলে সিন্দুকটার গায়েই লেপ্টে আছে। মণিমুক্তোগুলো কালচে হ'য়ে গেছে। কিন্তু হীরের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ফ্রান্সিসরা

ঐ অবস্থাতেই পোড়া সিন্দুকটায় যতগুলি মণি-মুক্তো দামী পাথর ভরল। গলিত সোনা রূপোর পাত ক'টা হাতে নিল। সব নিয়ে চোলুলায় ফিরে এল ওরা। তারপর রাজপ্রাসাদে রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। রাজাকে সব জিনিস ফ্রান্সিস দিয়ে দিল। রাজা খুশীই হলেন।

দিন সাতেক কেটে গেল। রাজা হুয়েমাক অনেকটা সুস্থ হলেন। রাজা কালহুয়াকান মারা গেছেন। তুলায় এখন রাজা কালহুয়াকানের এক মন্ত্রী শাসনকার্য চালাচ্ছেন। সেদিন তিনি রাজা হুয়েমাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চোলুলায় এলেন। রাজা হুয়েমাককে সবিনয়ে অনুরোধ করলেন স্ত্রোমো দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে। রাজা হুয়েমাক জানালেন তিনি চোলুলার প্রজাদের নিয়েই আনন্দে থাকতে চান। নতুন রাজ্যভার নিতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। মন্ত্রীই যেন শাসন করবার দায়িত্ব নেন। মন্ত্রী দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বারবার বলতে লাগলেন স্ত্রোমোর রাজা হ'তে পারে একমাত্র প্রথম কালহুয়াকানের বংশধররাই। সুতরাং রাজা হুয়েমাকই বংশধর হিসেবে রাজা হওয়ার উপযুক্ত। এবার রাজা হুয়েমাক দ্বিধায় পড়লেন। ভেবে পেলেন না কী বলবেন। তাই তিনি বললেন মন্ত্রী যেন দিন কয়েক পরে আসেন। রাজা হুয়েমাক এর মধ্যে ভেবে ইতিকর্তব্য স্থির করলেন।

সেদিন সন্ধেবেলা রাজা হুয়েমাক ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্রান্সিস রাজপ্রাসাদে এল। রাজা হুয়েমাক কালহুয়াকানের মন্ত্রীর সব কথা বললেন। ফ্রান্সিস বলল—আপনি অবশ্যই স্ত্রোমোর শাসনভার গ্রহণ করুন।

—'কী লাভ? এই তো বেশ আছি।' রাজা বললেন।

—না মহামান্য রাজা—আপনার মত প্রজাবৎসল মহান মানুষকে ওরা রাজা হিসেবে পেলে ওরা ধন্য হ'য়ে যাবে। আমরা য়ুরোপীয়রা সভ্য ব'লে গর্ব করি কিন্তু আমাদের য়ুরোপেও আপনার মত রাজা খুব কমই আছে।

—'কিন্তু চোলুলার কী হবে?' রাজা বললেন।

—চোলুলাকেও স্ত্রোমো রাজ্যের মধ্যে নিয়ে নিন। রাজধানী স্থাপন করুন তুলাতে। দু'দেশের প্রজাই তো এক। তলতেক ভাষাও। কোন অসুবিধের কারণ নেই। আপনার সুশাসনে তলতেক জাতি আরও সভ্য হোক উন্নত হোক। এটা কি আপনিও চান না? ফ্রান্সিস বলল। রাজা হুয়েমাক ফ্রান্সিসের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। মাথা নিচু ক'রে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন— 'বেশ ওদেশের মন্ত্রীকে সে কথাই বলবো।'

—মহামান্য রাজা—আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।

—বলো।

তুলার বিষাক্ত উপত্যকার নীচে প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তধনের খোঁজ আমরা পেয়েছি।

—'বলো কি।' রাজা আশ্চর্য হ'য়ে বললেন—'কতকাল ধ'রে ঐ গুপ্তধনের সন্ধান চল্‌ছে আর তুমি তার খোঁজ পেয়ে গেছো?'

—'হ্যাঁ—যাজক ব্রেগুনের একটা ছড়ার মধ্যে সাংকেতিক নির্দেশ ছিল। আমি তার সাহায্যেই এগিয়েছি। এখন মাত্র একটা সংকেত বাকি। আমি নিশ্চিত সেই

সংকেতের অর্থ বার করতে পারবো যদি আপনি আমাদের অনুমতি দেন।' ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ গুপ্তধনের ওপর আমার কোন লোভ নেই।

—তা' জানি। কিন্তু প্রথম রাজা কালহুয়াকানের বংশধর হিসেবে ঐ গুপ্তধন আপনারই প্রাপ্য।

—ঠিক আছে। দেখ যদি খুঁজে বের করতে পার। রাজা বললেন।

—আমরা ঠিক গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারবো। তবে একটা অনুরোধ— আপনি তো এখন সুস্থ। আপনি তুলাতে আসুন এটাই আমরা চাই।

—'বেশ। স্ত্রোমোর শাসনভার নিলে তুলাতে তো আমাকে যেতেই হবে।' রাজা বললেন।

রাজাকে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস চলে এল।

পরদিন রাজা কালহুয়াকানের মন্ত্রী তুলা থেকে এলেন। রাজা হুয়েমাক রাজ্যের শাসনভার গ্রহণে সম্মতি জানালেন। বললেন পরদিন সকালে তিনি তুলায় যাবেন। তাঁর সঙ্গে যাবে শুধু ছ'জন ননোয়াল্কা যোদ্ধা আর তিনজন বিদেশী বন্ধু। কোন রকম জাঁকজমক যেন করা না হয়। তিনি প্রথমে তুলার কোয়েতজাল মন্দিরে যাবেন। পূজা দেবেন। তুলার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। তারপর সিংহাসনে বসবেন।

পরদিন সকালে রাজা হুয়েমাক রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। একটা সুসজ্জিত ঘোড়াতে উঠলেন। দু'পাশে তিনজন ক'রে ননোয়াল্কা অশ্বারোহী যোদ্ধা রইল। পেছনে তিনটে ঘোড়ায় ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো।

রাজা হুয়েমাককে সামনে রেখে যাত্রা শুরু হ'ল। রাজা খুবই সাধারণ পোশাক পরেছেন। দেহে কোন অলংকার নেই। শুধু মাথায় গোঁজা পাখির পালকগুলো যা জমকালো। প্রান্তর পোড়া বন পেরিয়ে রাজাকে নিয়ে সবাই এল পুয়েবেলো নদীর সেতুর কাছে। সবাই ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াগুলো হাঁটিয়ে পার করানো হ'ল। তারপরই স্ত্রোমো রাজ্য। মন্ত্রী ও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানালেন। তারপর রাজার পেছনে পেছনে চললেন তুলার দিকে।

তুলায় প্রবেশের মুখে দাঁড়িয়েছিল নানারঙের পোশাক পরা কয়েকটি মেয়ে। তারা রাজাকে সম্মান জানিয়ে অনেক ফুল ছড়িয়ে দিল। একদল পুরুষ কাছিমের খোলের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নেচে নেচে চলল।

কোয়েতজাল মন্দিরের সামনে এসে সবাই ঘোড়া থেকে নামল। পুরোহিত মন্দিরের সিঁড়ির ওপরই দাঁড়িয়েছিল। সে ফুল ফল ছড়িয়ে জোরে জোরে কী আওড়াতে লাগল। রাজা মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। পুরোহিত থামল। রাজা মন্দিরে ঢুকলেন। বুনো ফল, ফুল পাতা দিয়ে কোয়েতজালের পুজো করলেন। তারপরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন মন্দিরের সিঁড়ির মাথায়। ততক্ষণে সামনের প্রান্তরে তুলার অধিবাসীদের ভীড় জমে গেছে। অধিবাসীরা অনেকেই মুখে থাব্ড়া দিয়ে শব্দ ক'রে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

রাজা হুয়েমাক দু'হাত ওপরে তুললেন। সব কোলাহল বন্ধ হ'য়ে গেল। রাজা হুয়েমাক হাত নামিয়ে বলতে লাগলেন—'আমার প্রিয় সন্তানতুল্য প্রজাগণ—এই দেশের শাসনভার আমি এইজন্যে নিলাম যাতে আরো মানুষের মঙ্গল আমি করতে পারি। দু'টো নির্দেশ আমার—কয়েদঘর ব'লে এখানে কিছু থাকবে না। যেটা আছে সেটা হবে মেয়েদের তাঁতঘর। দুই—কোয়েতজালের মন্দিরে নরবলি প্রথা আমি বন্ধ ক'রে দিলাম। কোয়েতজাল শুধু মৃত্যুর দেবতা নয় জীবনেরও দেবতা। মূল্যবান সম্পদ, খ্যাতি যশ, রাজ্যজয়, সম্মান, প্রতিপত্তি এসব নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র ভাবি না। আমার চিন্তা একটাই—প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান, আর দেশের উন্নতি।' রাজার কথা শেষে তুলার অধিবাসীরা আনন্দধ্বনি দিল।

তারপর রাজা হুয়েমাক ফ্রান্সিসদের ও মন্ত্রী গণ্যমান্যদের নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

রাজা হুয়েমাক সিংহাসনে বসলেন। দু'পাশে মোটা নক্সাকরা কাপড়বিছানো কাঠের আসনে বসলেন আগের মন্ত্রী আর তুলার গণ্যমান্যরা।

রাজা হুয়েমাক সিংহাসনে বসলেন।

ফ্রান্সিসরা রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস রীতিমাফিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল—'মহামান্য রাজা—আমাদের জাহাজে ফেরার সময় হ'য়েছে। এমনিতেই অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। এখন আমরা প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তভাণ্ডার খুঁজতে যাচ্ছি। আপনি অনুমতি দিন।
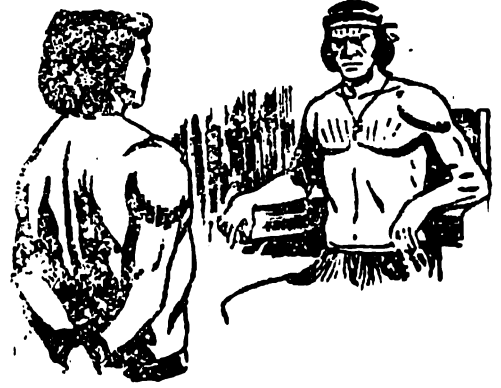
—বেশ যাও। প্রয়োজন হ'লে আমার যোদ্ধাদের নিয়ে যেতে পারো।

—তার দরকার হবে না।

ফ্রান্সিসরা রাজসভা থেকে চলে এল। প্রাসাদের বাইরে এসে চলল কোয়েতজালের মন্দিরের দিকে। মন্দিরে ঢুকে মূর্তির পেছনে এল ওরা। দেখল আগের মতই পাথর সরানো আছে। কেউ সুড়ঙ্গপথের মুখ বন্ধ করেনি। ফ্রান্সিস বলল—'শাঙ্কো, মশাল নাও।' শাঙ্কো মন্দির থেকে দু'টো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এলো।

মশালের আলোয় সিঁড়ির পথ দেখে দেখে ওরা আস্তে আস্তে নামল। নীচে সিঁড়ির কাছে তিনটি কুড়ুল পাওয়া গেল। রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা সেদিন পালাবার সময় ফেলে গেছে। ফ্রান্সিস দু'টো কুড়ুল হাতে নিল। আর একটা দিল হ্যারিকে।

ধুলোভরা পাথুরে মেঝে দিয়ে ওরা আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। দেখল প্রথম খোঁদলটা থেকে বিষাক্ত জল ফোঁটা ফোঁটা পাথরের সিঁড়িটির ওপর পড়ছে। বারিনথাসের মৃতদেহ নেই। হয়তো বিষাক্ত জলে গলে গেছে। হয়তো সরিয়ে ফেলা হ'য়েছে। বিষাক্ত জল যা সিঁড়ি গড়িয়ে আসছে তাই নীচের ধুলোয় শুষে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দ্বিতীয় খোঁদলটার কাছে এল। মাথা উঁচু ক'রে ফ্রান্সিস দেখল সেই একই রকম খোঁদল। পাথরের সিঁড়ি খোঁদল পর্যন্ত উঠে গেছে। হেঁটে হেঁটে তৃতীয় খোঁদলের কাছে এল। সেই একই রকম খোঁদলটা পর্যন্ত পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—এবার ফিরবো। শেষ সমাধান এখনও বের করতে পারিনি। কিন্তু সেই সমাধান এখানেই পাবো। তোমরা পাথরের ছাত দেয়াল মেঝের দিকে ভালো ক'রে নজর রাখো। মূর্তির ভাঙা বাঁ হাতটা এখনো পাইনি। আস্তে আস্তে ফিরে চলো। ভাঙা বাঁ হাতটা পেতেই হবে।

ওরা ধুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরতে লাগল। তীক্ষ্ণ নজর রাখলো চারদিকে। ফ্রান্সিস মুখে মুখে ছড়ার শেষটুকু আওড়াতে লাগল—এক হাত ধুলিময়। মাঝখানের সিঁড়ির কাছে এসে ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—'হ্যারি—দেখ তো ওটা কী?' মশালের আলোয় দেখা গেল ধুলোর মধ্যে থেকে কী যেন একটু উঁচু হ'য়ে আছে। ফ্রান্সিস ধুলো ঠেলে তাড়াতাড়ি ওখানে এল। দেখল একটা হাত ধুলোয় পোঁতা। হাতের তর্জনীটা ওপরের দিকে উঁচিয়ে আছে যেন কিছু নির্দেশ করছে। ফ্রান্সিস তর্জনীর নির্দেশ লক্ষ্য করল। দেখল তর্জনীটা নির্দেশ করছে ওপরে সেই দ্বিতীয় গোল খোঁদলটা। ফ্রান্সিস ঐ দিকে তরোয়াল উঁচিয়ে চীৎকার ক'রে বলল— 'হ্যারি ঐ যে গুপ্তধন।'

—কী ক'রে বুঝলে?

—এই হাতটাই কোয়েতজাল দেবতার ভাঙা বাঁ হাত যেটা আমরা খুঁজছিলাম। একবার ছড়াটা মনে করো—

এক হাত ধুলিময়
মুখ নয় কথা কয়
আঙুল তুলে হে—

ঐ দেখ হাতের তর্জনীটা ঐ গোলমত খোঁদলটার দিকেই ইঙ্গিত করছে কিনা ফ্রান্সিস বলল।

তারপর ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমরে গুঁজে হাতের কুড়ুলটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল। হ্যারি হাত বাড়িয়ে ওকে আটকাল। বলল—যদি কুড়ুল চালালে গোল জায়গাটা ভেঙে গিয়ে বিষাক্ত উপত্যকার জল নেমে আসে।

—অসম্ভব। আমি নিশ্চিত ওখানেই রয়েছে গুপ্তধন।

—'বেশ—সবাই একসঙ্গে উঠবো। একসঙ্গে কুড়ুল চালাবো। মরতে হয় তিনজন একসঙ্গে মরবো।' হ্যারি বলল।

'—আমরা মরবো না হ্যারি।' ফ্রান্সিস বলল।

—না। বারিনথাসের ভয়াবহ মৃত্যু আমরা দেখেছি। তোমরাও যদি—না ফ্রান্সিস—যা করবার একসঙ্গে করবো।' হ্যারি বলল।

সিঁড়িটা প্রশস্ত নয়। তিনজন কোনরকমে গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে উঠতে লাগল। গোলমত খোঁদলটার কাছে উঠে এল। শাঙ্কো হাতের মশাল পাথরের খাঁজে আটকাল। তারপর তিনজন একসঙ্গে ঐ জায়গায় কুড়ুলের ঘা দিল। পাথর কুচি ঝরে পড়ল ওদের মাথায় গায়ে। আবার কুড়ুল চালাল। আবার পাথর কুচি ঝরে পড়ল। তারপর

হ্যারি ও শাঙ্কো কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে হঠাৎ সজোরে ও জায়গাটায় কুড়ুলের ঘা মারল। ওর কুড়ুলের ফলাটা কীসের মধ্যে ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস ব'লে উঠল—'হ্যারি যেটাকে পাথর বলা হয়েছে সেটা আসলে পাথর নয়। খুব সম্ভব কাঠ আর সেটা রাখা হ'য়েছে ঠিক বিষাক্ত উপত্যকার মাঝখানে।

আবার তিনজনে কুড়ুল চালাল। কুড়ুলের ফলা বসে যেতে লাগল। ভেঙে পড়ল কাঠের টুকরো। ফুটো হ'য়ে গেল আর সেখান থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল হীরে মোতি চুনী পান্না—দামী দামী সব পাথরের টুকরো। ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বলল—'হ্যারি প্রথম কালহুয়াকান রাজার গুপ্তধন। এবার তিনজনেই উৎসাহের সঙ্গে কুড়ুল চালাতে লাগল। কাঠ কেটে ফাঁকটা বড় হ'ল। ঝর ঝর ক'রে হীরের টুকরো, পান্না চুনী সোনার চাকতি পড়তে লাগল। সিঁড়িতে জমা হ'তে লাগল সেসব। হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল কোয়েতজাল দেবতার দু'ফুটের মত উঁচু একটা সোনার মূর্তি। মূর্তির দু'চোখ দামী পাথরের। সারা গায়ে হীরে মণিমাণিক্য বসানো। মন্দিরে যে মূর্তি আছে অবিকল তেমনি দেখতে এই মূর্তি। ফ্রান্সিস মূর্তিটায় হাত দিল না। ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপার। রাজা হুয়েমাক হয়তো বিধর্মী মূর্তি স্পর্শ করেছে ব'লে মনঃক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন।

ফ্রান্সিস বলল—'আর কাটার দরকার নেই। শাঙ্কো—রাজা হুয়েমাককে গিয়ে সব বলো। উনি যেন জনাকয়েক ননোয়াল্কা যোদ্ধা নিয়ে এখানে আসেন।' শাঙ্কো চ'লে গেল। ফ্রান্সিস মণিমাণিক্য ছড়ানো সিঁড়ির ওপর ব'সে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা হুয়েমাক এলেন। সঙ্গে কয়েকজন ননোয়াল্কা যোদ্ধা। ফ্রান্সিস সিঁড়ি থেকে নেমে এল। রাজা হুয়েমাক অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলেন সিঁড়িতে ছড়ানো মণিমাণিক্য। ফ্রান্সিস বলল—মহামান্য রাজা—আমরা বিধর্মী তাই কোয়েতজাল দেবতার ভাঙা বাঁ হাত, এই মূর্তি ছুঁইনি। এবার আপনি যা করার করুন।

রাজা হুয়েমাক ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে গেল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—'সাবাস ফ্রান্সিস।'

রাজা যোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন ওপরের কাঠের আস্তরণ সব ভেঙে ফেলতে। একজনকে বললেন কাপড়ের বস্তা আনতে। যোদ্ধারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। কাঠের আস্তরণ কুড়ুল চালিয়ে ভাঙতে লাগল। আরো মণিমাণিক্য হীরে চুনী পান্না পড়তে লাগল। যোদ্ধাটি কাপড়ের বস্তা নিয়ে ফিরে এল। কাপড়ের বস্তায় সব ভরা হ'তে লাগল।

ফ্রান্সিস বলল—'মহামান্য রাজা—আমাদের কাজ শেষ। এবার আমরা গেরুয়া পাহাড়ে যাবো। সেখান থেকে জাহাজে। আপনি এক জন পথপ্রদর্শক আমাদের সঙ্গে দিন।'

—'নিশ্চয়ই।' রাজা আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছে গেলেন। কোয়েতজালের ছোট মূর্তিটা তুলে নিলেন। তারপর মূর্তিটা ভালো ক'রে দেখলেন। ফ্রান্সিসের দিকে বাড়িয়ে ধ'রে বললেন—ফ্রান্সিস এই দেবমূর্তি তোমাদেরই প্রাপ্য। নাও।

ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারলো না কী করবে। ও হ্যারি আর শাঙ্কোর দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—'নাও ফ্রান্সিস। এ তো সম্মানের।' ফ্রান্সিস মূর্তি নিয়ে হাত দিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল। রাজা হেসে বললেন—'তলতেক জাতির উপাস্য দেবতার মূর্তি। এ মূর্তিকে কখনো অপবিত্র ক'রো না। দেশে ফিরে কোন পবিত্রস্থানে এই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রো।'

—নিশ্চয়ই করবো।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—'মহামান্য রাজা—আমাদের কাজ শেষ। আমরা যাচ্ছি।'

ওরা মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে ধুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে সুড়ঙ্গের সিঁড়ির কাছে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরে এল। দেখল পুরোহিত কোয়েতজাল দেবতার ভাঙা বাঁ হাতটা জোড়া দিচ্ছে।

ফ্রান্সিসের মনে কী হ'ল। ও দেবমূর্তির সামনে এসে মাথা নুইয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা জানাল। তারপর তিনজনে মন্দিরের বাইরে এল।

সামনের প্রান্তরে ওদের ঘোড়া বাঁধা ছিল। ওরা সেদিকে চলল। একজন ননোয়াল্কা যোদ্ধা মন্দির থেকে ছুটে এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। হেসে ফ্রান্সিসের হাতে একটা ছোট কাপড়ের ঝোলামত দিল। ফ্রান্সিস ঝোলার মুখ খুলে দেখল—কিছু মণিমাণিক্য। ফ্রান্সিস ঐ ঝোলাতেই মূর্তিটা রাখল। যোদ্ধাটি বলল—সেই পথপ্রদর্শক। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

চারজনে ঘোড়ায় উঠল। ফ্রান্সিস ঝোলাটা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে রাখল।

সামনে পথপ্রদর্শক। পেছনে ওরা তিনজন। লাল ধুলো উড়িয়ে ওদের ঘোড়া ছুটল। বিষাক্ত উপত্যকার পাশ দিয়ে যাবার সময় ফ্রান্সিস ঐ দিকে তাকাল। দেখল সেই ধোঁয়াটে ভাব, বেগুনী রঙের ফুল আর মনসা গাছটা। ফ্রান্সিস বলল—জানো হ্যারি ঐ মনসা গাছটাও কাঠের। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ওটা করা হয়েছে।'

সামনেই বিস্তৃত প্রান্তর। ঘোড়া ছুটল পূর্বদিক লক্ষ্য ক'রে। গেরুয়া পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।

সমাপ্ত

এই পর্বের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি

সোনার ঘণ্টা ★ হীরের পাহাড় ★ মুক্তোর সমুদ্র ★ তুষারে গুপ্তধন ★ রূপোর নদী ★ মণিমাণিক্যের জাহাজ।

এই পর্বের পরবর্তী অধ্যায়গুলি

চিকামার দেবরথী ★ চুনীপান্নার রাজমুকুট ★ কাউন্ট রজারের গুপ্তধন ★ যোদ্ধামূর্তির রহস্য ★ রাণীর রত্নভাণ্ডার।

মণিমানিক্যের জাহাজ

পথে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো সারাদিন ঘোড়া ছোটাল। পথপ্রদর্শকটি পাঁচ দিনেই ওদের গেরুয়া পাহাড়ে পৌঁছে দিল। তারপর চলে গেল নিজের দেশে।

গেরুয়া পাহাড়ে ওরা যখন পৌঁছল তখন বিকেল। একটু দূরেই সমুদ্রে জাহাজ ভাসছে। শাঙ্কো একটা ছোট পাথররের ওপর উঠে চিৎকার করে ডেকে বলল—'ভাইসব, আমরা এসেছি।' জাহাজের ডেক-এ দু'তিনজন ভাইকিং দাঁড়িয়েছিল। তারা শাঙ্কোর ডাক শুনল। ফ্রান্সিসদের দেখতে পেল। ওরা চীৎকার চ্যাঁচামেচি করে বাকি বন্ধুদের ডাকাডাকি শুরু করল। ফ্রান্সিসের শরীরের দুর্বলতা তখনও কাটেনি। তার ওপর এত দূর পথ ঘোড়া ছুটিয়ে আসা। ও একটা পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল। হ্যারিও বসল ওর পাশে। একটু পরেই কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এল। দুর্বল ফ্রান্সিসকে দু'তিনজন ধরে নিয়ে চলল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো। জলে নামতে হলো সবাইকে। কারণ জাহাজে ফেলা কাঠের পাটাতন মাটিপাথর পর্যন্ত আসেনি। ফ্রান্সিসকে কাঁধে করে নিয়ে চলল। পাটাতন দিয়ে হেঁটে চলল।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠতেই ওরা কী এনেছে দেখবার জন্যে বন্ধুরা সবাই ওদের ঘিরে ধরল। শাঙ্কো থলে থেকে বের করে কোয়েতজাল দেবতার অতি সুন্দর মূর্তিটা দেখাল। সবাই অবাক। বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মূর্তিটা। তারপরই চিৎকার করে উঠল—'ও—হো—হো।' সবাই জানতে চায় সমস্ত ঘটনা। ফ্রান্সিস বলল—'আমরা ভীষণ পরিশ্রান্ত। পরে তোমাদের সব বলবো। এবার কিছু খাবার ব্যবস্থা করো। প্রায় উপোস করে আছি।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কেবিনঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ওখানেই ওদের খেতে দেওয়া হলো। শাঙ্কো কিন্তু তখনও বেশ সতেজ। ওকে ঘিরে ধরল সবাই। শাঙ্কো বিপুল উৎসাহে ওদের বিষাক্ত উপত্যকার গল্প শোনাতে লাগল।

পরদিন সকালেই জাহাজের নোঙর তোলা হলো। পাল খাটানো হলো। জোর হাওয়া বইছে তখন। পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চলল ভাইকিংদের দেশের দিকে।

মাসখানেক পরে জাহাজ ভাইকিংদের রাজধানীর জাহাজঘাটায় ভিড়ল।

তখন সকাল। জাহাজঘাটায় লোকজন কম। কেউ ফ্র্যান্সিসদের জাহাজ লক্ষ্যই করল না। কত জাহাজ তো আসে। রাজাকে সংবাদ দিতে একজন ভাইকিংকে পাঠানো হলো। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি চড়ে রাজা, রানী, মারিয়া, মন্ত্রী ও অমাত্যরা এলেন। এইবার জাহাজঘাটায় লোকজন জমতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জনারণ্যের সৃষ্টি হলো। ওদিকে জাহাজে রাজা, রানী, মারিয়া, মন্ত্রী ও অমাত্যরা রূপোর থাম, কোয়েতজাল দেবতার মূর্তি দেখে সবাই বিস্মৃত হলেন। রাজা ঐ

জাহাজের ডেকেই বললেন—'ফ্রান্সিসরা জাহাজ চুরি করেছিল। ওদের সে অপরাধ আমি মার্জনা করলাম।' ফ্রান্সিসের বাবা মন্ত্রীমশাই শুধু মুখে মৃদু শব্দ করলেন—'হুম্।'

রূপোর থাম দুটো রাখা হলো রাজার জাদুঘরে। ফ্রান্সিসের অনুরোধে রাজবাড়ির সামনের চত্বরের কোণায় তৈরি হলো শ্বেতপাথরের একটা ছোট মন্দিরমতো। তাতে স্থাপিত হলো কোয়েতজাল দেবতার মূর্তি। ফ্রান্সিস আর মারিয়া মাঝে মাঝেই আসে মূর্তি দর্শন করতে। ভক্তি জানাতে।

দিন কাটে। খাওয়া ঘুম। তবে এর মধ্যেই যখন বন্ধুরা আসে তখন ফ্রান্সিসের ভালো লাগে। গল্পগুজবে আড্ডা জমে ওঠে। যে সব অভিযানে ওরা গিয়েছিল সেই সব অভিযানের গল্প হয়। উৎসাহে উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে ওরা। হ্যারি এমনিতেই কম কথা বলে। কিন্তু বিস্কো শাঙ্কোদের উৎসাহ প্রবল। অধৈর্য হয়ে ওঠে ওরা। বলে—'চলো ফ্রান্সিস আবার বেরিয়ে পড়ি।' ফ্রান্সিস হাসে। বলে—উদ্দেশ্যহীন বেড়িয়ে বেড়ানো আর এই ঘরে বসে থাকা—একই। একটা লক্ষ্য তো চাই।' ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকায়। বলে—'কী হলো হ্যারি?' হ্যারি একটু মাথা নেড়ে বলে—'দেখা যাক চেষ্টা করে—অভিযানে বেরোবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।' বন্ধুদের এই আড্ডায় মারিয়াও আসে মাঝে মাঝে। কিন্তু নতুন অভিযানের ব্যাপারে কোনো কথা বলে না।

এভাবেই দিন কাটছিল। ফ্রান্সিস কোনোদিনই দুপুরে ঘুমোতো না। এখন ঘুমোয়। আশ্চর্য! সেটাই অভ্যেস হয়ে গেল। অবশ্য বেশিক্ষণ নয়। আধ ঘণ্টা মতো ঘুমিয়ে উঠতে লাগল। কিছুদিন হলে মারিয়াও এসময় বাড়ি থাকে না। কোথায় যায় কে জানে!

মারিয়া থাকলে তবু গল্প করে সময় কাটতো।

সেদিন বিকেলের দিকে মারিয়া বাড়ি ফিরতে ফ্রান্সিস বলল—'তুমি দুপুরে কোথায় যাও বলো তো?'

—'রাজবাড়িতে।' মারিয়া বলল।

—'কেন'?

—'রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে পড়তে যাই।' মারিয়া বলল।

—'তা বইগুলো নিয়ে এসে পড়লেই পারো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'নিয়ম নেই। মারিয়া বলল।

'তোমাদের বাড়িতে গ্রন্থাগার। তোমাকেও নিয়ম মানতে হবে?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয় মানাতে হবে। তাছাড়া ভেড়ার চামড়ায়, পার্চমেন্ট কাগজে লেখা, আঁকা বই। টানা হ্যাঁচড়া করলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

—'হুঁ'। তা এখন কী বই পড়ছো?'

ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'আইসল্যান্ডের এক একটা বই। প্রায় একশ বছর আগের লেখা। জানো তো আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা গীতিকাব্য গল্পকাহিনী ভীষণ ভালোবাসে। আসলে আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা তো বেশির ভাগই ভাইকিং—আমাদের দেশের মানুষ। কিছু আছে আয়ারল্যান্ডের আর অন্য দেশের লোক। ওখানকারই একজন কবি নাম থরগিলমন আরি। সংক্ষেপে কবি আরি নামে পরিচিত। তাঁর বই 'আইসল্যান্ডিগা

বক' বা আইসল্যান্ডবাসীদের বই। সেটাই পেয়েছি।'

—'বইটা পড়া হয়ে গেছে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভাইকিংরা দলে দলে আইসল্যান্ডে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। সমুদ্রের খাঁড়িতে, নদীতে প্রচুর মাছ। বহুবিস্তৃত তৃণভূমি। কবি আরি বলেছেন, সেই তৃণের প্রতিটি পাতা থেকে যেন মাখন ঝরে পড়ছে। তাহলেই বুঝতে পারছো কী উর্বর সেইসব দিগন্তবিস্তৃত তৃনভূমি। ভাইকিংরা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল ঘোড়া, গরু, ভেড়া যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, ধর্মীয় মূর্তি আর আগুন।'

—'হ্যাঁ, অনেকদিন আগে থেকেই অনেক ভাইকিং আইসল্যান্ডে বসতি স্থাপন করেছে। তোমাদের আত্মীয়স্বজনও তাঁদের মধ্যে আছেন।;

—'ঠিক বলেছো। তাঁরাই এক একজন এক একটি অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে রাজা হয়েছেন।' একটু থেমে মারিয়া বলল—'ওসব ইতিহাস থাক। শুধু একজনের কথা বলি। তার নাম ফ্রোকি। তিনি রেভক্জাভিক-এ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। রাজা হলেও তিনি জীবন শুরু করেছিলেন জলদস্যু হিসেবে। রাজা হয়েও জলদস্যুতা ছাড়েননি। দীর্ঘকাল আইসল্যান্ডের দক্ষিণ সমুদ্রে বিদেশী জাহাজ দখল করেছেন। নির্বিচারে লুঠ করেছেন। এই জলদস্যুতা করে তিনি প্রচুর সোনা মণিমাণিক্য পেয়েছিলেন। কবি আরি বলেছেন—রাজা ফ্রোকি সেই সোনা দিয়ে একটা ছোট্ট জাহাজ তৈরী করিয়েছিলেন। সেই ছোট্ট জাহাজটি বোঝাই করেছিলেন মণিমাণিক্য দিয়ে। তারপর মণিমাণিক্যসুদ্ধ সেই সোনার জাহাজ যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তা কেউ জানে না।'

ফ্রান্সিস এতক্ষণ বিছানায় আধাশোয়া হয়ে মারিয়ার মুখে গল্প শুনছিল। মণিমাণিক্যসুদ্ধ সোনার জাহাজের রহস্যের কথা শুনে ও লাফিয়ে উঠে বসল। বলল—'দাঁড়াও—দাঁড়াও। সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলো তো।'—'আমি আর নতুন কী বলবো? কবি আরি যা তাঁর বইতে লিখে গেছেন তাই বলছি।' মারিয়া বলল।

—'বেশ, বলে যাও।'

—'এই সোনার জাহাজ রাজা ফ্রোকি কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন তা কবি আরি সঠিক বলতে পারেননি। তবে অনুমান করেছেন সে সময় নরওয়ে থেকে অনেক ভাইকিং সমুদ্র পেরিয়ে রেভকজাভিক-এ বসবাস শুরু করেছিল। পাছে সেই সোনার জাহাজের কথা ছড়িয়ে পড়ে, পাছে চুরি হয়ে যায় তাই রাজা ফ্রোকি সেই জাহাজটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন।'

—'এই সোনার জাহাজের কথা তখন কি আর কেউ জানতো না।

—'কবি আরি এই সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে যে স্বর্ণকার সেই জাহাজের নক্সা তৈরি করেছিল, তৈরি কবি আরি ঘটনাচক্রে তার খোঁজ পেয়েছিলেন। সেই স্বর্ণকারের নাম থরবার্গ। থরবার্গ তখন মৃত্যুশয্যায়।'

—'আচ্ছা রাজা ফ্রোকি কি তখন বেঁচে ছিলেন?' ফ্রান্সিস বলল।

—'না। ফারো দ্বীপপুঞ্জের কাছে এক জলযুদ্ধে রাজা ফ্রোকি হঠাৎ মারা যান।' মারিয়া বলল।

—'তাহলে থরবার্গ তো সেই নিখোঁজ সোনার জাহাজ উদ্ধার করতে পারতো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'হয়তো পারতো। কিন্তু তার উপায় ছিল না। কারণ তখন থরবার্গ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। কাউকে সব গুছিয়ে বলে যাবার মত অবস্থা তার ছিল না। তাছাড়া সংসারে থরবার্গের কেউ ছিলও না।'

—'হুঁ। তারপর?' ফ্রান্সিস বলল।

—'মুমূর্ষু থরবার্গ কবি আরিকে দিয়েছিল একটু মসৃণ ভেড়ার চামড়া। তার এক পিঠে একটা জাহাজের মুখ নানারঙে আঁকা। অন্য পিঠে একটা ত্রিভুজের মতো আঁকা।'

—'দাঁড়াও দাঁড়াও—' ফ্রান্সিস বলে উঠল—'তুমি দেখেছো সেই ছবি আঁকা চামড়াটা?'

—'হ্যাঁ। কবি আরির ঐ পুরনো বইয়ের মধ্যে আছে।'

—'বইটা তো রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে।' ফ্রান্সিস বললো।

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা—থরবার্ক ঐ ক্ষুদে জাহাজটার মাপ বলেছিল?'

—'না। তবে ছবিটায় মাপ লেখা আছে পাঁচ ফুট।'

ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে বিছানা থেকে নেমে এল। বলল—'তৈরি হয়ে নাও। আমরা এক্ষুণি রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে যাবো।'

—'কী বলছো? সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গ্রন্থাগার কখন বন্ধ হয়ে গেছে।' মারিয়া বলল।

—'তুমি চলো। গ্রন্থাগারিককে অনুরোধ করবো। কিছুক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারের মধ্যে যেন যেতে দেন।'

মারিয়া হেসে বলল—'তোমার মাথায় মাঝে মাঝে এমন ভূত চাপে না যে কী বলবো।' মারিয়া এবার উঠতে উঠতে বলল—'তোমার অনুরোধ গ্রন্থাগারিক ফেলতে পারবেন না। কিন্তু তুমি তো সবটা শুনলে না।'

—'যেতে যেতে শুনবো। জলদি তৈরি হয়ে নাও।' ফ্রান্সিস বলল।

ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে দুজনে রাজবাড়ি চলল। ফ্রান্সিস বলল—'এবার বলো।'

মারিয়া বলতে লাগল—'কবি আরি লিখেছেন—মুমূর্ষু থরবার্গ কী যেন বলতে চেয়েছিল। কবি আরি থরবার্গের মুখের কাছে অনেকক্ষন কান পেতে দুটো কথা খুব অস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিলেন।'

—'সেই কথা দুটো কী?' সাগ্রহে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'সপ্তম স্তম্ভ।' মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস কথা দুটো কয়েকবার আওড়াল—'সপ্তম স্তম্ভ।' তারপর বলল—আচ্ছা আইসল্যান্ডে স্তম্ভ কোথায় আছে?

—'রেভক্‌জাভিকেই আছে। জানো—রেভক্‌জাভিকের চারপাশে সুন্দর পাহাড়। উত্তরের পাহাড়ের নিচে একটা বিস্তৃত সমতলভূমি। সেখানে কয়েকটা স্তম্ভ পোঁতা আছে। রাজা ফ্রোকি সেই স্তম্ভ পুঁতিয়েছিলেন। সেখানে প্রত্যেক মাসের পনেরো তারিখে নাচগানের আসর বসে। এই জায়গাটার নাম লোগবার্গ। কত মানুষ আসে।

মেলা বসে যায় যেন। অনেক রাত পর্যন্ত নাচগান চলে।' মারিয়া বলল।

—'আচ্ছা—ঐ জায়গায় স্তম্ভ কেন পোঁতা হয়েছিল?'

—'কবি আরি বলেছেন—হয়তো রাজা ফ্রোকির ইচ্ছে ছিল ওখানে একটা উপাসনা মন্দির তৈরি করার।'

—'কটা স্তম্ভ পোঁতা আছে ওখানে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'আমি তো যাইনি। ঠিক জানি না?' মারিয়া বলল।

রাস্তায় লোকজন। গাড়ি চলেছে। পথের ধারে দোকানপাট, বাড়িতে আলো জ্বলছে। ফ্রান্সিস বলল—'গ্রন্থাগারের চাবি কার কাছে থাকে?'

—'গ্রন্থাগারিকের কাছে।'

—'কোথায় থাকেন উনি?'

—'রাজবাড়ির পূবকোণায়।'

ফ্রান্সিস গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোচোয়ানকে সেখানে যেতে বলল।

খবর পেয়ে গ্রন্থাগারিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। মাথা নুইয়ে ফ্রান্সিসকে মারিয়াকে সম্মান জানালেন। বারবার বলতে লাগলেন—'আমি—মানে আপনারা—বুঝতে পারছি না—'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। গ্রন্থাগারের চাবিটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন। গ্রন্থাগারে আমরা একটু পড়াশুনা করবো।'

—'নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই।' গ্রন্থাগারিক প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ছুটলেন চাবি আনতে।

গ্রন্থাগারের পাহারাদার দরজার কাছেই পাহারা দিচ্ছিল। ফ্রান্সিসদের দেখে অবাক। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল। গ্রন্থাগারিক ওকে আলো নিয়ে আসতে বললেন। পাহারাদার একটা মোটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে এল। বিরাট দরজার বড় তালাটা গ্রন্থাগারিক খুললেন। ঘরঘর শব্দে দরজাটা খুলল। সকলে ভেতরে ঢুকল। গ্রন্থাগারিক বললেন—'কি বই পড়বেন আপনারা?'

—'আইসল্যান্ডের কবি আরির বই।' ফ্রান্সিস বলল।

—'কবি আরি ছাড়াও আইসল্যান্ডের লেখক পলিরিয়াস, স্ন্যাবো,—

বাধা দিয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল—'না না—শুধু আরির বই পড়বো। মারিয়া জানে বইটা কোথায় আছে। আলোটা রেখে আপনারা কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যান।'

—'নিশ্চয়-নিশ্চয়—।' গ্রন্থাগারিক বললেন। তারপর পাহারাদারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মারিয়া মোমবাতিটা হাতে নিয়ে এগোল। চারপাশে কাঠের পাটাতনে নানা আকাবের হাতে লেখা বই রয়েছে। মারিয়া একটা বড় আকারের চৌকোণা বইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। মোমবাতিটা রাখল। দেখা গেল বইটা সিন্ধুঘোটকের মোটা চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা। মারিয়া মোটা মলাট ওল্টাল। বইয়ের নাম লেখা—''আইসল্যান্ডিগা বক''। মোটা পার্চমেন্ট কাগজের বেশ কিছু পাতা উল্টে সেই ভেড়ার সাদা চামড়ায় আঁকা রঙ করা ছবিটা বের করল। ফ্রান্সিস খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। এটা একটা জাহাজের মুখ। নানা রঙে আঁকা। ছবিটা

দেখতে এরকম—নিচে লেখা 'দীর্ঘ সর্প'। পাঁচ ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া। ফ্রান্সিস
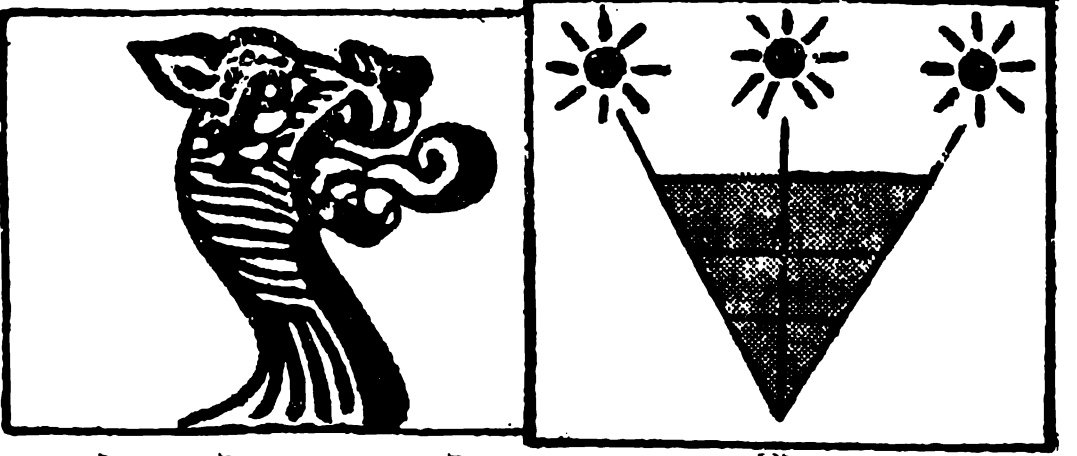
বুঝল ঐ জাহাজটার ক্ষুদে মাপ এটা। জাহাজের মুখের ছবিটার পেছনের পাতায় আঁকা একটা ত্রিভুজের মতো।

ফ্রান্সিস খুব মনোযোগ দিয়ে ছবির ত্রিভুজটা দেখল। জাহাজের ব্যাপারটা বুঝল। জাহাজটার নাম 'দীর্ঘ সর্প।' জাহাজের পুরো ছবি নেই। আছে শুধু সামনের মুখটা। কিন্তু অন্য পিঠের ত্রিভুজটার কোনো অর্থই বুঝতে পারল না। এই ত্রিভুজটা আঁকার মানে কি? ফ্রান্সিস ছবি দুটো বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। মারিয়া ঐ ছবি দুটো আগেই দেখেছিল। এবার বলল—'চলো—দেরি হয়ে যাচ্ছে; গ্রন্থাগারিক মশাই অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

ফ্রান্সিস ছবিটা থেকে মুখ তুলল। কোনো কথা না বলে মারিয়ার মাথার চুলে হাত দিয়ে কি দেখতে লাগল। মারিয়া অবাক।

—'কী ব্যাপার?' মারিয়া বলল।

—'তোমার মাথার চুলে গাঁথা এই কাঁটাটা খুলে দাও তো।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর চ্যাপ্টামতো সোনার কাঁটাটা দেখাল। মারিয়া আর কিছু বলল না। কাঁটাটা চুল থেকে খুলে দিল। ফ্রান্সিস দিয়ে বইয়ের পাতলা চামড়াটা কাটতে লাগল। চ্যাপ্টা মতো কাঁটাটা মারিয়া ওর কান্ড দেখে চাপা স্বরে বলে উঠল—'এই —কী করছো?'

—'চুরি। বইয়ের এই ছবির পাতাটা আমার চাই।' ফ্রান্সিস বলল। ততক্ষণে পাতাটা কাটা হয়ে গেছ। ফ্রান্সিস বলল—'এটা তোমার পোশাকের আড়ালে নিয়ে চলো।'

—'কী কান্ড—তুমি—।' মারিয়া কথাটা আরা শেষ করতে পারল না।

ফ্রান্সিস বলল—'চুপ। চলো।'

ওরা দরজার কাছে এল। গ্রন্থাগারিক ও পাহারাদার এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—'দেখুন—সব পড়া হলো না। পরে আসবো।'

—'অবশ্যই, অবশ্যই।' গ্রন্থাগারিক বললেন। এদিকে মারিয়া কোনোরকমে ছবির ছেঁড়া পাতাটা পোশাকের আড়ালে চেপে ধরে আছে। এই শীতেও মারিয়া ঘেমে উঠেছে। যদি ছবিসুদ্ধ ধরা পড়ে, লজ্জা অপমানের আর শেষ থাকবে না।

গাড়িতে উঠে মারিয়া ছবির পাতাটা ফ্রান্সিসকে দিল। বলল—'উফ্—কী কান্ড! তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে চোর বানালে?' ফ্রান্সিস হো হো করে হেসে উঠল।

—'কী দরকার ছিল চুরি করার? বাবাকে বললেই পারতে।' মারিয়া বলল।

—'আমি এখন কাউকে এই ছবির কথা জানাতে চাইনা। তাই—।' ফ্রান্সিস বলল—'তাছাড়া ছবি আর ত্রিভুজটা নিয়ে ভাবতে হবে তো। তাই হাতের কাছে রাখবো।'

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস ও মারিয়া শোবার ঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া, তুমি ঘুমোও।'

—'তুমি শোবে না?'

—'না—আমাকে এই ছবিটা খুব ভাবিয়ে তুলেছে।'

—'তুমি এটা নিয়ে ভাববে, ঘুমুবে না আর আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুবো? অসম্ভব।' মারিয়া বলল।

—'বেশ, তাহলে এসো সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা যাক।' দু'জনে বিছানায় বসল।

ফ্রান্সিস ছবিটা বিছানায় পাতল। রূপোর ঝকঝকে মোমবাতিদানটা বিছানায় রাখল। এবার খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। একটু পরে বলল 'আচ্ছা মারিয়া—কবি আরি স্তম্ভ সম্পর্কে কী লিখছে?'

—'লিখেছেন যে মণিমাণিক্য বোঝাই সেই সোনার জাহাজের সঙ্গে স্তম্ভগুলোর একটা সম্পর্ক আছে। কারণ, স্বর্ণকার থরবার্গ মরবার আগে—'সপ্তম-স্তম্ভ' এই কথা দুটো বহুকষ্টে বলতে পেরেছিল। কিন্তু সম্পর্কটা যে কী তা কবি আরি নিজে বুঝে উঠতে পারেননি। সবটাই অনুমান।' মারিয়া বলল।

—'হুঁ।' ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল—'দেখো—জাহাজের মুখের ছবিটায় কোনো রহস্য আছে কি নেই এটা ঠিক এখুনি বলা যাচ্ছে না। তবে আমার মনে হয় পেছনের ত্রিভুজটার রহস্য খুব গভীর। মণিমাণিক্য-বোঝাই ঐ ক্ষুদ্র জাহাজটা কোথায় গোপনে রাখা হয়েছে তার হদিস পাওয়া যাবে ঐ ত্রিভুজটা থেকে।'

এবার মারিয়া ঝুঁকে পড়ে। 'ত্রিভুজের মতো ছবিটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বলল—'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো?'

—'হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না ঐ তিনটে চিহ্নের অর্থ কি?' ফ্রান্সিস বলল।

এবার মারিয়া বলল—'সাপের মুখের মতো এই ছবিটায় একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো?'

—'কী?' ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া বলল—'ত্রিভুজের ওপরের দিকে তিনটে চিহ্ন।'

—'হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না ঐ তিনটে চিহ্নের অর্থ কী?' ফ্রান্সিস বলল।

এবার মারিয়া বলল—'সাপের মুখের মতো এই ছবিটায় একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো.'

—'কী?'

—'সাপের মাথার দিকে সাতটা মণির মতো চিহ্ন।'

—'বলো কী?' ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ছবিটা নিয়ে দেখতে দেখতে

বলল—'মারিয়া—আশ্চর্য—দেখো সাপের দাঁতও সাতটা।'

—'সত্যিই তো।' মারিয়া বলে উঠল।

—'স্বর্ণকার থরবার্গ বলেছিল—সপ্তম স্তম্ভ। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে সাত সংখ্যাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া বলে উঠল—'ঠিক বলেছো।'

ফ্রান্সিস বিছানা থেকে নেমে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। মারিয়া কিছুক্ষণ তাই দেখল। তারপর বলল—'কী ভাবছো?'

—'আবার সমুদ্রযাত্রা।' ফ্রান্সিস বলল।

—'মানে?' মারিয়া বলল।

—'এবার আইসল্যান্ড—সপ্তম স্তম্ভের রহস্য উদ্ধারে।'

—'বাবা তোমাকে আর যেতে দিলে তো?' মারিয়া বলল।

—'তবে সেই পুরোনো পথ—'

—'অর্থাৎ জাহাজ চুরি।'

—'হ্যাঁ।'

—'এবার আমিও যাবো।' মারিয়া বলল।

—'এ্যাঁ?' ফ্রান্সিস পায়চারি থামিয়ে মারিয়ার দিকে তাকাল।

—'দেখো—তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলবো। তারপর বলবো আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। তাহলে উনি আর আপত্তি করবে না।' মারিয়া বলল।

—'বেশ—তাহলে কালকেই অনুমতির বাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হবে। তারপর বন্ধুদের খবর দেবো।'

পরদিন রাতে ফ্রান্সিসের বাবা মন্ত্রীমশাই খেতে বসেছেন। ফ্রান্সিসও খাচ্ছে। মারিয়া খাবারদাবার পরিবশন করছে। তখনই মারিয়া আস্তে আস্তে আইসল্যান্ডের কবি আরি, রাজা ফ্লোকি, তার মণিমাণিক্য-বোঝাই ক্ষুদে জাহাজ, স্তম্ভ এসবের গল্প বলতে লাগল। মন্ত্রীমশাই খেতে খেতে শুনতে লাগেলন। সবশেষে সপ্তম স্তম্ভের রহস্যভেদ করতে ফ্রান্সিস আইসল্যান্ড যেতে চায় সে কথা বলল। মন্ত্রীমশাই খাওয়া থামিয়ে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চোখ ফেরালেন ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস খাওয়া থামিয়ে বাবার দিকে তাকাল। মন্ত্রীমশাই একবার কাশলেন। তারপর ভারী গলায় বললেন—'তোমার জ্বালায় তোমার মা অকালে দেহ রেখেছেন। এবার এই মেয়েটাকেও মেরে ফেলতে চাও।

ফ্রান্সিস বলল—'বাবা—তুমি ব্যাপারটা—'

ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিয়ে মন্ত্রীমশাই বললেন—'তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। এই আমার শেষ কথা।'

মারিয়া মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল—'বাবা—একটা কথা বলছিলাম।'

—'হুঁ। বলো।' মন্ত্রীমশাই বললেন।

—'মানে—আইসল্যান্ড তো বেশি দূরে নয়, কাছেই। তাই ভাবছি আমিও ওদের সঙ্গে যাবো।' মারিয়া মৃদুস্বরে বলল।

—'এ্যাঁ?' মন্ত্রীমশাই বেশ চমকে উঠলেন।

মারিয়া একই ভঙ্গিতে বলল—'বাবা—আপনি ভাববেন না। ওখানে তো ভাইকিংদেরই বসত। কোনো বিপদ হবে না আমাদের। নিরাপদে ফিরে আসবো।'

মন্ত্রীমশাই মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন—'দেখো মারিয়া—তোমার জন্যেই আমি ফ্রান্সিসকে যেতে দিতে চাইছিলাম না। এখন তুমি যদি সঙ্গে যাও—আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তোমাদের কোনো বিপদ ঘটলে আমাকে দোষ দিও না।'

ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—'বাবা, তুমি কিছ্ছু ভেবো না।

—'হুঁ', এবার বসো। 'খাওয়া শেষ করো।' মন্ত্রীমশাই বললেন।

ফ্রান্সিস শান্ত ছেলের মতো আবার বসে পড়ল। খেতে লাগল।

ফ্রান্সিসের আর তর সইছিল না। খুব ভোরে উঠে পড়ল। মারিয়াকে ডাকল। ঘুম ভেঙে মারিয়া ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—'শীগগিরি তৈরী হয়ে নাও। তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলতে যাবো।'

ওরা ঘোড়ায় টানা গাড়ি চড়ে যখন রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছল তখন সবে সকাল হয়েছে। রাজামশাই তখনও বিছানায় শুয়ে। রাজার শোবার ঘরে ঢুকল দু'জনে। রাজামশাই তো ওদের দেখে অবাক। বললেন—'কী ব্যাপার? তোমরা এত সকালে?'

মারিয়া বাবার পাশে বিছানাতেই বসল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়া একে একে সব কথা বলতে শুরু করল। তখনই পাশের ঘর থেকে রানী এলেন। বললেন—'মারিয়ার গলা শুনলাম। কী ব্যাপার? তোমরা এ সময়?' 'মারিয়া তখন বাবা-মা দুজনকেই সব কথা বলল। রাজামশাই বললেন—'দ্যাখো মারিয়া ফ্রান্সিসের বাবাই এখন তোমার অভিভাবক। উনি যদি সম্মতি দিয়ে থাকেন আমাদের বলার কিছু নেই।' মারিয়া খুশিতে হাততালি দিয়ে ফেলল। রানীর গলা জড়িয়ে ধরল। বলল—'মা, তুমি?' রানী হাসলেন। বললেন—'তোমার বাবা তো বললেনই । তাহলে আর আমি অমত করবো কেন? রাজামশাই বললেন—'আইসল্যান্ডের কথা তো বিশেষ জানো না তোমরা। ওখানে কিন্তু সূর্যের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নের জন্যে বছরে ছ'মাস রাত ছ'মাস দিন।'

—'এখন তো ওখানে শীতকাল।' ফ্রান্সিস বলল—'তার মানে রাত চলছে। এ সময়টায় কি আকাশ নিকষকালো!'

—'না—তা নয়। খুব নরম আলো যাকে এ সময়। কাছের সবকিছু আবছা দেখা যায়। তবে শীতটা বেশি।' রাজা বললেন।

—'তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।' ফ্রান্সিস বলল।

—'কিন্তু একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছি।' রাজা বললেন।

—'কী ব্যাপার?' মারিয়া জানতে চাইল।

রাজা বললেন—'ফ্রান্সিস, তোমার বোধহয় মনে আছে তুমি যখন সোনার ঘণ্টা আনতে গিয়েছিলে তখন আমার সেনাপতি ছিল গুমন্ড। সে তোমাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছিল।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি।' ফ্রান্সিস বলল।

—'সেই গুমন্ডকে আমি আইসল্যান্ডে নির্বাসিত করেছিলাম। এখন গুমন্ড

থিংভেলিরে লোকজন জড় করে রাজা হয়ে বসেছে।' রাজা বললেন।

—'কিন্তু আমরা তো যাচ্ছি রেভ্কজাভিকে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'হ্যাঁ, রেভকজাভিকের রাজা এখন ইনগল্ফ। ইনগল্ফ আমাকে বরাবরই সম্মান করে। ওকে আমি চিঠি লিখে তোমার হাতে দেবো, ও তোমাদের সমাদর করবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে সপ্তাহখানেক আগে ইনগল্ফ আমাকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে যে গুমন্ড নাকি ওর রাজ্য আক্রমণ করার জন্যে তোড়জোড় করছে। এ সময় তোমরা যাবে তাই ভাবছি তোমরা না বিপদে পড়ো।' রাজা বললেন।

—'আমরা যাতে যুদ্ধে না জড়িয়ে পড়ি সে চেষ্টাই করবো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'ঠিক আছে—তোমরা যা ভালো বুঝবে করবে।'

—'আমাদের একটা ভালো জাহাজ দিতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'বেশ।' রাজামশাই বললেন।

—'যাত্রার দিনটা পরে আপনাকে জানাবো;। ফ্রান্সিস বলল।

—'আচ্ছা'—রাজা বললেন।

ফেরার পথে ফ্রান্সিস হ্যারির বাড়ি গেল। হ্যারি সব শুনে লাফিয়ে উঠল—আবার অভিযান। ঠিক হলো হ্যারি বিস্কো, শাঙ্কো আর অন্য বন্ধুদের খবর দেবে। পরদিন বিকেলে ফ্রান্সিসের বাড়িতে মিলিত হবে সবাই।

বিকেলে প্রায় সব বন্ধুই এল। গল্পগুজবে আড্ডা জমে উঠল। একসময় ফ্রান্সি উঠে দাঁড়াল। সবাই চুপ করল। ফ্রান্সিস বলল—'ভাইসব—আবার অভিযানে বেরুবো আমরা। এবারের গন্তব্যস্থল—আইসল্যান্ড।' তারপর ফ্রান্সিস কবি আরির বই, ছবি নক্শা, রাজা ফ্রোকির গুপ্তধন, মণিমাণিক্য-বোঝাই জাহাজ, সপ্তম স্তম্ভ সব কথাই বলল। সবশেষে বলল—'ভাইসব, দুটো সুসংবাদ দিচ্ছি—এক—রাজামশাই আমাদের জাহাজ দেবেন—ভাল জাহাজ, আর দুই—এই অভিযানে মারিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে।' সব ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো—।' তারপর আলোচনা করে স্থির হলো, পাঁচ তারিখে ওরা জাহাজ নিয়ে অভিযানে বেরুবে।

দেখতে দেখতে পাঁচ তারিখ এসে গেল। এর মধ্যে সবাই গরম জামাকাপড় কিনল। খাদ্য অস্ত্রশস্ত্র সব যোগাড় করে রাখল। গ্রীনল্যান্ডে ওরা এর আগে এক অভিযানে গিয়েছিল। কাজেই শীতের দেশ সম্পর্কে ওদের অভিজ্ঞতা আছে। তাছাড়া—আইসল্যান্ড গ্রীনল্যান্ডের মতো সবসময় বরফে ঢেকে থাকে না।

যাত্রার দিন একটা সুদৃশ্য মজবুত জাহাজ জাহাজঘাটায় আনা হলো। ফ্রান্সিসরাও তখন সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস—কুড়ুল, বেলচা, দড়ি এসব জাহাজে রাখল। তারপর খাদ্য-জল।

জাহাজঘাটায় একটা সুন্দর সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নিচে রাজবাড়ি থেকে আনা চেয়ার-টেবিল রাখা হলো। মারিয়া, ফ্রান্সিস ও বন্ধুরা জাহাজে উঠল। ডেক-এ এসে দাঁড়াল। রাজা,মন্ত্রী ও অন্যান্য গণ্যমান্য অমাত্যরা সামিয়ানার নিচে এসে বসলেন। কামান দাগা হলো। ঘর ঘর শব্দে নোঙর তোলা হলো। ফ্রান্সিসদের জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে ভেসে চলল।

দিন সাতেকের মধ্যে জাহাজ ফারো দ্বীপে পৌঁছল। সেখান থেকে দক্ষিণ আইসল্যান্ডের বন্দর অলিপ্টাজর্ড-এ পৌঁছল।

আলোর দেশ ছেড়ে এবার ফ্রান্সিসরা অন্ধকারের দেশে পৌঁছল। সত্যি চারিদিকে নিকষ অন্ধকার নয়, শেষ বিকেলের ম্লান আলোর মত আকাশে মাটিতে আলো ছড়ানো। তাতে কাছাকাছি সবকিছুই অস্পষ্ট হলেও দেখা যায়। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। সবাই বাড়তি গরম পোশাক গায়ে পরে নিল।

কিছুদিন পরে ফ্রান্সিসদের জাহাজ রেভক্জাভিক বন্দরে পৌঁছল। রেভক্জাভিক বেশ বড় বন্দর। বেশ কটা জাহাজ নোঙর করা। মারিয়া ফ্রান্সিসকে বলল—'রেভক্জাভিক কথাটার অর্থ হলো বাষ্পাচ্ছন্ন উপসাগর।'

ফ্রান্সিস বিস্কোকে ডাকল। ওর হাতে রাজার চিঠিটা দিল। বলল—'এখানকার রাজা ইনগল্ফের হাতে চিঠিটা পৌঁছে দাও।' বিস্কো চিঠি নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা জাহাজ থেকে নেমে জায়গাটা দেখতে লাগল। বেশ কিছু বাড়িঘর আছে। বাড়িঘর সবই পাথরে তৈরি, ছাদ মোটা ঘাসের আস্তরণে তৈরি, রাস্তায় লোকজনের ভিড়। প্রায় সবাই ভাইকিং। দোকানপাট, কড মাছের গুদাম এসব আছে। বাড়িগুলো লম্বাটে। লম্বা ঘর। দু'পাশের দেয়ালে কাঠের পাটাতন। শোয়া, রান্না করা ঐ পাটাতনেই। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা ঘুরেফিরে বন্দরটা দেখতে লাগল। তখনই ওরা দেখল পথ দিয়ে ঘোড়ায় টানা একটা বেশ জমকালো গাড়ি আসছে। গাড়ির কালো চকচকে কাঠে সোনালী লতাপাতার কাজ। ওরা বুঝল রাজা ইনগল্ফ চিঠি পেয়ে আসছেন। ওরা তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে এল।

রাজার ঘোড়ার গাড়ি জাহাজঘাটায় এসে থামল। রাজা ইনগল্ফ আর রাণী দু'জনেই এসেছেন। ফ্রান্সিস আর মারিয়া জাহাজ থেকে নেমে এল। রাজা ও রানীকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। রাজা ইনগল্ফ ফ্রান্সিসকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—'ফ্রান্সিস, চারণ কবিদের গানে তোমার নানা বীরত্বের কাহিনী শুনেছি। তুমি আমাদের দেশে এসেছো এ জন্যে আমরা গর্ব অনুভব করছি।' ফ্রান্সিস মৃদু হেসে চুপ করে রইল। ওদিকে রানীও মারিয়ার সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলেন। কেমন লাগছে এ দেশ—আসতে কষ্ট হয়েছে কিনা—এসব।

একটু পরে রাজা-রানীর সঙ্গে গাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিস ও মারিয়া রাজবাড়িতে এল। রাজবাড়িটাও পাথরের। বেশ বড়। চারদিকে পাথরের দেয়াল।

একটা ঘর ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে ছেড়ে দেওয়া হলো। খুব সাজানো-গোছানো পাথরের ঘর। দেয়ালে পাথর কেটে ফুল লতাপাতার কাজ।

একসময় ফ্রান্সিসদের খাবারঘরে আসার জন্যে বলতে একজন পরিচারক এল। ওরা তার সঙ্গে চলল।

ওরা দু'জনে খাবার ঘরে ঢুকল। একটা লম্বাটে বেশ বড় মসৃণ পাথরের খাবার টেবিল। ধারে ধারে কারুকাজ করা ও কাঠের চেয়ার পাতা। রাজা-রানী তাঁদের পাশেই ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে বসালেন। মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্য অমাত্যরাও এসে বসলেন। পরিবেশনকারীরা খাবার পরিবেশন করতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া চলল। রাজা ইনগল্ফ ফ্রান্সিসকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—'রাজামশাইর চিঠিতে তোমরা আসছো এটা জেনেছি। কিন্তু তোমরা কেন এসেছো সেটা উনি লেখেননি।'

ফ্রান্সিস তখন আস্তে আস্তে কবি আরির 'আইসল্যানিগা বক'-এর কথা রাজা ফ্রোকি কর্তৃক গোপনে লুকিয়ে রাখা মণিমাণিক্য-বোঝাই সোনার জাহাজ এসবের

কথা বলল।

রাজা ইনগল্‌ফ বললেন—'তোমরা কি সেই গুপ্তধন খুঁজে বের করতে চাও?'

—'হ্যাঁ, আমরা সেজন্যেই এসেছি।' তারপর ফ্রান্সিস বলল—'এখানে কোথায় পনেরো দিন পর পর নাচগানের আসর বসে?'

—'ও, বুঝেছি। ঐ জায়গাটা কাছেই। উত্তরে যে পাহাড়টা আছে তার নিচে। জায়গাটার নাম লোগবার্গ।' রাজা বললেন।

—'ওখানে কি কয়েকটা স্তম্ভ আছে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'হ্যাঁ।' রাজা বললেন।

—'ক'টা স্তম্ভ আছে?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'ছ'টা। ঐ স্তম্ভগুলোর নিচেই নাচগানের আসর বসে।'

—'আমি আর মারিয়া কালকে দেখতে যাবো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'ঠিক আছে। তোমাদের গাড়ি দেওয়া হবে।' রাজা বললেন।

—'আচ্ছা—থিংভেলির রাজা গুমন্ড কি আপনার রাজ্য আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে?' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ইনগল্‌ফ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—'হ্যাঁ। এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। দু' দু'বার ওরা আক্রমণ করেছিল। হেরে পালিয়ে গেছে। এবার আক্রমণ করলে কী হবে জানি না।'

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল—'আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে অবশ্যই আপনার পক্ষে যোগ দেবো।'

রাজা ইনগল্‌ফ খুব খুশি হলেন। বললেন—'তোমরা যাতে রাজা ফ্রোকির গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারো তার জন্যে তোমাদের আমি যথাসাধ্য সাহায্য করবো।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস ও মারিয়া নিজেদের ঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—'বুঝলে মারিয়া—ওখানে ছ'টা স্তম্ভ আছে। তার মানে আর একটা স্তম্ভ, মানে সপ্তম স্তম্ভটা ওখানেই কোথাও আছে।'

মারিয়া বলল—'তাহলে দেখা যাচ্ছে সাত সংখ্যাটা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' 'হুঁ।' ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। বলল—'চলো কালকে লোগবার্গের স্তম্ভ দেখতে যাবো।'

পরদিন ফ্রান্সিস আর মারিয়া গাড়ি চড়ে লোগবার্গে গেল। তারপর মাটিতে পোঁতা স্তম্ভগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল। উত্তরদিকে একটা ছোট পাহাড়। তার নিচে এই সমতল ঘাসে ঢাকা জায়গাটা। এক সারিতে তিনটে স্তম্ভ আর এক সারিতে তিনটে স্তম্ভ। গোল। পাথর কেটে স্তম্ভগুলো তৈরি করা হয়েছে। বেশি মোটা নয়। মাটিতে পোঁতা হয়েছে। ফ্রান্সিস স্তম্ভগুলোর গায়ে হাত দিয়ে দেখল মসৃণ। স্তম্ভ কুঁদে কুঁদে কিছু ফুল, পাখি লতাপাতার নক্সা আঁকা হয়েছে। স্তম্ভগুলোর রঙ সাদাটে। মোট ছ'টা স্তম্ভ। কিন্তু সপ্তম স্তম্ভটা কোথায়? ফ্রান্সিস ঐ সমতল ভূমির চারদিকে তাকাল। অল্প আলোয় যতদূর দৃষ্টি যায় আর কোনো স্তম্ভ নেই। মারিয়া ঘুরে ঘুরে স্তম্ভগুলো দেখছিল। গোল স্তম্ভগুলো বেশি উঁচু নয়। দেড় মানুষ উঁচু। প্রথম স্তম্ভগুলোর প্রতিটির সামনে হাত পাঁচ-ছয় উঁচু চৌকোনো পাথরের থামের মতো। থামের মাথাটা গোল। গোলের মুখের দিকটা কিছুটা বেরিয়ে আছে। মারিয়া

ঠিক বুঝল না এগুলো কী? ফ্রান্সিসকে ডেকে বলল—'এই চৌকোণো থামের মতো এগুলো কী?' ফ্রান্সিস কাছে এল। চৌকোণো থামগুলো দেখল। কিন্তু ও নিজেও বুঝতে পারল না। মাথা নাড়ল।

ওরা দু'জনে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল কিছুদূরে পাহাড়ের নিচে একটা পাথরের ঘর। ছোট ঘর। ঘরটায় ছাউনি এখানকার রীতি অনুযায়ী মোটা শুকনো ঘাসের। ফ্রান্সিস তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ঘরটা থেকে একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। লোকটার মুখের দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুল সব সাদা।। একটা লম্বা কাঠের মাথায় ঝাঁটা বাঁধা। সেটা লোকটার কাঁধে। বৃদ্ধটি ঝাঁটা নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কাছে এল। একবার ওদের দেখল। তারপর স্তম্ভপোঁতা জায়গাটা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল। মারিয়া এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—'এ জায়গাটা পরিষ্কার করছেন কেন?'

বৃদ্ধটি সাদা ভুরু কুঁচকে মারিয়ার দিকে তাকাল। পাকা দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে হাসল। বলল—'তোমরা বুঝি নতুন এসেছো?'

—'হ্যাঁ।' মারিয়া বলল।

—'আজকে পনেরো তারিখ। ঘন্টাকয়েক পরে এখানে নাচগানের আসর বসবে।' বৃদ্ধ বলল।

'প্রত্যেক পনেরো তারিখই নাচগান হয় এখানে তাই না?' মারিয়া বলল।

—'হ্যাঁ—আর আমার কাজ হলো সেদিন এই জায়গাটা ঝাঁটটাট দিয়ে পরিষ্কার রাখা আর উৎসবের সময় প্রদীপ জ্বালানো।'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—'এখানে প্রদীপ কোথায়?'

বৃদ্ধটি আঙুল দিয়ে চৌকোণো থামগুলো দেখাল। বলল—'ঐ তিনটে প্রদীপ। মোটা কাপড় পেঁচিয়ে পলতে তৈরি করি। তারপর প্রদীপগুলোর মাথায় শীল মাছের তেল ঢালি। প্রদীপ জ্বালিয়ে দিই। এই কাজগুলো করাই আমার চাকরি।' বৃদ্ধটি আবার ঝাঁট দিতে লাগল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে পাথরের প্রদীপগুলো দেখল। দেখল সত্যিই বড় প্রদীপের মতো ওগুলো। ওগুলোর মাথায় তেলকালি লেগে আছে।

—'আপনি কতদিন এই কাজ করছেন?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

বৃদ্ধটি সাদা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল—'সেই কতদিন থেকে—মনে নেই।'

—'আচ্ছা আপনি কি বরাবর এই ছ'টা স্তম্ভই দেখেছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'সপ্তম স্তম্ভের কথা শুনেছেন কখনও?'

বৃদ্ধ একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—'আমার আগে যে এখানে কাজ করতো, কথায় কথায় সে একদিন বলেছিল এখানে রাজা ফ্লোকি আর একটা স্তম্ভ পুঁতেছিলেন। তবে সেটা পাথরের না, সোনার।

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল—'আর কী বলেছিল?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল—'না, আর কিছু না।' তারপর নিজের কাজ করতে লাগল।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ স্তম্ভ, প্রদীপ, ঘাসে ঢাকা জায়গাটা দেখল। কিন্তু কিছুই বুঝে

উঠতে পারল না। এই স্তম্ভগুলোর সঙ্গে মণিমাণিক্য-বোঝাই সোনার জাহাজের সম্পর্ক কী? আরো একটা সোনার স্তম্ভ নাকি আছে। সেটাই বা কোথায়? তবে একটা কথা ফ্রান্সিস বুঝল যে এই স্তম্ভগুলোর সাহায্যেই সপ্তম স্তম্ভটা খুঁজে বার করতে হবে। তাহলেই রাজা ফ্লোকির গুপ্তধনের হদিস্ পাওয়া যাবে।

দু'জনে গাড়িতে চড়ে রাজবাড়িতে ফিরে এল।

খাওয়া-দাওয়ার সময় ফ্রান্সিস রাজা ইনগল্‌ফকে বলল—'এবার আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।'

রানী বলে উঠলেন—'উঁহুঁ—তোমরা এখানেই থাকবে।'

—'তাহলে এক কাজ করা যাক—' ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া এখানে আপনার কাছে থাক। আমাকে জাহাজে বন্ধুদের সঙ্গে থাকতেই হবে।'

—'বেশ—তাতে আমাদের আপত্তি নেই।' রাজা বললেন।

—'আজকে লোগবার্গের উৎসবে তোমরা যাবে না?' রানী বললেন।

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো। বন্ধুদেরও নিয়ে যাবো। মারিয়া এখান থেকে আপনাদের সঙ্গে যাবে।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজার দেওয়া গাড়িতে চড়েই ফ্রান্সিস জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠতেই বন্ধুরা ওকে ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস বলল—'সবাই তৈরি হয়ে নাও। একটু পরেই আমরা লোকবার্গ যাবো। আজ ওখানে উৎসব। নাচগানের আসর বসবে।'

সব ভাইকিংরা হৈ হৈ করে উঠল। সবাই খেয়েদেয়ে তৈরি হতে চলে গেল।

স্থানীয় চাষীদের কয়েকটা শস্যটানার গাড়ি যোগাড় করা হলো। ঘোড়াও পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস আর ওর বন্ধুরা গাড়িতে আর ঘোড়ায় চড়ে হৈ হৈ করতে করতে চলল লোগবার্গের দিকে। যাবার সময় দেখল এই বন্দর নগরের রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে উৎসবে যোগ দিতে। চারদিকে উৎসবের আবহাওয়া।

ওরা লোগবার্গ পৌঁছল। তখন অল্প অন্ধকারে পাথরের তিনটি বড় প্রদীপ জ্বালাবার কাজ চলছে। সেই বৃদ্ধটি সাদা মোটা লম্বা কাপড় পেঁচিয়ে পলতে তৈরি করল। তারপর একটা ছোট কাঠের মই প্রদীপস্তম্ভের গায়ে লাগাল। মইয়ে উঠে লম্বা আর মোটা পলতে প্রদীপে রাখল। পলতের মুখটা বাড়িয়ে রাখল। এবার লোকটি একটা শীল মাছের তেলের পিপে নিয়ে এল। মই দিয়ে উঠে তিনটে প্রদীপেই তেল ঢালল। তারপর চক্‌মকি ঠুকে একটা মশাল জ্বালল। মশালের আগুন দিয়ে প্রদীপগুলো জ্বেলে দিল। প্রদীপগুলো ভালো করে জ্বলে উঠতেই জায়গাটা আলোয় আলোময় হয়ে উঠল।

অনেক লোক এসেছে। পাহাড়ের খাঁজকাটা পাথরে বসেছে সবাই। ওই পাথরগুলোতে বসে সাধারণ দর্শকরা। ওখানেই সামনের দিকে একটা বড় পাথরের বেদীমতো। বেদীতে পাথর কুঁদে ফুল পাতা পাখির ছবির অলঙ্করণ। একটু পরেই খয়েরী রঙের সুদৃশ্য একটা মাথা খোলা গাড়িতে চড়ে রাজা ইনগল্‌ফ ও রানী এলেন। রানীর পাশে মারিয়া। রাজা-রানী উৎসবের সাজে সেজে এসেছেন। মারিয়াও একটা হাল্‌কা সবুজ রঙের নতুন পোশাক পরে এসেছে। রাজা-রানী ও মারিয়া

সেই কাজ-করা বেদীতে বসল। দর্শকরা সমস্বরে রাজার জয়ধ্বনি দিল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসরাও খাঁজকাটা পাথরের আসনে বসে পড়েছে।

সেই বৃদ্ধ লোকটি আরো দু'তিনজনের সাহায্যে একটা লতাপাতা বোনা মোটা বিরাট কাপড় নিয়ে এল। স্তম্ভগুলোর পেছনে ঘাসের জমিতে সেটা পেতে দিল ওরা।

স্তম্ভের একপাশে তিন-চারটে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাদ্যযন্ত্রীরা বসল। শুরু হলো বাজনা। আইসল্যাণ্ডের নানা রঙের সুতোয় কাজ-করা পোশাক পরে একদল মেয়ে এসে দাঁড়াল নাচের জায়গায়। একটি মেয়ে এগিয়ে এসে সুরেলা গলায় বাজনার সঙ্গে গান ধরল। শুরু হলো নাচ। অন্য মেয়েরা দল বেঁধে, কখনও হাত ধরাধরি করে, কখনও হাত ছাড়িয়ে নাচতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসর জমে উঠল। দর্শকরা মাঝে মাঝে চিৎকার করে নাচিয়েদের উৎসাহিত করতে লাগল। একসময় নাচ-গান থামল।

এবার রাজা-রানী আসন ছেড়ে উঠলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল। রাজা ও রানী তাঁদের ঘোড়ার গাড়ির দিকে চললেন। পেছনে মারিয়া। তাঁরা গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলল। সুন্দর পোশাক পরা চারজন দেহরক্ষী ঘোড়ায় চড়ে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলল।

আবার শুরু হলো বাজনা-নাচগান। দর্শকদের মধ্যে থেকেও কিছু লোক গিয়ে নাচের আসরে যোগ দিল। আনন্দ হর্ষধ্বনি উঠল দর্শকদের মধ্যে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাচগান চলল। তারপর উৎসব শেষ হলো। দর্শকরা উঠে দলে দলে গাড়িতে চড়ে, পায়ে হেঁটে ফিরে চলল। ফ্রান্সিসরাও ফিরে চলল বন্দরের দিকে।

ওদিকে লোগবার্গের উৎসব থেকে রাজা-রানী ও মারিয়া ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ফিরে আসছে রাজবাড়িতে।

রাজা ইনগল্ফের গাড়ি চলেছে। সামনে দু'জন ও পেছনে দু'জন অশ্বারোহী দেহরক্ষীও চলেছে। রানী হেসে মারিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন—'কী? উৎসব কেমন লাগল?'

'খুব ভালো। বিরাট পাথরের প্রদীপের আলোয় এরকম নাচগান—অপূর্ব।' মারিয়া বলল।

অল্প আলোয় গাড়ি চলেছে। একটু কুয়াশার জটলা এখানে ওখানে। গাড়ি একটা মোড়ে এল। এখানে দুটো রাস্তা। একটা চলে গেছে বন্দর শহরের দিকে। রাজবাড়ির দিকে। অন্য রাস্তাটা সোজা চলে গেছে এ রাজ্যের সীমান্তের দিকে। সীমান্ত পেরিয়েই থিংভেলির রাজ্য। সেই রাস্তাটা খুব ভালো নয়। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে রাস্তা। এ রাস্তাটায় লোকজন গাড়িঘোড়ার চলাচলও কম। রাস্তার মাঝখানে দু'পাশে কোথাও কোথাও তুষার জমেছে।

ঠিক মোড়টায় হঠাৎ ঘন কুয়াশা গাড়িটাকে ঘিরে ধরল। একে আলো কম, তার ওপর কুয়াশা। গাড়ির চালক গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। গাড়িটা শহর ও রাজবাড়ি যাওয়ার পথটা ধরবে, ঠিক তখনই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এল একদল অশ্বারোহী সৈন্য। গাড়িটাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। গাড়ির চালক ঘোড়ার রাশ টেনে গাড়ি থামিয়ে ফেলল। রাজা ইনগল্ফ সেই সৈন্যদের পোশাক

দেখেই চিনলেন-এরা রাজা গুমণ্ডের সৈন্য। রাজার দেহরক্ষী চার অশ্বারোহী সৈন্য প্রথমে কুয়াশার মধ্যে ঠিক বুঝল না গাড়ি থামল কেন। এবার দেখল রাজা গুমণ্ডের সৈন্যদের। কিন্তু ততক্ষণে রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা ওদের ঘিরে ফেলেছে। দেহরক্ষী চারজন সঙ্গে সঙ্গে কোমরের খাপ থেকে তরোয়াল উঁচিয়ে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হলো। শত্রুসৈন্য সংখ্যায় কুড়ি-পঁচিশজন। দেহরক্ষীরা মাত্র চারজন। রাজা ইনগল্ফ ওপরখোলা গাড়ি থেকে সবই দেখলেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে দেহরক্ষীদের শান্ত হতে বললেন। দেহরক্ষী সৈন্যরা তরোয়াল নামাল। রানীর ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেল। উনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। মারিয়াও ভীত হলো। তবে একেবারে ভেঙে পড়ল না। মনে সাহস সঞ্চয় করল। ভাবল—দেখা যাক না কী হয়। মারিয়া রানীকে জড়িয়ে ধরল। স্পষ্ট বুঝল রানীর সারা শরীর কাঁপছে। মারিয়া মৃদুস্বরে বলল—'কাঁদবেন না। ভয়ের কিছু নেই।' রাজা এবার শত্রুসৈন্যদের দিকে তাকালেন। বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন—'তোমরা কী চাও?'

শত্রুসৈন্যের দলপতি এগিয়ে এল। বলল—'আমাদের রাজা গুমণ্ডের হুকুম—রাজকন্যা মারিয়াকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে।'

—'অসম্ভব।' রাজা চিৎকার করে বললেন—'মারিয়াকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হলে আমাদেরও তার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।'

দলপতি বেশ চিন্তায় পড়ল। একটু ভেবে বলল—'বেশ। আপনাদেরও সঙ্গে যেতে হবে।'

—'আমরা প্রস্তুত।' রাজা বললেন।

দলপতি বলল—'তার আগে আপনার দেহরক্ষীদের অস্ত্রত্যাগ করতে হবে।'

—'বেশ।' রাজা দেহরক্ষীদের দিকে তাকিয়ে অস্ত্রত্যাগের ইঙ্গিত করলেন। দেহরক্ষীরা অস্ত্রত্যাগ করল। পাথুরে রাস্তায় তরোয়াল ফেলে দিল ওরা। একজন সৈন্য তরোয়াল কুড়িয়ে নিল। ঝন্‌ঝনাৎ শব্দ উঠল। এবার শত্রুসৈন্যের দলপতির নির্দেশে দেহরক্ষী সৈন্যদের ঘিরে ফেলা হলো। গাড়িও ঘিরে ফেলা হলো। তারপর শত্রু-দলপতি গাড়ির চালককে হুকুম দিল—'এই রাস্তা ধরে গাড়ি চালাও। যত তাড়াতাড়ি পারো। সীমান্ত পেরিয়ে থিংভেলির দিকে। জলদি।' গাড়ি চলল। গাড়ি আর দেহরক্ষীদের ঘিরে শত্রুসৈন্যেরাও চলল। এবড়োখেবড়ো তুষার-জমা পাহাড়ি রাস্তা। চালক গাড়ি খুব জোরে চালাতে পারছিল না।

গাড়ি চলছে। শত্রুসৈন্যরাও ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে হঠাৎ আবার একটা কুয়াশার আস্তরণ সবাইকে ঢেকে ফেলল। একজন দেহরক্ষী ঘোড়া থেকে লাফ দিল রাস্তার ধারে খাদের তুষারের মধ্যে। ঠিক তখনই কুয়াশার আস্তরণ সরে গেল। পেছনের একজন শত্রুসৈন্য সেই অল্প আলোয় সঙ্গে সঙ্গে পলায়নপর দেহরক্ষীকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। নির্ভুল নিশানা। বর্শা ওর পিঠে গেঁথে গেল। দেহরক্ষীটি আর পালাতে পারল না। উবু হয়ে খাদের তুষারের মধ্যে পড়ে গেল। রাজা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে বাকি তিনজন দেহরক্ষীকে বললেন—'তোমরা পালাবার চেষ্টা করো না।' রাজা বসলেন। আবার গাড়ি চলল। শত্রুসৈন্যরাও চলল ঘোড়া ছুটিয়ে। গাড়ির সামনে পেছনে।

মারিয়া রানীকে ধরে রইল। রানী আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। রাজা মৃদুস্বরে

বললেন—'কাঁদছো কেন? আমি তো এখনো বেঁচে আছি।'

ঘণ্টা দুয়েক পরে দূরে আলোয় দেখা গেল কালো রঙের টানা নিচু পাহাড় একটা। এই নিচু পাহাড়টাই রেভক্‌জাভিক ও থিংভেলির রাজ্যের সীমানা। পাহাড়টার ওপরে জমা বরফ। শীতার্ত হাওয়া ছুটে আসছে ঐ সীমানা পাহাড়ের দিক থেকে।

ওদিকে খাদের মধ্যে পড়ে থাকা আহত দেহরক্ষীটি তখনও বেঁচে ছিল। পিঠে গাঁথা বর্শাটা খুলে ফেলেছিল। রক্তাক্ত দেহে সে কোনোরকমে খাদের তুষার থেকে শরীরটাকে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে উঠেছিল পাথুরে রাস্তাটায়। তারপর রাস্তাতেই পড়ে রইল সে।

উৎসবে হৈ-হল্লা আনন্দ করে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা তখন খুবই ক্লান্ত। ওরা জাহাজে উঠে যে যার কেবিনঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল না। কেবিনঘরে ঢুকে মোটা মোমবাতিটা চক্‌মকি পাথর ঠুকে জ্বালল। তারপর বিছানার তলা থেকে কবি আরির সেই ছবি ও নক্সা আঁকা কাগজটা নিয়ে বসল। ছবি আর নক্সাটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। 'দীর্ঘ সর্প' জাহাজের মুখের ছবি এটা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাপটার মুখে সাতটা দাঁত, মাথায় সাতটা মণি কেন? ত্রিভুজের নক্সাটার অর্থ কী? ফ্রান্সিস গভীরভাবে এইসব ভাবছে তখনই হ্যারি ওর ঘরে ঢুকল। বলল—'আলো জ্বলছে দেখে এলাম। কী ব্যাপার? ঘুমুবে না?'

—'হ্যাঁ, এইবার শোব।' ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি ওর পাশে এসে বসল।

—'এই ছবি নক্সা তো দেখেছো?' ফ্রান্সিস বলল।

—'হুঁ দেখেছি।' হ্যারি বলল।

—'কিছু বুঝতে পারছো?' ফ্রান্সিস বলল।

—'নাঃ। তা তুমি তো ঐ স্তম্ভ, জায়গাটা ভালো করে দেখে এসেছো। তুমি কিছু বুঝলে?' হ্যারি বলল।

—'উঁহু।—সাদাটে পাথরের স্তম্ভ। স্তম্ভ যেমন হয়। খুব সরুও নয়, খুব মোটাও নয়। সাধারণ স্তম্ভ।' ফ্রান্সিস বলল।

—'হুঁ।' হ্যারি নক্সাটা ভালো করে দেখল। হঠাৎ বলে উঠল—'আচ্ছা ত্রিভুজের ওপরে দেখো তিনটি চিহ্ন রয়েছে। প্রত্যেকটি রেখার শেষে। কীসের চিহ্ন এগুলো?'

—'দেখেছি। আমার মনে হয় ওগুলো সূর্য।' ফ্রান্সিস বলল।

—'ফ্রান্সিস—এটা আইসল্যান্ড। ছ'মাস সূর্যের দেখাই পাওয়া যায় না। তাও আবার একটা নয় তিনটে সূর্য।' হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'নাঃ, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।' তারপর বলল—'লক্ষ্য করে দেখো নিচের একটা বিন্দু থেকে তিনটে সরলরেখা উঠে গেছে। এভাবেই একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে।'

—'আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো—নিচের বিন্দুর কাছে কিন্তু সূর্যের মতো ঐ চিহ্নটা নেই।' হ্যারি বলল।

—'হ্যাঁ, সেটাও লক্ষ্য করেছি।' ফ্রান্সিস হেসে বলল।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—'নাও এবার ঘুমোও। পরে ভাবা যাবে।' হ্যারি

চলে গেল। ফ্রান্সিস ছবির কাগজটা বিছানার নিচে রাখল। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ঐ নক্সা ছবির কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। হঠাৎ হ্যারির ডাকাডাকিতে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও হ্যারির মুখের দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—'শীগগির ওঠো। রাজার প্রাসাদের দু'জন পাহারাদার এসেছে। তারা তোমাকে কী বলতে চায়।'

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। রাজবাড়ির পাহারাদার সৈন্য দু'জন এগিয়ে এল। একজন বলল—'আপনিই ফ্রান্সিস।'

'হ্যাঁ,'—ফ্রান্সিস বলল।

পাহারাদার সৈন্যটি বলল—'সেনাপতি একটা সংবাদ আপনাকে জানাতে বলেছেন।'

—'বলো।'

—'রাজা-রানী ও রাজকন্যা মারিয়া লোগবার্গের উৎসব থেকে ফিরছিলেন। পথে রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা তাঁদের বন্দী করেছে। তারপর থিংভেলিরে নিয়ে গেছে।' সৈন্যটি বলল।

ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল। বলল—'সব খুলে বলো।'

সৈন্যটি বলতে লাগল—'আমরা দু'জন রাজবাড়ির সদর দেউড়ি পাহারা দিচ্ছিলাম। লোগবার্গে উৎসব শেষ হয়ে গেল। লোকজন সব ফিরে এল। ঘরে ঘরে আলো নিভিয়ে সবাই শুয়ে পড়ল। রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে গেল। অথচ রাজা-রানী আর রাজকন্যা মারিয়াকে নিয়ে তখনও গাড়ি রাজবাড়ি ফিরল না। আমরা ভাবলাম হয়তো রাজা-রানী, রাজকন্যা মারিয়াকে উষ্ণ প্রস্রবণ, আগ্নেয়গিরি এসব দেখাতে নিয়ে গেছেন। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু গাড়ি ফিরল না। আমাদের কেমন সন্দেহ হলো। আমরা দু'জন ঘোড়ায় চেপে লোগবার্গে গেলাম। উৎসব অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। যে দু'চারজন লোক পাহাড়ের খাঁজে শুয়ে বসে ছিল তাদের কাছে জানলাম রাজা-রানী রাজকন্যা মারিয়াকে নিয়ে অনেকক্ষণ আগেই গাড়িতে চলে এসেছেন। আমরা অন্য যে পাথুরে পথটা থিংভেলির দিকে গেছে সে পথ দিয়ে ঘোড়া ছোটালাম। এই পথের ধারেই দুটো উষ্ণ প্রস্রবণ আর হেকলা আগ্নেয়গিরি আছে। কিছুদূর আসতেই দেখলাম রাজার এক দেহরক্ষী ভীষণ আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। মুমূর্ষু রক্ষীটি কোনোরকমে বলতে পেরেছিল—'বন্দী—রাজা গুমণ্ড—থিংভেলির।' তারপরই রক্ষীটি মারা গেল। আমরা ফিরে এসে সেনাপতিকে খবর দিলাম। তিনি আপনাকে খবর দেবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন।'

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঘরের কাঠের মেঝেয় কয়েকবার পায়চারি করল। পায়চারি থামিয়ে বলল—'হ্যারি—বোঝাই যাচ্ছে তিনজনেই রাজা গুমণ্ডের হাতে বন্দী হয়েছে।' একটু থেমে বলল—'আমরা রাজা গুমণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে চাইনি। কিন্তু এখন তো রাজা-রানী আর মারিয়াকে মুক্ত করতেই হবে। কাজেই প্রয়োজনে যুদ্ধে নামতেই হবে।' এদিকে খবরটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল। সব ভাইকিংরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—'যাও—সবাইকে ডেক-এ আসতে বলো।'

সব ভাইকিং ছুটে এল। জাহাজের ডেক-এ জড়ো হলো। ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—'ভাইসব—তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছো যে থিংভেলির রাজা গুমণ্ড রাজা ইনগল্‌ফ, রানী ও মারিয়াকে বন্দী করেছে। আমরা চাইনি যুদ্ধে জড়াতে। কিন্তু এখন প্রয়োজনে লড়াইতে নামতেই হবে। রাজা-রানী ও মারিয়াকে মুক্ত করতে হবে।' ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—'আমি আর হ্যারি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে রাজবাড়ি যাচ্ছি। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে রাজবাড়িতে এসো। সেনাপতির সঙ্গে কথা বলে আমরা ইতিকর্তব্য স্থির করবো।'

সব ভাইকিং চিৎকার করে উঠল—'ও—হো—হো—।' তারপর অস্ত্রঘরের দিকে ছুটল। যুদ্ধের উন্মাদনা জাগল ওদের মধ্যে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি গাড়ি চড়ে রাজবাড়িতে এল। সেনাপতি দরবার কক্ষে ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি ঘরে ঢুকল। সেনাপতি ওদের ভেলভেটে মোড়া কাঠের আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ওরা বসল। সেনাপতি বললেন—'সবাই তো শুনেছেন। এখন রাজা-রানী ও রাজকন্য মারিয়াকে মুক্ত করতে গেলে যুদ্ধ করতেই হবে।'

—'ঠিক আছে। আমাদের কিছু ঘোড়া দিতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'তার সব ব্যবস্থা হবে। প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনী যাবে। পেছনে যাবে পদাতিক বাহিনী। সীমান্ত পেরিয়ে প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনী থিংভেলির আক্রমণ করবে। তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে পদাতিক বাহিনী।' সেনাপতি বললেন।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—'আমার বন্ধুরা এখুনি এসে পড়বে। আপনি আপনার সৈন্যদের একত্র করুন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ভাইকিংরা রাজবাড়ির সামনের বিস্তৃত প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলো। রাজা ইনগল্‌ফের সৈন্যরাও অস্ত্র নিয়ে প্রান্তরে এসে মিলিত হলো। অশ্বারোহী ও পদাতিক দু'ভাগে সৈন্যদের ভাগ করা হলো। সমস্ত বাহিনীর সামনে রইল সেনাপতি, ফ্রান্সিস আর তীরধনুক হাতে শাঙ্কো।

রেভক্‌জাভিকের মানুষেরা এসে জড়ো হলো এই যুদ্ধযাত্রা দেখতে। রাজা-রানী ও মারিয়া রাজা গুমণ্ডের হাতে বন্দী হয়েছে এ সংবাদ ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেনাপতি থিংভেলির দিকে তরোয়াল তুলে ইঙ্গিত করলেন। সব সৈন্য চিৎকার করে উঠল। ভাইকিংরাও ধ্বনি তুলল—'ও—হো—হো—।' যুদ্ধযাত্রা শুরু হলো।

মাথার ওপরে স্বল্পালোকিত আকাশ, মাটিতেও কুয়াশা আর অন্ধকার আর এখানে ওখানে জমা তুষার। তার মধ্যে দিয়ে সৈন্যবাহিনী থিংভেলির দিকে এগিয়ে চলল। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে তখন।

সবার আগে চলেছে দশ-বারোজন মশালধারী। মশালের আলোয় ওরা পথ দেখিয়ে দিয়ে চলল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পর দূরে অস্পষ্ট দেখা গেল টানা পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় বরফ। ওটাই সীমান্ত। নিচু টানা পাহাড়ের চড়াই পেরোলেই থিংভেলির রাজ্যের শুরু।

হঠাৎ দেখা গেল সীমান্ত পাহাড় থেকে নেমে আসছে দুটো আলোর বিন্দু।

একটু এগিয়ে আসতেই বোঝা গেল দুটো চলন্ত মশাল। আর একটু পরে আলোছায়ায় দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছে। গাড়িটায় মশালের আলো পড়েছে। দেখা গেল রাজা ইনগল্‌ফের গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি তরোয়াল আকাশের দিকে তুলে থামবার ইঙ্গিত করলেন। সৈন্যবাহিনী আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়িটা কাছে এল। থামলে দেখা গেল গাড়িতে রাজা ও রানী। মারিয়া নেই। ছাতখোলা গাড়িটায় উঠে দাঁড়ালেন রাজা ইনগল্‌ফ। গাড়ির দু'পাশের মশালের আলো পড়েছে তাঁর মুখে। দু'হাত ওপরে তুলে রাজা ইনগল্‌ফ বলতে লাগলেন—'আমার বীর যোদ্ধারা—আমাকে আর রানীকে রাজা গুমণ্ড মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু বন্দী করে রেখেছে রাজকন্যা মারিয়াকে। রাজা গুমণ্ড এক শর্তে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। শর্তটা হচ্ছে আমাকে আর রানীকে রেভক্‌জাভিক ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্বে স্কালহল্টে চলে যেতে হবে। মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা সময় দিয়েছে রাজা গুমণ্ড। আমি ও রানী স্কালহল্টে পৌঁছে রাজা গুমণ্ডকে সংবাদ পাঠালে সে রাজকন্যা মারিয়াকে মুক্তি দেবে।' রাজা থামলেন।

সমস্ত সৈন্যরা নীরব। শুধু শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। দু'একটা ঘোড়ার ডাক শোনা যাচ্ছে। রাজা ইনগল্‌ফ আবার বলতে লাগলেন—'আমি এই শর্তে সম্মত হয়েছি। রাজকন্যা মারিয়ার জীবন রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তাই আমি আর রানী রাজবাড়িতে যাবো এখন। সব ব্যবস্থা করে স্কালহল্টে চলে যাবো। তোমরাও আমার সঙ্গে চলো। আমি রক্তপাত চাই না। বিনা রক্তপাতে রাজকন্যা মারিয়াকে মুক্ত করার জন্য অন্য কোনো পথ নেই। আমাকে এই নির্বাসন মেনে নিতেই হবে।'

এবার ফ্রান্সিস ঘোড়া নিয়ে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—'রাজা ইনগল্‌ফ—আমাদের একবার সুযোগ দিন। চেষ্টা করে দেখি রাজকন্যা মারিয়াকে মুক্ত করতে পারি কিনা।'

—'বেশ। দেখো চেষ্টা করে। কিন্তু কোনোরকম রক্তক্ষয় নয়।' রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস এবার সেনাপতির কাছে এল। বলল—'থিংভেলির রাজবাড়ির পথঘাট সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল একজন কাউকে আমাদের দিন।'

সেনাপতি চারদিকে তাকিয়ে একজন অশ্বারোহী সৈন্যকে ইঙ্গিতে ডাকল। লোকটি এগিয়ে এল। লোকটার মুখে দাড়ি-গোঁফ, একটু রোগামতো, লম্বা। সেনাপতি লোকটাকে দেখিয়ে বললেন—'এর নাম প্লিনি। থিংভেলির সব জায়গা ওর নখদর্পণে। ও আপনাদের সাহায্য করতে পারেবে।'

—'বেশ। এসো প্লিনি।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারিকে বলল—'বিস্কো আর শাঙ্কোকে নিয়ে আমি থিংভেলির যাচ্ছি। যদি পঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যে না ফিরি তবে তোমরা থিংভেলিরে আমাদের উদ্ধারে যেও।'

বিস্কো আর শাঙ্কো এগিয়ে এল। প্লিনিও এল। তখনই ফ্রান্সিস রাজার গাড়িতে রানীকে দেখল। মশালের আলোয় দেখল রানীর মুখ ভয়ার্ত, ফ্যাকাশে। গাড়িতে নিথর বসে আছেন।

সেনাপতির ইঙ্গিতে সৈন্যদল ফিরে চলল। ভাইকিংদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। একটা যুদ্ধ হতে হতে হলো না। আর কী করা যাবে। ওরাও ফিরে চলল।

মাথার ওপর টিমটিমে তারার আলোর আকাশ। সামনে কুয়াশা আর তুষারে ঢাকা অন্ধকার পথ। চলল ফ্রান্সিসরা ঘোড়া ছুটিয়ে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পর থিংভেলির নগরের কাছে ওরা পৌঁছল। একটা ছোট পাথুরে টিলার পেছনে ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল। বিস্কোরাও থামল। ফ্রান্সিস বলল—'ঘোড়া ছুটিয়ে নগরে ঢোকা যাবে না। সহজেই লোকের নজরে পড়ে যাবো। ঘোড়া এখানে রেখে নগরে ঢুকতে হবে।'

টিলার এপাশেই একটা ছোট ওক গাছ। সেই গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঘোড়াগুলো বাঁধা হলো।

ফ্রান্সিস বলল—'প্লিনি—ঘরবাড়ি পাথরের আড়ালে আড়ালে আমাদের রাজবাড়ি নিয়ে চলো।'

—'ঠিক আছে। আমার পেছনে পেছনে আসুন।' প্লিনি বলল। ফ্রান্সিসরা প্লিনির পেছনে পেছনে নগরে ঢুকল।

থিংভেলির খুব বড় নগর নয়। তবে খুব ছোটও নয়। সারা নগরের বাড়িঘর অন্ধকার। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পথের এখানে ওখানে পাথরের খাঁজে জ্বলন্ত মশাল। সেই মশালের আলোতেই পথ দেখে ওরা চলল। পাথরের বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে, কখনও ফাঁকা রাস্তা দৌড়ে পেরিয়ে ওরা রাজবাড়ির সামনে এল। পাথরের বাড়ির আড়াল থেকে দেখল রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে অনেক মশাল জ্বলছে। দ্বাররক্ষীরা সংখ্যায় আট দশজন। খোলা তরোয়াল হাতে প্রধান প্রবেশ পথ পাহারা দিচ্ছে। প্লিনি একটু চিন্তিত স্বরে বলল—কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

—কেন? কী হলো? বিস্কো বলল।

—এত পাহারাদার তো দেউড়িতে থাকে না। প্লিনি বলল।

—তার মানে তুমি বলতে চাইছো এত পাহারাদার এখানে সাধারণত থাকে না—এই তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। প্লিনি মাথা ঝাঁকাল।

—যাক এতে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—কী ব্যাপারে? শাঙ্কো বলল।

—অর্থাৎ মারিয়াকে এই রাজবাড়িতেই বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে। তাই এত জোরদার পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর প্লিনির দিকে তাকিয়ে বলল—সদর দেউড়ি ছাড়া অন্য কোন্ পথে ভেতরে ঢোকা যাবে? প্লিনি একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—রাজবাড়ির পেছনে একটা গোপন পথ আছে। চলুন সেটা দেখা যাক। আবার পাথরের বাড়ির আড়ালে আড়ালে ওরা চলল। রাজবাড়ি ঘুরে প্লিনি ওদের রাজবাড়ির পেছনে নিয়ে এল। পাথুরে দেয়ালের একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল প্লিনি। ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। প্লিনি চৌকো পাথর দিয়ে গাঁথা দেয়াল হাত দিয়ে দেখাতে লাগল। একটা জায়গায় চৌকো পাথর ধরল একটা। দু'হাতে পাথরটা আস্তে আস্তে টানতে লাগল। পাথরটা নড়ল। এবার প্লিনি পাথরটার দু'দিকে অল্প নাড়া দিয়ে দিয়ে খুলে আনতে লাগল। কয়েকবার এপাশ ওপাশ নেড়ে টানতেই পাথরটা খুলে এল। প্লিনি পাথরটা মাটিতে রাখল। পাথুরে দেয়ালে একটা খোঁদল

মত হলো। প্লিনি খোঁদলটায় হাত ঢোকাল। ওপাশের দেয়ালে দুটো মশাল আটকানা ছিল। তার আলোয় দেখা গেল খোঁদলটায় একটা গোল কাঠের চাকতি। প্লিনি চাকতিটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল। একটু মৃদু গোঁ গোঁ শব্দ উঠল। দেয়ালে একটা কাঠের দরজা লম্বালম্বি ফাঁক হলো। প্লিনি চাকা ঘোরাতে লাগল। ফাঁকটা বড় হ'তে লাগল। একসময় একজন মানুষ ঢোকার মত ফাঁক হলো। এখানেই প্লিনি একটা সাংঘাতিক ভুল করল। দরজার ফাঁকটা আরো বড় করল না। তাতে মাত্র একজন মানুষ ঢুকতে বা বেরোতে পারে এরকম বড় রইল। প্রথমে প্লিনি ঢুকল। ফ্রান্সিসরা এখানেও ভুল করল। ভেতরের অবস্থা কেমন অর্থাৎ নিরাপদ কিনা এটা প্লিনির কাছ থেকে না জেনেই ওরা তিনজন ঢুকে পড়ল। ঠিক তখনই প্লিনি চাপাস্বরে ব'লে উঠল—'পালাও।' ফ্রান্সিস দেখল গুমণ্ডের প্রায় দশ বারোজন প্রাসাদরক্ষীর দল মশাল হাতে দেয়ালের ধার ঘেঁষে পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিসরা ওদের প্রায় মুখোমুখি পড়ে গেল। ফ্রান্সিসরা ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু প্রাসাদরক্ষীরা ততক্ষণে ওদের দেখে ফেলেছে। ওরা খোলা তরোয়াল হাতে চিৎকার করতে ছুটে এল। ফ্রান্সিসরা ঐ ছোট দরজা দিয়ে একসঙ্গে বেরোতে পারল না। ফ্রান্সিস দেখল প্রাসাদরক্ষীদের চিৎকার শুনে আরো অনেক রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে। বিস্কো কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। শাঙ্কো তীরধনুক বাগিয়ে ধরল। প্লিনির মুখ ভয়ে সাদা হ'যে গেল। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল—বিস্কো-শাঙ্কো—লড়াই নয়।' বিস্কো তরোয়াল নামাল। শাঙ্কো ধনুক নামাল। প্রাসাদরক্ষীরা চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলে পায়ের কাছে পাথরের চত্বরে তরোয়াল ফেলে দিল। ঝনাৎ করে শব্দ হলো। দেখাদেখি বিস্কো আর প্লিনিও তরোয়াল ফেলে দিল। শব্দ হলো ঝনাৎ-ঝনাৎ। এবার চিবুকে ছুঁচোলো গোঁফ-ওলা একজন রক্ষী এগিয়ে এল। বোধহয় প্রাসাদরক্ষীদের দলনেতা। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল—'তোমরা কে?'

ফ্রান্সিস বুঝল প্রকৃত পরিচয় দিতে গেলে বিপদ বাড়বে। রাজা গুমণ্ড ওর পুরনো শত্রু। যদি রাজা গুমণ্ড শোনে যে ফ্রান্সিসকে বন্দী করা হয়েছে তাহলে শুধু ফ্রান্সিসের নয় ওদের সকলেরই জীবন বিপন্ন হবে। রাজা গুমণ্ড এই সুযোগ সহজে ছাড়বে না। মারিয়ার জীবনও বিপন্ন হবে। কোনমতেই ওদের আসল পরিচয় দেওয়া চলবে না। ফ্রান্সিস এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল—আমরা রাজা ইনগল্‌ফের সৈন। দলনেতা ছুঁচলে দাড়ি গোঁফে হাত বুলিয়ে বলল—'কিন্তু তোমাদের মধ্যে মাত্র একজনের পরনে রাজা ইনগল্‌ফের সৈন্যদের পোশাক।

—আমরা ছদ্মবেশে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন?

—রাজকুমারী মারিয়াকে উদ্ধার করতে। ফ্রান্সিস বলল।

ছুঁচলো দাড়ি গোঁফওয়ালা হো হো ক'রে হেসে উঠল। বলল—এবার তোমাদের কে উদ্ধার করে দেখ।' তারপর অন্য রক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বলল—'সব ক'টাকে কয়েদঘরে ভর।' একজন রক্ষী ফ্রান্সিসদের তরোয়ালগুলো তুলে নিল। ফ্রান্সিসদের কোমর থেকে তরোয়ালের খাপগুলোও নিল। শাঙ্কোর কাঁধ থেকে ধনুক তীরভরা তূনীর নিয়ে নিল। তারপর রাজবাড়ির পুবকোণার দিকে ধীর পায়ে চলল। অন্য

রক্ষীরা ফ্রান্সিসদের ধাক্কা দিয়ে বলল—'চল্।' ঐ রক্ষীর পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা চলল। ওদের পেছনে পেছনে চলল সাত আটজন রক্ষী। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল। বিস্কো আর শাঙ্কো রাগে ফুঁসতে লাগল। এভাবে লড়াই না ক'রে বন্দীত্ব মেনে নিতে হলো? কিন্তু উপায় নেই। ফ্রান্সিসের আদেশ। মানতেই হবে। যেতে যেতে ফ্রান্সিস চারদিকে নজর রেখে চলল। দেখল—দেয়ালের এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। অনেক প্রাসাদরক্ষী এখানে ওখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থায় এখন পালাবার চেষ্টা করলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ফ্রান্সিস চলল। চারদিকে ঠিক নজর রাখল। রাজবাড়ির পুবকোণায় একটা পাথরের ঘরের সামনে ওরা এল। ঘরটার কাঠের দরজার দু'পাশে দুটো মশাল জ্বলছে। দরজার সামনে দু'জন রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সবার সামনে যে রক্ষীটি ফ্রান্সিসদের তরোয়াল আর শাঙ্কোর তীর ধনুক নিয়ে যাচ্ছিল সে ঐ ঘরটার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার ধারে দাঁড়ানো একজন রক্ষী কোমর বন্ধনী থেকে লম্বা একটা চাবি বের করে দরজার বড় তালাটা খুলে দিল। রক্ষীটি ফ্রান্সিসদের তরোয়াল আর শাঙ্কোর তীর ধনুক নিয়ে ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস বুঝল—এই ঘরটা অস্ত্রাগার। এখানেই ওদের অস্ত্রগুলো রাখতে হবে। ঘরটার মাথায় একটা শীলমাছের ছবিওয়ালা পতাকা উড়ছে। রাজা গুমণ্ডের পতাকা। ঐ অস্ত্রাগার ছাড়িয়ে পাথুরে চত্বর। তারপরেই আর একটা পাথরের লম্বাটে ঘর। সেই ঘরের বাইরে অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। পাঁচ ছ'জন রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ঘরের সামনে ফ্রান্সিসদের দাঁড় করানো হলো। ফ্রান্সিস বুঝল—এটাই কয়েদঘর। ছুঁচোলো দাড়ি গোঁফওয়ালা রক্ষীদলের নেতা গলা চড়িয়ে বলল—'দরজা খোল্।' একজন রক্ষী ছুটে বন্ধ দরজার কাছে গেল। কোমর থেকে একটা লম্বা চাবি বের করল। বেশ বড় একটা তালা ঝুলছে দরজায়। রক্ষীটি সেই তালা খুলল। দরজাটায় ধাক্কা দিল। ঘর্ ঘর্ শব্দ করে লোহার দরজাটা খুলে গেল। ফ্রান্সিসরা খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস দেখল দরজাটায় খাড়া খাড়া লোহার গারদ বসানো। দরজার চৌকোণো চারদিক মোটা লোহার। হাত খোলা থাকলেও এই লোহার দরজা ভাঙা অসম্ভব। রক্ষীরা ওদের প্রায় ঠেলে গারদঘরে ঢুকিয়ে দিল। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল ঘরটা বেশ লম্বা। ঘরটায় চারটে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখা গেল ছোট ছোট কাঠের খুঁটিতে হাত বাঁধা অবস্থায় রয়েছে কয়েকজন বন্দী। দরজা খোলার শব্দে তাদের মধ্যে দু'একজন মুখ তুলে ফ্রান্সিসদের দেখল। বন্দীদের মধ্যে কয়েকজনের গায়ে রাজা গুমণ্ডের সৈন্যাবহিনীর পোশাক। হয়তো কোন অপরাধে ওদের বন্দী করা হয়েছে।

চার জন রক্ষী এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। অন্য বন্দীদের বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা মোটা দড়ি টানা দেওয়া। সেই দড়ির একটা মুখ বাঁদিকের পাথুরে দেয়ালে গাঁথা একটা লোহার আংটার সঙ্গে বাঁধা। অন্য দিকটা ডানদিকের দেয়ালে গাঁথা আর একটা লোহার আংটার সঙ্গে বাঁধা। একজন রক্ষী সেইদিকের আংটা থেকে দড়ির মুখটা খুলে হাতে নিল। অন্য রক্ষীরা ফ্রান্সিসদের জোর করে এক একেকটা খুঁটির সামনে বসিয়ে দিল। ওদের হাত দু'টো ছোট দড়ি নিয়ে বেঁধে দিল। এবার লম্বা দড়ি হাতে রক্ষীটি এসে ফ্রান্সিসদের বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে

দড়িটা টেনে নিল। তারপর ডানদিকের দেয়ালের লোহার আংটার সঙ্গে বেঁধে দিল। লম্বা দড়িটার মধ্যে সব বন্দীদের বাঁধা হাতও বাঁধা পড়ল। অন্য বন্দীদের মত ফ্রান্সিসদেরও হাত কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হলো। সব দেখে ফ্রান্সিসের মুখ গম্ভীর হলো। ওর মনে তখন একটাই প্রশ্ন—এই কয়েদঘর থেকে কি পালানো যাবে না? ফ্রান্সিসদের এভাবে বেঁধে রেখে রক্ষীরা চলে গেল। ওরা লোহার দরজা বন্ধ করে দিল। শব্দ হলো—ঢঢাং—ঢং। তালা লাগিয়ে দিল। একটু পরে বিস্কো ডাকল—ফ্রান্সিস?'

—উঁ? ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

—এখান থেকে পালানো অসম্ভব। বিস্কো বলল।

—হুঁ। দেখা যাক্। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার বন্ধুদের খবর পাঠাতে হয়। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—খবর পাঠাবে কী করে? খবর পাঠাতে হলেও তো আমাদের মুক্তি পেতে হবে।

—তাহলে উপায়? বিস্কো বেশ ভীতস্বরে বলল।

—দাঁড়াও—সব দেখিটেখি। তারপর পালানোর উপায় বার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। খুব ক্লান্তি বোধ করল ফ্রান্সিস। খুঁটিতে হাতবাঁধা অবস্থায় ও মেঝেয় শুয়ে পড়ল। খুব পুরু করে না হলেও মেঝেয় খড়বিছানো ছিল। ফ্রান্সিস খড়ের ওপর শুয়ে মাথার ওপর মোটা ঘাসে তৈরী চালার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ বুঁজল। ভাবতে লাগল—এভাবে মাত্র চারজনের আসা উচিত হয়নি। সব বন্ধুদের নিয়ে আসা উচিত ছিল। তার মানেই লড়াই। রক্তপাত। মৃত্যু। কিন্তু রাজা ইনগল্‌ফ রক্তপাত চান না। মৃত্যু চান না। লড়াই রক্তপাত না চাইলে বুদ্ধির লড়াই চালাতে হয়। সেজন্যেই ওদের একটু সাবধান হয়ে সজাগ থাকা উচিত ছিল। প্লিনির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে গিয়ে এই বিপদ হলো। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ডাকল—'প্লিনি।'

—বলুন। প্লিনি বলল।

—তুমি কি জানতে না ঐ গোপন দরজার কাছেও প্রাসাদরক্ষীরা থাকতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—বিশ্বাস করুন—এর আগেও দু'দুবার যুদ্ধের সময় ঐ গোপন পথ দিয়ে ঢুকে আমাদের সৈন্যদের উদ্ধার করেছি। আজকে এত প্রাসাদরক্ষী পাহারা দিচ্ছে আমি ভাবতেও পারিনি। আমিই আপনাদের এই বন্দী দশার জন্যে দায়ী। আমাকে মাফ করুন। প্লিনি বলল। ফ্রান্সিস চোখ খুলে হাসল। বলল—তুমি এই নিয়ে দুঃখ করো না। আমাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত ছিল। আমাদের সকলেরই, অভুল হ'য়েছে। ফ্রান্সিস বলল। আবার চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে রইল।

এখানে তো দিন ব'লে কিছুই নেই। শুধু রাত। কাজেই দিন-রাতের কোন হিসেব নেই। সময় ধরে হিসেব। প্রায় ঘণ্টা দু'তিন পরে হঠাৎ লোহার দরজায় শব্দ উঠল ঢং—ঢঢাং। শব্দ শুনে ফ্রান্সিস উঠে বসল। পাঁচ-ছ'জন রক্ষী ঢুকল। ওদের হাতে একটা বড় কাঠের পাত্র। একজনের হাতে বড় কাঠের থালার মত। তা'তে মোটা মোটা পোড়া রুটি। রক্ষীরা বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। সবার

সামনে রাখল বড় বড় পাতা। কোন গাছের পাতা কে জানে। পাতায় রুটি দিল। কাঠের হাতায় ক'রে হেরিং মাছ সেদ্ধ আর আলু সেদ্ধ ডাঁটা লতাপাতার তরকারী। বন্দীরা খেতে লাগল। ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল—পেট পুরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও।' খাবার খুব বিস্বাদ লাগল না। বিস্কো ও প্লিনি শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কথামত চেটেপুটে খেল। ফ্রান্সিস আরো রুটি তরকারী চাইল। সব খেল। কয়েদঘরের একপাশে রাখা মাটির বড় জালা। তাতে জল রাখা আছে। সবাইকে নারকোলের মালায় জল ভরে এনে খাওয়ানো হলো। বন্দীদের খাওয়া শেষ হ'তে রক্ষীরা চলে গেল। ঢঢাং—ঢং শব্দে লোহার দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেল। যাবার আগে ওরা অবশ্য বন্দীদের হাত বেঁধে দিতে ভুলল না।

ফ্রান্সিস খুঁটিতে হাতবাঁধা অবস্থায় আবার খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল। বলল—এখানে তো রাত-দিন বোঝার উপায় নেই। তবে মনে হয় আমাদের দেশে এখন রাত।

—'কী ক'রে বুঝলে? বিস্কো বলল।

—কারণ আমার ঘুম পাচ্ছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'বিস্কো—তোমরাও ঘুমিয়ে নাও। যতটা পারো বিশ্রাম নাও। শরীরটা। ঠিক রাখো।' বিস্কোরা জানে ফ্রান্সিস অনেক ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে কথা বলে। বিস্কোও ফ্রান্সিসের মত খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল। দেখাদেখি শাঙ্কোও। শুধু প্লিনি ব'সে রইল। প্লিনি তো এই দেশের মানুষ। হয়তো ওর এখনও ঘুমের সময় হয়নি। শাঙ্কো একসময় ডাকল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল। বিস্কো ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—'রক্ষীরা আমাকে ধরবার আগেই আমি আমার বড় ছোরাটা জামার নিচে লুকিয়ে ফেলেছিলাম।' ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ব'লে উঠল—'সাবাস্। ওটা অনেক কাজে লাগবে।'

দিনের হিসেবে ফ্রান্সিসদের বন্দীদশার দু'দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিসরা কেউই বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে পালাবে। ফ্রান্সিস শুয়ে বসে সারাক্ষণ পালানোর ফন্দী ভাবে। কিন্তু কোনটাই কাজের মনে হয় না।

ওদিকে রেভক্জাভিকে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা ভীষণ চিন্তায় পড়ল। দু'দিন কেটে গেল অথচ ফ্রান্সিসরা কেউ ফিরল না। নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে ওরা। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা ভেবে পাচ্ছে না কী করবে এখন। ওরা দল বেঁধে হ্যারির কাছে এল। হ্যারির মনও দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। ওরা হ্যারিকে প্রশ্ন করল এখন কী করবে?

হ্যারি বলল—দেখ—আমার মনে হয় ফ্রান্সিসরা ফিরে আসবে। যদি ওরা ধরা পড়েও ফ্রান্সিস ঠিক পালাতে পারবে। কিন্তু আমি ভাবছি—ধরা পড়লেই ফ্রান্সিসের জীবন বিপন্ন হবে। হয়তো ও পালাবার সময়টুকুও পাবে না।

—কেন? ও কথা বলছো কেন? বন্ধুরা ব'লে উঠল।

—তোমরা জানো না থিংভেলির রাজার পরিচয়। ওখানকার রাজা গুমণ্ড আমাদের রাজার সেনাপতি ছিল। তোমাদের অনেকেরই মনে আছে সোনার ঘণ্টা আনার সময় এই সেনাপতি গুমণ্ড আমাদের কী বিপদের মুখে ফেলেছিল? কাজেই একবার যদি গুমণ্ড ফ্রান্সিসকে চিনতে পারে তাহ'লে ফ্রান্সিসকে ও সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে। আমার ভীষণ দুশ্চিন্তার কারণ এটাই। তবে ফ্রান্সিস যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ধরা পড়লেও ও আত্মপরিচয় দেবে না। বন্ধুদের কেউ কেউ বলে উঠল—'তাহ'লে আমরা আজই

থিংভেলির আক্রমণ করবো। ফ্রান্সিসদের আর মারিয়াকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আসবো। হ্যারি হেসে বলল—'ওটা করা আত্মহত্যার সামিল। আমরা সংখ্যায় পঞ্চাশজনের মত। রাজা গুমণ্ডের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শুধু আমরা লড়াই ক'রে পারবো না। হেরে যাবো। আমাদের অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারই চেয়ে—আরো একটা দিন অপেক্ষা করি। যদি এর মধ্যে ফ্রান্সিসরা ফিরে না আসে তবে রাজা ইনগল্ফের কাছে আমরা যাবো। একজন বন্ধু বলল—হ্যারি আর একটা কথা ভাববার আছে। রাজা গুমণ্ড রাজা ইনগল্ফ ও রানীকে মুক্তি দিয়েছিল একটি শর্তে যে রাজা ইনগল্ফ রেভক্জাভিক ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্বে স্কালহল্টে চ'লে যাবেন। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কালহল্টে চ'লে গেছেন এই সংবাদ পেলে তবেই রাজা গুমণ্ড রাজকুমারী মারিয়াকে মুক্তি দেবে। রাজা ইনগল্ফ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন।

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল—আমিও সংবাদ পেয়েছি। রাজ ইনগল্ফ রেভক্জাভিক ছেড়ে স্কালহল্টে চ'লে যাবার জন্যে সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে বলেছেন।' একজন ভাইকিং-বন্ধু বলল—'তাহ'লে তো রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তির ব্যাপরটা সহজ হ'য়ে গেল। হ্যারি হাসল। বলল—ব্যাপারটা অত সহজে ভেবো না। রাজা ইনগল্ফ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কালহল্ট চ'লে গেলেই গুমণ্ড এসে এই রেভক্জাভিকে রাজা হ'য়ে বসবে। তার রাজত্ব বাড়বে। কিন্তু রাজকুমারী মারিয়াকে কখনো মুক্তি দেবে না। গুমণ্ডকে আমি ভালভাবেই চিনি। ওর মত শয়তান ধুরন্দর এত সহজে এই সুযোগ ছেড়ে দেবে না। গুমণ্ড রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তিপণ হিসেবে এরপর আমাদের রাজার কাছে আরো অনেক অর্থ সুবিধা এসব দাবী ক'রে বসবে। তাই বলছিলাম আরো একটা দিন দেখি। যদি ফ্রান্সিসরা না ফেরে আর মারিয়াকেও রাজা গুমণ্ড মুক্তি না দেয় তবে রাজা ইনগল্ফের কাছে যাবো। বলবো—আপনার স্কালহল্টে যাওয়া চলবে না। আপনাকে রাজা গুমণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে। আপনার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থেকে আমরাও যুদ্ধ করবো।

—কিন্তু রাজা ইনগল্ফ কি তা'তে রাজি হবেন? একজন বন্ধু বলল।

—রাজি করাতেই হবে—হ্যারি বলল—রাজ গুমণ্ডের চালের কাছে আমরা বিনা যুদ্ধে হার স্বীকার করবো না। এখন আর কয়েকদিন আমরা অপেক্ষা করি। দেখা যাক্ কী হয়।

হ্যারির বুদ্ধিমত্তার ওপর ওর বন্ধুদের অগাধ বিশ্বাস। ওরা আর কোন কথা না ব'লে নিজেদের কেবিনে চলে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে দিন কাটছে। থিংভেলির কয়েদঘরে। সেদিনও ফ্রান্সিস খুঁটিতে হাত বাঁধা অবস্থায় খড়পাতা মেঝেয় শুয়ে আছে। তাকিয়ে আছে ঘরটার ওপরের ঘাসের আচ্ছাদনের দিকে। এখানে এক ধরনের মোটা ঘাস প্রচুর জন্মায়। সেই ঘাস শুকিয়ে নিয়ে বাড়িঘরের মাথায় লোক আচ্ছাদন করে। ফ্রান্সিস এরকম আচ্ছাদনের বাড়ি নিজেদের দেশে দেখেনি। ওর মনে একটা চিন্তা খেলে গেল—আচ্ছা—এই ঘাসের চাল কি খুব শক্ত হয়? ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। ডাকল—নিলনি—

—বলুন। প্লিনি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস বলল—আচ্ছা তুমি তো এই দেশের লোক। বলো তো ঐ মোটা ঘাসের চাল কি খুব শক্ত হয়? প্লিনি চালটা একবার দেখে নিয়ে বলল—গাছের সরু ডাল কাঠ এসব দিয়ে খাঁচা মত তৈরী করা হয়। তা'তে চেপে শুকনো ঘাস বসিয়ে এই চাল করা হয়। তা একটু শক্ত হয় বৈকি। তুষার বৃষ্টি জমা—বরফের চাপ তো পড়ে। কিন্তু ভেঙে পড়ে না।

—হুঁ। ফ্রান্সিস আরো মনোযোগ দিয়ে ঘাসের চালটা দেখতে লাগল। অনেক উঁচু। ঘরটার মাথার কাছে এপাশের দেয়ালে আর ওপারের দেয়ালে লোহার গারদ বসানো দু'টো ছোট জানালামত আছে। কাঁচের জানলা। অসম্ভব। অত উঁচুতে তো ওঠাই যাবে না। তখনই দেখল—ঘাসঢাকা চালের নিচে টানা টানা কড়ি কাঠের মত। গাছের ডাল ফালা ক'রে ওগুলো লম্বালম্বি বসানো। কড়িকাঠগুলো থেকে ঘাসের চালের মধ্যে হাত তিনেক ফাঁক। যদি কোনভাবে ঐ কড়ি কাঠ পর্যন্ত ওঠা যায়—ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিস্কো ফ্রান্সিসকে লাফিয়ে উঠতে দেখে ব'লে উঠল—কী হলো ফ্রান্সিস?

—মুক্তি। ফ্রান্সিস হেসে মৃদুস্বরে বলল। কথাটা সকলের কানে গেল না। কিন্তু বিস্কো, শাঙ্কো, প্লিনির কানে গেল। ওরা অবাক হ'য়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। কী বলতে চায় ফ্রান্সিস? বিস্কো শাঙ্কো, ফ্রান্সিসকে ভালো ক'রেই চেনে। ফ্রান্সিস কখনো বাজে কথা বলে না। নিশ্চয়ই মুক্তির কোন পথ ও খুঁজে পেয়েছে। প্লিনি ভাবল—লোকটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। এই কয়েদঘর থেকে এই পাহারাদারদের হাত থেকে মুক্তি? অসম্ভব। ফ্রান্সিস ফিস্ ফিস করে বলল—খাওয়াদাওয়ার পর কাজে লাগবো। সব তৈরী থেকো।' এবার ফ্রান্সিস ব'সে পড়ল। কিন্তু শুয়ে পড়ল না। চোখ বুঁজে ভাবতে লাগল।

ঘণ্টা কয়েক পরে লোহার দরজায় ঢং-ঢঢাং শব্দ উঠল। রক্ষীরা খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিসদের খাওয়াদাওয়া শেষ হ'তে রক্ষীরা ওদের হাত বেঁধে দিয়ে চলে গেল। ঢঢাং-ঢং শব্দ তুলে দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। বাইরে পাহারাদারদের বিশেষ সাড়া শব্দ নেই। ফ্রান্সিস বসা অবস্থাতেই বিস্কোর যতটা কাছে আসা সম্ভব এল। তারপর বাঁধা হাত দু'টো বিস্কোর জামার তলায় ঢুকিয়ে দিল। আস্তে আস্তে বিস্কোর বড় ছোরাটা বের ক'রে নিয়ে এল। ছোরাটা বিস্কোর হাতে দিল। বিস্কো বাঁধা হাত দু'টো দিয়ে ছোরাটার বাঁট ধরল। তারপর ফ্রান্সিসের হাতবাঁধা দড়িটা কাটতে লাগল। উত্তেজনায় বিস্কোর হাত কাঁপছে। ও ঠিকমত ছোরাটা ঘষ্‌তে পারছিল না। ছোরার ফলাটা এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে ফ্রান্সিসের হাতে কব্জিতে বসে যাচ্ছিল। বেশ কয়েকটা জায়গা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস ওসব গায়ে মাখল না। শুধু দাঁতচাপা স্বরে বলল—জলদি। একটুক্ষণের মধ্যেই দড়ি কেটে গেল। ফ্রান্সিস খোলা হাত নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছোরাটা নিয়ে বিস্কোর হাতের বাঁধার দড়িটা কেটে ফেলল। বিস্কোকে ছোরাটা দিল। বলল—সবাইর দড়ি কাটো। কিন্তু লম্বা দড়িটা কেটো না। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল দরজার দিকে। লোহার দরজায় কান পাতল। বাইরেরটা নিঝুম। শুধু দু'জন পাহারাদারের জুতোর মৃদু খট্ খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দরজা থেকে স'রে এসে ঘরটার মাঝামাঝি দাঁড়াল। বিস্কো ততক্ষণে

প্রায় সব বন্দীর হাতের দড়ি কেটে দিয়েছে। অন্য বন্দীরা অবাকচোখে ফ্রান্সিসের কাণ্ড দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস এবার লম্বা দড়িটা যে লোহার কড়ার সঙ্গে বাঁধা সেখানে গেল। কড়া থেকে দড়ির বাঁধনটা খুলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা জাতিতে ভাইকিং। জাহাজের ব্যাপারে ওরা সুদক্ষ। জাহাজে পাল খাটানো থেকে শুরু ক'রে নানা কাজে দড়ি দড়া বাঁধতে হয় খুলতে হয়। ওরা এসব ব্যাপারে নিপুণ। খুব সহজেই ফ্রান্সিস দু'টো লোহার আংটা বাঁধা দড়ি খুলে ফেলল। এবার লম্বা দড়ির একটা মাথা নিয়ে বিস্কোর কাছে এল। বিস্কোর দড়ি কাটার কাজ শেষ। সব বন্দীরা হাত খোলা। ফ্রান্সিসরা ছাড়া অন্য বন্দীরা তখনও অবাক। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি পায়নি। তবু হাত দু'টো তো খোলা। এটাই বা কম কি। বিস্কোর হাত থেকে ফ্রান্সিস ছোরাটা নিল। লম্বা দড়ির এক কোণায় ছোরাটা বাঁধল। তারপর ওপরে কড়িকাঠের দিকে তাকাল। ছোরাটা দড়ির সঙ্গে দোলাতে দোলাতে কড়িকাঠের দিকে ছুঁড়ে দিল। বার তিনেক ফস্‌কে গেল। তারপর দড়ি বাঁধা ছোরা কড়িকাঠের ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে নিচে ঝুলে পড়ল। ফ্রান্সিস একপাশের দড়ি ছাড়তে লাগল। আস্তে আস্তে ছোরা বাঁধা দড়ির মুখটা নিচে নেমে আসতেই ফ্রান্সিস ধরল। ছোরাটা খুলে কোমরে গুঁজল। বিস্কোদের দিকে তাকিয়ে বলল—দড়ির একটা দিক তোমরা টেনে ধর। অন্য দিকটা ধ'রে আমি উঠবো। বিস্কো ইঙ্গিতের সব বন্দীকে ডাকল। সব বন্দীরা এগিয়ে এল। ওরা সবাই দড়ির একটা দিক টেনে ধরল। দড়ির অন্য দিকটা ধ'রে ফ্রান্সিস কড়িকাঠের দিকে লক্ষ্য ক'রে দড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। জাহাজে দড়ি ধ'রে ওঠা নামায় ফ্রান্সিসরা সুদক্ষ। একটুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস কড়িকাঠটা ধ'রে ফেলল। শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কড়িকাঠের ওপর বসল। মাথা নিচু ক'রে বসতে হলো। কারণ কড়িকাঠ আর ঘাসের চালের ফাঁক তিন ফুট মত। এবার ফ্রান্সিস কোমর থেকে ছোরাটা বের করল। মাথার ওপর মোটা ঘাসের ছাউনি। ছাউনির আঁটি বাঁধা ঘাসের আস্তরণ শক্ত ক'রে একটা কাঠের খাঁচার সঙ্গে বাঁধা। ফ্রান্সিস প্রথমে খাঁচাটার বাঁধা দড়িগুলো কাটতে লাগল। বেশ কয়েকটা খাঁচার দড়ি কাটতেই ঘাসের আঁটিগুলো আলগা হ'য়ে গেল। খাঁচার কাঠগুলোও তখন আলগা হ'য়ে গেছে। কাঠগুলো ফ্রান্সিস দু'হাতে সরাতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যে খাঁচার কাঠের টুকরোগুলো একেবারে আলগা হ'য়ে গেল, ফ্রান্সিস এবার ওপরের ঘাসের ছাউনি দু'হাত দিয়ে টেনে টেনে সরাতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যে খাঁচার কাঠের টুকরোগুলো একেবারে আলগা হ'য়ে গেল, ফ্রান্সিস এবার ওপরের ঘাসের ছাউনি দু'হাত দিয়ে টেনে টেনে সরাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘাসের আঁটি স'রে গিয়ে মাথার ওপরে কুয়াশা ঢাকা আকাশ দেখা গেল। একজন মানুষ বেরুতে পারে এরকম ফাঁক হ'য়ে গেল। নিচে দাঁড়ানো বিস্কো শাঙ্কো আর অন্যান্য বন্দীরা অবাক চোখে ফ্রান্সিসের কাণ্ড দেখতে লাগল। ছাউনি ফাঁক হ'তে, আকাশ দেখা যেতে বন্দীরা পালাবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। ফ্রান্সিস ছোরা কোমরে গুঁজে তাড়াতাড়ি দড়ি ধ'রে নেমে এল। ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল চেপে চাপাস্বরে বলল—'চুপ।' তারপর ইশারায় সবাইকে কাছে ডাকল। ফিস্ ফিস্ করে বলল—'ওপরে ঘাসের ছাউনিতে ফোকর করেছি। কিন্তু ছাউনি হাল্কা। সবাই একসঙ্গে দাঁড়াতে পারবো না। কাজেই একজন একজন ক'রে দড়ি বেয়ে উঠে ছাউনি যে

পাথরের দেয়ালের ওপর গাঁথা সেই দেয়ালের সঙ্কীর্ণ মাথায় দাঁড়াতে হবে। সবশেষে আমি উঠবো। তারপর কড়িকাঠে বাঁধা মোটা-দড়িটা নিয়ে ছাউনির দেয়াল থেকে পেছনে নিচে মাটিতে নামিয়ে দেব। আর দড়ি ধ'রে ধ'রে একজন ক'রে মাটিতে নেমে যাবো। এতে সময় বেশি লাগবে। কিন্তু উপায় নেই। দু'তিনজন একসঙ্গে নামতে গেলে দড়ির টানে কড়িকাঠ ভেঙে যাবে। এবার কাজে নামো, যা বললাম মনে রেখো। 'ফ্রান্সিসের নির্দেশমত সবাই একজন একজন ক'রে দড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। ছাউনির ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দেয়ালের অল্প জায়গায় দাঁড়াতে লাগল। সবশেষে ফ্রান্সিস উঠল। ও দড়িটা তুলে নিয়ে পেছনের দেয়ালের গা লাগিয়ে দড়িটা মাটিতে নামিয়ে দিল। এবার একজন একজন ক'রে পাথর বাঁধানো চত্বরে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস ফিস্ ফিস্ ক'রে ওদের কানে কানে ব'লে দিল—'দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াবে।' সবাই নেমে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। সবশেষে ফ্রান্সিস নামতে যাবে—দেখল পূবদিকের একটা পাথরের বাড়ি পাশ ছাড়িয়ে ছয় সাতজন প্রাসাদরক্ষী পাথরের চত্বর দিয়ে আসছে। দু'জনের হাতে মশাল। ফ্রান্সিস নামল না। চুপ ক'রে দড়ি ধ'রে বসে রইল। রক্ষীদের মশালের আলো এতদূর এলো না। বিস্কোরা অন্ধকারে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে রইল। রক্ষীরা পাথরের চত্বরে থপ্ থপ্ শব্দ তুলে চলে গেল। চলে গেল রাজবাড়ির দিকে।

এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দড়ি ধ'রে নেমে এল। নেমেই দ্রুতহাতে কোমর থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর হাত পাঁচেক দড়ি কেটে নিল। দড়িটা কোমরে জড়িয়ে রাখল।, যদি পরে কোন কাজে লাগে। ফ্রান্সিসরা ছাড়া অন্য বন্দীরা যারা ছিল তারা এবার ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফিস্ ফিস্ ক'রে একজন বলল—'আপনি আমাদের বাঁচালেন। রাজা গুমগুের কয়েদঘরে যে একবার কয়েদ হয় সে আর কোনদিন জীবন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। কত নিরীহ প্রজাদের যে গুমগু হত্যা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা রাজা গুমগুের সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম। রাজার আদেশে একদল নিরীহ নারী-শিশুকে হত্যা করার আদেশের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কয়েদঘরে বন্দী করা হয়েছিল। আপনার জন্যে মুক্তি পেলাম। এবার আমরা পালাই। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল—না ভাই—তোমাদের আমাদের সঙ্গেই পালাতে হবে। তোমরা নিরস্ত্র। যদি ধরা পড় তোমরা লড়াইও করতে পারবে না। তোমরা গুমগুের সৈন্যদের হাতে বিনাযুদ্ধে মারা যাবে। ততক্ষণে রাজা গুমগুের পাহারাদার সৈন্যরাও জেনে যাবে যে আমরা পালিয়েছি। নিরস্ত্র আমরাও ধরা পড়বো। আমরাও বাঁচবো না।

—তা'হলে এখন কী করবেন? বন্দী সৈন্যদের মধ্যে থেকে একজন বলল। ফ্রান্সিস সবাইকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করল। সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস নিচুস্বরে বলল—'আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা চলবে না, আমরা এখন অস্ত্রঘরে যাবো। অস্ত্রঘর থেকে আমাদের অস্ত্রগুলো উদ্ধার করবো। তারপর প্লিনি যে গোপন দরজা দিয়ে ঢোকার ব্যবস্থা করেছিল সেই গোপন দরজা খুলে পালাবো। এবার চলো অস্ত্রাগারে।' সবাই পাথরের বাড়ির দেয়ালের আড়ালে আড়ালে চলল। সৈন্যরা যখন ফ্রান্সিসদের ধ'রে নিয়ে আসছিল তখন ফ্রান্সিস অস্ত্রাগারটি ভালো ক'রে দেখে রেখেছিল। অস্ত্রাগারের মাথায় শীলমাছ আঁকা পতাকাটা উড়ছিল। ফ্রান্সিস দেখেই

চিনল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে সবাইকে দাঁড়াতে বলল। তারপর অস্ত্রাগারের পাথরের দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে দেখল—অস্ত্রাগারের দরজায় দু'জন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে দু'জন দরজার সামনে ঘুরছে, দরজার দু'পাশে দু'টো মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'বিস্কো—আমি বাঁদিকেরটা। তুমি ডানদিকেরটা। গলা চেপে ধ'রেই চোখ-মুখ ঢেকে বেঁধে ফেলবে।' অন্যদের দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে ব'লে ফ্রান্সিস আর বিস্কো কুয়াশা ঢাকা চত্বর মাথা নিচু ক'রে পেরিয়ে পাহারাদার দু'জনের কাছাকাছি পৌঁছে অস্ত্রাগারের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল। একুট দম নিল। তারপর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে দু'জন পাহারাদারের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। পাহারাদার দু'জনের হাতের তরোয়াল ছিট্‌কে গেল। কুয়াশায় আস্তরণের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কো এত দ্রুত বেরিয়ে এল যে পাহারাদার দু'জন হকচকিয়ে গেল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস একটা পাহারাদারের গলা হাত দিয়ে চেপে ধরল। পাহারাদারটি টুঁ শব্দ করতে পারছে না। পাহারাদারদের কোমরের ফেট্টিটা ফ্রান্সিস অন্য হাতে খুলে ফেলল। তারপর ফেট্টিটায় পাহারাদারের চোখ-মুখ ঢেকে মুখ বেঁধে দিলে। নিজের কোমর থেকে দড়িটা বের ক'রে পাহারাদারটির হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল। কোমর থেকে ছুরি বের ক'রে বাকি দড়িটা কেটে বিস্কোর দিকে এগিয়ে ধরল। বিস্কোও একই কায়দায় অন্য পাহারাদারটির মুখ হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল। ফ্রান্সিস আগেই দেখেছিল মোটা পাহারাদারটির কোমরে চাবির গোছা ঝুলছে। ও চাবির গোছাটা নিল। চাবিটাও আগে দেখেছিল। সেই লম্বা চাবিটা খুলে দরজার বড় তালাটায় লাগাল। এক মোচড়েই তালাটা খুলে গেল। ওদিকে শাঙ্কো, প্লিনি আর অন্য সদ্য মুক্ত সৈন্যরাও ছুটে এল। সবাই অস্ত্রাগারে ঢুকল। দেখল দেয়ালে জ্বলন্ত মশাল আটকানো। সেই আলোয় দেখা গেল সারি সারি তরোয়াল বর্শা ঢাল এসব সাজানো। ফ্রান্সিস নিজেদের তরোয়ালগুলোর খোঁজে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। দেখল ঘরের ডানকোণায় ওদের তরোয়াল রাখা হ'য়েছে। সঙ্গে শাঙ্কোর তীর ধনুক। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে তীরের খাপ ধনুক তুলে নিল। ফ্রান্সিস, বিস্কো, প্লিনি নিজের নিজের তরোয়াল তুলে নিল। সদ্যমুক্ত সৈন্যরাও তরোয়াল ঢাল হাতের কাছে যেমন পেল নিয়ে নিল। ফ্রান্সিসের কানে এল বন্দী পাহারাদার দু'জনের গোঙানি। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—জলদি—বাইরে চলো। সবাই দ্রুত ছুটে অস্ত্রাগারের বাইরে এল। ফ্রান্সিস দরজায় তালা লাগাল। তারপর চাবির তোড়াটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চাপাস্বরে ডাকল—'প্লিনি।' প্লিনি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—'সেই গোপন দরজার কাছে নিয়ে চলো। ঐ দরজা দিয়েই আমরা পালাবো।' প্লিনি মাথা ঝাঁকিয়ে আগে আগে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ছুটল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। একটা লম্বাটে পাথরের বাড়ির পেছনে এসে প্লিনি দাঁড়াল। সবাই একটু হাঁপাচ্ছে তখন। প্লিনি সামনের পাথুরে চত্বরের পরে পাথরের দেয়ালে যেখানে দু'টো মশাল জ্বলছে সেইদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—ঐ দু'টো মশালের মাঝখানে সেই গোপন দরজাটা। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস সেই মশাল দু'টোর দিকে তাকিয়ে রইল। রক্ষী সৈন্যরা যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। এক মুহূর্তও দেরী করা চলবে না। ফ্রান্সিস দ্রুত চিন্তা ক'রে নিল। ঐ মশাল দু'টো আগে নেভাতে হবে। জায়গাটা অন্ধকার ক'রে ফেলতে হবে। তারপর দরজা খুলে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস সকলের

দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল—'আমি আর প্লিনি আগে যাচ্ছি। মশাল দু'টো নিভিয়ে দেব। মশাল নিভলেই তোমরা কোন শব্দ না করে দেয়ালটার কাছে চলে যাবে।' ফ্রান্সিস প্লিনিকে ইঙ্গিত করল।

তারপর মাথা অনেকটা নিচু করে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পাথরের চত্বর পেরিয়ে চলল। ফ্রান্সিসের দেখাদেখি প্লিনিও মাথা নিচু ক'রে চলল। দেয়ালের কাছে পৌঁছেই ফ্রান্সিস তরোয়াল খুলল। দু'টো লোহার আংটায় মশাল দু'টো রাখা। ফ্রান্সিস মাথা নিচু অবস্থাতেই তরোয়ালের ডগার এক খোঁচায় একটা জ্বলন্ত মশাল পাথরের চত্বরে ফেলে দিল। চত্বরে জমা বরফ জলে পড়ে জ্বলন্ত মশালটা নিভে গেল। ফ্রান্সিস এবার সতর্ক দৃষ্টিতে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চারিদিকে তাকাল। না। রক্ষীদলের মশালের আলো কোনদিকে দেখা যাচ্ছে না। এবার তরোয়ালের খোঁচায় আর একটা জ্বলন্ত মশাল ফেলে দিল। ওটাও নিভে গেল। জায়গাটা অন্ধকার হ'য়ে গেল। ওদিকে মশাল নিভতেই বিস্কো শাঙ্কো ওরা দল বেঁধে দ্রুতগতিতে পাথুরে চত্বর পেরিয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। প্লিনি গোপন দরজা খোলবার জন্য পাথরের ছোট চাঁইটা সরাচ্ছে তখনই দূরে কুয়াশা ঢাকা কয়েকটা মশালের আবছা আলো দেখা গেল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—'প্লিনি—জলদি।' প্লিনি ততক্ষণে পাথরটা খুলে ফেলেছে। কাঠের চাকতিটা ঘোরাতে শুরু করেছে। একটা মৃদু গোঁ গোঁ শব্দ তুলে লোহার দরজাটা খুলে যেতে লাগল। মশাল হাতে প্রাসাদরক্ষীরা তখন অনেকটা কাছে চ'লে এসেছে। একজনের বেরোবার মত ফাঁক হ'তেই ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—এক এক ক'রে বেরিয়ে যাও।' প্রথমে সদ্যমুক্ত গুমণ্ডের সৈন্যরা বেরোতে লাগল। তারপর বিস্কো, শাঙ্কো, তারপর প্লিনি আর ফ্রান্সিস। রক্ষী-সৈন্যরা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে। গোপন দরজা খোলা হয়েছে। বন্দীরা পালাচ্ছে। ওরা জ্বলন্ত মশাল হাতে ছুটে আসতে লাগল। এবার প্লিনি দেয়ালের ওপাশের চৌকোণো ফোকরের পাথরটা খুলল। কাঠের যন্ত্রটা ভেঙে দিল। পাথরের কয়েকটা ঘা মেরে কাঠের যন্ত্রটা ভেঙে দিল। দরজা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন দেয়ালের ওপাশে প্রাসাদ রক্ষীদের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। কিন্তু ওরা বন্ধ দরজা খুলতে পারল না। ফ্রান্সিসরা তখন কিছুটা এগিয়ে গেছে। প্লিনি ছুটে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। ফ্রান্সিস তখন কিছুটা এগিয়ে গেছে। প্লিনি ছুটে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। ফ্রান্সিস একটা উষ্ণ প্রস্রবণের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে বলল—প্লিনি, যেখানে ঘোড়া রেখে এসেছি সেখানে নিয়ে চলো।' প্লিনি উত্তর মুখে ঘুরল। তখনই রাজা গুমণ্ডের সদ্যমুক্ত সৈন্যদের একজন বলল—আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। এবার আমরা যাই।' ওরা পর পর ফ্রান্সিসের ডানহাত ধরে ঝাঁকুনি দিল। তারপর কুয়াশা আর অল্প অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কো প্লিনির পেছনে পেছনে ছুটল অল্প অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একদিকে লোকবসতি কম। কয়েকটা বাড়ি পড়ল। দরজা জানলা বন্ধ! অন্ধকার। প্লিনি ওদের পথ দেখিয়ে সেই ঝরাপাতার বনে নিয়ে এল। বনের ধারের ওক গাছের সঙ্গে ঘোড়াগুলো বাঁধা আছে দেখা গেল। যাক্— ঘোড়াগুলো চুরি হয়নি। এখন এই ঘোড়াই ভরসা। তিনজনে গাছে বাঁধা দড়ি খুলে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। প্লিনি ঘোড়া ছোটাল। ফ্রান্সিসরা প্লিনির পেছনে পেছনে ঘোড়া ছোটাল।

শীতার্ত হাওয়া এলোমেলো বইছে। চোখের সামনে কুয়াশা সেই হাওয়ায় কখনো সরে যাচ্ছে কখনো জট পাকাচ্ছে। চোখেমুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগছে। ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। মাথার ওপরে আকাশও সাদাটে কুয়াশায় ঢাকা। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘোড়া ছোটাল ফ্রান্সিসরা। ঘোড়াগুলোর মুখে ফেনা জমেছে। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। ফ্রান্সিসরাও ক্লান্ত। কয়েদঘরে খাওয়া ঘুম কোনটাই যথেষ্ট হয়নি। ফ্রান্সিস ভাবল—কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন। নিজেদের ঘোড়াগুলোরও। ফ্রান্সিস ডাকল—'প্লিনি।'

—বলুন। প্লিনি ওর দিকে তাকাল।

—আমাদের কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন। এখানে কোথাও লোকবসতি আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আর আধঘণ্টা ঘোড়া ছোটালে একটা ছোট্ট গ্রাম পাওয়া যাবে। ছোট্ট গীর্জা আছে। সেখানে একজন পাদ্রী আছেন। বেশ কয়েকঘর বসতিও আছে। প্লিনি বলল।

—তাহ'লে ওখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণ পরেই দূর থেকে একটা ছোট্ট গীর্জার তিনকোণা মাথা দেখা গেল। কাছে গীর্জার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল গীর্জার পাশে বেশ কয়েকটা বাড়ি। ওরা গীর্জাটার সামনে এসে ঘোড়া থামাল। দেখল ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। তাহ'লে এই ছোট্ট গাঁয়ের লোকেরা জেগে আছে।

ঘোড়া থেকে ওরা নামল। গীর্জার পাশেই একটা ন্যাড়া গাছ। গাছটায় ঘোড়ার দড়ি বাঁধল। গীর্জার পাশেই যে পাথর আর কাঠের ঘরটা আছে তার পাথুরে বারান্দায় ফ্রান্সিস উঠে এল। কাঠের দরজায় ধাক্কা দিল। ঘরের ভেতর থেকে এক বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'আসছি।' দরজা খুলে গেল। পাদ্রীর পোশাক পরা এক বৃদ্ধ মোটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিসরা মাথা নীচু ক'রে শ্রদ্ধা জানাল। বৃদ্ধ ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—

—তোমরা কোত্থেকে আসছো ভাই?

—আমরা থিংভেলির থেকে আসছি। রেভকজাভিক যাবো। ঘোড়াগুলোর জন্যে দানাপানি আর আমাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার। পাদ্রী হাসলেন। বললেন—তোমরা আমাদের অতিথি। তোমাদের খাদ্য দেওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য। ভেতরে এসো।

ফ্রান্সিসরা ঘরের মধ্যে ঢুকল। দেখল—ঘরটা লম্বাটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একপাশে একটা বিছানা। ওদিকের দেয়ালের কাছে একটা চৌকোনো গর্তে আগুন জ্বলছে। তা'তেই ঘরটা বেশ গরম হ'য়ে আছে। বাইরের ঠাণ্ডা থেকে ঘরের গরমে ঢুকে সকলেরই ভালো লাগল। একটা কাঠের টেবিল আর টানা বেঞ্চমত দেখিয়ে পাদ্রী বলল—'তোমরা বসো। আমি লোকজনকে খবর দিতে যাচ্ছি। তোমাদের খেতে দেবার মত যথেষ্ট খাদ্য পানীয় তো আমার ঘরে নেই।'

ফ্রান্সিসরা বেঞ্চমত জায়গাটায় বসল। পাদ্রী টেবিলে জ্বলন্ত মোমবাতিটা রেখে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই পাদ্রী ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকলে। তাঁর পেছনে দাড়িগোঁফঅলা একটি স্বাস্থ্যবান যুবকও ঢুকল। যুবকটি হেসে বলল—'আপনারা আমাদের অতিথি।

একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের খাবার আসছে।

—আমাদের ঘোড়াগুলো খুব পরিশ্রান্ত। বিস্কো বলল। যুবকটি হেসে বলল—ঘোড়াগুলোর দানাপানির ব্যবস্থা করেছি। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন।

ফ্রান্সিসরা সকলেই খুব ক্লান্ত। এতক্ষণে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পেরে একটু আরাম পেল। পাদ্রী আপনমনেই বলতে লাগলেন—'এখানে পাঁচ সাত ঘরের বাস। আমরা সবাই বড় ভয়ে ভয়ে আছি।

—কেন বলুন তো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাজা গুমণ্ড অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা। তার রাজত্বে আমরা কেউ সুখে নেই সারাক্ষণ ভয় কখন রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা এসে হাজির হয়। খুন জখম লুঠপাট ওদের কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার। রাজার কাছে নালিশ করতে গেলে কারো রেহাই নেই, রাজা গুমণ্ড তাকে ফাঁসিয়ে দেয়। সে কোন অভিযোগ অনুযোগ কানেই তোলে না। সৈন্যরা যা খুশী ক'রে বেড়ায়। পাদ্রী আস্তে আস্তে বললেন।

—তাহ'লে তো এখানে এক অরাজক অবস্থা চলছে। বিস্কো বলল। পাদ্রী কোন কথা না ব'লে আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালেন। ফ্রান্সিস বলল—আপনাদের উচিত সব প্রজাদের নিয়ে রাজা গুমণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

'অসম্ভব—' পাদ্রীমশাই হেসে মাথা নাড়লেন। ফ্রান্সিস বলল—আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—অনেকদিন। সাদা ভুরু কুঁচকে পাদ্রী বললেন। দেখছেনই তো ছোট্ট গ্রাম এটা। এক তুষার ঝড়ে পথ হারিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছিলাম। কতদিন আগের কথা। এই ছোট্ট গ্রামের মানুষেরা সেবাযত্ন ক'রে আমাকে বাঁচিয়েছিল। নইলে আমার বাঁচার কোন আশাই ছিল না। তারপর কী ক'রে এখানকার মানুষদের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম কী এক বন্ধনে। প্রথমে এদের ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠশালা খুললাম। তারপর আস্তে আস্তে অনেক অনাথ ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দিলাম। একটা আশ্রমমত গড়ে তুললাম।

—আশ্রমের খরচ চালান কী ক'রে? বিস্কো জিজ্ঞেস করল।

—ভিক্ষে ক'রে। মাঝে মাঝে থিংভেলির নগরে চ'লে যাই। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রি। অবশ্য কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন তাঁরা বরাবর আমাকে অর্থ সাহায্য করেন।

—রাজা গুমণ্ড সাহায্য করেন না? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। পাদ্রীমশাই হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন—কিচ্ছু না। কয়েকবার গেছি সাহায্য চাইতে। উনি একটা কথাই বলেছেন—এসব অনাথ বাচ্চাকাচ্চার বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। মরুক সব। কথাটা শুনে ফ্রান্সিসরা অবাক হ'য়ে গেল। একজন দেশের রাজা এ ধরনের কথা বলতে পারে?

দাঁড়ি গোঁফঅলা যুবকটি বলল—এই পাদ্রীমশাই আমাদের কাছে দেবতার মত। গীর্জার কাজ চালান আবার পাঠশালা, হাতের কাজের শিক্ষাকেন্দ্রও চালান। কত অনাথ ছেলে মেয়ে কী সুন্দর কম্বল, গরম পোশাক বোনে। ফ্রান্সিস এসব শুনে খুব খুশী হ'ল। পাদ্রীমশাইকে বলল—'আপনার মত মানুষেরা যত বেশী থাকবেন আমাদের ততই মঙ্গল।' 'কথাটা ব'লে বিস্কোকে বলল—বিস্কো দেখতো তোমার

থলিতে ক'টা স্বর্ণমুদ্রা আছে।' বিস্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা রেশমী থলি বের করল। থলি খুলে দেখল চারটে স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। ফ্রান্সিস স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে পাদ্রীমশাইর হাতে দিল। বলল—এর বেশী তো নেই। যা আছে দিলাম।'

পাদ্রীমশাই হেসে বললেন—আপনাদের এই দানই আমার কাছে অনেক। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। বলে পকেটে স্বর্ণমুদ্রা রাখলেন। তখনই কাঠের দরজা ঠেলে দু'জন স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল। তাদের হাতে বড় বড় কাঠের পাত্র। তারা সেসব টেবিলে রাখল। তারপর ছোট ছোট কাঠের থালা ফ্রান্সিসদের সামনে পেতে দিল। থালায় পরিবেশন করল গরম গরম গোল রুটি আর ভেড়ার মাংস। খাবার দেখে এতক্ষণে ফ্রান্সিস বুঝল যে ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। বিস্কোদের অবস্থাও তাই। সবাই খেতে লাগল। পাদ্রীও খেতে লাগলেন। যুবকটিও খেতে বসল।

সবাই খাচ্ছে। স্ত্রীলোক দু'জন চলে গেল। তখনও সবার খাওয়া শেষ হয় নি। হঠাৎ ফ্রান্সিসের কানে ঘোড়ার ডাকের শব্দ এল। ওদের ঘোড়া বাঁধা বারান্দার পরেই। ওদের ঘোড়ার ডাক নয়। খুব মৃদু শব্দ। দূর থেকেই এল শব্দটা। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। খাওয়া ফেলে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বিস্কো শাঙ্কো ওর দিকে অবাক চোখে তাকাল। বিস্কো বলে উঠল—কী ব্যাপার ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা আমাদের পিছু ছাড়েনি। শিগগির পালাও। জল্‌দি।' কথাটা ব'লেই ফ্রান্সিস দরজার দিকে ছুটল। বিস্কো শাঙ্কোও খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ছুটল ফ্রান্সিসের পেছনে। কিন্তু দরজা খুলতে গিয়েই ফ্রান্সিস থম্‌কে গেল। বাইরের তুষারগলা জলে কাদায় ঘোড়ার থপ্‌ থপ্‌ শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস দ্রুত ফিরে দাঁড়াল।

এক ছুটে পিছিয়ে এল। টেবিলে রয়েছে ওদের আধখাওয়া খাবারের কাঠের পাত্রগুলো। ফ্রান্সিস দুহাতে ওদের পাত্রগুলো টেবিল থেকে মেঝেয় ফেলে দিল। ঘরটার আর একপাশে তাকাল। দেখল পেছনে একটা কাঠের আগল দেওয়া কাঠের ছোট দরজা। ফ্রান্সিস ওদিকে কয়েকপা ছুটে বলল এদিকে। আগল খুলে দরজাটা খুলল। ঢুকে পড়ল অন্ধকার ছোট ঘরটায়। পেছনে পেছনে বিস্কোরাও। ওদিকে পাদ্রীমশাই আর যুবকটি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না ফ্রান্সিসরা পেছনের ঘরে আত্মগোপন করল কেন। একটু পরেই দরজায় ধাক্কার শব্দ শোনা গেল সেই সঙ্গে উঁচুগলায় চীৎকার, 'দরজা খোল্‌। খোল্‌ দরজা।' গুমণ্ডের সৈন্যরা এসেছে। পাদ্রীমশাই আর যুবকটির মুখভয়ে সাদা হয়ে গেল। ওরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আবার দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা আর চীৎকার—খোল্‌ দরজা!

ফ্রান্সিস অন্ধকারে ঘরটার চারিদিকে তাকাল যদি বাইরে বেরোবার কোন দরজা পাওয়া যায়। না—নেই। ঘরটায় গম আটার বস্তা। বড় বড় কাঠের থালা। আরো অন্য বস্তা সাজানো। বোঝা গেল ভাঁড়ার ঘর এটা। ফ্রান্সিস এবার ছোট কাঠের দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে দেখতে লাগল গুমণ্ডের সৈন্যরা কী করছে। ধাক্কার চোটে দরজা প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা। এসব দাড়িগোঁফঅলা যুবকটি ভয়ে ভয়ে দরজার কাছে গেল। তারপর দরজার আগলটা খুলে দিল। গুমণ্ডের সৈন্যরা হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে পড়ল। সবার হাতে খোলা তরোয়াল। সংখ্যায় ওরা পাঁচজন। প্রথমেই রয়েছে সেই ছুঁচোলো দাড়িগোঁফঅলা দলনেতাটি। সে ঢুকেই এক ধাক্কায়

যুবকটিকে মেঝেয় ফেলে দিল। ছুঁচোলো দাড়িগোঁফঅলা দলনেতা তরোয়ালের ডগাটা যুবকটির বুকের ওপর ঠেকাল। বলল—'এখানে পলাতক কয়েদীরা এসেছিল? যুবকটি মেঝেয় শোওয়া অবস্থাতেই মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিসরা যে পলাতক কয়েদী একথা তো সত্যিই যুবকটি জানতো না। ও সত্যি কথাটাই মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল। দলনেতা তরোয়াল সরাল। যুবকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দলনেতা একবার পাদ্রীমশাইর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল—দু'জন চলে যা। অন্য বাড়িগুলো দ্যাখ। দু'জন সৈন্য তরোয়াল হাতে বাইরে বেরিয়ে গেল। দলনেতা এবার টেবিলের ধারে কাঠের থালা ছিটোনো খাবার দেখতে পেল। তারপর সন্দেহ দৃঢ় হ'ল। ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে যুবকটিকে বলল—তুই মিথ্যে কথা বলছিস্। ওরা এখানে এসেছিল। তোরা ওদের ছেড়ে দিয়েছিস্। মর্ তবে।' দলনেতা যুবকটির বাঁ কাঁধে তরোয়ালের কোপ বসাল। রক্ত বেরিয়ে এল। যুবকটি কাঁধে হাত চেপে কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় ব'সে পড়ল। গোঙাতে লাগল।

ফ্রান্সিস দরজার ফোকর দিয়ে সব দেখছিল। ও এবার একটানে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফেলল। চাপা স্বরে বলল—'বিস্কো শাঙ্কো তৈরী হও।' বিস্কো আর প্লিনি সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে ধনুকে তীর চড়াল। দলনেতার এবার নজরে পড়ল ভাঁড়ার ঘরের কাঠের ছোট দরজাটার দিকে। ও এক পা এক পা ক'রে তরোয়াল উঁচিয়ে দরজাটার দিকে আসতে লাগল। পাদ্রীমশাই হঠাৎ দুহাত তুলে ছুটে এসে দলনেতার সামনে দাঁড়ালেন। কান্নাভেজা গলায় ব'লে উঠলেন—না—না।' দলনেতা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল বসিয়ে দিল পাদ্রীমশাইর বুকে। বৃদ্ধ দু'হাত তোলা অবস্থায় টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। তারপর গড়িয়ে মেঝেয় পড়ে গেলেন।

ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে উঠল—'লড়াই। তারপর পায়ের এক লাথিতে দরজা খুলে ছুটে গিয়ে দলনেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দলনেতা এত হঠাৎ আক্রান্ত হবে স্বপ্নেও ভাবে নি। ও কোনরকমে ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাল। তারপরেই শুরু হ'ল দু'জনের তরোয়ালের লড়াই। ততক্ষণে শাঙ্কোর ছোঁড়া তীর একজন সৈন্যের বুকে বিঁধে গেছে। সেও মারা পড়ে গেছে। অন্য সৈন্যটির ওপর তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিস্কো আর প্লিনি। দু'জনের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা সৈন্যটার ছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই কপালে তরোয়ালের ঘা খেয়ে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তখনই পাশের বাড়িগুলো থেকে নারী ও শিশু কণ্ঠের চীৎকার ও কান্নার রোল উঠল। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে চালাতে বলল—'বিস্কো—ওদের বাঁচাও।' বিস্কো প্লিনি আর শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তখনও ফ্রান্সিস আর দলনেতার তরোয়ালের লড়াই চল্‌ছে। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে চালাতে বুঝল ও যে কোন মুহূর্তে দলনেতাকে হত্যা বা আহত করতে পারে। কিন্তু ও তা করলনা। একবার হঠাৎ আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণেই এত জোরে তরোয়াল চালাল যে দলপতির হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে মেঝেয় ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়ে গেল। নিরস্ত্র দলনেতা তখন হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ওর মুখে মৃত্যুভয় ফুটে উঠল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে তরোয়ালের ডগাটা বুকে চেপে

ধরল। বলল—'তোমাকে আমি হত্যা করবো না। শুধু কয়েকটা কথা বলি শোন।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'কী জীবন তুমি কাটিয়েছ? রাজা গুমণ্ডের আদেশ পালন করেছো। ভালো খেয়ে পরে আনন্দ করেছো। আর নির্বিচারে নারী শিশুদের নিরীহ্ মানুষদের হত্যা করেছো। এই পৃথিবীতে তোমার মত নরপিশাচের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। অথচ দেখ—যে বৃদ্ধ পাদ্রীমশাইকে তুমি হত্যা করলে তিনি সারাটা জীবন এই বসতির মানুষদের প্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছেন। তাদের মঙ্গলের জন্যে নিজের সব আনন্দবিলাস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়েছেন। এমন একজন দেবতুল্য মানুষ মরে যাবেন আর তোমার মত নরপশু বেঁচে থাকবে এ তো হয় না। দলনেতা হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে উঠে ফ্রান্সিসের পায়ে পড়ল। দু'হাতে ফ্রান্সিসের পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বলল—

—আমাকে মারবেন না—আমাকে মারবেন না!

—না—তোমাকে মারবো না—' ফ্রান্সিস বলল—'আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর আমি যা বলবো তুমি তাই করবে।

—হ্যাঁ করবো—নিশ্চয়ই করবো। দলনেতা কাঁদতে লাগল।

—এই পাদ্রীমশাই এখানে যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন সেইভাবে তোমাকে বাকী জীবন কাটাতে হবে। উনি যা যা কাজ করতেন সেই সব কাজ তোমাকে করতে হবে। এখানকার সবাইকে ভালোবাসতে হবে। তাদের মঙ্গল ছাড়া তুমি আর কিছু ভাববে না। কী? রাজী? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি যা বলবেন আমি সে সব করবো। দলপতি বলল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল নামাল। বলল—'অবশ্য তোমার মত নরপশুর প্রতিশ্রুতিকে আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিনা। তবু তোমাকে বেঁচে থাকার একটা সুযোগ দিলাম।'

তখনই দরজা দিয়ে বাকি দুজন সৈন্য ঢুকল। পেছনে বিস্কো ওরা। সবাই হাঁপাচ্ছে। সৈন্য দু'টির সারা গায়ে রক্তের দাগ। ফ্রান্সিস ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—'এই দুজন কি কাউকে হত্যা করেছে?

—না—তার আগেই আমরা পৌঁছে গেছিলাম। তবে দু'একটা বাড়িঘর লুঠ করেছে। বিস্কো বলল।

—তবে ওদের বন্দী ক'রে রাখো। ফ্রান্সিস বলল। বিস্কো সৈন্য দুজনকে টেনে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢোকাল। তারপর ভাঁড়ার ঘরের কাঠের হুড়কোটা টেনে বন্ধ করে দিল।

এবার ফ্রান্সিস সৈন্যদের দলপতির দিকে তাকাল। বলল—এই আহত যুবকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। তোমাদের দু'জন সৈন্য যদি ম'রে গিয়ে না থাকে তাদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। পাদ্রীমশাইকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে গীর্জার পাশের বাগানে কবর দেবে। পাদ্রীমশাইর পোশাকের পকেটে চারটে স্বর্ণমুদ্রা পাবে তাই দিয়ে এইসব ব্যবস্থা করবে। তারপর যে পরিমাণ অর্থ থাকবে তা আশ্রমের কাজে ব্যয় করবে। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—'আমরা এখন রেভকজাভিক ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার এখানে আসবো। দেখবো তুমি যে প্রতিজ্ঞা করলে তা পালন করেছো কিনা। যদি দেখি তুমি এখান থেকে পালিয়ে গেছো—'। দলপতি দু'হাত নেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—না-না আমি প্রতিজ্ঞা করছি পালাবো না।

—দেখা যাক। তবে যদি পালাও তা'হলে আমি তোমাকে একদিন খুঁজে বার করবোই। তখন তোমাকে যে অবস্থায় পাবো যেখানে পাবো তোমাকে হত্যা করবো। 'মনে রেখো আমার নাম ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে পাদ্রীমশাইর মৃতদেহের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। দুঁহাতে মৃতদেহের ডানহাতটা তুলে নিল। শ্রদ্ধার সঙ্গে চুম্বন করল। আস্তে আস্তে হাতটা নামিয়ে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের চোখ দু'টো জলে ভরে উঠল। জামার হাতায় চোখ মুছে বিস্কোদের দিকে তাকাল। কান্নাভেজা গলায় বললো—'চলো।' সবার আগে ফ্রান্সিস পেছনে বিস্কো, শাঙ্কো ও প্লিনি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘরের গরম থেকে বাইরে বেরোতেই শীতার্ত হাওয়া ছুটে এল। ফ্রান্সিসের শরীরটা কেঁপে উঠল। গাছে বাঁধা ঘোড়াগুলোর কাছে ওরা এল। ঘোড়ায় চড়ল সবাই। ঘোড়া ছোটাল রেভকজাভিকের দিকে। সবার আগে প্লিনি পথ দেখিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলল।

ফ্রান্সিসরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল রেভকজাভিকের উদ্দেশ্যে। চারদিকের সাদাটে কুয়াশা ঘন হ'তে শুরু করল। ঘণ্টাকয়েক পরেই শুরু হ'ল তুষার ঝড়। সেই সঙ্গে তুষারবৃষ্টি। তুষারের ঝড় বৃষ্টিতে ফ্রান্সিসরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। তুষারঝড়ের সাঁই সাঁই শব্দের মধ্যে ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে ডাকল—'প্লিনি?' একটু দূর থেকে প্লিনি উত্তর দিল—বলুন।

—আর কতদূর? ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বলল।

— ঠিক বুঝতে পারছি না। প্লিনিও চীৎকার ক'রে বলল। এবার বিস্কোর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ফ্রান্সিস থামো নইলে আমরা দলছুট হয়ে যাবো। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। 'ফ্রান্সিস বলল—চলবে না। শুধু ঘোড়ার গতি কমিয়ে দাও। তারপর ফ্রান্সিস গলা জড়িয়ে বলল—' প্লিনি—তুমি সবার সামনে থাকো। মুখে শব্দ করতে থাকো। সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে আমরা ঘোড়া ছোটাব।' তখন 'প্লিনি চীৎকার ক'রে একটা গান গাইতে লাগল। সেই গানের শব্দ লক্ষ্য ক'রে ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কো ঘোড়া ছোটাতে লাগল। প্লিনি ঘুরে ফিরে সেই গানটাই গাইতে লাগল। এখানকার ঘাসের উপত্যকায় ভেড়া চরাবার সময় ভেড়া চালকরা যে গান গায় সেই গান।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তুষার ঝড় থেমে গেল। বৃষ্টির জোর কমল। তারপর বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। তখনই পাতলা কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল টানা পাহাড়ের চড়াই। রেভকজাভিকের সীমান্ত। ফ্রান্সিস টানা পাহাড় দেখেই বুঝল সেটা। ও চীৎকার ক'রে উঠল—'ও হো—হো'। বিস্কো আর শাঙ্কোও চীৎকার ক'রে উঠল—'ও হা—হো।' তুষারের ঝড়বৃষ্টিতে ফ্রান্সিসদের সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। হাওয়ার তেজ কমলেও ফ্রান্সিসরা ঠান্ডায় কাঁপতে লাগল।

টানা পাহাড়ের চড়াই পেরিয়ে ঘোড়া ছোটাল ফ্রান্সিসরা। এখন চারদিক পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে। কুয়াশার আস্তরণও পাতলা। দূর থেকে আলোর বিন্দু দেখা গেল। রেভকজাভিক নগরের আলো।

ওরা যখন নগরে ঢুকল তখন পথঘাট প্রায় জনশূণ্য। ঘরে ঘরে আলো নেভানো। পথে দুএকজন পথচারী। ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়ির সামনে এল। ঘোড়া থামাল। সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো শাঙ্কো তোমরা জাহাজে চলে যাও।

প্লিনি তুমিও বাড়ি যাও আমি রাজা ইনগলফের সঙ্গে কথা ব'লে জাহাজে ফিরবো।' বিস্কো শাঙ্কো আর প্লিনি চলে গেল! দ্বাররক্ষী একজন ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—'রাজা ইনগলফকে খবর দাও।

রাজা ঘুমিয়ে আছেন । 'দ্বাররক্ষী বলল।

ঘুম ভাঙাও। খবর দাও যে ফ্রান্সিস থিংভেলির থেকে ফিরে এসেছে। দ্বাররক্ষী আর কোন কথা বলল না। দ্রুতপায়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল।

ফ্রান্সিস রাজবাড়ির চত্বর আস্তে আস্তে হেঁটে পেরিয়ে এল। রাজবাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। এতদূর ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে। পেটপুরে খেতেও পারেনি। একটু পরেই সেই দ্বাররক্ষী ছুটে এল। বলল—'রাজা আপনাকে ডাকছেন। ফ্রান্সিস দ্বাররক্ষীর পেছনে পেছনে রাজবাড়ির অভ্যন্তরে ঢুকল। কয়েকটা ঘর পার হ'য়ে রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। দ্বাররক্ষী শয়নকক্ষে ঢুকল না। ফ্রান্সিস কাঁচঢাকা আলোতে দেখল রাজা ইনগলফ পাখির পালকের বিছানায় বসে আছেন। রাজা ইনগলফ ফ্রান্সিসের পেছন দিকে তাকালেন। মারিয়াকে না দেখে তিনি হতাশার ভঙ্গী করলেন।

বললেন—ফ্রান্সিস বলেছিলে রাজকুমারী মারিয়াকে মুক্ত ক'রে আনবে। ফ্রান্সিস একটু মাথা নত ক'রে বলল—না—পারলাম না। রাজার মুখ চিন্তাকুল হ'ল। একটু মাথা নেড়ে বললেন—'তাহ'লে তো আমাদের সৈন্যদের নিয়ে স্কালহল্টে চলে যেতেই হবে।' ফ্রান্সিস একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল—আপনি কি মনে করেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনি স্কালহল্টে চ'লে গেলে গুমন্ড তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে?

—জানি না। কিন্তু এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। রাজা হতাশস্বরে বললেন। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। আসলে ও এত পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল যে ভালো ক'রে গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছিল না। ও একটু মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বন্দরে এল ঘোড়ায় চড়ে। অনেক চিন্তা ওর মাথায়। জাহাজে উঠতেই বন্ধুরা ওকে ঘিরে ধরল। বিস্কো শাঙ্কোর কাছে সবই শুনেছে ওরা। ফ্রান্সিসের অভিযান ব্যর্থ। মারিয়াকে ওরা মুক্ত করে আনতে পারে নি। ফ্রান্সিস বন্ধুদের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—সবই শুনেছো তোমরা। আমি খুবই পরিশ্রান্ত। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করবো। তবে একটা কথা জেনে রেখো—মারিয়াকে আমি মুক্ত ক'রে আনবই। আজ অথবা কাল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ওর কেবিনঘরে চলে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে ফ্রান্সিস প্রায় ঘণ্টা চারেক ঘুমোল। এর মধ্যে হ্যারি বার দু'য়েক ফ্রান্সিসকে দেখে গেছে। ও ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙায় নি।

ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। কিন্তু ও শুয়েই রইল। ভাবতে লাগল এরপরে কী করবে। হ্যারি কেবিনঘরে ঢুকল। কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসের পাশে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—এখন আমরা কী করবো বলোতো?

—রাজা ইনগলফ কী বললেন? হ্যারি বলল।

—উনি স্কালহল্টে যাবার জন্যে মনস্থির ক'রে ফেলেছেন।

—তুমি বোধহয় জানো না স্কালহল্টের রাজা হ্জরলিফ রাজা ইনগলফের ভাই

হ্যারি বলল।

—না আমি জানতাম না। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজ পরিবার ওখানে সুখেই থাকবেন। কিন্তু ভাবনার কথা হ'ল আমরা কি করবো? এখানে রাজা ইনগলফের সৈন্যরা থাকবে না। গুমন্ড এসে এখানকার রাজা হ'য়ে বসবে। সে তার সৈন্যবাহিনীও নিয়ে আসবে। এখনকার চেয়েও আমাদের বিপদ হবে আরো বেশী। কাজেই আমাদেরও স্কালহল্টে চ'লে তারপর যেতে হবে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস হ্যারির কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। বলল—হ্যারি, সবাইকে জাহাজের ডেকে জমায়েত হ'তে বলো। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। আমি যাবো।'

হ্যারি সবাইকে জমায়েতের খবর দিতে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের ডেকে এসে জড়ো হ'ল। একটু পরেই ফ্রান্সিস এল সঙ্গে হ্যারি। এতক্ষণ সবাই কথাবার্তা বলছিল। ফ্রান্সিস আসতেই সবাই চুপ করল। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বলতে লাগল—'ভাইসব—তোমরা জানো থিংভেলির রাজা গুমন্ড অতীতে আমাদের দেশের সেনাপতি ছিলেন। আমাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে তাকে এখানে নির্বাসিত করা হয়। সে থিংভেলির রাজা হ'য়ে বসে। এখন সে এক চাল চেলেছে। রাজকুমারী মারিয়াকে সে কৌশলে অপহরণ করিয়াছে। মারিয়ার মুক্তিপণ হিসেবে সে দাবী ক'রেছে রাজা ইনগলফকে রেভকজাভিকের রাজত্ব ছেড়ে স্কালহল্টে চলে যেতে হবে। সোজা কথায় বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে গুমন্ড রেভকজাভিকের রাজা হ'য়ে বসবে। তার রাজত্বের সীমানা বাড়বে। ফ্রান্সিস থামল। ভাইকিংরা কেউ কোন কথা বলল না। মাথার ওপর পাতলা কুয়াশার আবরণের মধ্যে দিয়ে আকাশে কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে উত্তরে শীতার্ত হাওয়া বইছে। ফ্রান্সিস আবার বলতে লাগল—'আমি রাজা ইনগলফের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা চারজন মারিয়াকে মুক্ত করতে পারি নি এই জেনে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যে তিনি পরিবারসহ এবং সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে স্কালহল্ট চ'লে যাবেন। তাহ'লেই রাজা গুমন্ড মারিয়াকে মুক্তি দেবে। কিন্তু আমি গুমন্ডকে ভালো করেই চিনি। সে তার প্রতিশ্রুতি কক্ষণো রাখবে না। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলতে লাগল—'হ্যারির সঙ্গে এই নিয়ে কথা হ'য়েছে। আমি স্থির করেছি আমরাও জাহাজে চড়ে স্কালহল্টে গিয়ে থাকবো। এবার এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত বলো।' ফ্রান্সিস থামল। সবাই চুপ ক'রে রইল। নীরবতা ভাঙল বিস্কো। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস—আমরা যদি এখানে থাকি? লড়াই করি? গুমন্ডের সৈন্যবাহিনীকে যদি এখানকার অধিকার নিতে না দি? ফ্রান্সিস বলল—সেক্ষেত্রে দু'টো সমস্যা আছে। এক—রাজা ইনগল্‌ফের সৈন্যবাহিনী এখানে থাকবে না। লড়তে হ'লে আমাদের জনা পঞ্চাশেককে একটা বড় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। মরণপণ লড়াই করলেও আমরা পারবো না। দ্বিতীয়ত—মারিয়া এখনও থিংভেলির বন্দী হ'য়ে আছে। আমরা এখানে যুদ্ধে নেমেছি এই সংবাদ—গুমন্ড পেলে মারিয়ার বিপদ বাড়বে। বলা যায় না হয়তো রাজত্বের লোভে গুমন্ড মারিয়াকে হত্যার হুমকি দিতে পারে। তখন আমাদেরই যুদ্ধ থামাতে হবে। কাজেই সব্বদিক বিবেচনা ক'রে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা এখানে থাকবো না রাজা ইনগলফের সঙ্গে আমরাও স্কালহল্টে আশ্রয় নেব।'

ফ্রান্সিস থামল। সমবেত ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। দু'একজন বলে উঠল—'তবু আমরা যুদ্ধ করবো। কিন্তু আর কাউকে সমর্থক না পেয়ে ওরা চুপ ক'রে গেল। একজন ভাইকিং বলে উঠল—কিন্তু রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তি কী হবে? ফ্রান্সিস বলল—আমরা স্কালহল্টে জাহাজ নিয়ে থামবো। যদি কোনভাবে রাজা গুমন্ড মারিয়াকে মুক্তি না দেয় তবে আবার চেষ্টা করবো মারিয়াকে মুক্ত করতে। যদি কোনভাবেই না পারি তবে রাজা ইনগলফকে বাধ্য করবো যুদ্ধে নামতে। রাজা ইনগলফের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমরাও যুদ্ধ করবো। মারিয়াকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমরা কেউ আইসল্যান্ড ছেড়ে যাবো না।' ভাইকিংরা সবাই উল্লাস চীৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো—হো।

—এবার তোমরা বলো এখন কী করবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল একজন ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল—তুমি যা বলবে আমরা তাই করবো। সবাই প্রায় একসঙ্গে কথাটা সমর্থন করল।

—তাহ'লে বলছি—আমরা জাহাজ নিয়ে স্কালহল্টে গিয়ে থাকবো। রাজাকেও আমাদের জাহাজে আসতে অনুরোধ জানাবো। তিনি আমাদের সঙ্গী হ'লে ভালোই। তারপর রাজা গুমন্ড কী ক'রে সেটা দেখবো। তারপর প্রয়োজনে লড়াইয়ে নামবো। ফ্রান্সিস বলল। সভা ভেঙে গেল। ভাইকিংরা কথা বলতে বলতে নিজেদের কেবিনে চ'লে গেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও নিজেদের কেবিনে চলে এল। ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হ'য়ে ভাবতে লাগল—এবার কী করবে? বন্ধুদের মতামত জানা গেল। এবার রাজা ইনগলফের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

দিনের হিসেবে পরদিন ফ্রান্সিস রাজা ইনগলফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। সঙ্গে হ্যারিকে নিয়ে গেল। ওরা যখন রাজবাড়ি কাছে গেল দেখল দক্ষিণে সৈন্যদের ছাউনি থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে আসছে। রাজবাড়ির ওপাশের প্রান্তরে সৈন্যরা জড়ো হচ্ছে। এরা পদাতিক সৈন্য। রাজবাড়িরর সামনের বিরাট চত্বরে জড়ো হচ্ছে অশ্বারোহী সৈন্যরা। চারিদিকে সাজ সাজ রব। সবাই ব্যস্ত। বোঝাই যাচ্ছে রাজার আদেশে সৈন্যরা স্কালহল্টে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

দ্বাররক্ষীকে দিয়ে রাজাকে সংবাদ পাঠিয়ে ওরা দু'জনে মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকল। পাথরের টেবিলের চারপাশে রাখা বাঁকানো পায়াঅলা ওককাঠের চেয়ারে বসল। তখনই সেনাপতি কক্ষে ঢুকল। সেনাপতিও বসল। একটু পরে রাজা ইনগল্‌ফ কক্ষে প্রবেশ করলেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল।

রাজা তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন। রাজার মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল রাজা খুবই চিন্তান্বিত। নিজের রাজত্ব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। চিরশত্রু গুমন্ড তার প্রতিশ্রুতি রাখবে কিনা, মারিয়াকে মুক্তি দেবে কি না, এসব চিন্তা তো রাজার হবেই।

প্রথমে রাজা সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন—

—আপনার সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে?

—সৈন্যদলের জমায়েত এতক্ষণে হ'য়ে গেছে। এবার আপনার অনুমতি। সেনাপতি বলল।

—আপনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কালহল্টের উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করুন। পথে কোথাও যদি রাজা গুমন্ডের সৈন্যদের মুখোমুখি পড়ে যান—সংযত থাকবেন। অযথা সংঘর্ষ

ও রক্তপাত আমি পছন্দ করি না এটা আপনি জানেন।' সেনাপতি উঠে দাঁড়াল। মাথা নীচু ক'রে সম্মান জানিয়ে বলল—'জানি মহামান্য রাজা।' সেনাপতি চ'লে গেল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—মহামান্য রাজা—আপনি কখন যাবেন?

—ঘণ্টা কয়েক পরেই। রাজা বললেন।

—যদি কিছু না মনে করেন তাহ'লে একটা অনুরোধ জানাই।

—বলো।

—আমরা তো আমাদের জাহাজ চালিয়ে স্কালহল্টে যাচ্ছিই। যদি আপনারা আমাদের জাহাজে চড়ে যান তাহ'লে আমরা নিজেদের ভাগ্যমান মনে করবো। রাজা ইনগলফ্ কিছুক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—'হ্যা তা যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তোমাদের কোন অসুবিধা হবে নাতো।

তাহ'লে শোন—আমি ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে তোমাদের জাহাজে যাবো।'

ফ্রান্সিস ও হ্যারি উঠে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আমরা এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজে ফিরে এল। সবাইকে ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব—রাজা ইনগলফ আমাদের জাহাজে চড়ে স্কালহল্টে যেতে সম্মত হ'য়েছেন।' সকলেই খুব খুশী হ'ল। এবার হ্যারি বলল—'রাজপরিবারের বসবাসের উপযোগী কর। সব ভাইকিং হৈ হৈ ক'রে কাজে লেগে পড়ল।

ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে জাহাজের চেহারা ফিরে গেল। জাহাজের ডেক, সিঁড়ি, মাস্তুল কেবিনঘর সব ঝকঝক করতে লাগল। এমনিতেই জাহাজটা ছিল নতুন আর খুব ভালো। কাজেই ভাইকিংদের খুব খাটতে হ'ল না।

রাজপরিবারে থাকার জন্যে কেবিন ঘরটাও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হ'ল। মোটা মোটা কম্বলের বিছানা, পরিষ্কার বিছানার ঢাকনা, পরিচ্ছন্ন বালিশ সব ব্যবস্থা করা হ'ল। এবার রাজপরিবারের আসার জন্যে প্রতীক্ষা।

ঠিক সময়মতই রাজার মাথা খোলা গাড়ি এল। সেই কালো রঙের গাড়ির গা চক্চক্ করছে। তাতে সোনালি ফুল লতাপাতার কাজ। রাজা রানী ও সাত আট বছর বয়েসের রাজকুমার। রাজারানী ও রাজকুমারের পরনে খুব একটা জমকালো পোশাক নয়। রাজার গাড়ির পেছনে আর একটা সাধারণ গাড়িও এল। দেখা গেল সেটাতে একটা কাঠের লম্বামত শক্ত সিন্দুক। বোঝা গেল—ওটা রাজকোষ। স্বর্ণমুদ্রা হীরে মণিমাণিক্য আছে ওটাতে। আরো দু'টো বাক্স। জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিস ওদুটোতে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি বেশ ভালো পোশাক পরে জাহাজঘাটে দাঁড়িয়েছিল। রাজার গাড়ি এসে থামতেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে গেল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। রাজা, রানী রাজপুত্র গাড়ি থেকে নেমে এলেন। তারপর পাতা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠলেন। বিস্কো তাঁদের পথ দেখিয়ে নির্দিষ্ট কেবিন ঘরে পৌঁছে দিল। জাহাজ দেখে কেবিন ঘর দেখে রাজপুত্র খুব খুশী। সে সারা জাহাজে ছুটোছুটি করতে লাগল। রাজা ও রানী কেবিনঘরে ঢুকে চুপ ক'রে বসে রইলেন। দু'জনের কারোর মন ভালো নেই।

ফ্রান্সিস সেই কেবিন ঘরে ঢুকল। বলল—মহামান্য রাজা—আপনাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? রাজা মৃদু হেসে বললেন—না। তারপর বললেন—'ফ্রান্সিস আমার রাজকোষ একটা সিন্দুকে রাখা আছে। ঐ সিন্দুকটা একটা নিরাপদ জায়গায় রেখো।

—ওটা আমরা অস্ত্রঘরে রেখেছি। দু'জন ক'রে ভাইকিং সারাক্ষণ ঐ ঘর পাহারা দেয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রান্সিস বলল—দরজায় দু'জন পাহারাদার রয়েছে। আপনাদের যখন যা প্রয়োজন চাইবেন।' তখনই রানী মৃদুস্বরে বললেন—'মারিয়া থাকলে কত খুশী হ'ত। কথাটা শুনেও ফ্রান্সিসও দুঃখ পেল। বন্দিনী মারিয়ার কথা তখনই মনে পড়ল। ও বলল—'মহা মাননীয়া আপনি যে মারিয়াকে সত্যি ভালোবাসেন এটা আপনার কথা থেকেই প্রমাণিত হ'ল। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' কথাটা ব'লে ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চ'লে এল।

জাহাজ চলেছে। রাজা ও রানী নিজেদের কেবিন ঘর থেকে বড় একটা বেরোন না। সারাক্ষণ কেবিন ঘরেই থাকেন। দু'জনেরই মন খারাপ! মারিয়া এখনও মুক্তি পেল না। রাজা ইনগলফ ভাবেন মারিয়ার যদি কোন বিপদ হয় তাহ'লে ভাইকিংদের রাজার কাছে কী জবাবদিহি করবেন? রাজা গুমন্ডের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবো? এই চিন্তাটাও রাজা ইনগলফের মাথায় মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু তিনি রক্তক্ষয় চান না। এর আগে রাজা গুমন্ড দু'দুবার তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিল ব'লেই তিনিই যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দু'বারই রাজা গুমন্ড হেরে গেছে। এবার তাই তাকে বিপদে ফেলতে মারিয়াকে অপহরণ করেছে। রাজা গুমণ্ড ভালো ক'রেই জানে এবার রাজা ইনগলফকে চাপ দিয়ে সে শুধু তাঁর রাজত্বই পাবে না আরো কিছু সুবিধেও আদায় ক'রে নেবে। কিন্তু রাজা ইনগলফ এ অবস্থায় একেবারে অসহায়। কিছুই করার নেই তাঁর। তাই রাজা রানী দু'জনেই চিন্তিত। তাঁদের মনে আনন্দ নেই।

এদিকে রাজপুত্র খুব খুশী। সারাক্ষণ জাহাজের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়ায়। ছটোছুটি করে আর মাঝে মাঝেই ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে-ঢুকে গল্প শোনবার বায়না ধরে। ফ্রান্সিসের মন চিন্তাকুল। তবু রাজপুত্র এলেও খুশীই হয়। ওকে সোনার ঘণ্টা , হীরের পাহাড়ের গল্প বলে। রাজপুত্র গালে হাত দিয়ে অবাক চোখে সেসব গল্প শোনে। গল্প বলতে বলতে ফ্রান্সিসের মনে পড়ে যায় মার কথা, মারিয়ার কথা। মাও অবাক চোখে শুনতেন এইসব গল্প।—বলতেন—হ্যাঁরে তুই এতসব কান্ড করেছিস—এ্যাঁ! ফ্রান্সিস হাসতো। বলতো—তোমার ছেলে কি ঘরে বসে দুধ পনীর খাওয়ার ছেলে? মা বলতেন—আমার দরকার নেই অত দুঃসাহসী ছেলে। বাড়িতে আমার চোখের সামনে থাক্ তুই আমার, তা'তেই সুখ, তা'তেই আনন্দ। মারিয়াও কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মুখে গল্প শুনতো! তাই গল্প বলতে বলতে ওর মনটা উদাস হয়ে যায়। গল্প বলা থামিয়ে ও মার কথা মারিয়ার কথা ভাবে। রাজকুমার তাগাদা দেয়—তারপর কী হ'ল বলো না।' ফ্রান্সিস আবার গল্প বলতে শুরু করে।

দিনের হিসেবে দু'দিন পর সাদাটে ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে স্কালহল্ট বন্দরের অস্পষ্ট আলো দেখা গেল। আস্তে আস্তে জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ল। জাহাজ থেকে ঘাটের

গায়ে তক্তা ফেলা হ'ল। দেখা গেল দু'টো গাড়ি বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। রাজা ইনগলফের সেনাপতি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। বোঝা গেল সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আগেই পৌঁছে গেছে।। একটা মাথা খোলা গাড়ি থেকে রাজা হ্জরলিফ ও রানী নেমে এলেন। ও দিকে রাজা ইনগলফ্ ও রানী রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজঘাটায় নামলেন। রাজা হ্জরলিপ তো রাজা ইনগলফের ছোট ভাই। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। ভাইকিংরা ধরাধরি ক'রে রাজা ইনগলফের রাজকোষ সেই লম্বা সিন্দুকটা অন্য গাড়িটায় তুলে দিল। রাজা রানীরা ও রাজপুত্র সামনের গাড়িটায় চড়ল। গাড়োয়ান চাবুকের শব্দ ক'রে প্রথম গাড়িটা ছেড়ে দিল। পরের গাড়িটিও ওটার পেছনে পেছনে চলল। সেই গাড়িতে বসল রাজা ইনগলফের সেনাপতি। রাজা হ্জরলিফের দুই সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে পেছনে পেছনে চলল।

রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে পৌঁছল গাড়ি। দ্বাররক্ষীরা বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছিল। রাজাদের গাড়ি আসতেই ওরা মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। গাড়ি রাজবাড়িতে ঢুকল। রাজা হজরলিফের বাড়ি তেমন বড় না। তবে মোটামুটি সাজানো গোছানো।

রাজবাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন সবাই। রাজা ইনগলফ একটু বিশ্রাম নিলেন। তারপর মোমবাতির আলোর সামনে বসে মোটা পার্চমেনট কাগজে রাজা গুমন্ডকে চিঠি লিখতে বসলেন। লিখলেন—আমি প্রতিশ্রুতিমত সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কালহল্টে চ'লে এসেছি। এবার আপনার প্রতিশ্রুতিমত রাজকুমারী মারিয়াকে মুক্তি দিয়ে প্রেরিত দূতের সঙ্গে এখানে পাঠিয়ে দিন। রাজা ইনগলফ্ তার সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন। চিঠি থিংভেলিরে পৌঁছে দিতে বললেন। সেনাপতি চিঠি এনে প্লিনিকে খবর দিল। প্লিনি এলে তাকেই চিঠি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল। প্লিনি তখনই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হ'ল থিংবেলিরের উদ্দেশ্য।

দিনের হিসেবে পরদিন প্লিনি ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল। কিন্তু সঙ্গে মারিয়া নেই। প্লিনি রাজবাড়িতে ঢুকল। রাজা ইনগলফকে একজন রক্ষী খবর দিতে গেল। রাজা ইনগলফ বেশ ব্যস্ত হ'য়ে বাইরের ছোট ঘরটায় ঢুকলেন। প্লিনি মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—রাজা গুমন্ড কোন চিঠি দেন নি। আপনাকে জানাতে বলেছেন যে তিনি প্রথমে রেভকজাভিক যাবেন। নতুন রাজ্যের অধিকার বুঝে নেবেন। তারপর আপনাকে চিঠি দেবেন। ততদিন মারিয়াকে বন্দিনী থাকতে হবে। রাজা ইনগলফ মাথা নিচু ক'রে একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—ঠিক আছে তুমি যাও। ফ্রান্সিসকে সংবাদটা দিয়ে যেও।

প্লিনি জাহাজে উঠে ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করল। সব কথা বলল। পাশে হ্যারিও ছিল। সব শুনে ফ্রান্সিস বলল বুঝলে হ্যারি আমি এই আশঙ্কাই করছিলাম। রাজা গুমন্ড দাঁও মারার এই সুযোগ সহজে ছেড়ে দেবে না। মারিয়ার মুক্তির বিনিময়ও অনেক কিছু চাইবে।

—তাহ'লে এখন কী করবে? হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস শ্বাস ছেড়ে হতাশার ভঙ্গীতে দু'হাত ছড়িয়ে বলল—'কিচ্ছু করার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকা।'

প্লিনি বলল—রাজা গুমন্ডের কাছে আমাদের রাজার দূত হ'য়ে এর আগেও আমি গেছি। কথা ব'লে দেখেছি—অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক। সব সময় প্যাঁচ কষছে

কী করে আমাদের রাজাকে বিপদে ফেলা যায়।

—প্লিনি—'ফ্রান্সিস বলল—'যা বুঝতে পারছি গুমন্ডের বিরুদ্ধে রাজা ইনগলফকে কিছুতেই যুদ্ধে নামাতে পারবো না। কাজেই শেষ পর্যন্ত আবার আমাদের অভিযানে বেরোতে হবে। মারিয়াকে মুক্ত করতে হবে। তুমি তৈরী থেকো।

—নিশ্চয়ই।' প্লিনি বলল। তারপর প্লিনি চলে গেল।

দিনের হিসেবে কয়েকদিন পরেই প্লিনি সংবাদ নিয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। রাজা গুমন্ড তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রেভকজাভিকের দখল নিয়েছে। তারপর সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি হানা দিতে সৈন্যদের ঢালাও হুকুম দিয়েছে। সৈন্যরা অবাধে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ি হানা দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা, দামী পাথর, গয়নাগাঁটি লুঠ করছে। কেউ বাধা দিতে এলে বা প্রতিবাদ করলে নির্দ্বিধায় হত্যা করছে। সাধারণ মানুষদের ওপরও সৈন্যরা নির্বিবাদে অত্যাচার উৎপীড়ন চালাচ্ছে। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল—আমি জানতাম এটাই হবে। এখানেই শেষ নয়। গুমন্ড আরো স্বর্ণমুদ্রা দাবী করবে। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।

সত্যিই তাই ঘটল। রাজা গুমন্ডের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দু'জন দ্রুত এল রাজা ইনগলফের কাছে। রাজা গুমন্ড লিখেছে—আপনি রাজকোষ স্কালহল্টে নিয়ে গেছেন। ঐ রাজকোষ প্রেরিত দূতদের দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। রাজকোষ পেলেই রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তি কথা বিবেচনা করা হবে।

রাজা ইনগলফ দূত দুজনকে বসিয়ে রেখে ছোটভাই রাজা হ্জরলিফ এর সঙ্গে কথা বলতে অন্দরমহল এলেন। সব শুনে রাজা হ্জরলিফ বললেন—রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তির জন্য রাজকোষ এখন দিয়ে দাও।

রাজকুমারী মুক্তি পাক তারপর দু'জন মিলে সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিংভেলির আক্রমণ করবো।'

—না—না—রক্তক্ষয় আমি চাই না। রাজা ইনগলফ বললেন।

—ঠিক আছে—সে সব পরে ভাবা যাবে। তুমি এখন রাজকোষ দিয়ে দাও।

—বেশ। রাজা ইনগলফ তাঁর দেহরক্ষীদের আদেশ দিলেন। দেহরক্ষীরা ধরাধরি ক'রে সেই লম্বাটে কালো ফুল লতাপাতার কাজ করা সিন্দুকটা অন্দরমহল থেকে নিয়ে এল। রাজা হজরলিফের একটা মাথাখোলা গাড়িতে তুলে দিল। রাজা গুমন্ডর দূত দু'জনের একজন গাড়িতে বসে রইল। অন্যজন গাড়ি চালাল রেভকজাভিকের উদ্দেশ্যে।

ফ্রান্সিসরা প্লিনির কাছ থেকে এই সংবাদ পেল। ফ্রান্সিস পাশে বসা হ্যারির মুখের দিকে একবার তাকাল। কিন্তু কোন কথা বলল না। ভাইকিং বন্ধুরাও শুনল এই সংবাদ। তারা এসে ফ্রান্সিসকে বারবার বলতে লাগল—ফ্রান্সিস যুদ্ধ ছাড়া রাজকুমারী মারিয়াকে মুক্ত করা যাবে না। তুমি রাজা ইনগলফকে বল—আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল উপায় নেই। আমাদের হাত-পা বাঁধা। মারিয়ার বাঁচামরা এখন রাজা গুমন্ডের হাতের মুঠোয়। আমরা নিরুপায়।' হ্যারিও ভাইকিং বন্ধুদের একই কথা বুঝিয়ে বলল। বন্ধুরা রাগে ফুঁসে উঠল। কিন্তু নিজেদের অসহায়তার কথা ভেবে চুপ ক'রে রইল।

আইসল্যান্ডে তো এখন শুধুই রাত। দিন ব'লে কিছু নেই। কাজেই দিন রাতের

মোট হিসেবে কয়েকদিন পরেই প্লিনি এসে খবর দিল—রাজা গুমন্ড রেভজাভিকএ লুঠকরা ধনসম্পদ আর রাজকোষ নিয়ে থিংভেলিরে ফিরে গেছে। রেভকজাভিক রাজ এখন তার সেনাপতির অধীনে। তার হুকুমে রেভকজাভিকে অত্যাচার নিপীড়ন চলছে।

দিনকয়েক পরে থিংভেলির থেকে রাজা গুমন্ডের একজন দূত এল। সঙ্গে রাজা ইনগলফকে লেখা গুমন্ডের চিঠি। চিঠিতে গুমন্ড লিখেছে—আপনার রাজকোষ পেয়েছি। এবার আপনার বন্ধু ভাইকিংদের রাজাকে বলুন যেন উনি সোনার ঘণ্টা তাঁর যাদুঘর থেকে বের কঁরে আমাকে দিয়ে দেন। কারণ সোনার ঘণ্টা আমারই প্রাপ্য। তাহলেই তার মেয়ে মুক্তি পাবে। নইলে মুক্তির কোন আশা নেই।

রাজা ইনগলফ সমস্যায় পড়লেন। ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। অন্দরমহলে এলেন। ছোটভাই রাজ হজরলিফকে সব জানিয়ে বললেন এখন কী করবেন তিনি। দু'জনেই সমস্যাটা নিয়ে ভাবলেন। কথা বললেন। তারপর রাজা হজরলিফ বললেন—'দাদা তুমি চিঠি দাও। লেখ যে ভাইকিংদের রাজাকে সব জানিয়ে চিঠি দিচ্ছি। রাজা ইনগলফ দূতের হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠালেন। লিখলেন—আপনার দাবী জানলাম। আমি সবকিছু জানিয়ে একটা চিঠি দূত মারফৎ ভাইকিংদের রাজাকে জানাচ্ছি। মনে হয় মেয়ের মুক্তিপণের এই দাবী তিনি মেনে নেবেন। এজন্যে কিছু সময় যাবে। এরমধ্যে রাজকুমারীর যেন কোন ক্ষতি না হয়। দূত চিঠি নিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজে এসে প্লিনি সব সংবাদ ফ্রান্সিসকে জানাল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসে ছিল। সব শুনে হ্যারিকে ডেকে বলল—'চলো রাজা ইনগলফের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করব। একটু পরেই রক্ষী ওদের মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এল। গদীআঁটা চেয়ারে ওরা বসল। একটু পরেই রাজা ইনগল্‌ফ কক্ষে ঢুকলেন। তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা ইনগল্‌ফ হাতের ইংগিতে ওদের বসতে বললেন। বসল ওরা। রাজা চেয়ারে বসলে ফ্রান্সিস বলল—প্লিনির মুখে আমরা সব শুনলাম।

—তোমাদের রাজার মতামত জানাবার জন্যেই আমাকে সময় চাইতে হ'ল। 'রাজা বললেন। বেশ চিন্তাভারাক্রান্ত দেখা দিল রাজাকে।

—আপনি সময় চেয়ে ভালোই করেছেন। এতে আমাদের কাজের সুবিধা হল। ফ্রান্সিস বলল।

—কোন কাজের কথা বলছো। রাজা জানতে চাইলেন।

—আমরা কয়েকজন মিলে আবার থিংভেলির যাবো। যে কেরই হোক মারিয়াকে মুক্ত ক'রে আনবো। ফ্রান্সিস বলল। রাজা ইনগল্‌ফ মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। মাথা তুলে বললেন—'ফ্রান্সিস তুমি যথেষ্ট সাহসী বুদ্ধিমান। তোমাকে কিছু বলার নেই। কিন্তু এভাবে বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া, যদি তোমাদের কিছু হয়?

—আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন—' হ্যারি বলল—' ফ্রান্সিসরা বিপদে পড়লে আমরা সব ভাইকিং যাবো উদ্ধার করতে।

—তবু তোমাদের রাজা কী উত্তর দেন সেটা জানবার জন্যে তোমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত। রাজা বললেন। —না মাননীয় রাজা—' ফ্রান্সিস বলল—'এখনই ঠিক সময় অভিযানে বেরুবার। কারণ রাজা গুমন্ড এখন অনেক নিশ্চিন্ত। ও ভালো

ক'রেই জানে আমাদের রাজা তাঁর মারিয়াকে প্রাণের চেয়েও বেশী স্নেহ করেন ভালোবাসেন। সুতরাং আমাদের রাজা নিশ্চয়ই কন্যার জীবনের বিনিময়ে সোনার ঘণ্টা দিয়ে দিতে ইতস্তত করবেন না। কাজেই রাজা গুমন্ড এখন মারিয়াকে পাহারা দেবার ব্যাপারে একটু ঢিলে দেবেন। আমরা যে আবার হানা দিতে পারি—মারিয়াকে আবার মুক্ত করার জন্যে যেতে পারি এটা সে ভাবতেই পারবে না। তাই এই সুযোগ হাত ছাড়া করা চলবে না।' রাজা ইনগলফ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বেশ —দেখ চেষ্টা করে। ফ্রান্সিসরাও উঠে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে ওরা চলে এল।

সেইদিন জাহাজে ফিরেই ফ্রান্সিস হ্যারি, বিস্কো শাঙ্কো আর প্লিনিকে নিয়ে আলোচনায় বসল। কীভাবে অভিযান চালানো হবে বিপদের হাত থেকে বাঁচতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে—এই সব নিয়ে আলোচনা হ'ল।

দিনের হিসেবে পরদিনই ফ্রান্সিস বিস্কো শাঙ্কো আর প্লিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু করল থিংভেলিরের উদ্দেশ্যে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল প্লিনি।

পথে ওফাস নদী পড়ল। নদীর পাড়ে আছে একটা কাঠ বাঁধা ভেলার মত। বেশ বড়। নদীটি খুবই শান্ত। খুব বেশী বড়ও নয়। নদীর এপারে ওপারে এখানে ওখানে বরফ জমে আছে। দু'টো ঘোড়া নিয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কো কাঠের ভেলাটায় উঠল। লম্বা কাঠের লগি বিস্কো ঠেলতে লাগল। আস্তে আস্তে নদী পার হ'য়ে ঘোড়া দু'টো নিয়ে ওরা ওপারে নামল। কাঠের ভেলাটার সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বাঁধা ছিল। দড়ির মুখটা এপারে একটা ছোট গাছের সঙ্গে বাঁধা। প্লিনি এবার সেই দড়িটা ধরে টানতে লাগল। শূন্য ভেলাটা এপারে এল। এবার শাঙ্কো আর বিস্কো একইভাবে দুটো ঘোড়া নিয়ে নদী পার হ'ল। এবার একটা পাতাঝরা বড় গাছের নিচে বসল ওরা। সঙ্গে আনা খাবার খেল। একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু।

কুয়াশা কোথাও ঘন কোথাও পাতলা। মাথার ওপর সাদা ধোঁয়াটে আকাশ। তারা ঢাকা পড়ে গেছে। ম্লান আলো চারদিকে। সেই আলোয় পথ দেখে ওরা ঘোড়া ছোটাল।

পথে আর একবার বিশ্রাম নিল ওরা। খাওয়া দাওয়া করল। তারপর আবার ঘোড়া ছোটাল।

ঘণ্টা দশ-বারো কাটল। তারপর ওরা থিংভেলির নগরের দেয়ালের কাছে পৌঁছল। ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াগুলোর লাগাম একটা গাছের গায়ে বেঁধে দিয়ে পায়ে হেঁটে নগরে প্রবেশ করল। দেখল কোন বাড়িতে আলো জ্বলছে না। তার মানে সবাই ঘুমুচ্ছে। পথে এখানে ওখানে পাথরের দেয়ালে জ্বলন্ত মশাল। এ পথ সে পথ ঘুরে দেয়ালের আড়ালে প্লিনি ওদের রাজবাড়ির পেছনে নিয়ে এল। এখানেই দেয়ালের গায়ে আছে সেই গোপন দরজাটা। চৌকোনো পাথরটা খুলল প্লিনি। খোঁদলে হাত বাড়িয়ে দেখল সেই কাঠের চাকাটা আছে। ও চাকাটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল। অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ তুলে কাঠের দরজাটা খুলে গেল। তার মানে ভাঙা চাকাটা মেরামৎ করা হয়েছে। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে দরজা পেরিয়ে ঢুকল। দেখল এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে

বটে কিন্তু কোন প্রাসাদরক্ষী নেই কোথাও। ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল। রাজা গুমন্ড এখন সোনার ঘণ্টার স্বপ্নে বিভোর এখন নিশ্চিন্তও। কাজেই আগের বারের মত প্রসাদরক্ষীর সংখ্যা বাড়ায় নি। তাছাড়া তাকে রেভকজাভিকে রাখতে হয়েছে। ফ্রান্সিস দরজা দিয়ে বাইরে এল। প্লিনি বলল।

—কী দেখলেন?

—একজন রক্ষীও চোখে পড়ল না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহ'লে চলো ঢুকে পড়ি। বিস্কো বলল।

—না এখন না। ফ্রান্সিস বলল। তারপর প্লিনির দিকে তাকিয়ে বলল—সৈন্যদের আস্তানা কোথায়।

প্লিনি আঙুল তুলে একটু দূরে উত্তর দিকে বেশ কয়েকটা টানা লম্বা পাথরের ঘর দেখাল। ঘরগুলোর ছাউনি এদেশীয় রীতি অনুযায়ী মোটা শুকনো ঘাসের।

ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে সবাইকে আসতে বলল। রাস্তা পেরিয়ে সবাই একটা দেয়ালের কাছে এল। দেয়ালের পাথরের খাঁজে দুটো মশাল আড়াআড়ি বসানো ছিল। দুটো জ্বলন্ত মশালই ফ্রান্সিস খাঁজ থেকে তুলে নিল। এবার একটা মশাল পাথরে ঘা মেরে নিভিয়ে ফেলল। অন্য জ্বলন্ত মশালটা হাতে নিয়ে উবু হয়ে বসল। মশালটা বিস্কোর হাতে দিল। তারপর নেভানো মশালটার মাথার দিক থেকে জড়ানো কাপড়ের লম্বা ফালি খুলতে লাগল। বেশ গরম। আস্তে আস্তে চারটে ফালি খুলে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে শাঙ্কোকে বলল—'শাঙ্কো, এগুলোর চারটে তীরের ফলায় জড়াও।' শাঙ্কো এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ও দ্রুত হাতে চারটে তীরের ফলায় কাপরের ফালি জড়িয়ে ফেলল। ফ্রান্সিস বলল—'তীরগুলোতে জ্বলন্ত মশাল থেকে আগুন ধরাও। তারপর সৈন্যদের ছাউনির ওপর ছুঁড়ে দাও।' শাঙ্কো একটা তীরের ফলার কাপড়ে জ্বলন্ত মশাল থেকে আগুন ধরাল। তারপর নিশানা ঠিক করে ছুঁড়ল। কুয়াশার মধ্যে তীরটা উড়ে গিয়ে পড়ল। শুকনো মোটা ঘাসের ছাউনিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেল। তারপর শাঙ্কো পরপর তিনটে জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ল। সৈন্যদের সব ছাউনিতেই আগুন লেগে গেল। কিছু সৈন্য বোধহয় জেগেছিল। তারা 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করল।

এদিকে ফ্রান্সিস বলল—'খোলা দরজা দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকবো। ছোট সবাই, জল্‌দি।' চারজনে দ্রুত ছুটে অন্ধকার রাস্তাটা পেরিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিস ছুটতে ছুটতে বলল—'প্লিনি, অন্দরমহলে নিয়ে চলো। রাজার শয়নকক্ষে। জল্‌দি।' ছুটল চারজন।

ওদিকে সৈন্যদের ছাউনিতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সৈন্যরা সব বেরিয়ে এসেছে ছাউনি ছেড়ে। কাঠের বড় বড় বালতি নিয়ে অনেকেই ছুটে যাচ্ছে কাছের উষ্ণ প্রস্রবণের দিকে। ওখান থেকে জল এনে জল ছিটিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা চলছে।; কুয়াশাভরা আকাশে আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে কালো ধোঁয়া।

রাজবাড়ির অন্দরমহলের রক্ষীরা ছুটে জানালার কাছে চলে এসেছে। সবাই আগুন দেখছে। অন্দরমহলের কাছে কোনো রক্ষী নেই।

ফ্রান্সিসরা রক্ষীদের দুটো ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজন রক্ষীর একেবারে সামনে পড়ে গেল। রক্ষীরা অবাক। এরা কোত্থেকে এল?

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—'শাঙ্কো-বিস্কো—ওদের প্রাণে মেরো না। আহত করো।' বিস্কো আর শাঙ্কো তরোয়াল খুলে রক্ষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই। শাঙ্কো আর বিস্কো নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যেই দু'জন রক্ষী হাতে কাঁধে তরোয়ালের ঘা খেয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। বাকি দু'জনের সঙ্গে লড়াই চলল। ফ্রান্সিস প্লিনির হাত ধরে টানল—'চলো।'

দু'জন ঘরের পর ঘর পেরিয়ে চলল। একটা ঘরে দরজার সামনে দেখল দু'জন রক্ষী। একজন খোলা তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যটি দরজায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। হাতে ঠিক তরোয়াল ধরে আছে। ফ্রান্সিসদের দেখে জাগ্রত রক্ষীটি হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণেই তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্লিনিও তরোয়াল হাতে এগিয়ে গেল। শুরু হলো দু'জনের তরোয়ালের লড়াই। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে ঘুমন্ত রক্ষীটির হাত থেকে তরোয়ালটা ফেলে দিল। পাথরের মেঝেতে ঝনাৎ করে তরোয়ালটা পড়ে যাওয়ার শব্দে রক্ষীটি ঘুম ভেঙে চমকে চোখ চাইল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে ওর গলায় নিজের তরোয়ালের ফলাটা ঠেকিয়ে বলল—'রাজকন্যা মারিয়াকে কোন্ ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে?' রক্ষীটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস তরোয়ালে আরো একটু চাপ দিল। বলল—'বল—রাজকন্যা মারিয়া—কোথায়?' রক্ষীটি এবার তাড়াতাড়ি দরজাটা দেখিয়ে বলল—'এই ঘরে,' ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীটির ঘাড়ের কাছে তরোয়ালের বাঁটটা দিয়ে একটা ঘা মারল। রক্ষীটি 'উঃ' শব্দ করে মেঝেয় পড়ে গেল। ওদিকে প্লিনি তখনও অন্য রক্ষীটির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

ফ্রান্সিস ঘরটার মধ্যে ঢুকল। বাইরের 'আগুন-আগুন' চিৎকার আর লোকজনের হৈ-হল্লায় মারিয়ার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও শুয়ে শুয়েই ভাবছিল কোথায় আগুন লেগেছে? এমন সময় ফ্রান্সিসের চাপা স্বরের ডাক শুনল—মারিয়া—মারিয়া।'

মারিয়া দ্রুত বিছানায় উঠে বসল। দেখল সামনেই ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে। মারিয়া বিছানা থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—"এক মুহূর্ত দেরী নয়। শিগগির চলো।' বলেই ও দরজার দিকে ছুটল। মারিয়াও পেছনে পেছনে ছুটল। ঘরের বাইরে এসে দেখল যে প্লিনি তখনও রক্ষীটির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। প্লিনির পোশাক এখানে ওখানে তরোয়ালের ঘায়ে ছিঁড়ে গেছে। সারা দেহ রক্তাক্ত। ফ্রান্সিস বুঝল—প্লিনি আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না। ফ্রান্সিস বুঝল রক্ষীটি তরোয়াল চালনায় নিপুণ। ফ্রান্সিস মনে মনে ওর প্রশংসা করল। কিন্তু হাতে সময় কম। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘায়েল করতে হবে। ফ্রান্সিস দু'একবার আত্মরক্ষার ভান করেই দ্রুত লাফিয়ে উঠে লোকটার ডান কাঁধের কাছে তরোয়ালের কোপ বসিয়ে দিল। রক্ত বেরিয়ে এল। লোকটা তরোয়াল ফেলে কাঁধ বাঁ হাতে চেপে ধরল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে রক্ষীটিকে বলল—'আমাদের রাজার শয়নকক্ষে নিয়ে চলো। জল্‌দি।' বলেই হাতের তরোয়ালটা রক্ষীটির পিঠে চেপে ধরল। রক্ষীটি একটা কাতর শব্দ করে এগিয়ে চলল। ফ্রান্সিসরা ওর পেছনে পেছনে চলল। আহত প্লিনিও চলল।

রাজার শয়নকক্ষের দরজায় দু'জন রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছিল। ঝোলানো মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিসদের আসতে দেখে তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে

এল। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—'তোমরা যদি আমাদের আক্রমণ করো তাহলে তোমাদের এই বন্ধুটিকে আমি নিকেশ করে দেবো।' রক্ষী দু'জন থমকে দাঁড়াল। এবার ভালভাবে দেখল যে ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালের ফলা রক্ষীটির পিঠে চেপে ধরেছে। রক্ষীটির কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। ওরা তরোয়াল নামিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

সবাইকে নিয়ে ফ্রান্সিস রাজা গুমগুর শয়নকক্ষে ঢুকল। দু'তিনটে কাঁচ ঢাকা মোমবাতি জ্বলছে শয়নকক্ষে। দামী কাঠের সুদৃশ্য কারুকাজ-করা পালঙ্ক। পাখির পালকের নরম বিছানা। কিন্তু ফ্রান্সিসের তখন এসব দেখার সময় নেই। ও বিছানার দিকে তাকাল। রাজা গুমগু বিছানায় নেই। রাজা গুমগু কাঁচের কারুকার্য করা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে তাকিয়ে আগুন দেখছিল। সৈন্য ও লোকজনের 'আগুন-আগুন' চিৎকার হৈ-হল্লায় রাজার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঐ জানালার কাছটা একটু অন্ধকারমতো। ফ্রান্সিস ঘরের চারদিকে তাকিয়েও বুঝতে পারল না রাজা কোথায় আছে। তখনই জানালার অন্ধকার জায়গাটি থেকে রাজা গুমগু গলা চড়িয়ে বলল—'তোমরা কে? কী চাও তোমরা?' ফ্রান্সিস এবার রাজা গুমগুকে দেখতে পেল। বলল—'সেনাপতিমশাই—আপনার এখানে নির্বাসন হয়েছিল। এখন থিংভেলির রাজা হয়েছেন।' রাজা তখনও ফ্রান্সিসকে চিনতে পারেননি। বলল—'তুমি কে?'

ফ্রান্সিস আলোর কাছে এগিয়ে এল।

এখন যদি নিরস্ত্র আপনাকে হত্যা করি? হেসে বলল—এবার চিনতে পারছেন?

—'ও—ফ্রান্সিস।' রাজা গুমগু মৃদুস্বরে বলল।

—'হ্যাঁ। সোনার ঘণ্টা আনতে যাবার সময় আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে ছিলেন। এখন যদি নিরস্ত্র আপনাকে হত্যা করি?' রাজা গুমগু কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করল। 'যাকগে—'ফ্রান্সিস বলল—'আক্রান্ত না হলে আমি আক্রমণ করি না। নিজের জীবন বিপন্ন না হলে আমি নরহত্যা করি না। সামনে এগিয়ে আসুন।'

রাজা গুমগু এগিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস দেখল অতীতের সেনাপতির মুখে চোখে বয়েসের ছাপ পড়েছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে এখনও ধূর্তামি। ফ্রান্সিস বলল—'আপনি আমার সামনে থাকবেন। আপনার পিঠে তরোয়ালের ফলা ঠেকিয়ে রাখবো আমি। এইভাবে আমরা নিরাপদে রাজবাড়ি থেকে বেরুবো। তারপর একইভাবে আপনাকে গাড়িতে চড়িয়ে রেভক্জাভিকে নিয়ে যাবো। কোনোরকম চালাকি করতে গেলে আপনাকে আমি তৎক্ষণাৎ হত্যা করবো। মনে থাকে যেন।' কথাটা শেষ করেই ফ্রান্সিস এক লাফে রাজা গুমগুর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। রাজার পিঠে তরোয়ালের ফলা চেপে বলল—'চলুন। কিন্তু ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না।'

রাজা গুমগু বুঝল ফ্রান্সিসের কথামতোই তাকে এখন চলতে হবে। ওর কথার অবাধ্য হলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। কাজেই রাজা ধীরপায়ে শয়নকক্ষের দরজার দিকে চলল। ঠিক পেছনেই তরোয়াল ধরে ফ্রান্সিস। তারপর মারিয়া ও প্লিনি।

দরজার বাইরে আসতেই ফ্রান্সিস দেখল বিস্কো আর শাঙ্কোকে চার-পাঁচজন সৈন্য ঘিরে ধরেছে। তরোয়ালের প্রচণ্ড লড়াই চলছে। দুই বন্ধুরই গায়ের পোশাক তরোয়ালের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন। কাঁধে, হাতে, বুকে রক্তের ছোপ।

রাজা গুমগু ও ফ্রান্সিসকে দেখে সৈন্যরা লড়াই থামাল। মাথা নিচু করে রাজাকে সম্মান জানাল। ফ্রান্সিস বলল—'ওদের অস্ত্রত্যাগ করতে বলুন।' রাজা গুমগু ডান হাত তুলে অস্ত্রত্যাগের ইঙ্গিত করল। সৈন্যরা তরোয়াল ফেলে দিল। পাথরের মেঝেয় শব্দ উঠল—ঝনাৎ—ঝনাৎ। হাঁপাতে হাঁপাতে বিস্কো আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—'পেছনে পেছনে এসো।' তারপর রাজাকে বলল—সৈন্যদের বলুন—গাড়ি তৈরি করে সিঁড়ির সামনে রাখতে।' সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে সেই কথা বলল। ফ্রান্সিস বলল, 'জল্‌দি।' তিনজন সৈন্য ছুটে চলে গেল। দ্বাররক্ষী আর সৈন্যরা বুঝল—রাজার জীবন বিপন্ন। এখন ফ্রান্সিসদের আক্রমণ করলে রাজার প্রাণ যাবে। কাজেই ওরা সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। রাজাকে সামনে রেখে ফ্রান্সিসরা চলল বাইরের সিঁড়ির দিকে।

বাইরে রাজবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফ্রান্সিস দেখল রাজার ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কালো কাঠে সোনালি লতাপাতার কাজকরা গাড়ি। গাড়ির দু'দিকে বসার আসন। চার ঘোড়ার খোলা গাড়ি।

রাজাকে সামনে রেখে ফ্রান্সিসরা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—'একটা আসনে মারিয়া বসবে। অন্যটায় আহত প্লিনিকে শুইয়ে ওর মাথা কোলে নিয়ে বিস্কো বসবে। রাজা গাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার পেছনে পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। শাঙ্কো তীর-ধনুক বাগিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। এবার ওঠো সবাই।'

সবাই গাড়িতে উঠল। ফ্রান্সিসের নির্দেশমতো সবাই যে যার জায়গা করে নিল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে কোচওয়ানকে বলল—'স্কালহল্ট চলো। বেচাল করেছো কি তোমাকে শেষ করে দেবো।'

গাড়ি চলল। রাজবাড়ির প্রধান দরজার সামনে তখন বেশ কিছু সৈন্য নগরবাসী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস রাজা গুমগুর পিঠে তলোয়ারের চাপ দিয়ে বলল—'সৈন্যদের বলুন—কেউ যেন আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা না করে।' রাজা গুমগু ডান হাত ওপরে তুলে সৈন্যদের লক্ষ্য করে সেকথা বলল। গাড়ি রাজবাড়ির থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। তারপর চলল স্কালহল্টের দিকে। পথের লোকজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা দেখল। একসময় নগর শেষ হলো। উন্মুক্ত প্রান্তর পড়ল। সেই প্রান্তরের টুকরো পাথর ছড়ানো রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটল রেভক্‌জাভিকের দিকে।

আকাশ-দিগন্তে অল্প আলো। সেই আলোও প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে নীলচে কুয়াশায়। রাস্তার এখানে ওখানে তুষার জমেছে। তার মধ্যে দিয়েই অল্প ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি ছুটল।

ঘণ্টা কয়েক কেটে গেল। গাড়ি থামানো, বিশ্রাম, খাওয়া এসব কথা কারো মনেই পড়ল না। ফ্রান্সিস বার বার কোচোয়ানকে দ্রুত গাড়ি চালাতে বলছিল।

চাইছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কালহল্টে পৌঁছুতে। বলা যায় না রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা যদি একসঙ্গে ছুটে এসে ওদের ঘিরে ধরে তাহলে বিপদে পড়তে হবে। কাজেই গাড়ি ছোটাও যত জোরে পারো।

একসময় দূর থেকে কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে ওফাস নদী দেখা গেল। নদীর এই পারে এসে গাড়ি থামল। কাঠের ভেলাটা এপারেই ছিল। প্রথমে কোচোয়ান আর শাঙ্কো, প্লিনি, বিস্কো গাড়িটা তুলে ভেলায় ওঠাল। বিস্কো লগি ঠেলে নৌকোটা পার করল। দড়ি ধরে টেনে. কাঠের ভেলাটা আবার এপারে আনা হ'ল। ঘোড়া চারটে পার করা হ'ল। সঙ্গে প্লিনি আর কোচোয়ান। ঘোড়াগুলো ওপারে পৌঁছলো। ঘোড়াগুলো নামিয়ে আনল বিস্কো। কোচোয়ান ঘোড়াগুলো গাড়ির সঙ্গে জুড়তে লাগল। ততক্ষণে রাজা গুমণ্ড আর মারিয়া ভেলায় চড়ে এপারে এসে পৌঁছল গুমণ্ডের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে প্লিনি দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়া গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। এবার ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো ভেলায় চড়ে পার হ'তে লাগল। ভেলাটা নদীর মাঝামাঝি এসেছে এমনই সময় একটা ছোট বরফের চাঁই ভেসে এসে ভেলাটায় জোর ধাক্কা মারল, ভেলাটা লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস টাল সামলাল কিন্তু শাঙ্কো পারল না। ছিটকে নদীর জলে পড়ে গেল। ওদিকে এই ঘটনা দেখে প্লিনি দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। রাজা গুমণ্ডও এই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। সে পেছন থেকে সেই হাত তোলা অবস্থায় প্লিনিকে এক ধাক্কা দিল। ও মুখ থুবড়ে কাদা বরফের মধ্যে পড়ে গেল। রাজা গুমণ্ড বিস্কো ছুটে আসার আগেই এক লাফে ছুটে গিয়ে তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর বিদ্যুৎবেগে গাড়িটায় লাফিয়ে উঠল। তরোয়ালের ধারালো জায়গাটা মারিয়ার গলার কাছে ঠেকিয়ে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল—তোমরা কেউ এক পা এগিয়ে এলে আমি মারিয়াকে হত্যা করবো।' এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাবে ফ্রান্সিসরা কেউ কল্পনাও করেনি। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি লগি ঠেলে নদীর এপারে এসে পড়ল। কিন্তু আর এগোল না। দাঁড়িয়ে পড়ল। ও ধ'রেই নিয়েছিল শাঙ্কো নদীর জল থেকে ভেলায় উঠে পড়েছে। কিন্তু শাঙ্কো জলে থেকেই সব ঘটনাটা দেখল। তারপর কাঁধের তূনীরটা এক হাতে ধ'রে রেখে ডুব সাঁতার দিয়ে এপারে চ'লে এসেছে ততক্ষণে। মাথা না তুলে বরফ কাদা জলের মধ্যে দিয়ে সাদা কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে বুক হিঁচড়ে আস্তে আস্তে একটা বড় বরফ ঢাকা পাথরের চাঁইয়ের পেছনে গিয়ে আড়াল নিল। উত্তেজনার মাথায় রাজা গুমণ্ড শাঙ্কোকে লক্ষ্যই করতে পারল না। গুমণ্ড চেঁচিয়ে কোচোয়ানকে ডাকল। কোচোয়ান গাড়িতে উঠে নিজের আসনে বসল। গাড়ি জোতা হ'য়ে গেছে তখন। গুমণ্ড গলা চড়িয়ে হাঁকল—'গাড়ি চালাও—জোরে।' কোচোয়ান ঘোড়াগুলোর গায়ে চাবুক হাঁকাল। গাড়ি চলতে শুরু করল। ওদিকে ফ্রান্সিস, প্লিনি, বিস্কো সব পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। নড়ল না ওরা। যদি ওদের এগিয়ে যেতে দেখে রাজা গুমণ্ড মারিয়ার গলায় তরোয়াল বসিয়ে দেয়।

ওদিকে শাঙ্কো বরফ ঢাকা পাথরের আড়ালে ব'সে তীর পরিয়ে ধনুক বাগিয়ে ধরল। গাড়িটা হাত কুড়ি এগিয়েছে তখন। শাঙ্কোর নাক মুখ দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তখন। মাত্র একটা তীরে রাজা গুমণ্ডকে ঘায়েল করতে হবে। নিশানা নিখুঁত হওয়া চাই। ছিলা টেনে গভীর মনোযোগের সঙ্গে রাজা গুমণ্ডের তরোয়াল

ধরা ডান বাহু লক্ষ্য ক'রে শাঙ্কো তীর ছুঁড়ল। পাকা হাত শাঙ্কোর। সাদা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তীরটা ছুটে এলো। লাগল ঠিক রাজা গুমণ্ডের ডান বাহুর ওপরের দিকে। রাজা গুমণ্ড আঃ শব্দ ক'রে লাফিয়ে উঠল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গাড়ির ভেতরেই পড়ল। মারিয়া নিচু হ'য়ে দ্রুত হাতে তরোয়ালটা তুলে নিয়ে বরফ কাদা জলে ফেলে দিল। রাজা গুমণ্ড বাঁ হাত দিয়ে টেনে তীরটা খুলে ফেলল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। ও সামনের আসনে বসে পড়ল। গোঙাতে লাগল। মারিয়া চিৎকার ক'রে ডাকল—ফ্রান্সিস—বিস্কো—শিগগির এসো। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা কিছু দেখতে পারছিল না। কিন্তু মারিয়ার চিৎকার ওদের কানে পৌঁছাল। মারিয়া চিৎকার ক'রে কোচোয়ানকে বলল—'গাড়ি থামাও।' কোচোয়ান গাড়ি থামাল। ফ্রান্সিসরা ছুটে এল। খোলা তরোয়াল হাতে গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। রাজা গুমণ্ড তখনও ডান বাহু বাঁ হাতে চেপে গোঙাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল শাঙ্কো তীর ছুঁড়ে গুমণ্ডকে ঘায়েল করেছে। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে শাঙ্কোকে খুঁজতে লাগল। একটু পরেই দেখল জলেভেজা পোশাক নিয়ে শাঙ্কো ক্লান্ত পায়ে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে শেঁটে ওর দিকে আসছে। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে শাঙ্কোকে জড়িয়ে ধরল। বিস্কোও গিয়ে জড়িয়ে ধরল।

আবার সবাই গাড়িতে উঠল। ক্লান্ত শাঙ্কো মারিয়ার পাশে বসল। রাজা গুমণ্ডের পাশে বসল বিস্কো। ফ্রান্সিস আর প্লিনি খোলা তরোয়াল হাতে গুমণ্ডের সামনে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে কোচোয়ানকে বলল—গাড়ি ছাড়ো—যত জোরে পারো চালাও।' গাড়ি দ্রুত ছুটল। ফ্রান্সিস দেখল রাজা গুমণ্ডের পোশাকের ডান হাতের কাঁধের কাছে রক্তে ভিজে উঠেছে। গুমণ্ড অল্প অল্প গোঙাচ্ছে।

কুয়াশাও বরফ কাদা জলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি জোরে ছুটল। শপাং—শপং—চাবুকের শব্দ শোনা গেল। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে গাড়ি চলল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে গাড়ি চলল। একসময় ম্লান আলোয় দূর থেকে দেখা গেল জ্বলন্ত মশালের আলোর বিন্দু। স্কালহল্ট আর দূরে নয়। গাড়ি চলল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ এক মুহূর্তের জন্যে তরোয়াল নামায়নি। শাঙ্কোও তীর-ধনুক একভাবে ধরে আছে। বলা যায় না পথের ধারে তুষার ঢাকা পাথরের আড়ালে রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা ওৎ পেতে আছে কিনা।

কিছুক্ষণ পরে স্কালহল্ট নগরে গাড়ি প্রবেশ করল। এইবার ফ্রান্সিস তরোয়াল নামিয়ে কোমরের কোষে রাখল। শাঙ্কোও কাঁধে ধনুক ঝোলাল তীর রাখল কাঁধের তূনীরে।

বিস্কো আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—'ফ্রান্সিস, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ। বসো।' 'ফ্রান্সিসও এতক্ষণে ভীষণ ক্লান্তিবোধ করল। ও আসনে বসে পড়ল। প্লিনি এখন অনেকটা সুস্থবোধ করছিল।

স্কালহল্ট নগরে বন্দরে তখন মানুষের কর্মচঞ্চল জীবন বয়ে চলেছে। দোকানে বাজারে নগরবাসীদের ভিড়। প্রায় সকলেই দেখল গাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা রাজা গুমণ্ডকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলন্ত গাড়ির পেছনে মানুষের জটলা ছুটে এল। রাজবাড়ির সামনে যখন গাড়ি এল তখন চারদিকে মানুষের ভিড়ে ছয়লাপ। সবাই ফ্রান্সিসদের দেখছে—দেখছে গাড়িতে আহত রাজা গুমণ্ডকে। কিন্তু ওরা কেউই বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কী?

রাজবাড়ির সদর দেউড়ি খোলাই ছিল। দ্বাররক্ষীরা পথ ছেড়ে দিল। গাড়ি রাজবাড়ির চত্বরে ঢুকল। থামল এসে সিঁড়ির সামনে। এর মধ্যে রাজবাড়ির অন্দরমহলে সংবাদ পৌঁছে গেছে যে, ফ্রান্সিসরা মারিয়াকে মুক্ত করে রাজা গুমগুকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস একজন দ্বাররক্ষীকে ডেকে রাজামশাইকে আসার জন্য বলে পাঠাল।

একটু পরেই রাজা ইনগল্‌ফ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। উনি খবরটা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। বন্দী রাজা গুমগুকে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ফ্রান্সিস গাড়ি থেকে নেমে রাজা ইনগল্‌ফকে সম্মান জানিয়ে বলল—'মারিয়া এখন মুক্ত। রাজা গুমগুকেও বন্দী করে এনেছি। এবার আপনার চিরশত্রুর ব্যবস্থা কী করবেন করুন।'

—তোমরা ভেতরে আসবে না?' রাজা বললেন।

—'না। আমরা খুব পরিশ্রান্ত। আমাদের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। মারিয়াকে নিয়ে এই গাড়িতেই আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। তবে প্লিনি থাকবে। ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিন।'

'বেশ।' রাজা ইনগল্‌ফ বললেন। তারপর রাজা গুমগুকে বললেন—'আপনি নেমে আসুন। আপনার বিচার হবে।' রাজা গুমগু কোনো কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। প্লিনিও নামল। তারপর রাজা ইনগল্‌ফের পেছনে পেছনে রাজা গুমগু ও প্লিনি রাজপুরীতে প্রবেশ করল। ফ্রান্সিস কোচওয়ানকে গাড়ি জাহাজঘাটায় নিয়ে যেতে বলল।

গাড়ি চলল জাহাজঘাটার দিকে।

জাহাজঘাটায় গাড়ি এসে থামল। ফ্রান্সিসদের দেখে ওদের বন্ধুদের আর তর সইল না। ওরা ছুটে জাহাজ থেকে পাটাতনের ওপর দিয়ে নেমে এল। গাড়ি থেকে ফ্রান্সিস নামতেই হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। হ্যারির চোখে জল এল। ফ্রান্সিস হ্যারির পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বলল—'এই—ছেলেমানুষি করো না।' তারপর হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—'সব বলবো। তার আগে জাহাজে চলো। গরম গরম ভেড়ার মাংস আর রুটির ব্যবস্থা করো।'

দল বেঁধে সবাই জাহাজে উঠে এল।

দিনের হিসেবে পরদিনই রাজা ইনগল্‌ফ প্লিনিকে ফ্রান্সিসের কাছে পাঠাল। প্লিনি বলল—মহামান্য রাজা ইনগল্‌ফ আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়িতে এল। মন্ত্রনাকক্ষে রাজা এসে বসলেন। সঙ্গে সেনাপতি। রাজা ইনগল্‌ফ বললেন—ফ্রান্সিস—এখন তো আর এখানে থাকার মানে হয় না। ভাবছি—ঘণ্টা কয়েক পরে সৈন্যদের নিয়ে আমি, রানী ও রাজপুত্র রেভক্‌জাভিক ফিরে যাবো।

—না মাননীয় রাজা—এখনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে রেভক্‌জাভিক যাবেন না। বরং আপনি, মহামান্যা রানী ও রাজপুত্র আমাদের জাহাজে ফিরে চলুন। বন্দী রাজা গুমগুকেও আমরা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবো। রেভক্‌জাভিক পৌঁছে রাজা গুমগুর সেনাপতি ও সৈন্যদের অস্ত্রত্যাগে বাধ্য করাবো। যদি তার আগেই আপনার

সৈন্যবাহিনী রেভক্‌জাভিক পৌঁছে যায় তাহলে সাংঘাতিক যুদ্ধ লেগে যাবে। কারণ রেভক্‌জাভিকে রাজা গুমগুর সেনাপতি ও সৈন্যরা এখনও জানে না যে রাজা গুমগু আমাদের হাতে বন্দী, কাজেই আপনার সেনাপতিকে আদেশ দিন তিনি যেন দিনের হিসেবে চারদিন পর তার অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে রেক্‌জাভিক যাত্রা করেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস ঠিকই বলেছে মাননীয় রাজা। হ্যারি বলল।

রাজা ইনগল্‌ফ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—সেনাপতি আপনি কী বলেন?

—হ্যাঁ মহামান্য রাজা—ফ্রান্সিস সঠিক পরামর্শই দিয়েছেন। সেনাপতি বলল।

—বেশ তাই হবে। রাজা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ফ্রান্সিসরাও উঠে দাঁড়াল। রাজাকে সম্মান জানিয়ে ওরা জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস সব ভাইকিং বন্ধুদের ডেকে বলল—রাজপরিবার আমাদের জাহাজে চড়ে রেভক্‌জাভিক দিয়ে যাবেন। বন্দী রাজা গুমগুকেও আমরা এই জাহাজেই নিয়ে যাবো। একটা নির্দিষ্ট কেবিন ঘরে তাকে বন্দী ক'রে রাখা হবে। হুঁশিয়ার গুমগু যেন আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে পালাতে না পারে।

জাহাজে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। আগেই সেই বড় কেবিন ঘরটাই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হ'ল। বন্দী রাজা গুমগুর ঘরটাও তৈরি রাখা হ'ল। এবার প্রতীক্ষা—রাজপরিবার কখন আসে। গুমগুকে কখন নিয়ে আসা হবে।

দিনের হিসেবে পরদিন রাজা হজরলিফের রাজকীয় গাড়ি চড়ে রাজা ইনগল্‌ফ রানী ও রাজপুত্র এল। নির্দিষ্ট ঘরে তাদের আপ্যায়ণ ক'রে নিয়ে আসা হ'ল। রাজকীয় গাড়ির পেছনে এল একটা সাধারণ গাড়ি। তাতে হাত বাঁধা অবস্থায় রাজা গুমগু। গুমগুর ডানবাহুতে কাঁধে কম্বলের ফেট্টি জড়ানো। রাজার চারজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে সেই গাড়িটা পাহারা দিতে দিতে নিয়ে এল। রাজা গুমগুকে তার নির্দিষ্ট কেবিনঘরে রাখা হ'ল। পাহারাদার সেই চারজন সৈন্য তো রইলই ভাইকিংরাও সব সময়ের জন্য দুজন রইল।

নোঙর তোলা হ'ল। জাহাজ চলল রেভক্‌জাভিকের উদ্দেশ্যে। রাজা ইনগল্‌ফ আর রাণীর মন এখন অনেক ভালো। তাঁরা মাঝে মাঝে ডেকে উঠে আসেন। ফ্রান্সিস, হ্যারি এবং তাদের ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-টল্প করেন। সবচেয়ে খুশী রাজকুমার। সে সারা জাহাজ টহল দিয়ে বেড়ায়। ছুটোছুটি ক'রে ক্লান্ত হ'লেই চলে আসে ফ্রান্সিসের কেবিনে। বলে গল্প বলো। ফ্রান্সিসের জীবনে তো ঘটনা কম নেই। ও সেইসব গল্প বলে। গল্প শেষ হ'লেই রাজকুমার ছোটে টহল দিতে।

জাহাজ রেভক্‌জাভিক বন্দরে পৌঁছল। রেভক্‌জাভিক এখন রাজা গুমগুর সেনাপতি সৈন্যদের দখলে। কাজেই ফ্রান্সিসরা আগে থেকেই অস্ত্রহাতে তৈরী হ'ল। জাহাজঘাটায় জাহাজ ভিড়ল। ভাইকিংরা পাটাতন ফেলল। বন্দরে রাজা গুমগুর সৈন্যরা পাহারায় ছিল। জাহাজ দেখে এবং সশস্ত্র ভাইকিংদের দেখে ওদের মনে সন্দেহ হ'ল। ওরা পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে একত্র করল। প্রায় দশ পনেরোজন সৈন্য জাহাজঘাটায় খোলা তরোয়াল হাতে সারি দিয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও এটাই চাইছিল। রাজা গুমগু এখন বন্দী এবং ওদের কব্জায় এটা গুমগুর সৈন্যরা ও সেনাপতি

জানুক। ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালটা হ্যারিকে রাখতে নিল। তারপর পাতা পাটাতন দিয়ে নেমে জাহাজঘাটে এল। গুমণ্ডের সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার ক'রে বলল—আমি নিরস্ত্র। আমি যুদ্ধ করতে আসেনি।' একজন মোটামত সৈন্য এগিয়ে এল—

—তোমরা কোত্থেকে এলে?

—স্কালহল্ট থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী চাও তোমরা? সৈন্যটি বলল।

—তোমরা তোমাদের সেনাপতিকে সংবাদ দাও যে রাজা গুমণ্ড তাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। আমি সেই চিঠি দিতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল। তখনই একটি সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে সেখানে এল। মোটা সৈন্যটি অশ্বারোহী সৈন্যকে বলল চিঠির কথা। সৈন্যটি ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—চিঠিটা আমাকে দিন। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—না—সেনাপতিকে এখানে আসতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। অশ্বারোহী সৈন্যটি আর কোন কথা না ব'লে রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছোটাল। ফ্রান্সিস জাহাজে উঠে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা ইনগল্‌ফের কালো রঙের সোনালি লতাপাতার কাজ করা গাড়িটায় চড়ে সেনাপতি এল।

এবার ফ্রান্সিস রাজা গুমণ্ডকে হাতবাঁধা অবস্থায় এনে ডেকে দাঁড় করালা। পেছন থেকে তরোয়ালের ডগাটা রাজা গুমণ্ডের পিঠে ঠেকিয়ে রাখল। সেনাপতি রাজা গুমণ্ডের এই বন্দীদশা দেখে হতবাক। ততক্ষণে জাহাজঘাটায় অনেক লোক জড় হয়েছে। তারাও কম আশ্চর্য হ'ল না। রেভক্‌জাভিকের অধিবাসীদের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক জাহাজঘাটায় এসে ভীড় করতে লাগল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—রাজা গুমণ্ড—আপনার সেনাপতিকে হুকুম দিন সব সৈন্য যেন এক্ষুণি অস্ত্রত্যাগ করে। রাজা গুমণ্ড একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর সেনাপতিকে লক্ষ্য ক'রে বলল—সব সৈন্যকে অস্ত্রত্যাগ করতে বলো।' সেনাপতি রাজা গুমণ্ডের অবস্থাটা সহজেই বুঝল। সে গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে বলল—'সৈন্যগণ—রাজা গুমণ্ডের জীবন বিপন্ন। তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর।' উপস্থিত সব সৈন্যরা হাতের তরোয়াল, কাঁধের তীর ধনুক পাথর বাঁধানো জাহাজঘাটায় ফেলে দিল। শব্দ উঠল—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ। 'তখনই বিস্কো তরোয়াল হাতে—আর শাঙ্কো ধনুক বাগিয়ে দ্রুত জাহাজ থেকে নেমে এল। পাথুরে জাহাজঘাটা থেকে সব অস্ত্র তুলে নিয়ে একপাশে জড়ো ক'রে রাখল। তারপর দু'জনে অস্ত্রগুলি পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস রাজা গুমণ্ডকে বলল—'সেনাপতিকে হুকুম দিন সব সৈন্য জড়ো ক'রে উনি যেন এক্ষুণি রাজবাড়ির উত্তরের প্রান্তরে চলে যান। একজন সৈন্যও যেন রেভক্‌জাভিক নগরে না থাকে।' রাজা গুমণ্ড চেঁচিয়ে সেই কথা সেনাপতিকে বলল। উপস্থিত সৈন্যরা দল বেঁধে উত্তরের প্রান্তরের দিকে চলল। সেনাপতি গাড়ি থেকে নেমে একটা ঘোড়ায় চড়লো। ছুটল সৈন্যদের ছাউনিতে রাজা গুমণ্ডের এই আদেশ জানাতে।

ফ্রান্সিস প্লিনিকে ডেকে বলল—নেমে গিয়ে একটা সাধারণ ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে এসো। প্লিনি জাহাজ থেকে নেমে গেল গাড়ির খোঁজে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—যাও রাজপরিবারকে নিয়ে এসো।' হ্যারি চলে গেল।

একটু পরেই রাজা ইনগল্ফ রানী আর রাজকুমার জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালেন। রাজা রানী ও রাজকুমারকে দেখে জাহাজঘাটায় জড়ো হওয়া রেভক্জাভিকের অধিবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেল। সত্যিই তারা রাজাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। তারা উল্লাসে করতালি দিতে লাগল। রাজা ইনগল্ফ মৃদু হেসে ডান হাত তুলে কয়েকবার নাড়লেন। তারপর রানী ও রাজকুমারকে নিয়ে পাটাতন দিয়ে নামতে লাগলেন। জনতা সোল্লাসে ধ্বনি দিল—আমাদের রাজার—জয় হোক। আমাদের রাজা—দীর্ঘজীবী হোন।

রাজা, রানী, রাজকুমার কালো গাড়িটায় গিয়ে উঠলেন। লোকেরা স'রে দাঁড়িয়ে পথ ক'রে দিল। গাড়ি চলল রাজবাড়ির উদ্দেশে।

ততক্ষণে প্লিনি একটা সাধারণ গাড়ি নিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে রক্ষী সেই চারজন সৈন্যকে ডাকল। বলল—রাজা গুমণ্ডকে ঐ গাড়িতে চড়াও। পাহারা দিয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে যাও। সাবধান—পালাতে না পারে।

এবার চারজন সৈন্যের পাহারায় রাজা গুমণ্ড পাতা পাটাতন দিয়ে নেমে এসে গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল। মাঝখানে রাজা গুমণ্ডকে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল। চারপাশে চারজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

জনতা স্তব্ধ হ'য়ে এই দৃশ্য দেখছে। রাজা গুমণ্ড এই রেভক্জাভিকে কিছুদিন রাজত্ব ক'রে গেছে। তার হুকুমেই তার সৈন্যরা যে নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালিয়েছিল রেভক্জাভিকের মানুষদের ওপর তা তারা ভুলতে পারেনি। হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে কে চিৎকার ক'রে উঠল খুনী শয়তান রাজা গুমণ্ড।' তারপরই একজন রাস্তা থেকে একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ল রাজা গুমণ্ডকে লক্ষ্য ক'রে মুহূর্তে জনতা উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই গাড়ির ওপর। চারজন সৈন্য বহুকষ্টে ভীড় ঠেকাল। এইবার শুরু হ'ল রাজা গুমণ্ডের ওপর পাথর বৃষ্টি। সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্যে গাড়িতে বসে পড়ল। পাথরের ঘায়ে রাজা গুমণ্ডের কপাল মাথা ফেটে গেল। দর্ দর্ ক'রে রক্ত পড়তে লাগল। সারা শরীর রক্তাক্ত হ'ল। রাজা গুমণ্ড জ্ঞান হারিয়ে গাড়ির মধ্যে পড়ে গেল। পাথর ছোঁড়া বন্ধ হ'ল। গাড়ির কোচোয়ান এবার জোর গাড়ি চালাল। গাড়ির পেছনে পেছনে আরও কিছু লোক ছুটে আসতে লাগল চিৎকার করতে করতে।

গাড়ি রাজবাড়ির সদর দেউড়ি পেরিয়ে খোলা চত্বরে ঢুকল। তারপর রক্ষী সৈন্যদের নির্দেশ অনুযায়ী—পূবকোনায় কয়েদ ঘরের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। রাজা গুমণ্ডের তখন জ্ঞান ফিরেছে। একে বাহুতে শাঙ্কোর তীরের ক্ষত তারপর এই পাথর বৃষ্টি রাজা গুমণ্ডের তখন উঠে দাঁড়াবার শক্তিও অবশিষ্ট নেই। সৈন্যরা ধরাধরি ক'রে রাজা গুমণ্ডকে কয়েদ ঘরে ঢুকিয়ে দিল। রাজা গুমণ্ডের নাক মুখ থেকে তখনও রক্ত ঝরছে।

দিনের হিসেবে পরদিন প্লিনি ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। রাজা ইনগল্ফ ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেছেন। এ নিমন্ত্রণ জানাতেই রাজা প্লিনিকে

পাঠিয়েছিলেন। প্লিনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল সেই ছোট্ট গীর্জাটা ঘিরে ছোট্ট গ্রামটার কথা। মারিয়া পাশেই বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার ফ্রান্সিস সেই ছোট্ট গ্রামটার কথা, সেই ছুঁচলো দাড়ি গোঁফঅলা দলপতির কথা সব মারিয়াকে বলল। মারিয়া সব শুনে বলল—চলো না সেই ছোট্ট গ্রামটা দেখে আসি।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল। ওর নিজেরও খুব ইচ্ছে করছিল সেই গ্রামটায় যেতে। তাই প্লিনিকে বলল।

—প্লিনি—তিনটি ভালো ঘোড়ার ব্যবস্থা করো। আমরা তিনজনে ঐ ছোট্ট গ্রামটায় যাবো। প্লিনি উঠে দাঁড়াল।

বলল—আমি এক্ষুনি ঘোড়া নিয়ে আসছি। আপনারা তৈরী হোন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লিনি ঘোড়া নিয়ে জাহাজঘাটায় এল। তারপর ফ্রান্সিস মারিয়া ও প্লিনি ঘোড়া ছোটাল সেই ছোট্ট গ্রামটার উদ্দেশ্যে। প্লিনি সামনে থাকল। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

মাথার ওপর আকাশ। আকাশে ম্লান আলো। চারপাশে পাতলা সাদাটে কুয়াশার আস্তরণ। তার মধ্যে দিয়ে ওরা ঘোড়ায় চড়ে চলল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। এক সময় ওরা সেই ছোট্ট গ্রামটায় পৌঁছল। দেখল সেই ছোট গীর্জাটা। গীর্জাটাকে ঘিরে পাথরের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে। বোঝা গেল সবাই জেগে আছে।

ঘোড়া থেকে নামল ওরা। গীর্জার লাগোয়া পাদ্রীমশাইয়ের সেই ঘরের দরজায় এসে ওরা দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বন্ধ দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে দাঁড়াল সেই ছুঁচালো দাড়ি গোঁফওলা দল নেতা, দাড়ি গোঁফ আছে, তবে মোম দিয়ে মেজে ছুঁচালো করা নেই। লোকটা মোমবাতির আলোয় একটা মোটা চামড়ার বই পড়ছিল। বোধহয় বাইবেল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে বলল—'চিনতে পারো? লোকটা সঙ্গে ফ্রান্সিসকে চিনল। ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিসও হেসে ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর পিঠে আদরের চাপড় দিল। আলিঙ্গন আলগা ক'রে ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—মারিয়া—আমার স্ত্রী। লোকটি মারিয়াকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। বলল—'বসুন—বসুন।' তিনজনে বেঞ্চিতে বসল।

—তোমার নাম কী ভাই? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

ইসলিফ।' তারপর ইসলিফ বলল—আপনার নাম আমি জানি না। কিন্তু আপনি আমার সমস্ত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আমি আজ অন্য মানুষ।' ফ্রান্সিসও ভালো ক'রে ইসলিফকে দেখল। সত্যি ইসলিফের পরনে চাষীদের পোশাক। চোখে মুখে শান্ত ভঙ্গী। ইসলিফ একটা ছেলেকে ডাকল। বলল—সবাইকে বল্ আমার পরম বন্ধু এসেছেন। ছেলেটা চলে গেল। একটু পরেই কিছু লোকজন এল। সেই স্ত্রীলোক দু'জনও এল। তারা ফ্রান্সিস আর প্লিনিকে দেখে চিনল। বার বার বলতে লাগল—আপনারা সেদিন আমাদের সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আপনারা বসুন। না খাইয়ে আপনাদের ছাড়বো না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্ত্রীলোকেরা খাবারের আয়োজন করল। গরম গরম গোল রুটি, ভেড়ার মাংস আর নানা সব্জির তরকারির মত। ওরা খেতে লাগল। খুব

সুস্বাদু রান্না। ফ্রান্সিস গোগ্রাসে খেতে লাগল। হঠাৎ ইসলিফ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্না ভেজা গলায় বলল—

ভাবলে আমার দুঃখে কষ্টে বুক ভেঙে যায়—কী অশান্ত কী বিশ্রী জীবন আমি কাটিয়েছি। বিশ্বাস করুন—আজ আমার মনে অপার শান্তি অসীম তৃপ্তি। আমার বাকী জীবন আমি উৎসর্গ করেছি এই ছোট্ট গ্রামটার মানুষদের জন্যে। কথাটা শুনে ফ্রান্সিস খুশী হ'ল। মৃদু হেসে ইসলিফের পিঠ চাপড়াল। মারিয়া খেতে খেতে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

ওরা যখন ফিরে আসার জন্যে ঘোড়ায় উঠল ছোট্ট গ্রামের মানুষগুলো ওদের ঘিরে ধরল। বারবার বলতে লাগল—আবার আসবেন।

ফ্রান্সিসরা ঘোড়া ছোটাল রেভক্জাভিকের উদ্দেশ্যে। ঘোড়া চালাতে চালাতে ফ্রান্সিস ডাকল—মারিয়া।

—বলো।' মারিয়া বলল।

—দেখ—জীবনে অনেক মূল্যবান জিনিস আমি অনেক কষ্টে—আবিষ্কার করেছি উদ্ধার করেছি। তা'তে খুশী হ'য়েছি। কিন্তু ইসলিফের জীবনধারা বদলাতে পেরেছি দেখে আমার সমস্ত মনপ্রাণ কী এক আনন্দে তৃপ্তিতে ভ'রে উঠেছে তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

মারিয়া একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল—তোমার আনন্দে আমিও আনন্দিত। তোমার তৃপ্তিতে আমারও তৃপ্তি। ফ্রান্সিস বলল—প্লিনি—ভেড়া চড়ায় যারা তাদের সেই গানটা গাও না। প্লিনি হাসল। তারপর গলা চড়িয়ে সেই গানটা গাইতে লাগল। একটু পরে ফ্রান্সিস প্লিনির গলার সঙ্গে গলা মেলাল। মারিয়াও যোগ দিল। তিনজনের মিলিত কণ্ঠের গানের সুর দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একসময় দূর থেকে রেভক্জাভিক নগরের আলো ওরা দেখল। নগরে প্রবেশ করল ওরা। ফ্রান্সিস বলল—'প্লিনি—রাজা গুমণ্ড যে কয়েদঘরে বন্দী আছে সেখানে আমাদের নিয়ে চলো।

—বেশ চলুন।' প্লিনি বলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজবাড়িতে প্রবেশ করল ওরা। চত্বর পেরিয়ে প্লিনি ওদের কয়েদ ঘরের দরজায় নিয়ে এল ওদের। দরজার দু'পাশে চারটে মশাল জ্বলছে। রক্ষীরা খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছে। ঘোড়া থেকে তিনজনে নামল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে একজন রক্ষীকে বলল—দরজা খোল। রাজা গুমণ্ডের সঙ্গে আমার কথা আছে। রক্ষীরা ফ্রান্সিসকে চিনল। প্লিনিও বলল ওদের। একজন গিয়ে দরজার বড় তালাটা খুলল। লোহার গারদ বসানো দরজাটা খুলল। তিনজনে ভেতরে ঢুকল। মশালের আলোয় দেখল একটা লম্বাটে পাথরের ওপর রাজা গুমণ্ড কম্বল গায়ে শুয়ে আছে। ওদের ঢুকতে দেখে গুমণ্ড উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার চিকিৎসা হ'য়েছে? গুমণ্ড কোন কথা না ব'লে মাথা নেড়ে বোঝাল চিকিৎসা হয়েছে।

ফ্রান্সিস বলল—রাজা গুমণ্ড—আপনার রাজত্বের নমুনা আমরা থিংভেলিরে দেখে এসেছি। আপনার সৈন্যদের অত্যাচারে নিপীড়নে আপনার নিরীহ প্রজারা জর্জরিত। মাত্র কয়েকদিন এই রেভক্জাভিকে রাজত্ব ক'রে গেছেন। সেই কয়দিন যে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন তার স্মৃতি এখানকার মানুষ ভুলে যায়নি।

তাই জাহাজঘাটায় আপনার প্রতি তীব্র ঘৃণায় ওরা আপনাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। ফ্রান্সিস থামল। রাজা গুমণ্ড মুখ নিচু ক'রে রইল। ফ্রান্সিস বলল—এই ঘটনা দেখে সহজেই অনুমান করতে পারছেন থিংভেলিরে আপনার প্রজাদের মনোভাব। তাই বলছিলাম—সারা জীবন তো নিষ্ঠুর উল্লাসে শুধু মানুষ হত্যা করেছেন আর নিপীড়ন অত্যাচার চালিয়েছেন। আজা আপনার ভাববার সময় এসেছে বাকী জীবনটা আপনি কীভাবে কাটাবেন। ফ্রান্সিস থামল। এতক্ষণে রাজা গুমণ্ড মুখ তুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস থামল। এতক্ষণে রাজা গুমণ্ড মুখ তুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার কি এর জন্য কোন অনুশোচনা হয় না?' রাজা গুমণ্ড একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন—সেদিন জাহাজঘাটে যেভাবে আমাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করল এখানকার অধিবাসীরা তা'তে একটা কথা বুঝলাম যে আমাকে আমার প্রজারা কী ঘৃণা করে।' একটু থেমে রাজা গুমণ্ড বলল—আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। কিন্তু আমার তো জীবন শেষ হ'য়ে যাবে এই কয়েদঘরেই।

—না' ফ্রান্সিস বলল—'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আপনার মুক্তির জন্যে যদি আপনি প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রজাদের মঙ্গল ছাড়া বাকী জীবন আপনি আর কিছু ভাববেন না।

—যদি সত্যিই আমি থিংভেলির রাজ্যের রাজপদ ফিরে পাই আমি সর্বতোভাবে প্রজাদের কল্যাণসাধন করবো। রাজা গুমণ্ড বলল।

—বেশ। 'ফ্রান্সিস বলল—'আমি বিশ্বাস করি আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি সততার সঙ্গে রক্ষা করবেন। আপনাকে মুক্তি দেবার জন্যে আমি রাজা ইনগল্ফকে অনুরোধ করবো। মনে হয় তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন।' ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তারপর ফ্রান্সিসরা জাহাজে ফিরে এল।

দিন কাটতে লাগল। ফ্রান্সিস ঘুমোনোর আগে পর্যন্ত কবি আরির বইয়ে পাওয়া ছবি আর নক্সাটা দেখে। কিন্তু তার রহস্য আর উদ্ধার করতে পারে না।

দু'একদিন পরে পরে মারিয়া অথবা হ্যারিকে নিয়ে লোগবার্গে যায়। ঘুরে ঘুরে স্তম্ভগুলো দেখে, প্রদীপ দেখে, ঘাসে ঢাকা জায়গাটা দেখে কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। ফ্রান্সিস এখানে এলেই সেই বৃদ্ধ লোকটির ঘরে যায়। বৃদ্ধটির সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বৃদ্ধটির নাম হ্রোলগ। সে আইসল্যাণ্ডের পুরোনো দিনের অনেক গল্প করে। কিন্তু সপ্তম স্তম্ভের ব্যাপারে ফ্রান্সিস আর নতুন কিছু জানতে পারে না। হ্রোলগ সেই পুরোনো কথাটাই বলে—আর একটা স্তম্ভ রাজা ফ্রোকি নাকি পুঁতেছিলেন। পাথরের নয়—সোনার স্তম্ভ। কিন্তু সে জানে না সেটা কোথায় পোঁতা হয়েছিল।

দেখতে দেখতে উৎসবের দিন এসে গেল। নগর থেকে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে উৎসবের সাজে সেজে পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চলেছে লোগবার্গে। ফ্রান্সিস, মারিয়া আর বন্ধুরাও চলল লোগবার্গে।

স্তম্ভগুলোর কাছে ওরা যখন পৌঁছল তখন দেখল প্রদীপ জ্বালানো হয়ে গেছে। আলোয় ভরে গেছে নাচগানের আসর। ওরা পাহাড়ের গায়ে খাঁজকাটা আসনগুলিতে

বসল। একটু পরেই গাড়ি চড়ে রাজা ইনগল্‌ফ ও রানী এলেন। নিজেদের নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। সেদিন দর্শকের সংখ্যা আগের দিনের চেয়ে বেশি।

উৎসব শুরু হলো। একদল মেয়ে রঙচঙে বাহারি পোশাকে সেজে স্তম্ভগুলোর পেছনে যে নক্সা-তোলা মোটা কাপড় বিছানো হয়েছে তাতে এসে দাঁড়াল। বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল। দুটি মেয়ে এগিয়ে এসে গান ধরল। গানের বিষয়—রাজা ফ্লোকির বীরত্বের কাহিনী। ওরা দু'জন গান শেষ করতে চারদিকে করতালির শব্দ শোনা গেল। এবার সব মেয়েরা মিলে গাইতে লাগল ভেড়াচালকদের গান। পাহাড়ের সবুজ ঘাসে লোকেরা ভেড়া চরিয়ে বেড়ায় এটা তাদের গান। এই গান শেষ হতে রাজা-রানী চলে গেলেন। আবার গান আর সেই সঙ্গে নাচ শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে আসর জমে উঠল। পুরুষ দর্শকরাও অনেকে নাচের আসরে যোগ দিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাচগান চলল। প্রদীপের আলো কমে গেল। একসময় নাচগানের উৎসব শেষ হলো।

দর্শকরা নগরে ফিরে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরাও ফেরার জন্যে একত্র হলো। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—'তুমি ওদের সঙ্গে ফিরে যাও। আমি আর হ্যারি কিছুক্ষণ পরে যাচ্ছি।'

মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—'তোমাদের দু'জনের সঙ্গে আমিও থাকবো। তোমাদের সঙ্গেই ফিরবো।'

ফ্রান্সিস বলল—'বেশ।' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—'তোমরা চলে যাও। আমরা পরে যাবো।'

বন্ধুরা হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসবপ্রাঙ্গণ জনহীন হয়ে গেল। সেদিনের মতো আজও কয়েকজন লোক পাহাড়ের খাঁজে এখানে ওখানে ভেড়ার লোমের মোটা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে দেখা গেল।

ফ্রান্সিস পাথরের আসন ছেড়ে স্তম্ভগুলোর কাছে এল। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সঙ্গে মারিয়া আর হ্যারি। একটুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফ্রান্সিস যে নক্সা বোনা মোটা কাপড়টা পাতা ছিল তার ওপরে বসে পড়ল। তারপর হাতে মাথা রেখে আধশোয়া হলো। পাথরের প্রদীপের আলো কমে গেছে। ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল ছ'টা স্তম্ভ আর পাথরের প্রদীপগুলোর দিকে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল মাটিতে পাতা মোটা কাপড়ের নক্সাগুলোর ওপর খুব আবছা স্তম্ভের ছায়া পড়েছে। ছায়াগুলো লম্বা হয়ে নেমে এসেছে। তবে স্পষ্ট নয়। কাপড়ের নক্সার জন্যে আর প্রদীপের আলোগুলোও কমে এসেছে বলে। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে ছায়া তিনটে ত্রিকোণ। নক্সাটাও তো ত্রিকোন! ফ্রান্সিস শরীরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে ডাকল—'হ্যারি।'

হ্যারি আর মারিয়া ছুটে এল। হ্যারি বলল—'কি ব্যাপার?'

—'এই নক্সাকাটা কাপড়টা সরাতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

তারপর তিনজনে মিলে কাপড়টা সরাতে লাগল। তখনই দেখল, হ্রোলগ আস্তে আস্তে আসছে। ও আসার আগেই কাপড়টা তোলা হয়ে গেছে। দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে হেসে হ্রোগল বলল—'তোমরা কেন তুলছো। ওটা তো আমার কাজ।'

তিনটি ছায়াই মিলেছে এক বিন্দুতে।
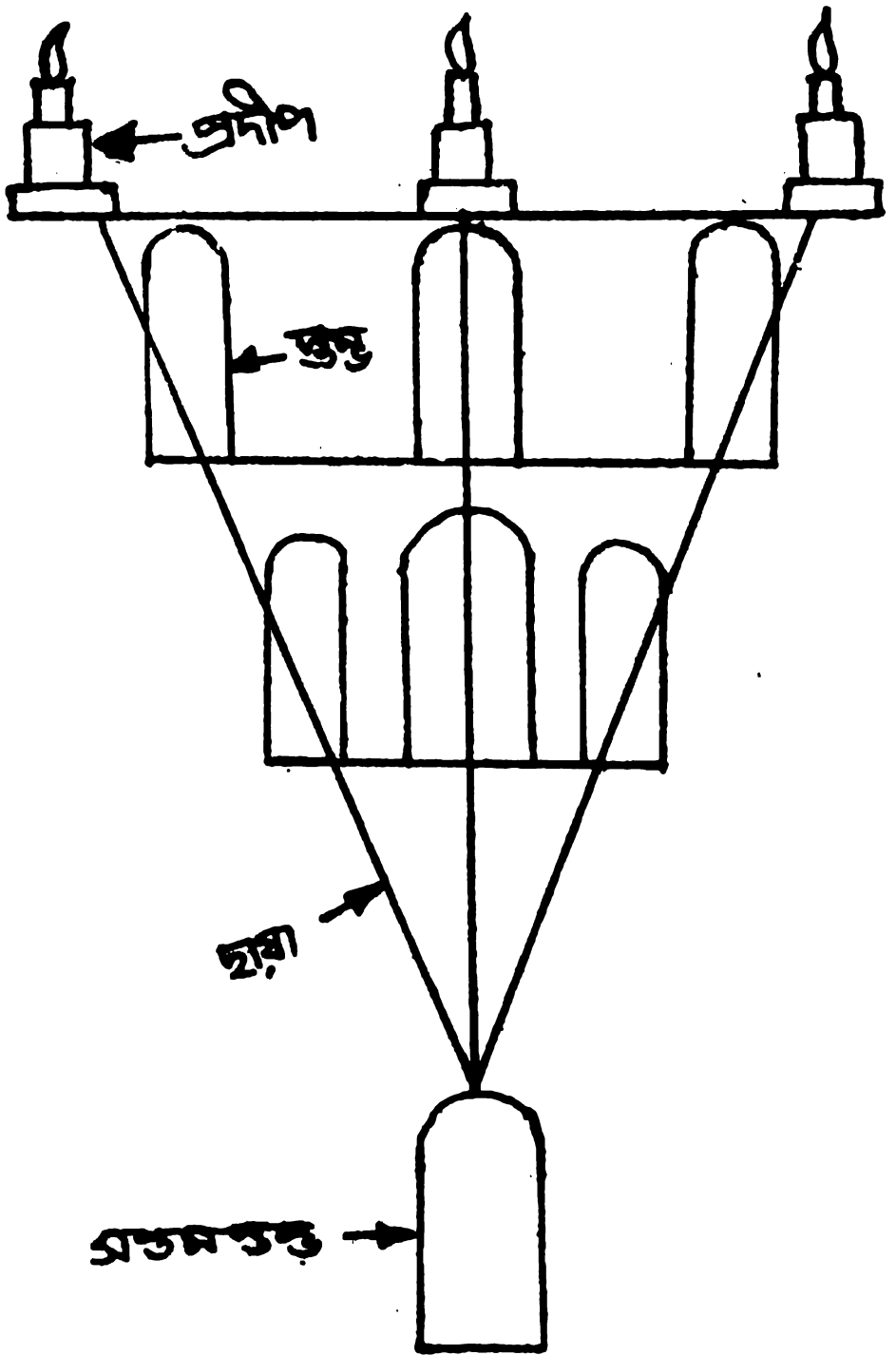
ফ্রান্সিস সে কথায় কান দিল না। ও তখন মাথা নিচু করে ঘাসের জমিতে স্তম্ভের যে অস্পষ্ট ছায়া পড়েছে তাই দেখছিল। এবার মুখ তুলে বলল—'হ্রোগল—আপনি প্রদীপ তিনটের পলতে উস্কে দিন তো। যতটা পারেন প্রদীপের আলোটা উজ্জ্বল করুন।'

হ্রোগল চলল প্রদীপের পলতে উস্কে দিতে। বিড়বিড় করে মাথা নেড়ে বলতে লাগল—'ছেলেটার মাথঅ খারাপ হয়ে গেছে।'

হ্রোগল মই বেয়ে উঠল। লম্বা কাঠের লাঠিটা দিয়ে পরপর তিনটে পাথরের প্রদীপের পলতে উস্কে দিল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল চারদিক।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল—'হ্যারি মারিয়া—দেখো স্তম্ভের তিনটে ছায়া মিলছে কিনা।'

হ্যারি আর মারিয়া দেখল—সত্যিই তাই। স্তম্ভ ছ'টির ছায়া একটা বড় ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে। তিনটে ছায়াই মিলেছে নিচে একটা বিন্দুতে।

ফ্রান্সিস এখানে যতবার আসে—ছবি আর নক্সার কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে আসে। আজকেও এনেছিল। ও ঢোলা জামার তলা থেকে নক্সাটা বের করল। নক্সার কাগজটা ঘাসে ঢাকা মাটিতে পাতল। বলল—'হ্যারি, মারিয়া—দেখো—নক্সার ওপরের দিকের তিনটি আলোর চিহ্ন। এগুলো ঐ তিনটে পাথরের প্রদীপ। তার নিচের বিন্দুগুলোতে যদি ছ'টা স্তম্ভের কল্পনা করো তাহ'লে নক্সাটা এরকম দাঁড়াবে কিনা. অর্থাৎ প্রদীপশিখাগুলো থেকে তিনটে ছায়ার দাগ কল্পনা করো। সেই ছায়াগুলো ঠিক নিচে একটা বিন্দুতে মিলে ত্রিভুজের সৃষ্টি করবে। দেখো ভালো করে—

মারিয়া ও হ্যারি ঝুঁকে পড়ে দেখল—ঠিক তাই। ফ্রান্সিস বলল—'ঐ দেখো—স্তম্ভের ছায়াগুলো ঐ জায়গায় মিশে গেছে।' দেখা গেল সত্যিই তিনটি ছায়া ঐ জায়গাটায় মিশে গিয়ে একটা ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সিস ঐ মিশে যাওয়া বিন্দুতে মাটিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে দু'হাত ওপরে তুলে বলে উঠল—'এইখানে আছে সেই রহস্যময় সপ্তম স্তম্ভ।'

হ্যারি একটুক্ষণ ভাবল। সত্যিই তো। নক্সাটা তো এই নির্দেশই দিচ্ছে। হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। চিৎকার করে বলতে লাগল—'সাবাস্—সাবাস্ ফ্রান্সিস।' মারিয়া তখনও রহস্যভেদ করার ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পারিনি। হ্যারি এসে আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। মারিয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। তিনজনেই প্রায় নাচতে লাগল।

বৃদ্ধ হ্রোলগ এসব দেখে বলে উঠল—'ছেলেমেয়েরা —নাচ অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে।'

হ্যারি ছুটে এসে হ্রোলগকে জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগল। এদিকে ওখানে যারা কম্বল জড়িয়ে ঘুমিয়েছিল তাদের এই চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। ওরা উঠে বসল কেউ কেউ। হ্যারিদের নাচ দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস হ্রোলগকে বলল—'আপনাকে সেদিন আপনার বাগানে বেলচা নিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছিলাম। আছে তো ওটা?'

—'তা, থাকবে না কেন।'

'—আপনি হ্যারিকে নিয়ে যান। বেলচাটা ও নিয়ে আসবে।,' ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি একটু পরেই বেলচাটা নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বেলচাটা হাতে নিল। তিনটে ছায়া যে বিন্দুতে মিশেছে সেখানে বেলচাটা বসিয়ে দিল। বলল—'এই জায়গাটা খুঁড়তে হবে।' তারপর নিজেই বেলচা দিয়ে জায়গাটা খুঁড়তে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ খুঁড়ল। তারপর হ্যারিকে ডাকল। হ্যারিও খুঁড়তে লাগল। তবে হ্যারি বরাবরই শরীরে দিক থেকে দুর্বল ও অল্পেতেই হাঁপিয়ে উঠল। তখন ফ্রান্সিস হাত লাগাল। চলল গর্ত খোঁড়া।

ওদিকে যারা শুয়ে বসে ছিল তারা তো অবাক। হলো কি এই পুরুষ দুটোর আর মেয়েটির। এতক্ষণ হৈ হৈ নাচানাচি করে এখন মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে? দিল গর্ত খুঁড়ে উৎসবের নাচগানের জায়গাটা নষ্ট করে। ওরা দু'তিনজন কাছে এল। মাটি কাটা দেখল। একজন বলল—'কী ব্যাপার? এখানে গর্ত খুঁড়েছেন কেন?'

ফ্রান্সিস বেলচা চালতে চালতে বলল—'এখানে ঐ স্তম্ভগুলোর মতো একটা স্তম্ভ আছে কিনা খুঁড়ে তাই দেখবো।'

—'বেশ, একটা পাথরের স্তম্ভ না হয় পেলেন। কিন্তু তাতে হবেটা কী?' আর একজন বলল।

হ্যারি বলল—'সেটা এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে একটা রহস্যের সমাধান হবে।'

লোকগুলো পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল—এগুলো কি পাগল নাকি? ততক্ষণে আর বাকি সবাই এসে ওখানে জড় হয়েছে। নানা মন্তব্য করতে লাগল ওরা। ফ্রান্সিস মাটি খুঁড়ে চলল। হ্যারি ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—'ভাই, তোমরাও একটু সাহায্য করো না।'

ওরা সব গাঁয়ের চাষী। এসব কাজ ওদের কাছে কিছুই না। সবাই রাজী হলো না। দু'জন শুধু বোধহয় কৌতূহলবোধ করল। মজার খেলা। দেখাই যাক না। একটি যুবক ফ্রান্সিসকে থামতে বলল। ফ্রান্সিস খোঁড়া থামিয়ে হাঁপাতে লাগল। যুবকটি বেলচা হাতে নিল। বলল——'এসব আপনাদের কাজ নয়।' তারপর নিপুণ ভঙ্গীতে বেলচা চালাতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যেই হাঁটুসমান গর্ত করে ফেলল।

হ্যারি বলল—'ফ্রান্সিস—কোনো কিছুর হদিস তো পাওয়া যাচ্ছে না।'

ফ্রান্সিস চিন্তিতস্বরে বলল—'হুঁ, তাই তো দেখছি। দেখা যাক আর হাত কয়েক খুঁড়ে।' এবার যুবকটি বেলচা রেখে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—'তুমি উঠে এসো। আমি খুঁড়ছি।'

অন্যজন এগিয়ে এসে বলল—'না—আপনি বিশ্রাম করুন। আমি হাত লাগাচ্ছি।'

এই লোকটি একটু বয়স্ক। যুবকটি গর্ত থেকে উঠে এল। বয়স্ক লোকটি খুঁড়তে লাগল। হাত খানেকও খোঁড়েনি, হঠাৎ বেলচায় কী লেগে ঠং করে শব্দ হলো। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে গর্তের মধ্যে তাকাল। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না। বয়স্ক লোকটি হাত দিয়ে দিয়ে ওখানকার মাটি সরিয়ে সরিয়ে জিনিসটা দেখল। বলল—'মনে হচ্ছে লোহার ডান্ডার মতো কিছু।'

ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি, শীগগিরি হ্রোলগের ঘর থেকে একটা মশাল জ্বালিয়ে

নিয়ে এসো।'

হ্যারি ছুটে চলে গেল। বয়স্ক লোকটি ঐ লোহার ডান্ডাটার চারপাশে খুঁড়তে লাগল। কাটা মাটি সরাতে লাগল।

হ্যারি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বয়স্ক লোকটিকে বলল—'তুমি ভাই এসো। আমি খুঁড়ছি।'

লোকটি গর্ত থেকে উঠে এল। ফ্রান্সিস মশাল হাতে গর্তে নামল। যেটাকে লোকটা লোহার ডান্ডা বলছিল সেটার গায়ে তখনও মাটি লেগে আছে। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে ওটার গা থেকে মাটি মুছে ফেলল। মশালের আলোয় দেখল—লোহা নয়—সোনা। সোনার দন্ড মতো। তার গায়ে সবুজ নীল মীনে করা। এইবার ফ্রান্সিস বিপদ আঁচ করল। যদি লোকগুলো জানতে পারে যে ওটা লোহা নয় সোনা, তাহলেই বিপদ। সোনার লোভে মানুষ উন্মত্ত হয়ে যায়। তখন মানুষ মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাছাড়া এরা গরিব চাষী। সোনার জন্যে নিজেরাই খুনোখুনি শুরু করে দেবে। ফ্রান্সিসদের তো খুন করবে প্রথমেই।

ফ্রান্সিস কোনো কথা না বলে মশালটা খোঁড়া মাটির মধ্যে গুঁজে দিল। মশাল নিভে গেল। গর্তটা অন্ধকার হয়ে গেল। ফ্রান্সিস মশাল নিভিয়ে ফেলল যাতে চাষী লোকগুলোর সোনার দন্ড দেখতে না পায়। গর্তের ওপরে উঠে এল। বয়স্ক লোকটি জিজ্ঞেস করল—'ওটা লোহার ডান্ডা তাই না?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'হ্যাঁ, এত খাটুনি বৃথাই গেল। বোধহয় ফ্রান্সিসদের পাগলামির ব্যাপারেই কথা বলতে লাগল ওরা।

হ্যারির কাছে এসে ফ্রান্সিস দাঁড়াল। হ্যারি বলল—'লোহার একটা ডান্ডাকে তুমি সোনার স্তম্ভ বলবে?

ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল—'চুপ।' তারপর হ্যারি কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল—'হ্যারি—লোহার নয়—সোনার দন্ড মতো। তাতে মীনের কাজ করা।

—'বলো কি?' হ্যারি চমকে উঠল।

—'আস্তে।' ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—'হ্রোলগের একটা আধভাঙা ঘোড়া গাড়ি আছে দেখেছি। গোড়াটা তেজীয়ান না হলেও মোটামুটি ছুটতে পারবে। তুমি গাড়িটায় চড়ে বন্দরে চলে যাও। বিস্কো শাঙ্কো আর জনার দশেক বন্ধুকে দিয়ে এসো। সবাই যেন অস্ত্র নিয়ে আসে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

হ্যারি চলে গেল। মারিয়া সন্দেহ করল কিছু একটা হয়েছে। কাছে এসে বলল—'কী হয়েছে ফ্রান্সিস'

—'পরে বলবো।' ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল। অন্য মেয়ে হলে হয়তো কী হয়েছে সেটা জানবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ত। কিন্তু মারিয়া খুব বুদ্ধিমতী। সে বুঝল যে এখন চুপ করে থাকাই ভাল। সময় এলে ফ্রান্সিস নিজে থেকেই সব বলবে। ফ্রান্সিস বলল—'খুব পরিশ্রান্ত—বুঝলে? চলো—ঐ স্তম্ভে হেলান দিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই।

একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে ফ্রান্সিস শরীর ছড়িয়ে আধশোয়া হলো। মারিয়াও কাছে বসল। অস্পষ্ট আলোয় ওরা দেখল একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে হ্যারি

চলেছে সঙ্গে বৃদ্ধ হ্রোগল।

ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকাল। দেখল চাষী শ্রেণীর সেই লোকগুলো ভেড়ার লোমের মোটা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে সবাই। পাথরের প্রদীপের আলো নিভে এসেছে। আকাশে দিগন্তে ম্লান আলো। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—'মারিয়া—সপ্তম স্তম্ভের রহস্যের সমাধান মরেছি।' মারিয়া খুশীতে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে ফ্রান্সিসের ইঙ্গিতে থেমে গেল। ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—'একটা সবুজ মীনে করা সোনার দন্ড পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা জাহাজের মাস্তুল অর্থাৎ 'দীর্ঘ সর্প' জাহাজটা ওখানেই পুঁতে রাখা হয়েছে। 'সপ্তম স্তম্ভ' যেটা থরবার্গ বলেছিল সেটা আসলে সোনার মাস্তুল। স্তম্ভ নয়।'

—'এখন কী করবে?' মারিয়াও নিচু স্বরে বলল।

—'এখানে যে চাষীরা ঘুমিয়ে আছে তারা কিছু বোঝার আগেই আমাদের বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। তাই হ্যারিকে গাড়ি করে পাঠালাম। বন্ধুরা এলেই নিশ্চিন্ত। ঐ চাষী লোকগুলোর মনে সন্দেহ হয় এমন কোনো কথা আমরা এখন বলবো না। তেমন কোনো কাজও করবো না। চুপ করে বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করবো।' মারিয়া কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

অনেকটা সময় কেটে গলে। ফ্রান্সিস মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। তখনই দেখল দূরে রাস্তার ওপর অল্প অন্ধকার আর কুয়াশার মধ্যে মশালের আলোর বিন্দু পর পর কয়েকটা। গাড়ি আসছে। একটুক্ষণের মধ্যেই গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল। কয়েকটা ঘোড়ায় টানা চাষীদের গাড়ি বোঝাই হয়ে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা এল। সবার পেছনে হ্রোলগের গাড়ি।

গাড়ি থেকে নেমে বন্ধুরা হৈ-হৈ করতে ছুটে এল। সকলের হাতেই খোলা তরোয়াল। শুধু শাঙ্কোর কাঁধে ধনুক ও তূনীর। ওরা ধরেই নিয়েছিল—এবার লড়াই হবে। নইলে ফ্রান্সিস অস্ত্রশস্ত্র আনতে বলবে কেন।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—'ভাইসব—ঐ গর্তটা খুঁড়ে আরো বড় করতে হবে। হাত লাগাও।' ভাইকিং বন্ধুরা হাতের তরোয়াল স্তম্ভগুলোর কাছে জমা করে রাখল। হ্যারি বুদ্ধি করে চারটে বেলচা হ্রোলগের গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিল। পাঁচজন ভাইকিং বেলচা চালিয়ে গর্ত গভীর করতে লাগল। তবে লড়াই হলো না বলে সকলেই বেশ মনমরা হয়ে গেল।

আরো হাতখানেক খুঁড়তেই দেখা গেল পাথরের ছোট ছোট চাঁই দিয়ে বাঁধানো একটা জায়গা। সেই চাঁইগুলোর একটা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে সোনার দন্ডটা।

ওরা ফ্রান্সিসকে ডাকল। ফ্রান্সিস ঘোড়ার গাড়িতে রাখা মশাল নিয়ে গর্তে নামল। মশালের আলোয় দেখল নিচেটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। ফ্রান্সিস বুঝল—ঐ বাঁধানো জায়গাটাতেই রাখা আছে ক্ষুদে 'দীর্ঘ সর্প' সোনার জাহাজ। দেখা গেল বাঁধানো জায়গাটা লম্বাটে। ফ্রান্সিস গর্ত থেকে উঠে এল। বলল—'ঐ বাঁধানো পাথরগুলো খুলে ফেল। দেখা যাক কী আছে ওর মধ্যে।'

খুঁড়তে খুঁড়তে প্রায় সাত ফিট বাঁধানো জায়গাটা পাওয়া গেল। এবার পাথরগুলো খুলতে হবে। গাঁইতি চাই। হ্রোগলই ওর ঘর থেকে একটা গাঁইতি নিয়ে এল। একে একে পাথরের ছোট ছোট চাঁইগুলো জোড়ামুখে চাড় দিয়ে খোলা হতে লাগল।

কয়েকটা চাই খুলতেই দেখা গেল চকচকে গাড় নীল রঙের কাপড়ে কী যেন ঢাকা। সব চাঁই খুলতেই দেখা গেল—একটা পাঁচ ফিট লম্বা সোনার জাহাজ। তার মাস্তুলটা তো আগেই দেখা গিয়েছিল। ক্ষুদে জাহাজের মুখটা অবিকল সেই ছবির সাপের মুখের মতো। মশালের আলো পড়তে জাহাজের সোনার গা ঝিকিয়ে উঠল। ক্ষুদে জাহাজটা পাথরের চাঁইয়ের বাক্সের মধ্যে ছিল বলেই মাটি লাগেনি। এবার ফ্রান্সিস গর্তে নামল। বিস্কো মশাল হাতে নামল। ফ্রান্সিস গাড় নীল কাপড়টা সরাল। ঝক্‌মক্ করে উঠল জাহাজের এক ফুট চওড়া খোল বোঝাই মণিমাণিক্য, দামী পাথরের টুকরো।

ততক্ষণে ভাইকিংরা আর কয়েকজন চাষী সবাই ঝুঁকে পড়েছে গর্তটার ওপর। ফ্রান্সিস ক্ষুদে জাহাজটা তুলতে গেল। তুললও কিছুটা। কিন্তু বেশ ভারী। তাছাড়া তুলতে গেলে জাহাজটা কাত হবে। খোল থেকে মণিমাণিক্য দামী পাথরগুলো ছড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে। ফ্রান্সিস বললো—'বিস্কো—মশালটা ওপরে কারো হাতে দাও। তারপর জাহাজের ওপাশটা ধরো। দু'জনে মিলে তুলতে হবে।'

মশাল গর্তের ওপরে একজন নিল। ফ্রান্সিস আর বিস্কো মিলে ক্ষুদে সোনার জাহাজটা তুলতে লাগল। আস্তে আস্তে ওপরে তুলতেই এতক্ষণে মশালের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল সোনার ক্ষুদে জাহাজ, মাস্তুল। অপরূপ সবুজ নীল মীনে করা জাহাজের ঝকঝকে গা, মাস্তুল। জাহাজের খোলভর্তি মণিমাণিক্য দামী পাথরের স্তুপ। তার মধ্যে কিছু দামী হীরের সোনার গয়নাগাঁটিও আছে।

এই দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। তারপাই শুরু হলো ভাইকিংদের চিৎকার—'ও—হো—হো—হো—।'

ওদিকে চাষী লোকগুলোর সকলেরই ঘুম ভেঙে গেছে। ওরা ছুটে এল। সোনার জাহাজ, মণিমাণিক্য দেখে ওরা বিস্ময়ে হতবাক। হাঁ করে দেখতে লাগল জাহাজটা।

গর্ত থেকে উঠে আসতেই ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। শুরু হলো ফ্রান্সিসকে কাঁধে তুলে নাচ। মারিয়াও খুশিতে নেচে উঠল। ছুটে এসে জাহাজের সোনার গায়ে হাত ঘষতে লাগল, মণিমাণিক্য তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। তখনই ও দেখল জাহাজটার গায়ে লেখা—'দীর্ঘ সর্প।'

ক্ষুদে সোনার জাহাজটা রাখা হলো স্তম্ভগুলোর কাছে। ফ্রান্সিসের নির্দেশ হ্যারি গাড়ি নিয়ে ছুটল নগরের দিকে—রাজা ইনগল্‌ফকে এই সংবাদ জানাতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা রেভক্‌জাভিক নগরে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। রাজা ইনগল্‌ফ ও রানী ততক্ষণে গাড়িতে চলে এসেছেন। রেভক্‌জাভিক নগরের লোকেরাও ছুটে আসতে লাগল লোগবার্গের দিকে যেন আবার নাচ-গানের উৎসব হবে।

রাজা ইনগল্‌ফ জাহাজ ও মণিমাণিক্য দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। আনন্দে ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রানীও খুশি। মারিয়াকে বুকে টেনে নিলেন। রাজা ফ্রান্সিসের মুখ থেকে শুনলেন মণিমাণিক্যের জাহাজ উদ্ধারের গল্প।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই জায়গাটা লোকারণ্য হয়ে গেল। সবাই অবাক চোখে দেখতে লাগল সেই অপরূপ সোনার জাহাজ, মণিমাণিক্য।

এবার রাজা ইনগল্‌ফ ফ্রান্সিসকে বললেন—'এই মহামূল্য জাহাজ নিয়ে এখন কী করবে?'

—'এই গুপ্তধন তো এই দেশেরই রাজা ফ্রোকির। কাজেই এই দেশেই থাকবে।'

রাজা ইনগল্‌ফ বললেন—'তা ঠিক। তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু ফ্রান্সিস—মারিয়াকে উদ্ধার করতে, আমার রাজ্যকে শত্রুর হাত তেকে বাঁচাতে এই গুপ্তধন উদ্ধার করতে যে সাহস, বুদ্ধি ও শৌর্যের পরিচয় তুমি দিয়েছো তাতে এই 'দীর্ঘ সর্প' তোমারই প্রাপ্য।'

ফ্রান্সিস কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারির দিকে তাকাল।

হ্যারি নম্রস্বরে বলল—'রাজা ইনগল্‌ফ—আপনি আপনার যে উদার মনের পরিচয় দিলেন তা আমরা কোনদিন ভুলবো না। আমার প্রিয় বন্ধু ফ্রান্সিস সোনার ঘণ্টা, হীরে-মুক্তো এসব এনেছে আর সেসব আমাদের রাজার জাদুঘরে রক্ষিত আছে এই 'দীর্ঘ সর্প' জাহাজ আইসল্যান্ডবাসীদের রাজা ফ্রোকির সম্পত্তি। তাই এটা আপানার প্রাসাদেই থাক। বরং মণিমাণিক্যগুলো ফ্রান্সিসকে দিন।

রাজা একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—'বেশ তাই হবে।' তারপর বললেন—'ফ্রান্সিস, মণিমাণিক্য রেখে দাও। শুধু জাহাজটা আমাদের গাড়িতে তুলে দাও। গাড়ি আস্তে আস্তে যাবে আমার দেশবাসী এই মহামূল্যবান গুপ্তধন স্বচক্ষে যেন দেখতে পায়।'

রাজা ইনগল্‌ফের কথামতো মারিয়া একটা চামড়ার থলিতে মণিমাণিক্য গয়নাগাঁটি ভরে রাখল। জাহাজটা তুলে দেওয়া হলো রাজার গাড়িতে। রাখা হলো সামনের আসনের ওপর। রাজা-রাণী গাড়িতে উঠলেন।

ফ্রান্সিস কী ভেবে গাড়িতে বসা রাজা ইনগল্‌ফের দিকে এগিয়ে গেল। বলল—মহামান্য রাজা—আপনার কাছে আমার দু'টো অনুরোধ আছে।

—বেশ—বলো। রাজা বললেন।

—প্রথম অনুরোধ—ফ্রান্সিস বলল—'আপনি রাজা গুমন্ডের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। রাজা গুমন্ডকে মুক্তি দিন এবং তার হারানো রাজ্য থিংভেলির তাকে ফিরিয়ে দিন।

রাজা ইনগল্‌ফ একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—'ফ্রান্সিস তুমি এই অনুরোধ করছো কেন?'

—কারণ আমি রাজা গুমন্ডের মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। তিনি অনুতপ্ত। আমাকে তিনি বলেছেন আবার থিংভেলির রাজ্যের রাজা হ'লে তিনি বাকি জীবন প্রজাদের কল্যাণ সাধন করবেন। গুমন্ড আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁকে একবার তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন। ফ্রান্সিস বলল। রাজা ইনগল্‌ফ দ্বিধায় পড়লেন। একদিকে চিরশত্রু রাজা গুমন্ডের প্রতি সমস্তজীবন কারাবাসের আদেশ অন্যদিকে স্নেহাস্পদ ফ্রান্সিসের অনুরোধ। একটু ভেবে নিয়ে রাজা ইনগলফ বললেন—'ফ্রান্সিস—তোমার অনুরোধ কি আমি রক্ষা না ক'রে পারি? ঠিক আছে—রাজা গুমন্ডকে আমি মুক্তি দেব। তার রাজত্বও তাকে ফিরিয়ে দেব।

—অশেষ ধন্যবাদ মহামান্য রাজা। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে বলল।

—তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ? রাজা বললেন;

ফ্রান্সিস এবার মারিয়ার হাত থেকে মণিমাণিক্য গয়নাভরা চামড়ার থলিটা নিল। থলিটা এগিয়ে ধ'রে বলল—'আপনি দয়া করে এই মণিমাণিক্য অলঙ্কার নিল।

এসব রাজা গুমন্ডকে মুক্তির সময় দেবেন।' রাজা আবার চিন্তায় পড়লেন। বললেন—'কিন্তু ফ্রান্সিস—রাজা গুমন্ড ভীষণ স্বার্থপর লোভী অর্থ পিশাচ।

—জানি। তবু তাঁকে আমি অনুরোধ করবো—এই সমস্ত মণিমাণিক্য বিক্রি ক'রে অর্থ সংগ্রহ ক'রে তা যেন উনি প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় করেন। ফ্রান্সিস বলল। এবার রাজা চামড়ার থলিটা নিলেন। রানীর হাতে দিলেন। বললেন—বেশ—এইসব মণিমাণিক্য অলঙ্কার রাজা গুমন্ডকে দেব। তোমারই এই গুপ্তসম্পদ উদ্ধার করেছো। নইলে এই গুপ্তধন মাটির নিচেই পড়ে থাকতো। কাজেই এ ব্যাপারে তুমি যা চাইবে তাই হবে। ফ্রান্সিস মারিয়া ও হ্যারি মাথা নুইয়ে রাজা রানীকে সম্মান জানাল। রাজা কোচওয়ানকে গাড়ি চালাতে ইঙ্গিত করলেন। গাড়ি চলল।

গাড়ি ধীরগতিতে চলল রেভক্‌জাভিকের দিকে। রাজার গাড়ির মশালের আলো পড়েছে দশ ফুট দীর্ঘ সোনার জাহাজে। ঝক্‌ঝক্ করছে জাহাজের গা—মীনে করা মাস্তুল। উপস্থিত মানুষেরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল। জনতার মধ্যে থেকে অনেকে নিঃশব্দে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। সোনার জাহাজ সোনার মাস্তুল। কী অপূর্ব সুন্দর। দেখে দেখে ওদের যেন সাধ মিটছে না। আস্তে আস্তে রাজার গাড়ি কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস মারিয়া, হ্যারি ও বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—চলো সবাই। সবাই ধ্বনি তুলে আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস মারিয়া ও হ্যারি একটা গাড়িতে উঠল। অন্য গাড়িগুলোয় উঠল ভাইকিং বন্ধুরা সব গাড়ি চলল রেভকজাভিকের উদ্দেশ্যে।

গাড়ি নগরে প্রবেশ করলে ফ্রান্সিস কোচওয়ানকে বলল—'কয়েদঘরের কাছে নিয়ে চলো।' গাড়ি রাজবাড়ির চত্বরে ঢুকল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল কয়েদঘরের সামনে। ফ্রান্সিসরা গাড়ি থেকে নামল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে একজন রক্ষীকে বলল—রাজা গুমন্ডের সঙ্গে দেখা করবো। দরজা খুলে দাও।' একজন রক্ষী বড় তালাটা খুলল। লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ঢুকল। রাজা গুমন্ড আজকে শুয়ে ছিল না দাঁড়িয়ে পায়চারী করছিল। মুখ ফিরিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখল। বলল—রাজা ইনগলফকে আমার কথা বলেছেন?

—বলেছি। আপনি খুব শিগগিরই মুক্তি পাবেন।

থিংভেলির রাজ্য আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্যি? রাজা গুমগু দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে গভীর বিস্ময়। গলায় বলে উঠল—'সত্যি আমি মুক্তি পাবো?'

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল। রাজা গুমগু কিছুক্ষণ দু'হাত তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল। যখন মুখ নামাল ফ্রান্সিসরা দেখল—রাজা গুমগুের চোখে জল। কান্না ভেজা গলায় গুমগু বলল—'ফ্রান্সিস—তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

—কিন্তু আপনার প্রতিশ্রুতি? ফ্রান্সিস বলল।

—অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। গুমন্ড ম্লান হেসে বলল।

—এই আইসল্যান্ডের একজন রাজা ছিলেন ফ্লোকি। তাঁর নাম শুনেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। উনি ছদ্মবেশে জলদস্যুতাও করতেন। গুমন্ড বলল।

—সেই রাজা ফ্রোকির গুপ্তধন আমরা উদ্ধার করেছি।

—বলো কি? গুমন্ড বেশ আশ্চর্য হ'ল।

—হ্যাঁ। দশ ফুট লম্বা একটা সোনার জাহাজ আর জাহাজের খোল ভর্তি মণিমাণিক্য অলঙ্কার। ফ্রান্সিস বলল। রাজা গুমন্ড বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল।

—এই সব মণিমাণিক্য অলঙ্কার আপনাকেই দেওয়া হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে? গুমন্ড আরও আশ্চর্য হ'ল।

—হ্যাঁ—দেওয়া হবে একটি শর্তে—সেই মণিমাণিক্য অলঙ্কার বিক্রি ক'রে একটি অর্থভান্ডার আপনি গড়ে তুলবেন। সেই অর্থ ব্যয়িত হবে শুধুমাত্র আপনার প্রজাদের কল্যাণে। অন্য কোন কারণে একটি স্বর্ণমুদ্রাও আপনি ব্যয় করতে পারবেন না।' রাজা গুমন্ড নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—ফ্রান্সিস—সত্যিই তুমি মহান। ফ্রান্সিস শুধু বলল—আপনার শরীর এখন কেমন?

—আমি অনেকটা সুস্থ। ফ্রান্সিস তোমাকে ধন্যবাদ। গুমন্ড বলল।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে ফিরে এল। জাহাজের ডেকে উঠতেই বন্ধুরা ওদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ ছাড়ো। এবার মাতৃভূমিতে ফেরা। সব ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—'ও—হো—হো।' তারপর যে যার কাজে লেগে পড়ল। দড়িদড়া টেনে বিরাট বিরাট পাল খাটানো হ'ল। ঘড়্ঘড়্ শব্দে নোঙর তোলা হ'ল। একটা পাক খেয়ে জাহাজ মহাসমুদ্রের দিকে জল কেটে চলল। পাশে দাঁড়ানো মারিয়াকে ফ্রান্সিস হেসে বলল—'তোমার কি দুঃখ হচ্ছে মারিয়া?

—কেন বলো তো? মারিয়া বলল।

—অত মূল্যবান মণিমাণিক্য রেখে এলাম।

মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—'দুঃখ নয় তোমার জন্যে আজ আমি গর্ববোধ করছি।' ফ্রান্সিস হেসে হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি—তোমার?' হ্যারি কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া হ্যারি—আগের অভিযানগুলোর শেষে কত মূল্যবান জিনিস নিয়ে দেশে ফিরেছি। আজ না হয় শূন্য হাতেই ফিরলাম—কী বলো? কেউ কোন কথা বলল না। নিস্তেজ আলো আর কুয়াশা ঢাকা আকাশের নিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে ওরা তাকিয়ে রইল। জাহাজ চলল।

সমাপ্ত

এর পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি ঃ—

সোনার ঘণ্টা, হীরের পাহাড়, মুক্তোর সমুদ্র, তুষারে গুপ্তধন; রূপোর নদী

এর পরবর্তী অধ্যায়গুলি ঃ—

বিষাক্ত উপত্যকা, চিকামার দেবরক্ষী, চুনীপান্নার রাজমুকুট, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন, যোদ্ধামূর্তি রহস্য, রানীর রত্নভাণ্ডার, চার্লসের স্বর্ণসম্পদ।

চিকামার দেবরক্ষী

ফ্রান্সিস আর মারিয়া রাজবাড়ির গাড়ি চড়ে রেভকজাভিকের জাহাজঘাটায় এল। একটু পরেই ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা শস্যটানা গাড়িতে চেপে জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠে সবাই আনন্দে হৈ হৈ করতে লাগল। যে মণিমাণিক্যের জাহাজের খোঁজে ওরা এসেছিল তা উদ্ধার করা হয়েছে। ওদের আনন্দ ধরে না।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া হাসিমুখে জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালো। সব বন্ধুরা ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। বন্ধু ভাইকিংরা চীৎকার করে উঠলো--'ও হো-হো-হো।' ফ্রান্সিস হাসল! হাত তুলে ওদের থামতে ইঙ্গিত করল। চীৎকার হৈ-হল্লা বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস বলল 'ভাইসব, রাজা ইনগলফ ও রাণী আমাদের আজ ভোজসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেছেন। আমরা ভোজসভায় অবশ্যই যাবো। তারপর ফিরে এসে জাহাজ ভাসাবো স্বদেশের উদ্দেশ্যে।' সব ভাইকিংরা আনন্দে চীৎকার করে উঠল--'ও-হো-হো।' এবার সবাই ভোজসভায় যাবে বলে পোশাক পরে তৈরি হতে গেল।

ক'ঘন্টা পরে ভাইকিংরা ভোজসভার শেষে জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস ও মারিয়া রাজা ইনগলফের বিশেষ অতিথি হিসেবে গিয়েছিল। ওরাও রাজবাড়ির গাড়িতে ফিরে এল। ফ্রান্সিস জাহাজ ছাড়ার ইঙ্গিত করল। ঘরঘর শব্দে জাহাজের নোঙর তোলা হলো, বাতাসের তেমন জোর নেই। দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে চলে গেল। সমুদ্রের জলে দাঁড় চালাবার শব্দ উঠল, ছপ্ ছপ্। সব কটা পাল খাটানো হলো। পালে হাওয়া লাগল। জাহাজটা আস্তে আস্তে রেভকজাভিক বন্দর ছেড়ে মহাসমুদ্রের দিকে চলল।

দিনকয়েক পরেই জাহাজ দিনরাতের অঞ্চলে চলে এল। শীতের তীব্রতা কমে গেল। সবাই বাড়তি পোশাক খুলে ফেলল। জাহাজ চলল ভাইকিংদের দেশের দিকে।

সেদিন দুপুরবেলা। জোর হাওয়ায় জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। আকাশও পরিস্কার। দাঁড় টানার কাজ থেকে ছুটি। ভাইকিংরা বেশিরভাগই নিজেদের কেবিনে শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে। অনেকে ঘুমিয়েও নিচ্ছে। জাহাজের ডেকের নিস্তেজ রোদে কয়েকজন ভাইকিং কম্বল পেতে শুয়ে আছে। ওদের মধ্যে বিস্কোও আছে। হঠাৎ মাস্তুলের মাথায়-বসা নজরদার নিচে ডেকের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল--'একটা জাহাজ এইদিকে আসছে।'

--'কোন দেশের জাহাজ?' শুয়ে থাকা বিস্কো চেঁচিয়ে বলল।

--'মাস্তুলে একটা পতাকা উড়ছে-ঠিক ঠাহর করতে পারছি না কোন দেশের পতাকা।' নজরদার বলল।

--'মরুক গে', বিস্কো বলল--'দেখো জলদস্যুদের জাহাজ যেন না হয়।'

একটু সময় গেল। সেই জাহাজটা বেশ কাছে চলে এসেছে। নজরদার এতক্ষণে জাহাজটার পতাকা ভালোভাবে দেখতে পেল। স্পেনদেশের পতাকা। নজরদার নিশ্চিত হলো। নজরদার চেঁচিয়ে বলল--'স্পেন দেশের জাহাজ।'

বিস্কো শুয়ে শুয়েই বলল-- 'ঠিক আছে।'

জাহাজটা তখন ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ের কাছে পাশে পাশেই চলেছে। হঠাৎ নজরদার দেখল সেই জাহাজের মাস্তুল থেকে স্পেনদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলা হলো। সেখানে ওড়ানো হলো কালো কাপড়ে সাদা মড়ার মাথা আর ঢ্যাড়া আঁকা জলদস্যুদের পতাকা। নজরদারের বুক কেঁপে উঠল-- জলদস্যুদের জাহাজ। ও চিৎকার করে উঠল-- 'জলদস্যু।' কিন্তু ওর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। যেটুকু শব্দ গলা দিয়ে বেরুলো তা কারো কানেই গেল না। ততক্ষণে জলদস্যুদের জাহাজটা ভাইকিংদের জাহাজের গায়ে এসে লেগেছে। কোনোরকম শব্দ না করে জলদস্যুরা খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে এই জাহাজে উঠতে লাগল। প্রথমে উঠল জলদস্যুদের দলপতি। ছুঁচোলো গোঁফ দাড়ি মুখে। মাথায় বাঁকা কালো টুপি। গায়ে জমকালো পোশাক। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বুট। জলদস্যুদের ইয়া গোঁফ, গাল পর্যন্ত জুলপি, মাথায় ঝাঁকরা চুলে লাল কাপড়ের ফেট্টি, গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি।

নজরদার দ্রুত মাস্তুলের গায়ে লাগানো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল-- 'জলদস্যু-সাবধান।' ও কথাটা একবারই বলতে পারল। জলদস্যুর দলপতি কোমরের বেল্টে গোঁজা লম্বা ছুরিটা বের করে ছুঁড়ল নজরদারের দিকে। ছুরিটা পাক খেয়ে ছুটে গিয়ে নজরদারের বুকে বিঁধে গেল। ও দড়ির সিঁড়ি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিঁধে যাওয়া ছুরিটা ধরে টানতে গেল। ছুরিটা বুক থেকে বের করতে পারল না। ছিটকে পড়ল জাহাজের রেলিং-এর ওপর। তারপর পাক খেয়ে সমুদ্রের জলে।

ততক্ষণে যে চারজন ভাইকিং ডেকে কম্বল পেতে শুয়ে ছিল তাদের দু'জনের বুকেও জলদস্যুরা তরোয়াল বিঁধিয়ে দিয়েছে। ওরা টুঁ শব্দটিও করতে পারল না। বিপদ আঁচ করে বিস্কো দ্রুত উঠে পড়ল। দেখল উদ্যত তলোয়ার হাতে জলদস্যুরা ওদের ঘিরে ধরেছে। জলদস্যুদের দলপতি এগিয়ে এসে হাতের তরবারির ডগাটা বিস্কোর বুকে ঠেকিয়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল-- 'কোনোরকম শব্দ করবে না। চলো তোমাদের অস্ত্রঘরটা দেখিয়ে দাও।' ততক্ষণে অন্য ভাইকিংটির মাথায় একজন জলদস্যু তলোয়ারের বাঁট দিয়ে ঘা মেরেছে। ভাইকিংটি দু'হাতে মাথা চেপে ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়ে গেল।

এবার বিস্কোর পিঠে জলদস্যুদের দলপতি তলোয়ারের ডগা ঠেকিয়ে বলল-- 'চলো।'

বিস্কো দাঁড়িয়েই রইল। ও তখন ভাবছে কী করে ফ্রান্সিস ও হ্যারিকে ওই বিপদের কথা জানাবে। ওর পিঠে তলোয়ারের চাপ বাড়িয়ে দস্যু দলপতি বলল-- 'চলো, নাহলে তলোয়ার বিঁধিয়ে দেব।' বিস্কো বুঝল এখন এদের কথামতো চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। রুখে দাঁড়ালে ওকে ঠিক হত্যা করবে। বিস্কো আস্তে আস্তে চলল। সিঁড়ি বেয়ে ওরা নামতে যাবে দলপতি চাপাস্বরে বলল-- 'কোনো শব্দ যেন না হয়।'

বিস্কো সামনে, পেছনে দস্যু দলপতি ও অন্য দস্যুরা নামতে লাগল। বিস্কো ওদের অস্ত্রঘরের সামনে নিয়ে এল। আঙুল দেখিয়ে বলল-- 'অস্ত্রঘর।' দলপতির

নির্দেশে দু'জন জলদস্যু খোলা তলোয়ার হাতে ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। জলদস্যুদের দলপতি বলল-- 'তোমাদের ক্যাপ্টেন কে? তার কাছে আমাকে নিয়ে চলো।' বিস্কো চিন্তায় পড়ল। যে করেই হোক সে ফ্রান্সিসকে মুক্ত রাখতে চাইল। যদি ফ্রান্সিস ধরা না পড়ে তাহলে ফ্রান্সিস বুদ্ধি খাটিয়ে নিশ্চয়ই বিপদ থেকে সকলকে উদ্ধার করতে পারবে। জলদস্যু নেতা ওর পিঠে তলোয়ারের চাপ বাড়াল। গম্ভীর গলায় বলল-- 'চলো। কোনোরকম চালাকি করেছ কি মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।'

বিস্কো চলল। পেছনে পেছনে জলদস্যু নেতা। ওর পেছনে চারজন খোলা তলোয়ার হাতে জলদস্যু। ঠিক তখনই একটা কেবিন ঘরের দরজা খুলে একজন ভাইকিং বেরিয়ে এল। পড়ল একেবারে বিস্কো আর জলদস্যুদের সামনে। বিস্কো বলে উঠল-- 'এই আমাদের ক্যাপ্টেন।'

জলদস্যু নেতা একলাফে সামনে গিয়ে ভাইকিংটির গলায় তলোয়ার ঠেকিয়ে বলল-- 'তুমিই এই জাহাজের ক্যাপ্টেন? ভাইকিংটির মুখ তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। দু'হাত ওপরে তুলে ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল-- 'না-না, আমি না। ফ্রান্সিস।' বিস্কো চোখের ইঙ্গিতে ভাইকিং বন্ধুটিকে বোঝাল যেন ও বলে যে, ওই ক্যাপ্টেন। কিন্তু বন্ধুটি ত সেটা বুঝল না উল্টে ফ্রান্সিসের নাম বলে দিল।

জলদস্যু নেতা এবার রাগত দৃষ্টিতে বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল-- 'আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিলে।' একজন জলদস্যুর দিকে তাকিয়ে বলল-- 'একে ডেকে নিয়ে যাও। বন্দী কর।' এবার দলনেতা ভাইকিংটির দিকে তাকাল। বলল-- 'আমাকে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে চলো। কোনোরকম চালাকি করবে না।' ভাইকিংটিকে সামনে রেখে জলদস্যু চলল।

সবাই ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিন ঘরের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিংটি আঙুল দিয়ে দরজাটা দেখাল। দস্যুনেতা গলা নামিয়ে বলল-'ফ্রান্সিসকে ডাকো।' ভাইকিংটি দরজায় টোকা দিল। ডাকল-ফ্রান্সিস-ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস তখন বিছানায় আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম করছিল। মারিয়া বিছানায় বসে রুমালে এমব্রডারি করছিল। ডাক শুনে মারিয়া এসে দরজা খুলে দিল। জলদস্যু নেতা উদ্যত তরবারি হাতে এক ধাক্কায় দরজার সবটা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ফ্রান্সিস একলাফে বিছানা থেকে নেমে কাঠের দেয়ালে ঝোলানো তরোয়ালটার দিকে ছুটল। কিন্তু তরোয়াল হাতে নেবার আগেই দু'জন জলদস্যু দুদিক থেকে ফ্রান্সিসকে জাপটে ধরল। ফ্রান্সিস শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। জলদস্যু দু'জনের তরোয়ালের খোঁচা লেগে ফ্রান্সিসের বুক পিঠ হাত কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। মারিয়া বুঝল ওরা সকলেই বিপদে পড়েছে। কিন্তু মারিয়া ভয় পেল না। দৃপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল-'আপনি কে?' জলদস্যু-দলপতি একটু মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে হেসে বলল-'আমার নাম আলবার্তো।'

-'তুমি জলদস্যু।' মারিয়া চেঁচিয়ে বলল।

'হ্যাঁ, আলবার্তো বলল-'মাদ্রিদ নগরে পাঁচ একর জমি কিনেছি। বাড়ি হচ্ছে। সোনা, রুপো, হীরে, অলঙ্কার এসব আমার এখন খুব প্রয়োজন। তাই জাহাজ লুঠ

করি। আর একটা কাজও করতে হয়। ক্রীতদাস সংগ্রহ ও বিক্রি।

-'ঠিক আছে,' মারিয়া বলল- 'আমাদের যা সোনা রুপো অলঙ্কার আছে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের জাহাজ থেকে দূর হও তোমরা।'

'-খুব ভালো কথা। আপনি সেসব একত্র করুন। কিন্তু আপনাদের কাউকে তো ছাড়া হবে না। কাছাকাছি ডাঙ্গায় যেখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট পাবো সেখানেই আপনাদের বিক্রী করে দেব। সাদা চামড়ার ক্রীতদাস, অনেক দাম পাওয়া যাবে।'

ফ্রান্সিসকে ততক্ষণে দু'জন জলদস্যু দুহাত, বুক, ঘাড় দড়ি জড়িয়ে বেঁধে ফেলেছে। ফ্রান্সিস বাধা দেয়নি। ও বুঝতে পেরেছে এখন লড়াই অসম্ভব। খালি হাতে এখন লড়াই চলবে না। সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। আলবার্তো জলদস্যু দু'জনকে ইঙ্গিত করল। ওরা ফ্রান্সিসকে ধরে নিয়ে চলল। পেছনে মারিয়া। মারিয়ার দু'টো হাত ততক্ষণে বাঁধা হয়ে গেছে। সামনে আলবার্তো, পেছনে ফ্রান্সিসরা। সবাই চলল ডেকে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ওদিকে জলদস্যুরা চেষ্টা করল যাতে নিঃশব্দে সব কাজ সারা যায়, কিন্তু পারল না। ওদের দ্রুত চলাফেরায় কাঠের পাটাতনে শব্দ হলো বেশ। দু'চারজন ভাইকিং কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জলদস্যুদের দেখল। অস্ত্রঘরের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা পাহারা দিচ্ছে। ওরা হতাশ হলো। জলদস্যুরা ওদের ঘিরে ফেলল। ওদের হাত বেঁধে নিয়ে চলল ডেকে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি আর সব ভাইকিংদের জাহাজের ডেকে জলদস্যুরা জড়ো করল। আলবার্তো সকলের দিকে তাকিয়ে বলল-'তোমরা সবাই বন্দী। শুধু-' আঙুল দিয়ে মারিয়াকে দেখিয়ে বলল-'ইনি স্ত্রী লোক। ইনি থাকবেন একটি কেবিন ঘরে। সেই ঘরের দরজার সামনে অবশ্যই পাহারাদার থাকবে। একটা কাজ তাঁকে করতে হবে। এই জাহাজে সোনা-মুক্তো-হীরে যা কিছু দামী জিনিস আর অলঙ্কার আছে সব একত্র করে আমাকে দিতে-হবে।'

-'যদি না দিই।' মারিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলল।

-'তাহলে আপনি এবং এই জাহাজের কেউ বেঁচে থাকবেন না। সবাইকে মেরে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলা হবে।' আলবার্তো বেশ জোরের সঙ্গে বলল। ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল-'মারিয়া-কোনো কথা বলো না।' ভাইকিংরা সবাই তখন রাগে ফুঁসছে। বিনা যুদ্ধে এভাবে হার স্বীকার করা ওদের সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু উপায় নেই। এ অবস্থায় খালি হাতে লড়া যাবে না। ওরা চুপ করে রইল।

আলবার্তো মারিয়ার সামনে এল। মারিয়ার বাঁধা হাত খুলে দিল। বলল-'যান এই জাহাজে যা কিছু সোনা দানা, হীরে, মুক্তো আছে সব নিয়ে আসুন।' একজন জলদস্যুর দিকে তাকিয়ে আলবার্তো বলল-'এর সঙ্গে যা! সব যোগাড় হলে এঁকে আমাদের ক্যারাভালে-এ নিয়ে যাবি। পাঁচ নম্বর কেবিন ঘরে বন্দী করে রাখবি। পাহারা দিবি।'

জলদস্যুটি খোলা তরোয়াল হাতে মারিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। মারিয়া তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আলবার্তো গলা চড়িয়ে হুকুমের স্বরে বলল-'যান।'

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল-'মারিয়া কথার অবাধ্য হয়ো না।' মারিয়া একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে এগোলো।

আলবার্তোর হুকুমে সব জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর ওদের ঠেলে নিয়ে চলল জাহাজের ডেকের পাশে কাছের রেলিঙের দিকে। দুটো জাহাজই তখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের একে একে জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজে নিয়ে আসা হলো। সিঁড়ি দিয়ে নিচে জাহাজের খোলে নামানো হলো। একটা লোহার শিক লাগানো দরজার সামনে ওদের আনা হলো। একজন পাহারাদার জলদস্যু দরজাটার তালা খুলল। দেখা গেল এই দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকার কয়েদ ঘর। ফ্রান্সিসদের প্রত্যেকের সেই ঘরে ঢোকানো হলো। তিনজন কয়েদ ঘরের পাহারাদার জলদস্যু ফ্রান্সিসদের প্রত্যেকের হাতে দড়ি বেঁধে দিল। তারপর লোহার মোটা শিকওয়ালা দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করল। তালা লাগাল। তারপর দরজার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল।

ভাইকিংরা কেউ কেউ কাঠের মেঝেয় শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ বসে পড়ল। কেউ কেউ পায়চারি করতে লাগল। ফ্রান্সিস কাঠের দেয়ালে পিঠ চেপে বসল। পাশে বসল হ্যারি আর বিস্কো। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল-আমাদের সাবধান থাকা উচিত ছিল। বিস্কো বলল-'ইস্-নজরদার যদি একটু আগে বলতো-'

-'ওসব ভেবো-না আর'- ফ্রান্সিস বলল। একটু থেমে বলল- 'চারদিক ভালো করে দেখেছি। দরজা ছাড়া আর কোথা দিয়েও পালাবার উপায় নেই। তবে পা খোলা আছে আর শাঙ্কো বলেছে 'ওর বড় ছুরিটা ও জামার ভেতর লুকিয়ে রেখেছে। ক'টা দিন থাক। ওদের পাহারা দেবার নিয়ম, খাবার দেবার নিয়ম এসব দেখি। তারপর মুক্তির ফন্দী আঁটিবো।' আর কেউ কোনো কথা বলল না। লোহার গরাদ দেওয়া ওপারে তখন আলোর ভাব কমে এসেছে। বাইরে বোধহয় বিকেল হলো।

চার পাঁচ দিন কেটে গেল। মারিয়া ওর গয়নাগাঁটি স্বর্ণমুদ্রা যা ছিল সবই আলবার্তোকে দিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে আলবার্তো মারিয়া যে ভাইকিং রাজার মেয়ে এটা জেনেছে। ও ঠিক করেছে-কোনো বন্দরের ক্রীতদাস কেনা বেচার হাটে ভাইকিংদের বিক্রি করে দেবে। তারপর ভাইকিংদের দেশের বন্দরে যাবে। মারিয়ার মুক্তিপণ হিসেবে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভাইকিং রাজার কাছে দাবি করবে।

জাহাজ চলল। দিনের পর দিন। ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে জীবন কাটতে লাগল কয়েদ ঘরে।

ওদিকে পাঁচ নম্বর কেবিনে মারিয়ারও একঘেয়ে বন্দিনী জীবন কাটছে। মারিয়ার বেশি চিন্তা ফ্রান্সিসদের জন্য। ওতো তবু আকাশ আলো সমুদ্র দেখতে পায়। ফ্রান্সিসরা তো অন্ধকারে পড়ে আছে। আলবার্তো মারিয়াকে মাত্র একবার ফ্রান্সিসদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছে। আধঘন্টার জন্য।

মারিয়া আসে। লোহার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ওর মুখ বিষণ্ণ। ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা হয়। সামান্য কথাবার্তা। দু'জনের কারও কিছুই তো বলবার নেই। মা

কিছু কথা এই বন্দী জীবন নিয়েই। মারিয়ার কাছেই ফ্রান্সিস জেনেছিল যে আলবার্তো ওর ক্যারাভেল জাহাজের পেছনে ফ্রান্সিসদের জাহাজটাও বেঁধে নিয়ে চলেছে। মারিয়া তখনও ফিসফিস করে বলে-'ফ্রান্সিস-এই বন্দীদশা থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই?'

ফ্রান্সিসও চাপাস্বরে বলে-'আছে। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই মুক্তি পেতে হবে আমাদের কারও জীবন বিপন্ন না করে আর সুযোগ বুঝে।' ওরা এসব কথা খুব আস্তে বলে, যাতে পাহারাদারের কানে না যায়। মারিয়া এভাবে প্রতিদিনই আসে। কথা বলে। চলে যায়।

এর মধ্যে ফ্রান্সিসদের চারজন ভাইকিং বন্ধু নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল পালাবে। কথাটা ওরা আর কাউকেই বলল না।

সেদিন রাতে তিনজন জলদস্যু পাহারাদার লোহার শিকের দরজা খুলে খাবার নিয়ে ঢুকল। সেই চারজন ভাইকিং পাহারাদারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন পাহারাদারকে কাবু করল। কিন্তু হাত বাঁধা অবস্থায় কি লড়াই করা চলে? বাকি দু'জন পাহারাদার তরোয়াল নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাইকিং চারজন তরোয়ালের মার ঠেকাবে কী করে? চারজনই তরোয়ালের ঘায়ে আহত হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হলো। রক্তাক্ত দেহে ওরা গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিসরা যে ওদের সেবা-শুশ্রূষা করবে তারও উপায় নেই। সবারই হাত বাঁধা। পাহারাদাররা দরজা বন্ধ করে পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস একজন পাহারাদারকে ডাকল। সে দরজার কাছে মুখ বাড়াল। ফ্রান্সিস বলল-'আমার বন্ধুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।'

-'ক্যাপ্টেন আলবার্তোর হুকুম না হলে হবে না।' পাহারাদার বলল।

ফ্রান্সিস ভীষণ রেগে গেল। বলল-'এক্ষুণি আলবার্তোকে আসতে বলো।'

-'ক্যাপ্টেন এখন বিশ্রাম করছেন।' পাহারাদার বলল।

ফ্রান্সিস লোহার দরজায় প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে উঠল -'আমার আহত বন্ধুরা যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে উনি বিশ্রাম করছেন?' ফ্রান্সিসের চিৎকার করে বলা কথাগুলো শুনে সব ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে লোহার দরজার কাছে এল। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল- 'ও-হো-হো।' পাহারাদার এই চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে ঘাবড়ে গেল। ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল-'যাও শিগগির।' পাহারাদারটি কী ভাবল কে জানে। ও চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আলবার্তো লোহার গারদ-আঁটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল-'আমাদের চারজন বন্ধু আহত। ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।'

আলবার্তো হেসে বলল-'ওরা আমার রক্ষীদের আক্রমণ করেছিল। ফল যা হবার তাই হয়েছে।'

-'কিন্তু ওরা আহত-ওদের চিকিৎসা-।'

আলবার্তো চেঁচিয়ে বলে উঠল-'ওসব হবে না। মরুক ওরা।' ফ্রান্সিসও গলা চড়াল-'যদি বিনা চিকিৎসায় ওরা কেউ মারা যায় তোমাকে আমি ছাড়বো না আলবার্তো। তোমাকে যেখানে যে অবস্থায় পাবো আমি হত্যা করবো।' আলবার্তো হো হো করে

হেসে উঠল। বলল-'ঐ স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তোমার জীবন এই কয়েদ ঘরে শেষ হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস আগুন-ঝরা চোখে আলবার্তোর দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলল না। আলবার্তো চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে এসে নিজেদের জায়গায় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। কয়েকজন ভাইকিং তখন জলের পাত্র করে জল এনে আহতদের শরীরে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

কিছুক্ষণ পরে মারিয়া এল। লোহার গরাদ দেওয়া দরজায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস উঠে একটু দ্রুত পায়েই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল' এক্ষুনি আমাদের জাহাজে চলে যাও। বৈদ্য যে কটা ওষুধের বোয়াম আনতে বলে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে ওদের ভাইকিং বৈদ্যকে ডাকল। বৈদ্য আড়মোড়া ভেঙে উঠল। ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল-'মারিয়া আমাদের জাহাজে যাচ্ছে। কী কী ওষুধের বোয়াম আনবে বলে দাও।'বৈদ্য ও নিচুস্বরে বলল-'রাজকুমারী, আমার কেবিনঘরের তাকে দেখবেন কালো, হলুদ আর নীল রঙের তিনটে বোয়াম আছে। আপনি হলুদ বোয়ামটা থেকে একমুঠো গুঁড়ো একটা কাগজের ঠোঙায় ঢেলে আনবেন।'

-'আমি বোয়ামটাই নিয়ে আসতে পারি।' মারিয়া বলল।

-'তা পারেন। কিন্তু এই কয়েদঘরের দরজায় লোহার শিক লাগানো। এইটুকু ফাঁক দিয়ে বোয়াম ঢুকবে না। আপনাকে প্রত্যেক দিন ঠোঙায় করে লুকিয়ে ওই গুঁড়ো আনতে হবে।' বৈদ্য বলল।

-'মারিয়া দেরি করো না-শিগগির যাও।' ফ্রান্সিস তাগাদা দিল। মারিয়া পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে বলল-'ওদের পোশাক ভীষণ ময়লা হয়ে গেছে। আমি আমাদের জাহাজ থেকে কিছু পোশাক আনতে যাচ্ছি।' পাহারাদার দুজন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। মুখে কিছু বলল না।

মারিয়া ডেকে উঠে এল দ্রুতপায়ে। একজন জলদস্যুকে দেখল মাস্তুলে ঠেসান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। মারিয়া ডাকল-'শুনছো?' লোকটা চোখ মেলল। মারিয়াকে দেখেই একলাফে উঠে দাঁড়াল। তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। মারিয়া হেসে বলল-'লড়াই করতে আসিনি। তুমি তোমাদের দড়ির মইটা ধরো। আমি আমাদের জাহাজে যাবো।'

-'কেন?' জলদস্যু বলল।

-'আমার স্বামী আর বন্ধুরা তো কয়েদ ঘরে বন্দী হয়ে আছে। ওদের পোশাক নোংরা হয়ে গেছে। কিছু পোশাক আনবো।'

-'কিন্তু ক্যাপ্টেনের হুকুম ছাড়া-'

-'আরে আমি তো পালাচ্ছি না। ক্যাপ্টেনকে পরে আমি বলবো' খন। মারিয়া বলল।

জলদস্যুটা আর কিছু বলল না। জাহাজের পেছন দিকে চলল। জাহাজের পেছনের কাঠের রেলিংয়ের গায়ে একটা দড়ির মই আটকানো। মইটার মাঝে মাঝে কাঠের ফালি বাঁধা। মইটা বাঁধা রয়েছে ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে। দুটো জাহাজ একটা মোটা কাছিতে বাঁধা। জলদস্যুটি মইয়ের একটা মাথা কাঁধে নিয়ে কাছিটা ধরে ঝুলে ঝুলে

ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠল। তারপর কাছিটা একটা হুক-এর সঙ্গে আটকে টেনে ধরে রইল। মারিয়া মইয়ের কাঠের ফালিগুলোর ওপর পা রেখে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মারিয়াকে আসতে হলো। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈদ্যর কেবিন ঘরে ঢুকল। তাকের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে হলুদ বোয়ামটা পেল। বোয়ামটা নিয়ে মারিয়া নিজের কেবিনঘরে চলে এল। নিজের আর ফ্রান্সিসের কিছু পোশাক নিল। অন্য কেবিনঘরগুলোতে ঢুকে অন্য ভাইকিং বন্ধুদের পোশাক নিল। সব পোশাক পেঁচিয়ে বাঁধবার আগে হলুদ বোয়াম ভেতরে রেখে দিল। পেঁচিয়ে বাঁধা পোশাকের বোঁচকার মধ্যে রইল বোয়ামটা।

পোশাকের বোঁচকা দেখে জলদস্যুটি কিছু বলল না। মারিয়া মই বেয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ক্যারাভেল জাহাজে ফিরে এল। নিজের কেবিনে ঢুকল। কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে থেকে হলুদ বোয়াম বের করল। একটা রুমালে হলুদ গুঁড়ো একমুঠো ঢালল। বোয়ামটা কাঠের তাকে লুকিয়ে রাখল। তারপর কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে ওষুধ রুমালটা রেখে কয়েদঘরের সামনে এল। চারজন ভাইকিং পালাবার চেষ্টা করছিল বলে এখন নিয়মে কড়াকড়ি করা হয়েছে। সব ভাইকিংদের হাত খুলে দেওয়া হয়েছে। খাবারদাবার দরজার নিচের একটা ফোকর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলবার্তোর হুকুম কোনো কারণেই যেন দরজা খোলা না হয়। মারিয়া কাপড়ের পুঁটলি খুলে একটা করে পোশাক গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস টেনে নিতে লাগল। হলুদ ওষুধ জড়ানো পোশাকটা দেবার সময় মারিয়া বেশ জোরে বলল-'এই পোশাকটা এক্ষুনি পর।' ফ্রান্সিস বুঝল। মৃদু হেসে বলল-'আচ্ছা'। তারপর পোশাকটা নিয়ে বৈদ্যর কাছে এল। পোশাকের ভাঁজ খুলে ওষুধটা মেঝেয় ঢালল। বলল-'জল'। একজন ভাইকিং নারকেলের মালায় করে জল নিয়ে এল। বৈদ্যর নির্দেশমতো হলুদের গুঁড়োর মধ্যে অল্প করে জল ঢালতে লাগল। বৈদ্য গুঁড়োটা মাখতে লাগল। একটু পরেই আঠার মতো দেখতে হলো। বৈদ্য ওষুধ নিয়ে আহত ভাইকিং ক'জনের ক্ষতে লাগিয়ে দিল। একটু জ্বালা করে উঠেই একটা ঠান্ডা ভাব লাগল। ওদের ব্যথা অনেক কমে গেল।

পরের ক'দিনই মারিয়া একটা করে পোশাক আনল আর হলুদ গুঁড়ো ওষুধ দিয়ে গেল। তিনজন আহত ভাইকিং মোটামুটি সুস্থ হলো। কিন্তু একজন আহত ভাইকিং ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওষুধ লাগানো চলল। কিন্তু ওর বুকের ক্ষতস্থান ফুলে পেকে উঠল। একদিন দুপুরে বাড়াবাড়ি অবস্থা হলো। প্রচন্ড জ্বরে ওর গা পুড়ে যেতে লাগল। ভাইকিংটি প্রলাপ বকতে লাগল। সন্ধ্যের সময় অজ্ঞান হয়ে গেল। একটু রাত বাড়তে ভাইকিংটি হঠাৎ চোখ বড় বড় করে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করল। শেষবারের মতো ওর শরীরটা নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস মৃত বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল। ওর চোখ ফেটে জল এল। দুহাতে মুখ চেপে ও কেঁদে উঠল। হ্যারি এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখল। সব ভাইকিং বন্ধুরা মুখ নিচু করে বসে রইল। অনেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস চোখ মুছে হ্যারিকে বলল-'হ্যারি-ও নিজের জীবন দিয়ে আমাদের মুক্তির উপায় করে দিয়ে গেল।' হ্যারি কোনো কথা বলল না।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গেল। রক্ষীদের বলল-'আমাদের এক বন্ধু মারা গেছে। আলবার্তোকে খবর দাও।' একজন রক্ষী চলে গেল। একটু পরেই কাঠের

মেঝেয় জুতোর শব্দ তুলে আলবার্তো এল। পেছনে জলদস্যুদের বৈদ্য। রোগা। পাকা দাড়ি। কয়েদ ঘরের দরজা খোলা হলো। শুধু বৈদ্য ঢুকল। মৃত ভাইকিংটির বুকে কান পাতল। আঙুল দিয়ে চোখ খুলে দেখল। হাতের পায়ের নাড়ি টিপে দেখল। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলল-'মারা গেছে।' কয়েদঘরের বাইরে গিয়ে আলবার্তোকে বলল সে কথা। আলবার্তো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল-'এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলে এই অবস্থাই হবে। মড়া কালকে সমুদ্রে ফেলা হবে।

ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, -'না আজকে রাতেই মড়া এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে।'

-'কেন?' আলবার্তো বেশ আশ্চর্য হয়েই বলল।

-'আমরা একটা মড়ার সঙ্গে রাত কাটাতে পারবো না।'

আলবার্তো ঠাট্টা করে হেসে বলল-'কিছুক্ষণ আগেও তো ও তোমাদের বন্ধু ছিল।'

-'সে ছিল ছিল। এখন তো একটা মড়া। বিদায় করো এটাকে।' ফ্রান্সিস বলল।

-'হুঁ-তাই হবে।' আলবার্তো পাহারাওয়ালাদের সে কথা বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রান্সিসের এ ধরনের কথাবার্তায় ভাইকিং বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের এ কী কথাবার্তা! এ কী ব্যবহার! বন্ধুদের জন্যে যে ফ্রান্সিস নিজের জীবন দিতে তৈরী থাকে, সে এক মৃতবন্ধু সম্পর্কে এরকম কথা বলছে। হ্যারির সহ্য হলো না. ও ফ্রান্সিসের মুখোমুখি দাঁড়াল। দৃঢ়স্বরে বলল-' ফ্রান্সিস সাবধান, মৃত বন্ধু সম্পর্কে এরকম কথা যদি আর একটা বল, তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব না।'

ফ্রান্সিস শুধু ফিসফিস করে বলল-'রাত্রি চাই-অন্ধকার চাই।' তারপর ফ্রান্সিস দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে একজন পাহারাদারকে ডাকল। বলল-'আচ্ছা ভাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

-'কী কথা?' একজন পাহারাদার এগিয়ে এসে বলল।

-'আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাহাজটা থেমে আছে অথবা খুব আস্তে চলছে।'

-'আরে-ঠিক বলছো। দু'দিন যাবত হাওয়া পড়ে গেছে। জাহাজ প্রায় চলছেই না। কিন্তু তুমি কী করে বললে?'

-'আমরা ভাইকিং-সমুদ্র জাহাজ এসবের মতিগতি আমরা সহজেই ধরতে পারি।' ফ্রান্সিস তারপর বলল- 'তা ভাই দেরি করছো কেন। মড়াটা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও।'

-'তোমাদের রাতে খাওয়া হলেই নিয়ে যাবো।' পাহারাদার জলদস্যুটি বলল।

-'জলদি কর, জলদি কর।' ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার কাছ থেকে চলে এল।

ফ্রান্সিস দু-একজন ভাইকিং বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু এক হ্যারি ছাড়া আর সবাই মুখ ফিরিয়ে রইল। মৃত বন্ধু সম্পর্কে ফ্রান্সিস যা কিছুক্ষণ আগে বলেছে সেটা বন্ধুরা ভুলতে পারেনি। ছিঃ এত নোংরা মন ফ্রান্সিসের। একটু পরেই পাহারাদাররা রাতের খাবার দিয়ে গেল। প্রায় কেউই বিশেষ খেল না। ফ্রান্সিস কিন্তু পেট পুরে খেল। সব বন্ধুরা দেখল সেটা। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল তারপর। একটু পরে একজন পাহারাদার জলদস্যু একটা মোটা কাপড়ের বস্তা গরাদের মধ্য দিয়ে ভাঁজ করে গলিয়ে দিল। সঙ্গে একটা দড়ি। পাহারাদার বলল-'মড়াটা বস্তায় পুরে মুখ বেঁধে

দরজার কাছে রেখে সবাই সরে যাও। আমরা ঢুকে মড়া নিয়ে আসবো। তখন কাছে আসবে না।

শাঙ্কো বস্তা দড়ি নিয়ে এল। এবার মৃতদেহ এই বস্তায় ভরতে হবে। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে ডাকলে-'শাঙ্কো'। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে বলল-'শিগগির ছোরাটা দাও।' শাঙ্কো ঢোলা জামার নিচ থেকে ছোরা বার করে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঢোলা জামায় ছোরাটা ভরে রাখল। সকলের দিকে তাকিয়ে বলল-'তোমরা সব দরজার কাছে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়াও যাতে পাহারাদাররা দেখতে না পায় এখানে কী হচ্ছে! সবাই এবার বুঝল ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কোনো ফন্দী এঁটেছে। সবাই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভিড় হয়ে গেল দরজার সামনে। ফ্রান্সিস দ্রুত বস্তাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। বলল-'শাঙ্কো, বস্তার মুখ বেঁধে দাও।' শাঙ্কো তাড়াতাড়ি বস্তার মুখ বাঁধল। ফ্রান্সিস বস্তা বন্দী হলো। হ্যারি বলে উঠলো-'সাবাস্ ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস বস্তার মধ্যে থেকে বলল-'আস্তে।'

বিস্কো শাঙ্কো আর কয়েকজন ভাইকিং বস্তাটা কাঁধে নিয়ে দরজার কাছে এল। একজন পাহারাদার বলল-'মড়া আবার কাঁধে করে নিয়ে আসছো। টেনে হিঁচড়ে আনো।'

-'না আমাদের বন্ধু তো-' হ্যারি বলল-'তা ভাই তোমরাও কাঁধে করে নিয়ে যেও।

-'কাঁধে করে পারবো না। তবে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবো।' পাহারাদার বলল।

দরজা খুলে ওরা বস্তাটা ধরল। ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। ততক্ষণে একজন পাহারাদার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

বস্তা বন্দী ফ্রান্সিসকে চার পাঁচজন জলদস্যু ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। ডেকে এসে আর ঝুলিয়ে নিল না। ডেকের কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। ঘষা লেগে ফ্রান্সিসের মাথার পেছনে পিঠে জ্বালা করতে লাগল। ফ্রান্সিস দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগল। মুখে কোনো শব্দ করল না। ডেকের রেলিঙের কাছে এসে দু'জন জলদস্যু বস্তা বন্দী ফ্রান্সিসকে দোলাতে লাগল। তারপর ছুঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

জলে পড়েই বস্তা সুদ্ধ ফ্রান্সিস জলে ডুবে যেতে লাগল, ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জামার তলা থেকে ছোরাটা বার করে মোটা কাপড়ের বস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েই জোরে হ্যাঁচকা টান দিল। বস্তা লম্বালম্বি কেটে গেল। ফ্রান্সিস বস্তার ভেতরে থেকে বেরিয়ে এল। জলের মধ্যে এইজন্যে ওকে বেশ কিছুক্ষণ দম আটকে থাকতে হলো। মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনার জন্য ফ্রান্সিস মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে থেকে দম বেশিক্ষণ রাখার অভ্যেস করেছিল। এখন সেটা কাজে লেগে গেল। হাত পায়ে জলের মধ্যে কয়েকটা ধাক্কা দিয়েই ও জলের ওপরে ভেসে উঠল। হাঁপাতে লাগল। ওর ভাগ্যও ভালো। দেখল ক্যারাভেল জাহাজ আর ওদের জাহাজ খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে। মৃদু জোৎস্না পড়েছে সমুদ্রের জলে, জাহাজে। বাতাস তেমন জোরে বইছে না। তাই ঢেউও কম।

ফ্রান্সিস ওদের জাহাজটা লক্ষ্য করে সাঁতরাতে লাগল। একটু পরেই ওদের জাহাজের পিছন দিকের জলে ডোবা হালটা ধরল। হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে

একটু উঠল। তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। একটু জিরোল। হাঁপানো একটু কমল। দেখল হালের কাছে একটা মোটা কাছি ঝুলছে। ফ্রান্সিস কাছিটা বেয়ে বেয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। এক সময় হালের গায়ে পা রেখে জাহাজের ডেকে নামল। দেখল ওদের জাহাজের কোথাও আলো জ্বলছে না। ওর গায়ের পোশাক ভিজে সপ্ সপ্ করছে। সিঁড়ি দিয়ে নামল অন্ধকারে। দ্রুত পায়ে নিজের কেবিন ঘরে ঢুকল দ্রুত হাতে ভেজা পোশাক ছেড়ে পোশাক পরে নিল। দেয়াল থেকে তরোয়ালটা নিয়ে কোমরে গুঁজল। তারপর একটা কাচ ঢাকা লণ্ঠন জ্বালল। সেটা নিয়ে চলল অস্ত্রঘরের দিকে। অস্ত্রঘর খুলল। বিস্কোর জন্যে আর একটা তরোয়াল কোমরে গুঁজে নিল। এবার শাঙ্কোর ধনুকটা নিল কাঁধে, বুকে ছিলাটা চেপে রাখল। কাঁধে ঝোলাল তীর ভর্তি তূণীরটা। আলোটা নিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ির কাছে এল। আলোটা নিভিয়ে ফেলল। আলো জলদস্যুর নজরে পড়লে বিপদে পড়তে হবে। কাচ ঢাকা লণ্ঠনটা রেখে দিল। ডেকে উঠে এল। দেখল জলদস্যুদের ক্যারাভেলের ডেকে কয়েকটা আলো জ্বলছে। গভীর রাত। জলদস্যুরা নিজেদের কেবিনে ঘুমিয়ে আছে। মাস্তুলের আড়ালে দাঁড়াল ফ্রান্সিস। কিছুক্ষণ লক্ষ্য রেখে দেখল চার পাঁচজন জলদস্যু ডেকে জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। দুজনের হাতে খোলা তরোয়াল। বাকিরা তরোয়াল পাশে রেখে ডেকে বসে আছে।

ফ্রান্সিস ওদের জাহাজের সামনের দিকে এল। চাঁদের আলো খুবই অস্পষ্ট! তবু যদি জলদস্যুরা দেখে ফেলে তাই ও হামাগুড়ি দিয়ে এল। কাঠের ফালি বাঁধা দড়ির মইটা তখনও দুটো জাহাজের মধ্যে লাগানো ছিল। মারিয়া ঐ দড়ির মই দিয়েই দু জাহাজে পারাপার করছিল। ফ্রান্সিস হামাগুড়ি দিয়ে দড়ির মইয়ের ওপর দিয়ে এল। নামল জলদস্যুদের ক্যারাভেল-এর ডেকে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল! না জলদস্যুরা পাহারাদাররা ওর আসা বুঝতে পারেনি।

ফ্রান্সিস এবার দড়ির মইয়ের হুকটা খুলে দিয়েই জাহাজের অন্ধকার কোণাটায় সরে এল। কাঠ বাঁধা মইটা জাহাজের গায়ে গিয়ে লাগল। বেশ জোরে শব্দ উঠল—খট্‌ট্‌--। দস্যু ছুটে এল। জাহাজের হালের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখতে লাগল শব্দটা কিসের। ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। এক লাফে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে জলদস্যুটার ঘাড়ে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে এক ঘা মেরেই নিজের জায়গায় এলো। জলদস্যুটি মুখে কোনো শব্দও করতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে রেলিঙের মুখ জুড়ে পড়ে রইল। অন্য

পাহারাদার জলদস্যুটি দু একবার ওর অজ্ঞান বন্ধুকে ডাকাডাকি করল। তারপর খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বুঝল এর সঙ্গে তরোয়াল নিয়ে লড়তে গেলে তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ হবে। ডেকে বসে থাকা জলদস্যুরা শব্দ শুনে ছুটে

আসবে। কাজেই কোনোরকম শব্দ করা চলবে না। নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। ও অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর পেছন থেকে জলদস্যুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে তার মুখ চেপে ধরল যাতে কোনো শব্দ না করতে পারে। তারপর ছোরাটা আমূল ওর পিঠে বসিয়ে দিল। জলদস্যুটা কয়েকবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ওকে ধরে আস্তে আস্তে ডেক-এর ওপর শুইয়ে দিল, যাতে কোনো শব্দ না হয়।

এবার ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল অন্য পাহারাদাররা মৃদু স্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। এত কান্ড হলো ওরা কিছুই বুঝতে পারল না।

সিঁড়ির ঘর হাত বারোর মধ্যে। ফ্রান্সিস ডেকের মেঝেয় বুক পেতে শুয়ে পড়ল। তারপর বুক দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল। তারপর নিচে নামার সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল। তখনই ফ্রান্সিস শুনল ডেকের জলদস্যুরা ওদের বন্ধু দুজনকে ডাকাডাকি করছে। ফ্রান্সিস বুঝল-- আর দেরি করা চলবে না। কাচ ঢাকা আলোয় ও দ্রুত সিঁড়ি দি[illegible]মতে লাগল। কয়েদঘরের সামনে যখন এল তখন ও হাঁপাচ্ছে। দেখল দুজন

জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে কয়েদঘর পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস ভাবল এদের হত্যা না করে যাতে কয়েদ ঘরের চাবিটা নেওয়া যায় ও সেই চেষ্টাই করবে। কয়েদঘরের দরজার কাছে একটা কাচ ঢাকা বাতি ঝুলছিল। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল বের করে আস্তে আস্তে পাহারাদার দুজনের সামনে এসে দাঁড়াল। পাহারাদার দুজন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এ কী? এ কী করে গারদ ঘরের বাইরে এল। তাও হাতে তরোয়াল নিয়ে। পরক্ষণেই ওরা লড়াইয়ের জন্য তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল---'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসো না। আমি ফ্রান্সিস। তোমাদের মতো দশজনের সঙ্গে লড়াই করা আমার কাছে কিছুই না। গারদ ঘরটা খুলে দাও। বন্ধুদের মুক্তি দাও। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।'

পাহারাদার দু'জন একটু থমকে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একজন তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একপাক ঘুরে তরোয়াল চালাল বিদ্যুৎবেগে। ওর মাথায় তরোয়ালের কোপ বসে গেল। জলদস্যুটা তরোয়াল ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অন্য পাহারাদারটির মুখ মৃত্যুভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফ্রান্সিস গম্ভীর গলায় বলল--'দরজা খুলে দাও'। লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোমরে গোঁজা চাবির তাড়া বের করল। কয়েদ ঘরের তালা খুলতে লাগল।

ওদিকে হ্যারি সারারাত ঘুমুতে পারেনি। ওর এক চিন্তা-ফ্রান্সিস বস্তা কেটে বেরতে পারল কিনা, হয়তো পারেনি। এসব বিপদের কথা ভাবছিল। তখনই ও কয়েদ ঘরের দরজার কাছে ফ্রান্সিসের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। ও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বিস্কো শাঙ্কো অন্য বন্ধুদের ধাক্কা দিতে দিতে চাপা স্বরে বলতে লাগল-'ওঠ-ওঠ-ফ্রান্সিস এসেছে।' দু'জন একজন করে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দাঁড়াতে লাগল সবাই। হ্যারি চাপা স্বরে বলল-'কোনরকম শব্দ করো না।' তখনই কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস এক লাফে ঢুকল। কয়েদঘরে ঢুকেই ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙুল রাখল। সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে সবাই চুপ করে রইল। হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল এসে গেল।

ফ্রান্সিস বলল- 'পাগলামি করো না! এখন বড় লড়াই সামনে।' ফ্রান্সিস বিস্কোকে তরোয়াল খুলে দিল। শাঙ্কোকে দিল তীর ধনুক। বলল-'ভাইসব, এবার চূড়ান্ত লড়াই। সবাই জলদস্যুদের অস্ত্রাগারে চলে যাও। অস্ত্র নিয়ে প্রত্যেক কেবিনঘরে ঢুকে জলদস্যুদের বন্দী কর। তারপর সবাইকে বন্দী করে ডেকে নিয়ে এসো। জলদি। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না।'

ওদিকে ডেকের ওপরে যে পাহারাদার তিনজন ছিল তারা মৃত ও আহত বন্ধু দু'জনকে দেখে বুঝল কিছু একটা হয়েছে। ওরা সিঁড়ির দিকে ছুটল কেবিনঘরে ঘুমন্ত বন্ধুদের ডাকতে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে আসতে দেখল খোলা তরোয়াল নিয়ে ভাইকিংরা দলে দলে উঠে আসছে। ওরা বুঝল এখন লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। তবু দুজন তরোয়াল হাতে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আহত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। গোঙাতে লাগল কেবিন থেকে নিরস্ত্র জলদস্যুদের বন্দী করে এনে ডেকে জড়ো করা হল।

এদিকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খুঁজে খুঁজে মারিয়াকে যে কেবিনঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে সে ঘরটা পেল। দেখল বাইরে তরোয়াল হাতে একজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে। পাহারাদারটি কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ হাতে গলা চেপে ধরল। লোকটা বেরিয়ে আসা চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো পাহারাদারটির হাত থেকে তরোয়ালটা কেড়ে নিল। ফ্রান্সিস বলল '—যাও ডেকে যাও'। তারপর ওর গলা ছেড়ে দিল। ফ্রান্সিস তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। ও এগিয়ে এসে দরজায় টোকা দিল। একবার, দু'বার। মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। বলল— 'তুমি, — মানে আমি কী বলবো—।' ফ্রান্সিস হেসে বলল— 'কিছু বলতে হবে না। শিগগির ডেকে চলে যাও। —ওখানে সবাই আছে।'

'—কিন্তু তোমরা?'

'—আলবার্তোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি। তুমি যাও' মারিয়া আর কথা বাড়াল না। সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো আলবার্তোর ঘরের সামনে এল। দেখল দরজা খোলা। একজন জলদস্যু ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় আলবার্তোকে লড়াইয়ের খবরটা দিতে এসেছে। জলদস্যু ওদের দেখেই চিৎকার করে উঠল—'ক্যাপ্টেন—ঐ যে।' আলবার্তো দ্রুত এগিয়ে এল। দেখল তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে। পেছনে তীর ধনুক হাতে শাঙ্কো। আলবার্তো নিজেও তখন যুদ্ধসাজে তৈরি। সোনা দিয়ে বাঁধানো ওর তরোয়ালের হাতল। ও হাতল চেপে এক টানে তরবারি কোষমুক্ত করল। ফ্রান্সিস হেসে বলল '—তাহলে আলবার্তো। তুমি লড়াই চাও?' আলবার্তো কোন কথা না বলে তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। ফ্রান্সিস বলল—'তোমার জাহাজ এখন আমাদের কব্জায়। সব জলদস্যু বন্দী। এরপরেও তুমি লড়াই করতে চাও।' আলবার্তো ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল—'হ্যাঁ, হিম্মৎ থাকে তো লড়ো।'

'—বেশ। এখানে এই ছোট ঘরে লড়াই করা অসুবিধে। ডেকে চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

আলবার্তোকে আর জলদস্যুকে সামনে রেখে ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল। দেখল— ভোর হয়েছে। নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে, সমুদ্রের জলে, জাহাজে, একটু পরেই আলবার্তোর সঙ্গে তরোয়ালের লড়াইয়ে নামতে হবে। এই সুন্দর রোদে উজ্জ্বল নীল আকাশ—কতদূর ছড়িয়ে আছে। শান্ত সমুদ্রের জলে রোদের নাচন— ফ্রান্সিসের মনটা কেমন যেন করে উঠল। এ অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে লড়াই—রক্তপাত—হত্যা? ওর মন মানল না। শেষবার চেষ্টা করতে হবে যাতে এই অমানবিক রক্তপাত হত্যা এড়ানো যায়।

কিন্তু আলবার্তো নির্বিকার। ডেকে দাঁড়িয়ে ও তরোয়াল ওঠাল। ওর মুখ কঠিন। চোখে হত্যার নেশা। মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলল-'ফ্রান্সিস কী হলো? তৈরি হও।' ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। তরোয়াল নামিয়ে রাখল।

'-কী হল ভাইকিং? ভয় পেয়ে গেলে? আলবার্তো বলল। ফ্রান্সিসের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু মনকে শান্ত করল। বলল-'আলবার্তো, আমি জানি তুমি

নরঘাতক। অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করছো। ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করার জন্য নিরীহ মানুষদের কয়েদঘরে জানোয়ারের মতো দীর্ঘদিন বন্দী করে রেখেছো। সেই তোমাকে আমার অনুরোধ-যে জীবন তুমি কাটিয়েছো,সেই জীবনের কথা ভুলে যাও। নতুন করে সৎ মানুষের মতো বাকি জীবনটা কাটাও। মানুষকে হত্যা নয়-মানুষকে ভালোবাসতে শেখ। মানুষের সেবা কর, দুঃখী-অভাবী মানুষের দুঃখ দূর কর, অভাব দূর কর। তোমার ধনসম্পত্তি কম নয়।'

আলবার্তো হো হো করে হাসল। বলল-'ফ্রান্সিস তুমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেছো'।

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল,আলবার্তো তোমাকে আমি বাঁচার সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বুঝলে না। তোমার মতো নরপশুরা জীবনের উজ্জ্বল দিক কোনো দিন দেখতে পায় না। যাকগে-তুমিই আমাকে লড়াইয়ে নামালে। আমার কোন দায়িত্ব রইল না'।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই আলবার্তো তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে আলবার্তোর তরোয়ালের মার ঠেকাল। শুরু হল দুজনের তরোয়ালের লড়াই। ডেকের একপাশে বসে আছে নিরস্ত্র জলদস্যুর দল। অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র ভাইকিংরা আর মারিয়া। মারিয়া শুনেছে তরোয়াল চালনায় ফ্রান্সিস সবার সেরা। কিন্তু কোনোদিন ফ্রান্সিসের তরোয়াল লড়াই দেখে নি। আজকে সেই সুযোগ এল। মারিয়া এমনিতে খুব শক্ত মনের মেয়ে। কিন্তু আজকে ও একটু আশঙ্কাই বোধ করল। কারণ ও ঠিক বুঝল যে আলবার্তো সুযোগ পেলে ফ্রান্সিসকে হত্যা করতে পিছপা হবে না। আলবার্তো বার বার আক্রমণ করতে লাগল। ও তরোয়ালের মার ঠেকাতে লাগল। ও চাইছিল যাতে আলবার্তো অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। আলবার্তো সতিাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। আলবার্তোর একটা তরোয়ালের মার ঠেকাতে গিয়ে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াতে গেল। তখনই আলবার্তো তরোয়াল ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিক থেকে তরোয়াল চালাল। তরোয়ালের চকচকে ফলাটা ফ্রান্সিসের বাঁ বাহু ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। পোশাকটা কেটে তরোয়াল বসে গেল। রক্তের ধারা বইল। মারিয়া চিৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস একবার ক্ষতস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলবার্তোর ওপর । এবার আর আত্মরক্ষা নয়। ফ্রান্সিস আক্রমণ করল। ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাতে ঠেকাতে আলবার্তো ভাল করেই বুঝতে পারল এ বড় কঠিন ঠাঁই। মারিয়া ফ্রান্সিসের নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে অবাক হয়ে গেল। কী অনায়াস ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাচ্ছে। বিদ্যুৎগতিতে স্থান পরিবর্তন করছে। কিন্তু পিছোচ্ছে না। এইভাবে আক্রমণের চাপ রাখছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে আলবার্তোর হাত অবশ হয়ে এল। তরোয়াল আর হাতের বশে রইল না। ! ও এলোমেলো তরোয়াল চালাতে লাগল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। এক পাক দ্রুত ঘুরেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তরোয়ালের এক ঘা মারল আলবার্তোর তরোয়ালে। আলবার্তোর হাত থেকে

তরোয়াল ছিটকে গিয়ে মাস্তুলের কাঠে বিঁধে গেল। বেঁধা অবস্থায় তরোয়ালটা দুলতে লাগল। ওর চোখে মুখে মৃত্যু ভয় ফুটে উঠল। ফ্রান্সিস শেষ আঘাতের জন্য তরোয়াল তুলল। ফ্রান্সিসও হাঁপাচ্ছে তখন। কিন্তু তরোয়াল চালাল না। আস্তে আস্তে তরোয়াল নামাল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,— 'তোমার জাহাজ আর তোমার দলবল নিয়ে যাও— এক্ষুনি এই তল্লাট ছেড়ে পালাও।' ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। কেউ লক্ষ্য করেনি যে আলবার্তোর কোমরে বেল্ট-এ একটা ছোরা গোঁজা আছে। এইবার আলবার্তো দ্রুত হাতে ছোরাটা টেনে বের করল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। শাঙ্কো আলবার্তোকে কোমরে হাত দিতে দেখেই বুঝেছিল ওর উদ্দেশ্য কি। আলবার্তো ছোরা ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গেই শাঙ্কো ফ্রান্সিসের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল! দুজনে জড়াজড়ি করে ডেকের ওপর পড়ে গেল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।তখনই মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদার চেঁচিয়ে উঠল—'ডাঙা দেখা যাচ্ছে, ডাঙা।'

সকলেই হৈ হৈ করে উঠে জাহাজের রেলিঙের কাছে জড়ো হলো। সত্যি দূরে বিস্তীর্ণ বালির তটরেখা দেখা যাচ্ছে। এই হৈচৈ-র মধ্যে আলবার্তো জাহাজের রেলিঙে দ্রুত উঠে পড়ল। উদ্দেশ্য সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়া। কারণ কাছেই সমুদ্রতীর। সাঁতরে পালাতে পারবে। কিন্তু আলবার্তো শাঙ্কোর নজর এড়াতে পারেনি। শাঙ্কো অতি দ্রুত ধনুকে তীর পরিয়েই তীর ছুঁড়ল। একেবারে নিঁখুত নিশানা শাঙ্কোর। তীর আলবার্তোর পিঠে বিঁধে গেল। আলবার্তো দুহাত উপরে তুলে ছিটকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। ডেক থেকে ভাইকিংরা ও জলদস্যুর দল দেখল যে আলবার্তো আর ভেসে উঠল না। জলে যেখানে আলবার্তো পড়েছিল সেখানের জলটায় একটু লাল রঙ লাগল। হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল--'ফ্রান্সিস, আমাদের এক বন্ধুর মৃতদেহ এখনো কয়েদঘরে পড়ে আছে।' ফ্রান্সিস দ্রুত বলে উঠল—'সত্যিই তো। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়নি।' কথাটা বিস্কোর কানে গেল, বলল, 'আমরা কয়েকজন যাচ্ছি।'

একটু পরেই বিস্কোরা কয়েদঘর থেকে বন্ধুর মৃতদেহ ডেকে শুইয়ে দিল। সবাই চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল। ভাইকিংদের মধ্যে যে ধর্মযাজকের কাজ করে সে এগিয়ে এল। তার গলায় ঝুলছে একটা ভাঁজ করা চাদরের মতো। হাতে একটা চামড়ার ছেঁড়াখোঁড়া বাইবেল। ওটার পাতাগুলো সব খোলা। ভাইকিং যাজক তাই থেকে একটা পাতা খুলে বিড়বিড় করে কি পড়ল। সবশেষে বলল,—'আমেন।' তখন মৃতদেহটা একটা মোটা কাপড়ের থলেতে ঢোকানো হলো। মাথার দিকে বেঁধে দেওয়া হলো। দুজন ভাইকিং মৃতদেহটি নিয়ে জাহাজের রেলিঙের কাছে গেল। মৃতদেহটি দোলাতে দোলাতে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিরস্ত্র জলদস্যুর দল থেকে একজন যুবক জলদস্যু ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। বলল—'আমাদের ক্যাপ্টেন মারা গেছে। এখন আমরা কি করবো'?

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডেকে বলল—'এখন এই জলদস্যুদের নিয়ে কি করবে'?

—'ওদের মুক্তি দেব—ওদের ক্যারাভেল জাহাজ নিয়ে ওরা চলে যাবে। কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা ওদের করতে হবে বাকি জীবন ওরা আর জলদস্যুতা করবে না। দেশে ফিরে সৎ জীবনযাপন করবে'।

ফ্রান্সিস যুবকটির দিকে তাকাল. বলল—'কী. এই শর্তে তোমরা রাজী?

—'হ্যাঁ আমরা রাজী।' যুবকটি বলল।

—'কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান এখনই করতে হবে।' হ্যারি বলল।

—'দেখ—আলবার্তোর কেবিন ঘরে নিশ্চয়ই লুণ্ঠিত ধনসম্পদ রয়েছে। এখন আলবার্তো মারা গেছে ঐ লুঠ করা সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে এবার এই জলদস্যুদের নিজেদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। বলল—'কথাটা সত্যি। এই ধনসম্পত্তি কি হবে?'

শাঙ্কো বলল— ওগুলো আমরা দেশে নিয়ে গিয়ে রাজার জাদুঘরে রাখবো।

—'না শাঙ্কো', ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—'অনেক নিরীহ মানুষের রক্তে ভেজা ঐ অভিশপ্ত ধনসম্পদ আমরা কোনমতেই নেবো না। হ্যারিকে দায়িত্ব দিচ্ছি—হ্যারিই ঐ ধনসম্পদ জলদস্যুদের মধ্যে যতটা সম্ভব সমান ভাগে ভাগ করে দেবে।'

—'বেশ!' হ্যারি রাজি হলো। জলদস্যু যুবকটিকে হ্যারি বলল,—'চলো—তোমাদের সঙ্গে কথা আছে. যেখানে জলদস্যুরা বসে আছে যুবকটিকে নিয়ে হ্যারি সেদিকে গেল।

মারিয়া এগিয়ে এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল, 'তুমি আহত। কাটা জায়গা থেকে এখনো রক্ত পড়ছে। তুমি কেবিনে চলো। তোমার বিশ্রামও দরকার।'

—'হ্যাঁ চলো।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিস্কোকে বলল—'আমাদের জাহাজ চালককে বলো আমাদের জাহাজটা যতটা সম্ভব তীরের কাছে যেন নিয়ে যায়।'

দুপুরের খাওয়ার সময় হ্যারি ফিরে এলো। ফ্রান্সিসকে বলল—'ভাগবাঁটোয়ারা করে এসেছি এবার কি করবে?'

—'ওদের ক্যারাভেল জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজটা যে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেটা শাঙ্কোকে কেটে দিতে বলো। জলদস্যুরা ওদের জাহাজে করে দেশে ফিরে যাক।

তাই করা হলো। জলদস্যুদের মুক্তি দেওয়া হলো ওরা ওদের ক্যারাভেল জাহাজে তাড়াতাড়ি পাল খাটাল। হাওয়ার তোড়ে পাল ফুলে উঠল। ওদের জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে চলল। ডেকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসরা তা দেখল।

কিছুক্ষণ পরে রসুইঘর আর ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্ব যে তিনজন ভাইকিং এর হাতে ছিল তারা ফ্রান্সিস আর হ্যারির কাছে এল। একজন বলল-'এবার কি দেশে ফিরবে?'

--'হ্যাঁ।' ফ্রান্সিস বলল। অন্য ভাইকিংটি বলল-'কিন্তু আমরা জানিনা আমরা কোথায় এসেছি। তীরের যে বালিয়াড়ি দেখছি তাতে বুঝতে পারছি না এটা কোনো দেশ না দ্বীপ। দিক ঠিক করে দেশে ফিরতে আমাদের কতদিন লাগবে জানি না'

--'তা তো ঠিকই.' হ্যারি বলল।

অন্য ভাইকিংটি বলল-'ভাঁড়ার ঘরে যা ময়দা চিনি খাবার দাবার আছে তাতে তবু কিছুদিন চলবে। কিন্তু খাবার জলের পরিমান অনেক কমে গেছে। কিছু খাবার জল না জোগাড় করতে পারলে সাংঘাতিক সমস্যায় পড়ে যাবো।'

ফ্রান্সিস হ্যারি দুজনেই ভাবল কিছুক্ষণ। হ্যারি প্রথমে বলল-'ফ্রান্সিস, যে ডাঙাটা দেখা যাচ্ছে ওখান থেকেই খুঁজে পেতে খাবার জল জোগাড় করতে হবে।' তারপর দিক ঠিক করে দেশের দিকে পাড়ি দেবো।'

--ঠিক বলেছো তোমরা'-ফ্রান্সিস বলল-'তাহলে কালকেই আমরা তীরে নামবো। দ্বীপ হোক আর দেশ হোক খাবার জল খুঁজে বার করতেই হবে।'

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোকে তৈরি হয়ে আসতে বলল। বিস্কো তরোয়াল নিয়ে এল আর শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে এল। মারিয়ার যাওয়ার ব্যাপারে ফ্রান্সিস দু'একবার আপত্তি জানাল । কিন্তু মারিয়া জেদ ধরল ও ওদের সঙ্গে যাবেই। অগত্যা ফ্রান্সিস আর আপত্তি করল না।

জাহাজের গায়ে ঝোলান একটা শক্তপোক্ত নৌকা জলে নামানো হলো। দড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নৌকায় নেমে এল। মারিয়াকে নামানো হলো দড়ির জালে দাঁড় করিয়ে। খাবার দাবার, খাওয়ার জল এসব প্রয়োজনীয় জিনিস আগে থেকে নৌকায় রাখা হয়েছিল আর দুটো জল রাখবার খালি পিপে। মারিয়া নেমে আসতেই বিস্কো নৌকো ছেড়ে দিল। বিস্কো আর শাঙ্কো নৌকো বাইতে লাগল তীরভূমি লক্ষ্য করে।

আধ ঘন্টার মধ্যে নৌকো তীরে ভিড়ল। ফ্রান্সিসরা নামল। মারিয়া কিন্তু কারো সাহায্য ছাড়াই নৌকো থেকে লাফিয়ে নামল। সবাই বিস্তীর্ণ বেলাভূমির বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

অনেকটা হাঁটার পর ওরা থামল। দেখল যতদূর চোখ যায় শুধু ধু ধু বালির প্রান্তর। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল।

সাদা-ধূসর রঙের বালি। কোনদিকে সবুজের চিহ্ন নেই। দু'একটা পাখি মাঝে মাঝে বালিতে ছায়া ফেলে উড়ে যাচ্ছে। তীব্র রোদ-বালিতে প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে লাগছে। ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। গরম হাওয়া বইছে।

কিছুক্ষণ চলার পর ওদের নজরে পড়ল ক্ষয়িত শিলার তালচে পাহাড়। বেশি উঁচু নয়। তার ওপাশে কিছু সবুজ গাছগুলির মাথা দেখা গেল। ফ্রান্সিস আশ্বস্ত হলো-যাক মরুভূমির মত জায়গাটা খুব দূরবিস্তৃত নয়।

টানা পাহাড়ের কাছে ওরা এল। পাথরে পা রেখে ওরা পাহাড়টায় উঠল। দেখল ওপাশে একটু দূর থেকে বনভূমি শুরু হয়েছে। খুব ঘন ঘন বন নয়। ছাড়া ছাড়া। দূরে কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। ছাইগাদা দিয়ে গেথেঁ গেথেঁ তৈরি বাড়িঘর। ছাদ পেইকো ঘাসের। ফ্রান্সিস বলল-'মানুষের বসতি আছে দেখছি। চলো ওখানেই জলের খোঁজ করা যাক। ওরা পাথরের চাঁইয়ে পা রেখে রেখে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস অবশ্য মারিয়াকে হাত ধরে সাহায্য করতে লাগল। মারিয়া প্রায় নেমেই এসেছিল, হঠাৎ একটা পাথরের টুকরোয় পা রাখতেই টুকরোটা সরে গেল। মারিয়া টাল সামলাতে পারল না। পাথরের চাঁইয়ের মাথা থেকে নিচে পড়ে গেল একটা

বড় গহ্বরের মধ্যে। ভাগ্য ভালো -নিচে ছিল বালি। বালির ওপর মারিয়ার দু'পা পড়ল। ওর শুধু হাতটা একটু ছড়ে গেল। পাথরের চাঁইয়ের ধারে এসে ফ্রান্সিসরা হাঁটু গেড়ে বসে নিচে তাকাল। গহ্বরটা একটু অন্ধকারই, তবু দেখল মারিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস ডেকে বলল-তোমার কি খুব লেগেছে?'

মারিয়া হেসে বলল-'কিচ্ছু না।'

-এবার ফ্রান্সিস অন্যদের দিকে তাকাল। বলল-'এখন মারিয়াকে তোলা যায় কী করে?'

-'জাহাজ থেকে দড়ি আনতে হবে'। বিস্কো বলল-

ওদিকে মারিয়া গহ্বরটার চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটু অন্ধকার হলেও পাথুরে দেয়াল, খোঁদল এসব দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গুহার মুখ। মুখটা বেশ বড়। একজন মানুষ মাথা উঁচু করে ঢুকতে পারবে। মারিয়া আস্তে আস্তে গুহাটার মুখে এসে দাঁড়াল। দেখল কাঠের ফালি দিয়ে তৈরি একটা দরজা গুহার মুখটায়। তার মানে এই গুহায় নিশ্চয়ই মানুষ থাকে। তাহলে এই গহ্বর থেকে বেরোবার পথও নিশ্চয়ই আছে। মারিয়া চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু পথ কোথায়? চারিদিকেই পাথরের অমসৃণ গা। হঠাৎ এক জায়গায় দেখল যেন ওখানে অন্ধকারটা কম। মারিয়া দ্রুত পায়ে সেখানে এল। দেখল দুটো পাথরের মাঝখানে একটা পাথরের ফাটল। মারিয়া বালির ওপর হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর বালির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ফাটলের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তার মানে এই গুহায় যে বা যারা থাকে তারা এই পথেই যাতায়াত করে। লুকিয়ে থাকার পক্ষে ভালো জায়গা।

মারিয়া বাইরে পাথরের চাঁইয়ের নিচে এসে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে ডাকল-'ফ্রান্সিস।' বিস্কো তখন জলের খালি পিপে রেখে জাহাজ থেকে দড়ি আনতে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে। তখন মারিয়ার ডাক ওদের কানে গেল। ওরা তাড়াতাড়ি পাথরের চাঁই থেকে নেমে এল। দেখল মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া বলল-'এই গহ্বরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার পথ আছে।'

—'ভালই হলো', ফ্রান্সিস বলল—'আমরা তোমাকে দড়ি দিয়ে তুলব ভাবছিলাম।'

—'ফ্রান্সিস —এর ভেতর একটা গুহা আছে। গুহার মুখের কাঠের দরজা আছে। মনে হয় মানুষ বাস করে।'

—'বলো কি।' ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হলো।

বিস্কো বলল—'চলো না ফ্রান্সিস দেখা যাক।'

সবাই হামাগুড়ি দিয়ে ফাটল পেরোল। গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। ফালি কাঠের দরজাটা একটুকরো দড়ি বাঁধা ছিল। ফ্রান্সিস খুলল দড়িটা। তারপর একে একে সবাই গুহাটায় ঢুকল। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। চোখে ভাবটা সয়ে আসতে ওরা দেখল—গুহার একপাশে শুকনো ঘাসের বিছানা। তার ওপর মোটা কাপড়ের কম্বল মতো পাতা। অন্য পাশে পোড়া হাঁড়ি কুড়ি, পাথরের টুকরো পেতে উনুন। একপাশে এলোমেলো গাছের বাঁকা কাণ্ড কুঁদে কুঁদে তৈরি বিচিত্র সব মূর্তি। এসব

কী মূর্তি ফ্রান্সিসরা বুঝল না। আবার মা-ছেলে. বিয়ের বর-কনে, এসবের মূর্তিও আছে।.ওরা বুঝল এখানে একজনই মানুষই থাকে। বিছানায় একটা মাত্র ঢিলাঢালা পোশাক পঞ্চো পড়ে আছে। সব দেখেটেখে ফ্রান্সিস বলল—'চলো, আর কিছু দেখার নেই। তবে লোকটাকে পেলে এখানে জলের সন্ধান পাওয়া যেত।'

ওরা গুহার বাইরে আসতেই একজন মধ্যবয়স্ক লোকের মুখোমুখি পড়ল। লোকটা ভীষণভাবে চমকে উঠল। ও বোধহয় ওর গোপন আস্তানা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল। লোকটা দ্রুত পেছন ফিরল। পালাবার ধান্ধা। বিস্কো জোরে ছুটে গিয়ে লোকটার ঢিলেঢালা পোশাক পঞ্চোটা পেছন থেকে চেপে ধরল। লোকটার পালানো হলো না। বিস্কো লোকটাকে ধরে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়েএল। লোকটা বেশ ভয় পেয়ে গেছে বোঝা গেল। লোকটার কাছে আসতে ফ্রান্সিস হেসে হাত তুলে ওকে ভয় না পেতে ইঙ্গিত করল। লোকটা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো। ফ্রান্সিস কথা বলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ল। কী ভাষা বুঝবে লোকটা? ফ্রান্সিস প্রথমে পর্তুগীজ ভাষায় জিজ্ঞেস করল—'তোমার নাম কী?' লোকটা বুঝল না। তাকিয়ে রইল।এবার ফ্রান্সিস স্প্যানিশ ভাষায় বলল—'তোমার ভয় নেই। তোমার নাম বলো।' লোকটার চোখমুখ উজ্জ্বল হলো। বোঝা গেল ও ফ্রান্সিসের কথা বুঝছে। লোকটা ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় বলল, —'আমি মেস্তিজো—চিকিমাদের দেবতার পূজারী।

ফ্রান্সিস এবার ভালোভাবে মেস্তিজোকে দেখল। মেস্তিজোর মাথায় লম্বা লম্বা চুল। মুখের দু'পাশের আধখানায় হলুদ রঙ মাখা। দু'কানের লতিতে সোনার কাঠি বেঁধানো। পরনে ঢিলেঢালা পঞ্চো পোশাক। ওর একহাতে একটা ঘাসের তৈরি ঝুড়ি। তাতে ক্যারোপ বীনএর বেশ কয়েকটা রুটি। অন্য হাতে একটা চীনেমাটির কুঁজো মতো। বোঝা গেল খাবার জল তাতে। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো যে মেস্তিজোর হাতে অস্ত্র নেই।তার মানে সে যোদ্ধা নয়। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো. তোমার কোন ক্ষতি আমরা করবো না। আমাদের জাহাজ সমুদ্রতীরে রয়েছে। আমরা পানীয় জল নিতে এসেছি। তুমি পানীয় জলের জায়গাটা দেখিয়ে দাও।' ফ্রান্সিস কথাগুলো থেমে থেমে বলল যাতে মেস্তিজো সহজে বুঝতে পারে।

মেস্তিজো মাথার লম্বা লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বলল—'চলো জলের জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি' ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—'তাহলে তোমরা ওর সঙ্গে যাও। জল নিয়ে এসো।'

মেস্তিজো হাতের খাবারের ঝুড়ি জলের কুঁজো ওর গুহাঘরে রেখে এল। তারপর জলের জায়গা দেখাতে চলল। পেছনে পিপে নিয়ে বিস্কো ও শাঙ্কো চলল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া —চলো আমরা গুহাঘরে গিয়ে বসি।' দু'জনে এসে ফালি কাঠের দরজা খুলে গুহায় ঢুকল। খড়ের বিছানায় গিয়ে বসল দু'জনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কোরা পিপে ভর্তি জল নিয়ে ফিরে এল। এদিকে বেশ বেলা হয়ে গেছে সকলেরই খিদে পেয়েছে। জাহাজ থেকে খাবার দাবার আনা হয়েছিলো। মারিয়া সে সব খাবার সবাইকে ভাগ করে দিল। মেস্তিজোকেও দেওয়া হলো। মেস্তিজো খুব খুশি। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো—আমি তোমার খাবার

খাবো। তুমি আমাদের খাবার খাও।'

মারিয়া মেস্তিজোর খাবার খেতে চাইল। মেস্তিজো ঘাসে তৈরি ঝুড়ি থেকে রুটি, সামুদ্রিক মাছ, বীন, লঙ্কামেশানো আলুর তরকারি বের করে দিল। ফ্রান্সিস মারিয়া খেতে লাগল। নতুন ধরনের খাবার। দু'জনের ভালো লাগলো।

খাওয়াদাওয়ার পর মেস্তিজো বিছানায় পাতা কাপড় তুলে খড়গুলো গুহার মেঝেয় আরও জায়গায় ছড়িয়ে দিল। তারপর দুটো কম্বল মতো মোটা কাপড় পেতে দিল। ফ্রান্সিসরা সবাই বসল তাতে। শাঙ্কো শুয়ে পড়ল, বিস্কো আধশোয়া হলো। ফ্রান্সিস, মারিয়া আর মেস্তিজো বসে রইল। এতক্ষণ ফ্রান্সিস ভাবছিল—মেস্তিজোর কথা। স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে অথচ আচার আচরণ মোটেই স্পেনীয়দের মতো নয়। ওর আসল পরিচয়টা কী? এই গোপন গুহাঘরে লুকিয়ে থাকে কেন? ফ্রান্সিস ডাকল—'মেস্তিজো?'

—'বলুন।'

'দেখ তোমার ভাষা শুনে বুঝেছি তুমি স্পেনীয়। অবশ্য তোমার কথা কিছুটা ভাঙা ভাঙা তবু ভাষাটা তো স্পেনীয়। তাছাড়া তুমি আমার স্পেনীয় ভাষাও বুঝতে পারছো। অথচ তোমার এখনকার চেহারা মোটেই স্পেনীয়দের মতো নয়। কী ব্যাপার বলো তো?' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো আস্তে আস্তে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলতে লাগল—'সে অনেকদিন আগের কথা। আমার বয়স তখন ছয় সাত। স্পেনের ডিমেলো শহরে বাবা-মার সঙ্গে থাকতাম। এটুকু আমার মনে আছে। বাবা মালবাহী জাহাজে কাজ করতেন। তখন একবার বাবা-মার সঙ্গে আমিও সমুদ্রযাত্রায় বেরোলাম। মাস চার পাঁচ জাহাজেই কাটল। ঝড় ঝাপটায় আমাদের জাহাজ বার কয়েক প্রায় ডুবে যাচ্ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বেঁচে থেকেছি। জাহাজ ডোবেনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

একদিন আকাশে ঘন মেঘ করে সন্ধ্যের পরেই ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তবু বাবা আর জাহাজের নাবিকেরা ঝড়ের মোকাবিলা করবার জন্য তৈরি হল। চলল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই। বড় বড় পাল সব নামিয়ে ফেলা হল। ঝড়ের ঝাপটায় প্রচণ্ড বেগে জাহাজ দুলতে লাগল। এই জাহাজটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে পরক্ষণেই ঢেউয়ের ফাটলে নেমে আসছে। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনিতে আমরা কেবিন ঘরের এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ছি। অনেকের মাথা ফাটল, হাত পা ভাঙল। আমি ডেকএ যেতে সাহস পেলাম না।

আকাশ মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে। হঠাৎ জাহাজটা ভীষণ জোরে দুলে উঠল। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে কানে এল মড়মড় শব্দ। জাহাজটা কাত হতে লাগল। একটু পরেই অনেকটা কাত হয়ে গেল। কেবিন ঘরে আমি একা, বাবা আর তার বন্ধুরা ডেকে গেছে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে। হঠাৎ নাবিকদের চিৎকার—জাহাজ ডুবছে। সাবধান। তখনই দেখি পায়ের কাছে জল ঢুকতে লাগল। আমি বুঝলাম আর এখানে থাকা চলবে না। জাহাজ ডুবছে। দ্রুত ছুটলাম সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি দিয়ে কি উঠতে পারি? সিঁড়ি নাগরদোলার মত দুলছে। কোনরকমে

শরীর পা ঠিক রেখে ডেকএ উঠে এলাম। ততক্ষণে কেবিনঘরগুলো ডুবিয়ে দিয়ে সমুদ্রের জল ডেকএ উঠে এসেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝল্‌সে উঠছে। তারই আলোতে বাবাকে খুঁজতে লাগলাম। ওদিকে নাবিকেরা একে একে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমি বুঝলাম বাবাকে এই অবস্থায় খুঁজতে গেলে আমি আর বাঁচব না। তখন আমি হালের কাছে এসেছি। দেখি দড়ি বাঁধা একটা কাঠের থাম মত। আমি মাথাটা গড়িয়ে নিয়ে চললাম। ডেক-এর রেলিঙের ধারে নিয়ে এলাম। তারপর নিজের শরীরটা দড়ি দিয়ে থামটার সঙ্গে বাঁধলাম। ঠিক তখনই বোধহয় জাহাজটা ডুবে গেল। কয়েকজন নাবিকের চিৎকার কোলাহল শুনলাম। বিরাট এক ঢেউয়ের ধাক্কায় থামসুদ্ধু আমি ছিটকে পড়লাম ঝড়োন্মত্ত সমুদ্রে। প্রাণপণে থামটা জড়িয়ে ধরলাম। ঢেউয়ের ধাক্কায় বিদ্যুতের আলো ঝলসে ওঠা সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমি ভেসে চললাম। কতক্ষণ জানি না। আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন চোখ খুললাম দেখি ভোর হ'য়েছে। সমুদ্রের ধারে ভেজা বালির মধ্যে থাম জড়িয়ে ধ'রে আমি পড়ে আছি। নুনে বালিতে চোখ বুঝে গেছে। খুলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম। হাওয়ার শব্দ। সমুদ্রের মৃদু গর্জন শুনতে লাগলাম। তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুললাম। রোদের তেজ বাড়তে লাগল। শরীরটা গরম হ'ল। আস্তে আস্তে থামে বাঁধা দড়িটা খুললাম। তারপর বালিয়াড়িতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মাথাটা ঘুরে উঠল। টাল সামলে সোজা হলাম। চারদিকে তাকালাম। একদিকে সমুদ্র। অন্যদিকে ধূধূ বালি। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। এখানে পড়ে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। কাজেই কোথাও লোকজন বাড়িঘর আছে কিনা খুঁজে বের করতে হবে। সেই বালির মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে চললাম আমি।

আস্তে আস্তে সূর্য পশ্চিমদিকে অনেকটা নেমে এল। গত সন্ধ্যেয় পেটে কিছু পড়েনি। গলা শুকিয়ে কাঠ। ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় আমি টলতে টলতে হেঁটে চললাম।

হঠাৎ দেখি একটু দুরেই কিছু বাড়িঘর। ঠিক দেখছি তো? দু'চোখ কচ্‌লে নিলাম। হ্যাঁ-থাম দেওয়া পাথরের বাড়িঘর। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গেলাম। গলা দিয়ে কোন শব্দই বেরোলো না। হাঁটতে লাগলাম। এখানে বালি গরম নয়। বালি মাটি মেশানো শক্ত জমি। আমি তখন আর হাঁটতে পারছি না। সেই জমির ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চললাম।

প্রথম যে বাড়িটা পেলাম সেটার দরজার ওপর আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কাঠের ফালি কেটে তৈরি দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। সেই শব্দটাই আমি শেষ শুনেছিলাম। তারপরই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আর কিছুই মনে নেই।

আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এল। অস্পষ্ট কাদের কথাবার্তা কানে আসতে লাগল। সেই শব্দ আস্তে আস্তে আমার কানে স্পষ্ট হ'ল। কিন্তু সেই কথাবার্তার কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। বেশ কষ্ট করে চোখ খুললাম। আমার গলায় গোঙানির শব্দ উঠল। কথাবার্তা থেমে গেল। কে একজন একটু দ্রুতই আমার মাথার কাছে এল। কপালে হাত রাখল। আমি দেখলাম মুখের দু'পাশে রঙমাখা একটা মুখ। লোকটা

আমার চোখ খোলা দেখে হাসল। আমি অনেক কষ্ট করে বললাম জল। লোকটি কিছুই বুঝল না। তাকিয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ডানহাতটা তুলে জল খাওয়ার ভঙ্গি করলাম। লোকটা বুঝল। গলা চড়িয়ে কী বলল। সামুদ্রিক মাছের তেলের আলো জ্বলছিল ঘরটাতে। সেই আলোয় দেখলাম একজন স্ত্রীলোক চিনেমাটির বাটিতে জল নিয়ে ছুটে এল। স্ত্রীলোকটির মুখে কোনো রঙ লাগানো নেই। আমি মুখ হাঁ করলাম। স্ত্রীলোকটি আস্তে আস্তে মুখে জল ঢেলে দিতে লাগল। আমি থেমে থেমে অনেকটা জল খেলাম। মুখ গলা নাকের শুকনো ভাবটা কেটে গেল। অনেকটা স্বাভাবিক হলাম আমি। স্ত্রীলোকটি হাসল। আমার মুখের কাছে মুখ এনে কী বলল। কিছুই বুঝলাম না। স্ত্রীলোকটি এবার হাত তুলে মুখে ছুঁইয়ে খাওয়ার ইঙ্গিত করল। আমি আস্তে আস্তে মাথা কাত ক'রে সম্মতি জানালাম। স্ত্রীলোকটি চলে গেল। এবার লোকটি এগিয়ে এল। হেসে আমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কী যে ভাল লাগল। রাতে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। এত ক্লান্ত যে কথা বলতে পারছিলাম না। লোকটি ও স্ত্রীলোকটি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ওদের ভাষা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। চুপ ক'রে থাকা ছাড়া উপায় কী? একটু থেমে মেস্তিজো আবার বলতে লাগল দিন চার পাঁচেক কাটল। আমি তখন অনেকটা সুস্থ। জানলাম যেখানে আমি আশ্রয় পেয়েছি সেটা একটা ছোট শহর। নাম চিক্লাই। লোকটির নাম জামিলি। সমুদ্রে মাছ ধরাই তার কাজ। চিক্লাই শহরের অধিকাংশ লোকই সমুদ্রে মাছ ধরেই সংসার চালায়। মেস্তিজো থামল, ফ্রান্সিস বলল তারপর? মেস্তিজো বলতে লাগল।

জামিলির আশ্রমে আমার দিন কাটতে লাগল। জামিলিরা যে ভাষায় কথা বলে তার নাম উনকা। জামিলির পরিবারের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি তাড়াতাড়ি উনকা ভাষা শিখে গেলাম। মাছ ধরার কাজে জামিলিকে আমি সাহায্য করতাম। এইভাবে আমি ঐ পরিবারেরই একজন হ'য়ে গেলাম। জামিলির স্ত্রী মায়ের মত স্নেহে যত্নে আমাকে মানুষ করতে লাগল। মেস্তিজো এই পর্যন্ত ব'লে থামল। ফ্রান্সিস বেশ আগ্রহের সঙ্গে মেস্তিজোর জীবনের কাহিনী শুনছিল। মেস্তিজোকে একটু দম নিতে সময় দিল। তারপর বলল-মেস্তিজো তারপর কী হ'ল বলো। মেস্তিজো আবার বলতে শুরু করলো-এবার চিকামা উপত্যকার কথা বলি। চিক্লাই থেকে বেশ কিছুটা উত্তরে চিকামা উপত্যকা। এই উপত্যকা ঘিরে গড়ে উঠেছিল মোচিকা রাজ্য। চিকামা উপত্যকাতেই রাজধানী চিকমা। অনেক মানুষের বাস সেখানে। সবাই উনকা ভাষায় কথা বলে। তাই এদের বলা হয় উনকা। এই উনকাদের রাজা ছিল কোলা। খুব উদার হৃদয়ের মানুষ। এই মোচিকা রাজ্যের উত্তরে চিমু রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজার নাম লুপাকা। একটু থেমে মেস্তিজো বলতে লাগল-দুই রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা। তখন আমি যুবক। নানা প্রয়োজনে আমাদের চিকামা যেতে হত। জামিলির সঙ্গে একদিন চিকামার উদ্দেশ্যে বেরোলাম। চিকামায় খুব ভালো মাছ ধরা জালের সুতো পাওয়া যায়। তা ছাড়া সংসারেরও কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করার ছিল। আমরা যখন চিকামা পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয় হয়। একটা সরাইখানায় দুজনে আশ্রয় নিলাম। রাতে খেতে বসেছি

তখনই সরাইখানার লোকজনের মুখে শুনলাম অবস্থা ভালো নয়। চিমুদের রাজা লুপাকা চিকিমার উত্তর সীমান্তে সৈন্য সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। যে কোন মুহূর্তে মোচিকা রাজ্য আক্রমণ করতে পারে। জামিলি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। খেয়ে উঠে শুতে এলাম দু'জনে। ঠিক করেছিলাম সেদিন রাতটা বিশ্রাম নিয়ে পরদিন কেনাকাটা করবো। জামিলি বলল-কেনাকাটা দরকার নেই। কাল ভোরেই চিক্লাই রওনা হবো। এই চিকিমায় আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। ভোরে উঠতে হবে। শুয়ে শুয়ে জামিলির মুখে উনকা আর চিমুদের শত্রুতার নানা গল্প শুনেছিলাম। জামিলি সে সব বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।' একটু থেমে মেস্তিজো বলতে লাগল-' গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। চারপাশের বাড়িতে ও সরাইখানায় লোকজনের চিৎকার হৈ হল্লা চলছে তখন। জামিলি আর আমি দু'জনেই ছুটে বাইরে এলাম। দেখলাম উনকা সৈন্যরা মশাল আর লোহার ছুঁচালো মুখ বর্শা হাতে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই রাজবাড়ি থেকে রাজা কালো ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এল। পেছনে ঘোড়ায় চড়ে এল রাজার দেহরক্ষী সৈন্যরা। রাজা কোলার মাথায় লাল রঙের মোটা কাপড়ের ফেট্টি। তাতে লাল হলুদ বিচিত্র সব পাখির পালক গোঁজা। গায়ে কাচের টুকরো বসানো পঞ্চো। বিচিত্র রঙের সুতোর কাজ করা পঞ্চোটায়। জামিলি বলল 'এটাই নাকি রাজা কোলার যুদ্ধযাত্রার পোশাক।' রাজা উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল। পেছনে অশ্বারোহী দেহরক্ষীরা। তারপরে পদাতিক সৈন্যরা। চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। চিকিমার অধিবাসীরা চিৎকার ক'রে রাজা কোলার জয়ধ্বনি দিল। সৈন্যরা উত্তর মুখে চলল। একটা নিচু পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেল রাজা কোলা আর তার সৈন্যরা। মেস্তিজো থামল। তারপর আবার বলতে লাগল 'কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম অন্ধকারে মশাল হাতে উত্তর দিক থেকে লোকজন ছুটে আসছে। খবর পাওয়া গেল চিমুদের রাজা লুপাকার সঙ্গে রাজা কোলার যুদ্ধ বেঁধে গেছে। শুরু হল লোকজনের চিৎকার চ্যাঁচামেচি ছোটাছুটি। আমরা আর সরাইখানায় ঢুকলাম না। যুদ্ধের খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। উত্তর দিক থেকে আবার কিছু লোকজন ছুটতে ছুটতে এল। তাদের কাছে খবর পাওয়া গেল প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। কে জিতবে কে হারবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।' একটু থেমে মেস্তিজো বলতে লাগল- 'বাকি রাতটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েই কাটল। ভোর হ'ল তখনও লড়াই চলছে। জামিলি আর আমি সরাইখানায় ঢুকলাম। নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে এলাম। তখনও রাস্তাঘাটে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। চিক্লাইয়ের উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটতে শুরু করলাম। দুপুর নাগাদ চিক্লাই এসে পৌঁছলাম। ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত সারা শরীর ধূলিধূসরিত। চিক্লাইয়ের লোকজন আমাদের দেখে লড়াইয়ের খবর জানার জন্যে ছুটে এল। আমরা আর কথা বলতে পারছি না। তবু সংক্ষেপে বললাম সব। লড়াই চলছে। কে হারে কে জেতে বলা শক্ত।

বিকেলের একটু আগে। পরিশ্রান্ত আমি আর জামিলি ঘরে শুয়ে ব'সে বিশ্রাম করছি এমন সময় কে যেন খবর দিয়ে গেল রাজা লুপাকা তার পরাজিত সৈন্যদের

নিয়ে উত্তরে চিমু রাজ্যে পালিয়ে যাচ্ছে। রাজা কোলা তাঁর সৈন্যদের নিয়ে চিকিমায় ফিরে এসেছেন। বিজয় উৎসব চলছে চিকিমায়। চিক্লাই শহরের লোকজন আনন্দে চিৎকার করতে করতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল আর রাজা কোলার জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। আমি শহরের পথে পথে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে হৈ হল্লা শুনে ফিরে এসে ঘরে বিশ্রাম করছি। জামিলি আনন্দ উৎসব শেষ ক'রে ফেরেনি। হঠাৎ শুনলাম কাঠের দরজায় হাত দিয়ে চাপড়াবার শব্দ। তেমন জোরে চাপড়ানো হয়নি। তবু আমি মৃদু শব্দ পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। দরজা খুলে দিলাম। দেখি একজন মধ্য বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে। মুখের একপাশে হলুদ রং। মাথায় ফেট্টি। পালক গোঁজা তাতে। লোকটির গায়ে চাদরের মত একটা হলদে কাপড় জড়ানো। লোকটি এতক্ষণ মুখ নিচু ক'রে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিলো। এবার মুখ তুলে তাকাতেই চমকে উঠলাম- আরে এ যে রাজ পুরোহিত ল্লামা। চিকামার হুয়াকা দেবতার পুরোহিত। আমি তাড়াতাড়ি ল্লামাকে দু'হাতে তুলে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানালাম। তারপর তাঁকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলাম। ল্লামা তখন এত ক্লান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সারা গায়ে ধুলো বালি। স্ত্রীলোকেরা ল্লামাকে খুব যত্ন করে হাত মুখ ধুইয়ে খেতে দিল বীনের রুটি তরকারি। খেয়ে দেয়ে ল্লামা বিছানায় শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে যেন শরীরে মনে একটু জোর পেল। জামিলি আমাকে চিকামা নিয়ে যেতো। হুয়াকা দেবতার পূজায় উৎসবেও গেছি। তখন ল্লামাকে দেখেছি। হুয়াকা দেবতার বেদী থেকে সমবেত ভক্তদের দিকে প্রসাদী ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

জামিলি তখনই বাড়ি ফিরল। ল্লামাকে দেখে সেও অবাক। জামিলি ল্লামাকে মাথা নুইয়ে হাত বাড়িয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল- 'আপনার এ রকম অবস্থা হ'ল কী ক'রে?' ল্লামা ক্লান্তস্বরে বলল- 'তার আগে বলো - যুদ্ধের সংবাদ কী?'

রাজা কোলা জয়লাভ করেছে। লুপাকা তার সৈন্যদের নিয়ে চিমু রাজ্যে পালিয়ে গেছে। ল্লামা খুশিতে প্রায় চিৎকার করে উঠল- রাজা কোলা দীর্ঘজীবী হোন। হুয়াকা দেবতার জয় হোক। এবার ল্লামা আস্তে আস্তে গায়ের লাল কাপড়টা বাঁদিকে সরাল। দেখা গেল কাঁধের কাছে বর্শার ক্ষত। গাছের লতাপাতা দিয়ে বাঁধা। রক্ত পড়ছে না। ল্লামা বলল- 'লুপাকার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে জানতাম। দুপুরের দিকে তিতিকাকা হ্রদের থেকে পূজের জল আনতে যাচ্ছি হঠাৎ পাঁচ ছ'জন সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে একেবারে আমার সামনে এসে হাজির। ওরা বোধহয় দলছুট সৈন্য ছিল। আমি তো ছুটতে লাগলাম তিতিকাকা বনের দিকে। ওরাও পিছু নিল। একজন বর্শা ছুঁড়ল। লাগল না আমার গায়ে। কিন্তু পরের বর্শাটি কাঁধ ছুঁয়ে গেল। কাটা জায়গা থেকে রক্ত ছুটল। আমি দাঁড়ালাম না। ঐ অবস্থায়ই ছুটে জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। চিমু সৈন্যরা তিতিকাকা বনের কিছুই চেনে না। আমাদের কাছে ঐ বনের সবই চেনা। অল্পক্ষণের মধ্যেই আত্মগোপন করলাম গভীর বনের মধ্যে। কিন্তু বর্শার ঘায়ে কাঁধ থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি তখনও। কিছু বুনো লতাপাতা আমি চিনতাম। সে সব পাতা থেঁতলে লাগালাম গায়ে। রক্ত পড়া বন্ধ হ'ল। জ্বালা

যন্ত্রণাও কমল। তারপর ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে হাঁটতে হাঁটতে চালা মরুভূমিতে এলাম। উত্তর দিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই চিক্লাই এসে পৌঁছলাম। জানি তোমাদের সেবা শুশ্রূষার কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হবো। মেস্তিজো থামল। ফ্রান্সিস মেস্তিজোর জীবন কাহিনী বেশ মন দিয়ে শুনছিল। বলল-তারপর?'

'মেস্তিজো বলতে লাগল- 'দু'তিন রাত জেগে খুব কষ্ট ক'রে রাজ পুরোহিত ল্লামার সেবা শুশ্রূষা করলাম। ল্লামা দিন সাতেকের মাথায় একেবারে সুস্থ হ'য়ে গেল। এবার চিকিমা চলে যেতে হবে। আবার হুয়াকা দেবতার পূজো শুরু করতে হবে। রাজা কোলা যুদ্ধে জিতেছেন। কাজেই এবারের পূজোয় খুব ধূমধাম হবে।'

ল্লামা যাবে পরদিন। তার আগের দিন রাতের বেলা জামিলিকে ডেকে বলল 'দেখ মেস্তিজোর প্রাণপণ সেবা শুশ্রূযাতেই আমি এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হলাম। মেস্তিজো ছেলেটি খুবই সৎ পরিশ্রমী আর দয়াবান। যদি তুমি আপত্তি না কর তবে মেস্তিজোকে আমি চিকামা নিয়ে যাবো। ওকে রাজপুরোহিতের সব ক্রিয়াকর্ম পদ্ধতি শেখাবো। আমার অবর্তমানে মেস্তিজোই হবে রাজপুরোহিত। জামিলি চুপ করে রইল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। ওদিকে আমার মন তখন আনন্দে নেচে উঠেছে। জামিলি আমার দিকে তাকাল। বলল- 'তোর কী ইচ্ছে বল।'

—'আমি ল্লামার সঙ্গে যাবো। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম।'

—'বেশ। জামিলি আর কোন আপত্তি করল না। মুস্কিল হ'ল জামিলির স্ত্রীকে নিয়ে। আমাকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর কান্না আর থামে না। সত্যি উনি আমাকে মার মত স্নেহ যত্নে মানুষ করেছিলেন। আমিও তাঁকে মা বলেই মেনে নিয়েছিলাম। যা হোক মাঝে মাঝে আসবো এই কথা দিয়ে ছাড়া পেলাম। পরদিন ভোরেই ল্লামার সঙ্গে চললাম চিকামা। দুপুর নাগাদ চিকামা পৌঁছলাম। এর আগেও চিকামা এসেছি। হপ্তাতে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে। এখন এসেছি থাকতে। চিকামা শহরে থাকবো ঐ স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। আজকে সেই স্বপ্ন সার্থক হ'ল।

মেস্তিজো গল্প থামিয়ে ফ্রান্সিসকে বলল 'আপনি তো চিকামা যাননি। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। মেস্তিজো বলতে লাগল বড় সুন্দর জায়গা চিকামা। এখানে এক উঁচু পাথরের স্তূপের ওপর উনকাদের দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। নিখাদ সোনায় তৈরি সেই দেবমূর্তি কতদিন আগে তৈরি হ'য়েছিল কেউ জানে না। এই দেবমূর্তিকেই উনকারা বলে হুয়াকা। প্রতিদিন ল্লামা হুয়াকার পূজো করে। আমি ল্লামাকে নানাভাবে পূজোর ব্যাপারে সাহায্য করি। থাকি দেবমূর্তির পাথরের

বেদীর কাছেই একটা পাথরের ঘরে ল্লামার সঙ্গে। এই হুয়াকা দেবতা মন্দিরের প্রাঙ্গনে মাঝে মাঝে উৎসব হয়। সারা চিকামার লোক দল বেঁধে আসে সেই উৎসব দেখতে পূজো দিতে ও আনন্দে অংশগ্রহণ করতে।

—সেই দেবতার স্বর্ণমূর্তি দেখতে কেমন?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। মেস্তিজো আঙুল দিয়ে গুহার প্রায় অন্ধকারে কোণায় রাখা একটা কাঠের মূর্তি দেখাল। ফ্রান্সিসরা সেইদিকে তাকাল। দেখল কাঠের মূর্তি কয়েকটা। 'দেখতে এ রকম-'

—আসল মূর্তিটা কত উঁচু? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হাত আড়াই তিনেক। রাজপুরোহিত ল্লামা শুধু পূজোআর্চা করত না। পাথর, এলগারোর গাছের আঁকাবাঁকা কাণ্ড কুঁদে মূর্তি বানাতো। আমিও তার কাছে থেকে তার সঙ্গে কাজ ক'রে এসব বানানো শিখে ছিলাম। ঐ মূর্তিগুলো আমারই তৈরি। মেস্তিজো থামল। ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়েই মেস্তিজোর গল্প শুনছিল। তবে উৎসাহিত হবার কোন তথ্য পাচ্ছিল না।

'—এবার তোমার সম্পর্কে বলো, ফ্রান্সিস বলল-'তুমি চিকামা থেকে পালিয়ে এসে এখানে আত্মগোপন করে আছো?'

'—চিমু রাজ্যের রাজা লুপাকা এবার রাজা কোলার মোচিকা রাজ্য আক্রমণ করার

জন্যে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে লাগল। উত্তরের পাহাড়ী এলাকার উপজাতিদের নিয়ে লুপাকা এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল। মাস তিনেক আগে লুপাকা সেই দুর্ধর্ষ সেনাদের নিয়ে মোচিকা রাজ্য আক্রমণ করেছিল। রাজা কোলা এই আক্রমণের সম্ভাবনার কথা গুপ্তচরের মারফৎ যখন জানলেন তখন আর সৈন্য সাজিয়ে নতুন সৈন্য

জোগাড় ক'রে সেই আক্রমণের মোকাবিলা করার সময় নেই। তবু রাজা কোলা সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর সীমান্তের দিকে চললেন। কিন্তু সীমান্ত পর্যন্ত যাবার আগেই চিমু সৈন্যরা আক্রমণ করল। সেই পাহাড়ী বন্য হিংস্র চিমু সেনাদের সামনে রাজা কোলার সৈন্যবাহিনী দাঁড়াতেই পারল না। ধুলোর মত উড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত লড়াই ক'রে রাজা কোলা মৃত্যুবরণ করলেন। মোচিকা সৈন্যরা পিছু হটে এল। পরে চিমুদের পদাতিক বাহিনীও এল। শুরু হল অগ্নিসংযোগ আর অবাধ লুন্ঠন। রাজা লুপাকা চিকামার রাজ সিংহাসনে বসল। তারপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল।

—'লুপাকা এসে এখানে উনকাদের কাছে যত সোনা অলঙ্কার দামি পাথর পেল সব কেড়ে নিল। মাস দু'য়েক কাটল। একদিন লুপাকা হুয়াকা স্বর্ণমূর্তি নিজের চিমু রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইল। হুয়াকাভক্ত উনকাদের কোনো আপত্তিই সে গ্রাহ্য করল না। সৈন্যরা স্বর্ণমূর্তি নামিয়ে আনতে গেল। তখনই ধরা পড়ল যে, যে মূর্তিটা রাখা আছে সেটা সোনার নয় কাঠের। এত সুন্দর রঙ মিশিয়ে তৈরি যে কারো বোঝবার উপায় ছিল না। রাজা লুপাকা ভীষণ ক্ষেপে গেল। আসল স্বর্ণমূর্তি তাহলে কে সরিয়েছে? কে লুকিয়ে রেখেছে সেই স্বর্ণমূর্তি? রাজা লুপাকার যত রাগ গিয়ে পড়ল রাজপুরোহিত ল্লামার ওপর। ল্লামার সঙ্গে তার শিষ্য আমাকেও বন্দী করা হলো। ভীষণ অত্যাচার চলল ল্লামার ওপর। ল্লামা বলল—'রাজা কোলার নির্দেশেই সে আসল স্বর্ণমূতির মতো একটি কাঠের মূর্তি তৈরি করেছিলো। সেটা নিয়ে রাজা কোলা কী করেছেন তা সে জানে না।

রাজা লুপাকার রক্ষীদের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে রাজপুরোহিত ল্লামা কয়েদঘরেই মারা গেল আমার কোলে মাথা রেখে।' মেস্তিজো থামল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে আধশোয়া হয়ে মেস্তিজোর কথা শুনছিলো। স্বর্ণমূর্তির রহস্যের কথা শুনেই ও সোজা হয়ে বসল-'বোঝা যাচ্ছে রাজা কোলা আশঙ্কা করেছিলেন যে রাজা লুপাকা তাঁর দেশ আক্রমণ করতে পারে। তাঁর পরাজয় হতে পারে। যুদ্ধে জিতেও যাতে রাজা লুপাকা স্বর্ণমূতি নিয়ে নিজের দেশে যেতে না পারে তার জন্যে তিনি নকল হুবুহু একরকম দেখতে একটা কাঠের মূর্তি ল্লামাকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন।

—'ঠিক বলেছেন।' মেস্তিজো বলল।

—'এখন প্রশ্ন হলো রাজা কোলা সেই আসল স্বর্ণমূর্তি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন?' ফ্রান্সিস বলল।

—'তাদের হদিস কেউ জানে না।' মেস্তিজো বলল-'রাজা লুপাকা এখন হন্যে হয়ে সেই আসল স্বর্ণমূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।' ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর ঘাসের বিছানা থেকে উঠে নকল কাঠের মূর্তিটার কাছে গেল। ভাল করে দেখল। বলল-'মেস্তিজো, রাজপুরোহিত কি এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিতই তোমাকে দিয়ে যেতে পারেনি?'

—'না, স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তবে রাজা কোলাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল—এই নকল কাঠের মূর্তি তিনি কেন তৈরি করেছেন?' মেস্তিজো বলল।

—'তার উত্তরে রাজা কোলা কী বলেছিলেন?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল

—'শুধু হেসে বলেছিলেন-সবই কপালের লিখন।' মেস্তিজো বলল।

—'সবই কপালের লিখন—' কথাটা ফ্রান্সিস বার কয়েক বিড়বিড় করে বলল। কী অর্থ কথাটার? ফ্রান্সিস গুহার পাথুরে মেঝেয় কয়েকবার পায়চারি করল। বিস্কো বলল—'ফ্রান্সিস, ব্যাপারটা কি তোমার কাছে রহস্যময় লাগছে?'

—'অবশ্যই-' ফ্রান্সিস পায়চারি থামিয়ে বলল-'আর আমি স্থির করে ফেলেছি ঐ স্বর্ণমূর্তি খুঁজে বের করতে আমি চিকামা উপত্যকায় যাবো।

—'পারবে খুঁজে বের করতে?' মারিয়া বলল।

—'আগে নকল মূর্তিটা দেখি। চারপাশ ভালো করে দেখি, তবেই বুঝতে পারবো মূর্তি উদ্ধার করতে পারবো কিনা।' ফ্রান্সিস বলল। এবার ফ্রান্সিস মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে বলল- 'তুমি এই গুহাঘরে লুকিয়ে আছ কেন?'

—'গুরুদেব ল্লামা মারা যাওয়ার পর রাজা লুপাকা আমার ওপর অত্যাচার শুরু করে-' মেস্তিজো বলল-'কোনোরকমে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছি।'

—'তুমি রাজা লুপাকাকে কী বলেছ?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'ঐ যে কথাটা রাজা ল্লামাকে বলেছিলেন-সবই কপালের লিখন।'

—'হুঁ।' ফ্রান্সিস কপাল কুঁচকে ভাবল একটুক্ষণ। বলল-'রাজা লুপাকা বোধহয় কিছুই বোঝেনি।'

—'না। এই জন্যেই তো আমার উপর রাগ। এখানে লুকিয়ে থাকি। আমি তো রাজপুরোহিত ল্লামার সহকারী ছিলাম। তাই উনকারা আমাকে শ্রদ্ধা করে. ভালবাসে। আমার খাবার লুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কখনো আমিও খাবার আনতে যাই।' মেস্তিজো বলল।

—'তুমি তাহলে উনকা ভাষা জানো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'অনর্গল বলতে পারি।' মেস্তিজো বলল। ফ্রান্সিস বিস্কোদের দিকে তাকাল। বলল—'বিস্কো, শাঙ্কো-বিকেল হয়ে গেছে। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র এখানে রেখে জল নিয়ে জাহাজে চলে যাও। বন্ধুদের গিয়ে বল-আমরা চিকামা যাবো। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করবো। ওরা যেন দিন দশ পনেরো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। ততদিন আমরা না ফিরলে ওরা যেন সশস্ত্র হয়ে চিকামায় যায়। সব বলে তোমরা দু'জনে ফিরে এসো।'

—'বেশ—' বিস্কো বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। শাঙ্কো উঠল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া তুমি ওদের জাহাজে ফিরে যাও।'

মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'না, আমিও তোমাদের সঙ্গে চিকামা যাবো।'

—'বেশ, চলো—' ফ্রান্সিস বলল- 'আমরা কিন্তু বেড়াতে যাচ্ছি না। যে কোনো মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারি।'

—'আমি ভয় পাই না।' মারিয়া দৃঢ়স্বরে বলল।

বিস্কো আর শাঙ্কো সন্ধ্যের আগেই জলের পিপে নিয়ে জাহাজে চলে গেল। গুহাঘরটা একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল। মেস্তিজো চকমকি ঠুকে পাথরের খাঁজে রাখা একটা মশাল জ্বালাল। মশালটা সামুদ্রিক মাছের তেলে ভেজানো ছিল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে আর মারিয়াকে শোনাচ্ছিল ওর চিকামায় কাটানো জীবনের কথা। ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনছিল। ওর এত মনোযোগ দিয়ে

শোনার উদ্দেশ্য যদি স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

একটু রাতে বিস্কো আর শাঙ্কো ফিরে এল। বলল-'বন্ধুরা সবাই ফ্রান্সিসের কথা মন দিয়ে শুনেছে। ওরা খুসি হয়েছে ফ্রান্সিস আর এক অভিযানে যাচ্ছে শুনে।' ওরা জাহাজ থেকে খাবার এনেছিল। রাতের খাওয়ার পর ওরা শুকনো ঘাস ছড়ানো বিছানায় শুয়ে পড়ল।

গভীর রাত তখন। দূরের সমুদ্রের মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ কিসের শব্দে মারিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল ও আর কোনো শব্দ হয় কি না শোনার জন্যে কান পেতে রইল। আবার শব্দ হলো। দু-চারটে পাথরের টুকরো বাইরে চাঁই পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। ও ফ্রান্সিসকে ফিসফিস করে ডাকল-'ফ্রান্সিস, ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল-'শুনেছি। আসার পথে ধূসর রঙের শেয়াল দেখেছিলাম। বোধহয় শেয়ালের পাল, খাবারের ধান্ধায় এসেছে।'

ঠিক তখনই কাঠের ফালিতে তৈরি গুহাঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো। স্পষ্ট শব্দ। ফ্রান্সিস বিপদ আঁচ করল। একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে তরোয়ালটা নিয়ে চাপাস্বরে ডাকল-'বিস্কো-শাঙ্কো।'

বিস্কো শাঙ্কো তখনও ঘুমে অচেতন। মারিয়া ওদের জোরে ধাক্কা দিল। দু'জনেই দ্রুত উঠে বসল। ততক্ষণে কয়েকজন লোক এসে গুহাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে। মশালের আলোয় দেখা গেল- লোহার ছুঁচালো মুখওয়ালা বর্শা। সকলের হাতেই বর্শা। বর্শা ছোঁড়ার জন্যে উঁচিয়ে ধরল ওরা। লোকগুলো বেঁটে। শক্ত-সমর্থ। গায়ের রঙ হালকা তামাটে। মাথায় লম্বা চুল। কপালে লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। তাতে পাখির পালক গোঁজা। পরনে ঢিলেঢালা পোশাক-পঞ্চো। মুখের দুপাশে লাল রং মাখা। শাঙ্কো দ্রুত তীর ধনুকের দিকে হাত বাড়াল। ফ্রান্সিস বলে উঠল-'শাঙ্কো, আগেই লড়াই নয়।' ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে দিল। মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে দেখল ভয়ে মেস্তিজোর মুখ সাদা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো এরা কারা?'

—'রাজা লুপাকার সৈন্য। আমাকে ধরলে মেরে ফেলবে।' সৈন্য ক'জন কিন্তু ফ্রান্সিসদের আর মারিয়াকে দেখে অবাক। সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে বলশালী লোকটা ভারী গলায় কী বলে উঠল। ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো-এরা যা বলবে আমাকে তা বলো।'

—'ও দলনেতা। বলছে-তোমরা কে?' মেস্তিজো বলল।

—'বলো, আমরা ভাইকিং। রাজা কোলার লুকোনো স্বর্ণমূর্তি আমরা খুঁজে বের করতে এসেছি। আমরা লড়াই চাই না।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো উনকা ভাষায় কথাগুলোকে দলনেতাকে বলল। দলনেতা কিছুক্ষন মাথা নিচু করে কী ভাবল। তারপর মাথা তুলে কী বলল। মেস্তিজো বলল-'দলনেতা বলছে, ওরা আমার খোঁজে এসেছিলে। কিন্তু আপনারা বিদেশী। আপনাদেরও ওরা বন্দী করবে। রাজা লুপাকার কাছে নিয়ে যাবে। তারপর রাজা লুপাকা যা করবার করবে।'

—'খুব ভাল কথা। কিন্তু মেস্তিজো, ওকে বলো আমাদের কারো যেন কোনো ক্ষতি না হয়।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো কথাটা দলনেতাকে বলল। দলনেতা মাথাটা দু'পাশে নাড়ল। বোধহয় কথাটা মেনে নিল। দলনেতার ইঙ্গিতে একজন সৈন্য নিজের কোমরে

জড়ানো কালো রঙের লম্বা দড়ি বের করল। সেই দড়ি দিয়ে প্রথম মেস্তিজো তারপর মারিয়ার হাত বাঁধা হলো। তারপর ফ্রান্সিসদের বাঁধা হলো। আর একজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের তরোয়াল শাঙ্কোর তীর ধনুক নিল। শাঙ্কো ওদের চোখের আড়ালে বড় ছোরাটা ঢোলা জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

গুহাঘর থেকে সবাই বাইরে এল। দু'জন সৈন্য মশাল হাতে সামনের দিকে চলল। পেছনে দলনেতা, অন্য সৈন্য আর ফ্রান্সিসরা চলল।

পাহাড়ী এলাকা পেরোতেই পুব আকাশ লাল হলো। একটু পরেই সূর্য উঠল। দেখা গেল এদিকটায় বালির চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিকে সবুজ গাছগাছালি। বীন, তুলো আলুর ক্ষেত। মাঝে মাঝে দু'চারটে পাথরগাঁথা বাড়ি। পেইকো ঘাসের ছাউনি। সেসব বাড়ি থেকে পুরুষ স্ত্রীলোক বাচ্চাকাচ্চারা বেরিয়ে এল।

অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বিশেষ করে হলদে গাউন পরা মারিয়াকে। ওদের পরনে মোটা সুতোর হাতে তৈরি ঢোলা পোশাক। পোশাকে নানা রঙের সুতোর কাজ।

ধুলোটে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই চিকামা পৌঁছাল। দেখা দেখা গেল সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপত্যকায় চিকামা নগর। এখানে জনবসতি বেশি। পাথরের বাড়িঘরও অনেক। চিকামার অধিবাসীরাও অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। মারিয়ার পোশাক দেখে ওরা আশ্চর্য হলো বেশি।

একটা পথরের লম্বাটে ঘরের সামনে এসে দলনেতা দাঁড়ালো। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন সৈন্য গিয়ে ঘরটায় কাঠের দরজায় লাগানো একটা বড় হুক টেনে খুলল। দলনেতা ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকার জন্য ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। ঘরে ঢুকেই ফ্রান্সিস বুঝল এটা কয়েদঘর। হাত বাঁধা অবস্থায় প্রায় আটদশজন লোক ঘরটায় শুয়ে বসে আছে।

ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে সঙ্গে সঙ্গে বলল-'দলনেতাকে বলো, আমাদের কেন কয়েদঘরে রাখা হচ্ছে?'

মেস্তিজো ভয়ে সে কথা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দলনেতাকে বলল!

দলনেতার উত্তরটা মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল-'দলনেতা বলছে, ও রাজাকে সব বলবে। তারপর আপনাদের রাজসভায় রাজার সামনে উপস্থিত করবে। রাজা যা করার করবেন। ততক্ষণ কয়েদঘরেই থাকতে হবে।'

অগত্যা ফ্রান্সিসদের এই বন্দী জীবন মেনে নিতেই হলো।

দুপুরের দিকে কয়েদঘরের রক্ষীরা বড় বড় পাতা পেতে ফ্রান্সিসদের খেতে দিল। হাত খুলে দিল। ওরা খেতে লাগল। ফ্রান্সিসরা বন্দীদশায় যেমন বরাবর বলে তেমনি বলল-'পেট ভরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। শরীরটা ঠিক রাখো।' মেস্তিজোর গুহাঘরে যে খাবার ফ্রান্সিস আর মারিয়া খেয়েছিল তেমনি খাবার। খুব সুস্বাদু হলেও খাবার অন্যরকম বলেই ভালো লাগলো। ফ্রান্সিস চেটেপুটে খেল। খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই সৈন্যদের দলনেতা সেই, বেঁটে বলশালী লোকটা এল। মেস্তিজোর সঙ্গে কী কথা হলো।

মেস্তিজো বলল-'ফ্রান্সিস, চলো. রাজা আমাদের ডেকেছেন। রাজসভায় যেতে

হবে।'

হাত বাঁধা অবস্থাতেই ওরা দলনেতার পেছনে পেছনে চলল। রাস্তার দু—ধারের লোকজন বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে ওদের দেখতে লাগল। রাস্তার পাশ থেকে হঠাৎ একজন পুরুষ ও একজন নারী ছুটে এসে মেস্তিজোকে মাথা নিচু করে দু'হাত বুকে রেখে বোধহয় শ্রদ্ধা জানালো। সৈন্যরা ঐ দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বুঝল, মেস্তিজো রাজপুরোহিতের শিষ্য ছিল। ওকে উনকারা এখনও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু রাজা লুপাকার সৈন্যদের ভয়ে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধা জানাতে সাহস পাচ্ছে না।

রাজবাড়িটা বেশ উঁচু, বড় ও পাথরের তৈরি। পাথরের ছাদ। ওরা রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল। একটু অন্ধকার মতো ভেতরটা। দিনের বেলায়ও পাথুরে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। রক্ষীরা লোহার ছুঁচালোমুখ বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে।

একটু এগোতেই ফ্রান্সিসরা দেখল রাজসভা চলছে। একটা পাথরের সিংহাসনে রাজা লুপাকা বসে আছে। দু'পাশে আরো কয়েকটা পাথরের ছোট আসনে বোধহয় মন্ত্রী গণ্য মান্যরা বসে আছে। রাজা বেঁটে। বয়েস হয়েছে। তবু বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মাথায় লম্বা চুল। কপালে চকচকে কাপড়ের হলুদ রঙের ফেট্টি। তাতে সুন্দর লম্বা লম্বা পালক গোঁজা। দুকানের লতিতে সোনার কাঠি গাঁথা। গায়ে পঞ্চো। তবে পঞ্চোর কাপড় মোটা নয়। পাতলা। মুখের অর্ধেক অংশে লাল রঙ মাখা।

ফ্রান্সিসরা যখন পৌঁছল তখন একটা বিচার চলছিল বোধহয়। রাজা বোধহয় রায় দিল। বিচারপ্রার্থীরা মাথা নুইয়ে বুকে দু'হাত রেখে সম্মান জানিয়ে চলে গেল। দলনেতা মাথা নুইয়ে দু'হাত বুকে রেখে সম্মান জানিয়ে কী বলে গেল। রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস রাজার কঠিন মুখ দেখে আর ধূর্ত চাউনি দেখে বেশ চিন্তায় পড়ল। একে কি বোঝানো যাবে? তবে সোনা মণিমাণিক্যের লোভ বড় সাংঘাতিক। সেই লোভেই রাজা হয়তো ওদের কোনো বিপদে ফেলবে না।

এবার রাজা আর ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। মেস্তিজো দোভাষীর কাজ করতে লাগলো।

রাজা-'তোমরা ভাইকিং?'

ফ্রান্সিস- 'হ্যাঁ।'

রাজা মারিয়াকে দেখিয়ে বললো-'এ কে ?'

ফ্রান্সিস-'রাজকুমারী মারিয়া। আমার স্ত্রী'।

রাজা-'তোমাদের সব কথা শুনলাম। পারবে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে?'

ফ্রান্সিস-'সবকিছু দেখবো আগে, যতটা সম্ভব খবর সংগ্রহ করবো তারপর বলতে পারবো।'

রাজা-'বেশ, দ্যাখো চেষ্টা করে।'

ফ্রান্সিস-'এর জন্যে আমাদের মুক্তি দিতে হবে। সব জায়গায় অবাধে ঘুরতে দিতে হবে।

রাজা-'বেশ, কিন্তু মারিয়াকে রাজপ্রাসাদে রাখা হবে।'কথাটা বলে রাজা মৃদু হাসল। ফ্রান্সিস বুঝল ওরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই মারিয়াকে নজরবন্দী রাখা হবে।

ফ্রান্সিস বলল-'বেশ।'

এবার রাজা মেস্তিজোর দিকে তাকাল। রাগে রাজার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। ভয়ে মেস্তিজো বেশ কাঁপতে লাগল। চিৎকার করে রাজা কী বলে উঠল। একজন রক্ষী ছুটে এসে মেস্তিজোকে ধরল। ভয়ে মেস্তিজো কাঁদতে লাগল। মেস্তিজোকে টেনে হিঁচড়ে রাজার সামনে দাঁড় করানো হলো। আর একজন রক্ষী লম্বা চাবুক হাতে এগিয়ে এল। কোনো সামুদ্রিক মাছের সরু লেজ দিয়ে তৈরি চাবুকটা। চাবুকটার গায়ে ছোট ছোট কাঁটা। নির্মম হাতে চাবুক চালাল মেস্তিজোর গায়ে। মেস্তিজো যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। দেখা গেল পিঠে যেখানে চাবুকের ঘা পড়েছে সে জায়গা থেকে পঞ্চোতে রক্ত ফুটে উঠেছে। রাজা আবার চিৎকার করে কী বলে উঠল। মেস্তিজো বারবার মাথা নোয়াতে লাগল আর মুখে কী বলতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল রাজা মেস্তিজোর কাছে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তির হদিস জানতে চাইছে। আবার চাবুক আছড়ে পড়ার আগেই ফ্রান্সিস ডান হাত তুলে মেস্তিজোর কাছে দাঁড়াল।

আবার রাজা আর ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো।

মেস্তিজো কাঁপা কাঁপা গলায় দোভাষীর কাজ করতে লাগল।

ফ্রান্সিস-'মেস্তিজোকে মুক্তি দিতে হবে।

রাজা-'না, ও স্বর্ণমূর্তির খোঁজ জানে।'

ফ্রান্সিস-'না, ও জানে না। ও যা জানে সব আপনাকে বলেছে।'

রাজা-'না, ওকে মুক্তি দেওয়া হবে না।'

ফ্রান্সিস-'তাহলে স্বর্ণমূর্তির সন্ধান আমরা করবো না। আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।'

রাজা ভুরু কুঁচকে কী ভাবল। তারপর বলল-'যদি মেস্তিজো পালিয়ে যায়?'

ফ্রান্সিস-'ওর দায়িত্ব আমাদের। ও পালিয়ে গেলে আমরা যে কোনো শাস্তি মেনে নেব।'

রাজা লুপাকা ভেবে দেখলো যে ল্লামা মরে গেল, মেস্তিজো এত অত্যাচারেও কিছুই বলতে পারছে না, নিজের অনেক চেষ্টা করেও স্বর্ণমূর্তির হদিস করতে পারেনি-এখন যদি এই ভাইকিংরা হদিস বার করতে পারে তবে করুক না। বিদেশী বিধর্মী এরা। কাজ ফুরুলে মেরে ফেলাও যাবে।

—'বেশ।'রাজা বলল।

—'মেস্তিজো সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে। ওর সাহায্য খুবই প্রয়োজন।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মাথা দু'পাশে নাড়ল। তার মানে সম্মতি দিল।

—'আর একটা কথা।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—'আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ফেরৎ দিতে হবে। মারিয়া তো রাজপ্রাসাদে নজরবন্দী থাকবে। কাজেই আমরা তো আর ওকে ফেলে পালাতে পারবো না।' ফ্রান্সিস বলল। রাজা সম্মতির ভঙ্গি করল।

ফ্রান্সিস আবার বলল-'সারাদিনে মারিয়াকে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে। অবশ্য মারিয়ার সঙ্গে আপনার প্রাসাদরক্ষীরাও থাকবে।'

রাজা সম্মতির ভঙ্গি করল। ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন একজন খুলে দিল।

রাজসভা থেকে ফ্রান্সিসরা চলে এল। মেস্তিজোর পিঠের দিকটা তখনও রক্তে ভেজা। বাইরে এসে ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে ওর কাঁধে ভর দিতে বলল। মেস্তিজো তখনও ভালো করে হাঁটতে পারছে না। ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো, দলনেতাকে বলো যেন তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।' দলনেতা ওদের সামনে সামনে যাচ্ছিল। মেস্তিজো ওকে কাঁপা কাঁপা গলায় সে কথা বলল। দলনেতা কিছু বলল না।

রাজবাড়ির পেছনদিকে ওরা কিছুদূর এল। একটা পাথরের বাড়ির সামনে দলনেতা দাঁড়াল। দরজা খুলে ফ্রান্সিসদের ইশারায় ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা বাড়িটায় ঢুকল। সামনের ঘরটা বেশ খোলামেলা। একপাশে শুকনো ঘাস বিছানো। দলনেতা হাততালি দিল। বাড়ির ভেতর থেকে দু'জন লোক এঘরে ঢুকল। দলনেতা তাদের কী বলল।

মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল-'এই দু'জন আমাদের দেখাশুনা করবে।'

লোক দু'জনে বাড়ির মধ্যে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। হাতে মোটা কাপড়ের কম্বলমতো। সেটা শুকনো ঘাসের গাদার ওপর পেতে দিল। মেস্তিজো বোধহয় জল চাইল। লোক দু'জন চীনে মাটির বড় কুঁজোর মতো নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা প্রায় সকলেই জল খেল। ওরা বিছানায় বসল। মেস্তিজো শুয়ে পড়ল।

এবার দলনেতা মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কী বলল। মেস্তিজো বলল-'মারিয়া, দলনেতা আপনাকে রাজবাড়ির অন্দরমহলে রেখে আসবে। এখন যেতে বলছে।' মারিয়া বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ওর চোখ জলে ভিজে উঠল। মারিয়া বেশ শক্ত মনের মেয়ে। কিন্তু ফ্রান্সিসদের জন্যে ওর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। তাই দেখে ফ্রান্সিস হেসে বলল- 'মারিয়া, আমরা ভাইকিং। আমরা শুধু কব্জির জোরে লড়াই করি না, বুদ্ধির জোরেও লড়াই করি। আমাদের মন খারাপ করো না, যাও। দিনে একবার তো দেখা হবেই।'

মারিয়া কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে বোধহয় ফ্রান্সিসদের কথা ভাবতে ভাবতেই আস্তে আস্তে দলনেতার পেছনে পেছনে চলে গেল। ফ্রান্সিসদেরও মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিস্কো বলল-'চলো ফ্রান্সিস, জাহাজে ফিরে যাই।'

'অসম্ভব,' ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল-'বিস্কো তুমি আমাকে ভালো করেই জানো। তোমরা সবাই চলে গেলেও আমি একা এখানে থাকবো। স্বর্ণমূর্তি খুঁজবো, উদ্ধার

করবো। তারপর ফিরবো।'

'—না-না ফ্রান্সিস, তোমাকে ছেড়ে যাবো না।' - বিস্কো দ্রুত বলে উঠল। শাঙ্কোও বলল- 'আমরা তোমর সঙ্গেই থাকবো।'

ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হলো। ভাবতে লাগল স্বর্ণমূর্তির কথা। কোথায় কীভাবে রাখা হতো সেই মূর্তিটা তা দেখতে হবে। মেস্তিজো শুয়ে আছে। তখনও অল্প অল্প গোঙাচ্ছে।

একটু পরেই একটা রোগা বেঁটেমতো লোক ঘরে ঢুকলো। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। মাথায় হলুদ কাপড়ের পাগড়ি মতো। গলায় নানারঙের পাথরের মালা। লোকটার হাতে একটা চীনেমাটির বোয়াম। বোঝা গেল লোকটা বৈদ্য। বৈদ্য মেস্তিজোর কাছে গেল। পিঠের দিকে পঞ্চো সরিয়ে চাবুকের ক্ষত দেখল। তখনও ক্ষত থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। বৈদ্য বোয়াম থেকে থেকে সবুজ রঙের আঠা আঠা মতো একটা ওষুধ বের করল। আঙুল দিয়ে ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। মেস্তিজো একটু কঁকিয়ে উঠল। তারপর শান্ত হলো। বোধ হয় ব্যাথা জ্বালা একটু কমল। একটা ছোট ন্যাকড়ার পুঁটলি করে চারটে কালো বড়ি বাঁধল। মেস্তিজোকে কী বলল। তারপর চলে গেল।

দু'দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল। মেস্তিজো সুস্থ না হলে কিছুই করার নেই। সেই দু'দিনই মারিয়া এসে ওদের দেখে গেল। সেদিন ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে বলল-'এখন তোমার শরীর কেমন?'

—'অনেকটা ভালো।' মেস্তিজো বলল।

—'আমাদের নিয়ে চিকামায় একটু ঘোরাঘুরি করতে পারবে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'পারবো।'

—'তাহলে আজই চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসরা মেস্তিজোকে সঙ্গে নিয়ে চিকামা দেখতে বেরুল। প্রথমে রাজবাড়ির সামনে এল। রাজবাড়ি ওরা আগেই দেখেছে।

মেস্তিজোকে ফ্রান্সিস বলল-'রক্ষীদের বলো, মারিয়াকে নিয়ে আসতে। মারিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে।' মেস্তিজো একজন দ্বাররক্ষীকে বলল সে কথা। একথাও বলল যে, এটা রাজার হুকুম। রক্ষীটি রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকল। একটু পরেই মারিয়া বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে চলল। পেছনে দু'জন রক্ষীও চলল।

পথে বেশ ভিড়। কিছুদূর আসার পর ডানদিকে একটা উঁচু বেদীমতো দেখা গেল। বেদীটি কাটা। বেদীর ওপরে একটা মূর্তি প্রায় ঢেকে গেছে। বেদীর সামনে এসে ফ্রান্সিস দেখল- মেস্তিজোর গুহাঘরে দেখা সেই কাঠের মূর্তির মতোই এই মূর্তিটা। তবে মেস্তিজোর মূর্তিটা ছিল ছোট। এটা একটু বড়। প্রায় আড়াই তিন ফুট।

মেস্তিজো বলল—'এই আমাদের দেবতা হুয়াকার মূর্তি। তবে এটা আসল সোনার মূর্তি নয়, কাঠের।'

—'মেস্তিজো, মূর্তিটা থেকে ফুলপাতা সরিয়ে দাও।' ফ্রান্সিস বলল। 'ভালো করে দেখি।

মেস্তিজো বেদীর মসৃণ সিঁড়ি বেয়ে উঠল। মূর্তিটা থেকে ফুলপাতা সরাল। সিঁড়িতেও ছড়িয়ে আছে ফুলপাতা। ফ্রান্সিস মূর্তিটা ভালো করে দেখল। সত্যি, এত সুন্দর রঙ ব্যবহার করা হয়েছে যে মনে হচ্ছে সোনার মূর্তি। সিঁড়িতে বেদীতে পাথর কুঁদে কুঁদে ফুল লতাপাতার কাজ করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো, এখানকার কারুকাজ কি তোমরা করেছো?'

—'না, রাজা কোলা নিজেই এই কারুকাজ করেছেন। রাজা কোলার আর একটা পাথরের কাজ দেখ।' মেস্তিজো সামনে আঙুল তুলে দেখাল। দেখা গেল একটা বিরাট পাথরের মাথা। একটা ছোটখাটো আস্ত পাহাড় কেটে খুঁদে কুঁদে ঐ মাথাটা তৈরি করা হয়েছে।

মেস্তিজো বলল-'এই মাথাটা পাথর কেটে আমরা তৈরি করেছি-রাজা কোলা, গুরুদেব ল্লামা আর আমি।

—'দেবরক্ষীর মাথা।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস বলল-'দেবরক্ষীরও পুজো হয় নাকি?'

—'হ্যাঁ, হুয়াকা দেবতার সঙ্গে দেবরক্ষীরও পুজো হয়।' মেস্তিজো বলল।

—'অত উঁচুতে লোক ওঠে কি করে? ফ্রান্সিস বলল।

—'অনেক উঁচু একটা কাঠের মই আছে।'

'সেটা বেয়ে সবাই ওঠে। ফুলপাতা দিয়ে পুজো করে। আমরাও পাথর কেটে
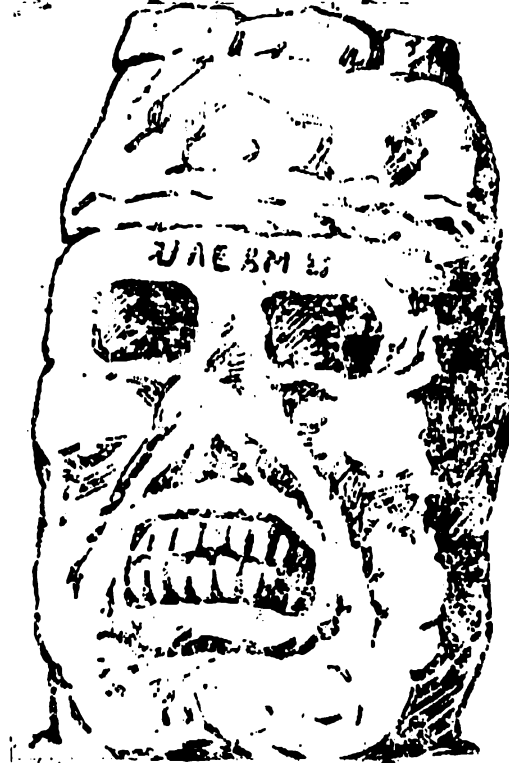
তৈরি করার সময় ঐ মইটা ব্যবহার করতাম।' মেস্তিজো বলল। ফ্রান্সিসরা স্বর্ণমূর্তির পাথরের বেদীতে ফুল-লতাপাতা, পাখির কাজ, দেবরক্ষীর মাথা সব দেখতে লাগল। সত্যি দুটোই দেখতে খুব সুন্দর। রাজা কোলা যে একজন দক্ষ ভাস্কর ছিলেন এসব দেখে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সব দেখেশুনে ফ্রান্সিসরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। মারিয়াকে নিয়ে রাজবাড়িতে চলে গেল।

দিন সাতেক কাটল। প্রায় প্রত্যেকদিনই ফ্রান্সিস মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তি দেবরক্ষীর মাথা দেখতে যায়। ঘুরে ফিরে দেখে। কিন্তু আসল স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কোনো সূত্র পায় না। শাঙ্কোর কাছে এসব একঘেয়ে লাগে। ও তাই দুপুরের খাওয়া সেরেই তীরধনুক নিয়ে পাখি খরগোশ শোল শিকার করতে বেরিয়ে যায়। ডানদিকের সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ওপারেই বনজঙ্গল শুরু হয়েছে। খুব গভীর বন নয়। তবে গাছপালা প্রচুর। ঐ বনজঙ্গলেই শাঙ্কো শিকার করতে যায়।

এর মধ্যে রাজা লুপাকা ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠিয়েছিল। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবে কি না। পারলে কবে নাগাদ পারবে এসব জিজ্ঞেস করেছিল। মেস্তিজোর মারফৎ ফ্রান্সিস বলেছে—'খোঁজ খবর করছি। কোনো সূত্র এখনও পাইনি। তবে বেশিদিন লাগবে না।'

সেদিনও শাঙ্কো তীরধনুক নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল দুপুরে খেয়ে দেয়ে। বিকেল হয়ে গেল তখনও ফিরল না। ফ্রান্সিস আর বিস্কো ভাবল শাঙ্কো বোধহয় বেশি শিকার পেয়েছে তাই আসতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যে হলো। রাত হলো শাঙ্কো ফিরল না। এবার ফ্রান্সিস আর বিস্কো চিন্তায় পরল।

ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে বলল-'শাঙ্কো এখনও শিকার থেকে ফিরল না, কী ব্যাপার বলো তো?'

-'ঐ তিতিকাকা জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী নেই। তবে বিষধর সাপ আছে। শাঙ্কোকে কি সাপেই কামড়াল নাকি, ঠিক বুঝতে পারছি না।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে ছিল। ভাবল, এভাবে অপেক্ষা করে দুশ্চিন্তাই বাড়বে শুধু। ঐ বনে-জঙ্গলে গিয়েই শাঙ্কোর খোঁজ করা ভাল। ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ডাকল-'বিস্কো অস্ত্র নাও। শাঙ্কোর খোঁজে যাবো।' বিস্কো দেয়ালের খাঁজে রাখা তরোয়ালটা নিল। ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে নিজেদের তরোয়াল বার করল। বলল-'মেস্তিজো, তুমি আমাদের সবার সামনে চলো।'

তিনজন ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের দিকে চলল। মেস্তিজো সবার সামনে চলল। হাতে জ্বলন্ত মশাল। পাহাড় পেরিয়ে ওপাশে নামল। জঙ্গলে ঢুকল। খুব নিবিড় বন নয়। গাছপালা লতাগাছ এসব বেশ ছাড়া ছাড়া। ওরা মশালের আলোয় গাছপালার মধ্যে গিয়ে চলল বনে পথ বলে কিছু নেই। বেশ কিছুটা এল। কিন্তু ফ্রান্সিস ভেবে পেল না এই রাতের বেলা বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় শাঙ্কোকে খুঁজবে। তবু দু'হাতে তালু মুখের সামনে গোল করে চিৎকার করে ডাকল-- 'শাঙ্কো-শাঙ্কো।'কিন্তু নির্জন বনভূমিতে কোনো উত্তর ভেসে এল না। শুধু একটা পাখির দল কিচ্‌মিচ্‌ করে উঠল। রাতজাগা পাখিরা ডানা ঝাপটাল। বিস্কোও একইভাবে চিৎকার করে বলল-- 'শাঙ্কো, আমরা এসেছি। তোমার কোনো ভয় নেই। শাঙ্কো-ও।' কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। ওরা এগোতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের কানে এল শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ। ও থমকে দাঁড়াল। তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল-'বিস্কো, সাবধান।' ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই ওদের চারদিকে শুকনো পাতা ভেঙে কারা ছুটে এল। ওদের চারপাশে ঘিরে

দাঁড়াল একদল যোদ্ধা। তাদের হাতে উদ্যত বর্শা। মেস্তিজো যোদ্ধাদের মশালের আলোতে দেখেই চিৎকার করে কী বলে উঠল উনকা ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা বর্শা নামাল। সবাই মাথা নিচু করে মেস্তিজোকে সম্মান জানাল। মেস্তিজো বলল- 'ফ্রান্সিস, আপনারা যুদ্ধ করবেন না। এরা আমাদের বন্ধু। এরা উনকা সৈন্য। রাজা কোলার সৈন্যবাহিনীর সৈন্য। যুদ্ধে পরাজয়ের পর এরা এই তিতিকাকা জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে।'

ফ্রান্সিস আর বিস্কো তরোয়াল খুলল না আর। যোদ্ধাদের মাথায় কালো কাপড়ের ফেট্টি। তাতে পাখির পালক গোঁজা। মুখের দুপাশে লাল রঙ লাগানো। ওদের দলনেতা এগিয়ে এল মেস্তিজোর সামনে। মেস্তিজোর সঙ্গে দলনেতা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর মেস্তিজো ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল-'শাঙ্কোকে এরা রাজা লুপাকার গুপ্তচর ভেবে বন্দী করে রেখেছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। শাঙ্কো ভালো আছে।'

' শাঙ্কোকে ওরা যেখানে রেখেছে সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে বলো।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো দলনেতাকে বলল সে কথা। দলনেতা মাথা ঝাঁকাল। কী বলল। তারপর গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলল। মেস্তিজো বলল-'চলুন ওদের পিছনে পিছনে। একটু পরে মশালের আলোয় দেখা গেল বনভূমির গাছপালা পাতলা হয়ে এসেছে। সামনে গাছপালার আড়ালে একটা লম্বাটে বাড়ি দেখা গেল। পেইকো ঘাসের ছাউনি। কাঠ পাথর মিলিয়ে বাড়িটা নতুন তৈরি হয়েছে। বাড়িটার পরেই একটা বড় হ্রদ বেশ বড়। হ্রদের জলে মৃদু ঢেউ।

সবাই বাড়িটার সামনে এল। বর্শা হাতে চারজন উনকা যোদ্ধা এগিয়ে এল। মেস্তিজোকে দেখে তারাও মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। ফ্রান্সিস বুঝল উনকা রাজপুরোহিতের শিষ্য বলে মেস্তিজোকে শ্রদ্ধা করে, ভালোওবাসে। দলনেতা রক্ষী যোদ্ধাদের কী বলল। ওরা চলে গেল। দলনেতার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা এসে বাড়িটার সামনে উঠোনে দাঁড়াল। দলনেতা একটা লম্বা ঘর দেখিয়ে মেস্তিজোকে কি বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল-'আপনাদের এই ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।' ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। লম্বাটে ঘর। কাঠ আর পাথরের দেয়াল। ঘরের দু'পাশের দেয়ালে দুটো বাতি জ্বলছে। তার আলোয় দেখা গেল সারা ঘর জুড়ে শুকনো ঘাসের বিছানা। তাতে মোটা কম্বলমতো পাতা। প্রায় আট-দশজন উনকা যোদ্ধা তাতে শুয়ে বসে আছে। ফ্রান্সিসরা এতটা হেঁটে তখন বেশ ক্লান্ত ওরাও বিছানায় বসল। ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে অনেকগুলো বর্শা।

একটু পরেই শাঙ্কো হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। ওর কাঁধে তীর ধনুক। ও ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। শাঙ্কোকে সুস্থ দেহে দেখে বন্ধুরা খুশি হলো।

-'এখানে তোমার ওপর কোনো অত্যাচার করা হয়নি তো? ফ্রান্সিস বলল।

-' না-না। এরা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। কারণ ধরা পড়ার পর আমি বারবার মেস্তিজোর নামটা বলেছি। তাতেই দেখলাম ওরা আমাকে বিশ্বাস করল।' শাঙ্কো তীর ধনুক রেখে বিছানায় এসে বসল। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে লাগল।

বিস্কো বলল-'ফ্রান্সিস, স্বর্ণমূর্তি-বেদী,-- দেবরক্ষীর মাথা সব তো দেখলে। আসল স্বর্ণমূর্তির কোনো হদিস করতে পারলে?'

—'এখনই কিছু বলতে পারছি না। সব বার বার ভালভাবে দেখতে হবে। সূত্র একটা পাবোই। ফ্রান্সিস বলল। ওরা কথাবার্তা বলছে। তখনই মেস্তিজো ঢুকল। ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। বলল--'ফ্রান্সিস-এরা তোমাদের আজকে রাতে এখানে অতিথি হিসেবে থাকতে অনুরোধ করেছে।' ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল। বিস্কো বলল-- 'রাতে তো আমাদের কোনো কাজ নেই। থাকি না এখানে। একটা রাতই তো'। ফ্রান্সিস মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে বলল-- বেশ। বন্ধুরা যখন বলছে।'

—'উনকা যোদ্ধারা খুব খুশি হবে। যাক ওদের কথাটা বলে আসি।' মেস্তিজো চলে গেল।

রাত বাড়ল। একসময় একজন উনকা যোদ্ধা এসে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের রাতের খাওয়া খেতে ডাকল। ফ্রান্সিসরা ঘরের বাইরে এল। লম্বাটে ঘরের সামনে উঠোনে দেখল তিনকোণা পাতা পেতে দেওয়া হয়েছে। যোদ্ধারা খেতে বসছে পাতার সামনে। ওরাও খেতে বসল। ফ্রান্সিস দেখল উনকা সৈন্যরা সংখ্যায় একশ'রও বেশি। খেতে দেওয়া হলো সেই বীন আলুর তরকারি। ক্যারোপটা বীনের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রুটি, সামুদ্রিক মাছের ঘন ঝোলমতো। ওরা খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছিল বেশ।

সবারই খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। ফ্রান্সিসরা আগের ঘরে এসে বিছানায় বসল। অন্য যোদ্ধারাও এসে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা এই উনকা ভাষার বিন্দুবিসর্গ বুঝল না। তবে মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তার মধ্যে লুপাকার নাম ওরা শুনছিল।

কিছুক্ষণ পরে মেস্তিজো এল। পেছনে সেই দলনেতা ওরা দু'জনে ফ্রান্সিসের কাছে এসে বসল। মেস্তিজো দলনেতাকে দেখিয়ে ফ্রান্সিসকে বলল,-'ওরা বলছিল তোমরা কী বলতে চাইছো। ফ্রান্সিস, মেস্তাজো বলল-'তোমরা ভাইকিং। তোমাদের শৌর্যবীর্যের কথা খুব ছেলেবেলায় আমি শুনেছি। তাই আমিও চাই তোমরা এদের সাহায্য কর। তোমাদের সাহায্য পেলে ওদের সাফল্য সুনিশ্চিত।'

'কীভাবে সাহায্য পেলে ওদের সাফল্য সুনিশ্চিত।'

'কীভাবে সাহায্য করবো সেটা সেটা বলো।' ফ্রান্সিস বলল।

'এই উনকা যোদ্ধাদের এই তিতিকাকা বনে আশ্রয় নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সব উনকা যুবকদের একত্রিত করছে। শক্তি সংগ্রহ করে ওরা কিছুদিন পরেই রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যে করেই হোক, ওরা উনকাদের রাজ্য থেকে সৈন্যসহ রাজা লুপাকাকে তাড়াবে। এটাই ওদের প্রতিজ্ঞা। দেশ ও জাতিকে যে করেই হোক শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবে। সেইজন্য ওরা তোমাদের সাহায্য চায়।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল ব্যাপারটা। হ্যারি থাকলে ভালো হতো। ওর পরামর্শ নেওয়া যেত। ফ্রান্সিসকে একাই ভাবতে হলো সব। ভেবে নিয়ে ও বলল-- 'তার মানে ওরা চাইছে আমরা যেন ওদের দলে যোগ দিই, রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে

লড়াইয়ে নামি।'

-- 'হ্যাঁ, তোমাদের সাহায্যে উনকাদের রাজ্য জয় করতে পারলে ওরা তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস বলল-- 'কিন্তু মেস্তিজো-- রাজা লুপাকা তো কখনও আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। অবশ্য গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের পর রাজা লুপাকা অন্য চেহারা নিতে পারে। এমনকি আমাদের হত্যাও করতে পারে। আমি সেটা ভালো করেই জানি। রাজা লুপাকা অসৎ ও লোভী। তবু এখনও তো ও আমাদের বিপদে ফেলেনি। কাজেই আমরা কেন রাজা লুপাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে যাবো। এসব তোমাদের ব্যাপার। তোমরা মিটিয়ে নাও।'

--'তাহলে তোমরা এদের সাহায্য করবে না?' মেস্তিজো বেশ মনঃক্ষুন্ন হয়ে বলল।

'--না, এই অবস্থায় পারবো না। তাছাড়া ভেবে দেখ, মারিয়া এখন রাজা লুপকার হাতের মুঠোয়। মারিয়া বন্দিনী। আমরা যুদ্ধে উনকাদের সাহায্য করছি, এ সংবাদ রাজা লুপাকা পাবেই। তখন মারিয়ার জীবন বিপন্ন হতে পারে। সবদিক ভেবে বলছি এখন, আমাদের এসব ব্যাপারে না জড়ানোই ভালো।' ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

মেস্তিজো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল-'আজ হোক, কাল হোক -- লড়াই হবেই।'

মেস্তিজোর এই দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনে খুশি হল। যে কোন কাজে দৃঢ় মনোবল বজায় রাখা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে জেতার মনোভাব এটা ফ্রান্সিস খুবই পছন্দ করে, ঘাসের বিছানায় শুতে শুতে ফ্রান্সিস বলল-- মেস্তিজো তোমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে কিন্তু ভাবছি এত অল্প সৈন্য নিয়ে চিমু সেনাবাহিনীর সঙ্গে তোমরা কতদিন লড়াই চালাতে পারবে? মেস্তিজো বলল-'ফ্রান্সিস তোমাকে একটা কথা এখনও জানাইনি। কথাটা খুবই গোপনীয়। তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি-- রাজা কোলার যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র পিসকোজকে যুদ্ধক্ষেত্রেই পিতার মৃত্যুসংবাদ জানানো হল। পিসকোজ বুঝল, এখন পশ্চাদপসরণ আর আত্মরক্ষা ছাড়া উপায় নেই। পরাজয় সুনিশ্চিত কয়েকজন বিশ্বস্ত সহরক্ষীকে নিয়ে পিসকোজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালালো চাঙিনের দিকে। বেশ কিছুদিন রাজপুত্রের কোন সংবাদ কেউ জানতো না। মাত্র মাসখানেক আগে রাজপুত্র পিসকোজ এই তিতিকাকা আস্তানায় খবর পাঠিয়েছে সে সুস্থ আছে। চাঙিনের জঙ্গলে আত্মগোপন করে ঐ পাহাড়ি এলাকার উপজাতিদের একত্র করছে।. সেখানে অস্ত্র তৈরি করে উপজাতিদের সুশিক্ষিত সৈন্য হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানেও সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজপুত্র পিসকোজ এখানে সংবাদ পাঠিয়েছে সে যখন রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করতে বলবে তখনই আক্রমণ শুরু করতে হবে। তার আগে সবাইকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে তিতিকাকার জঙ্গলে, চাঙিনের জঙ্গলে। রাজা লুপাকার গুপ্তচররা যেন তাদের হদিশও না পায়। একটু থেমে মেস্তিজো বলল-বুঝলে ফ্রান্সিস চিকামার মানুষেরা পিসকোজকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করে। নিরুদ্দিষ্ট রাজপুত্র যদি উনকা সৈন্যদের সামনে এসে আত্মপ্রকাশ করে তবে তাদের মনোবল হাজারগুণ বেড়ে যাবে। সেই শেষ লড়াইয়ে আমরা জিতবোই। রাজা লুপাকাকে এ দেশ ছেড়ে

পালাতেই হবে।

'--মেস্তিজো আমিও চাই-তোমরা স্বাধীনতা ফিরে পাও।' ফ্রান্সিস বলল।

রাত বাড়ল। ফান্সিসরা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও তখন ভাবছে-- গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করা যাবে কি? কোনো সূত্রই তো পাচ্ছি না। এখানে বেশিদিন থাকাও চলবে না। দেরি দেখে হয়তো বন্ধুরা এসে হাজির হবে। আবার স্বর্ণমূর্তির সন্ধান করতে ওরা ব্যর্থ হলে লোভী রাজা লুপাকা কি চেহারা ধরে কে জানে? হয়তো ওদেরও মারিয়ার মতো বন্দী করে রাখতে পারে।এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালেই ওরা চিকামায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। আসার সময় দলনেতা ফ্রান্সিসকে বেশ সুন্দর ফুল-পাতার কাজ করা একটা পঞ্চো উপহার দিল। ফ্রান্সিস খুব খুশি হলো। বারবার বলল- 'ধন্যবাদ'। মেস্তিজো কথাটা বুঝিয়ে বলল দলনেতাকে। দলনেতা হাসল।

বিকেলে মারিয়া একা। সঙ্গে সেই দু'জন চিমু পাহারাদার সৈন্য। মেস্তিজো সারা দুপুর টানা ঘুমিয়ে তখনই উঠল। আড়মুড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলল-'যাবে নাকিহুয়াকার উৎসবে'?

--'কোথায় হবে'? বিস্কো জানতে চাইল।

--'ঐ হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তির বেদীর সামনে। নাচ গান হবে। রাজা লুপাকা ও রানী দুজনেই নাকি আসবে। রাজা লুপাকা এখন চেষ্টা করছে উনকাদের মন জয় করতে। যাবে তোমরা?

মারিয়া খুশির চোটে হাততালি দিল। বলল--'ফ্রান্সিস, চলো না।'

'--যাবে তো! কিন্তু লুপাকা কি তোমাকে ওখানে যাবার অনুমতি দেবে?'

ফ্রান্সিস বলল।

--'কেন দেবে না? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।' মারিয়া বলল

--'ঠিক আছে। মেস্তিজো কখন আরম্ভ হবে উৎসব?'' ফ্রান্সিস বলল।

--'একটু রাতে। আমরা খেয়ে-দেয়ে যাবো। উৎসব বেশ কিছুক্ষণ চলবে।' মেস্তিজো বলল

--'তাহলে এক কাজ করো মেস্তিজো। তুমি মারিয়াকে নিয়ে রাজা লুপাকার কাছে যাও। রাজাকে বলো যেন মারিয়াকে উৎসবে যেতে অনুমতি দেয়। অবশ্য সঙ্গে পাহরাদার থাকবে।' ফ্রান্সিস বলল।

--'দেখি বলে।' মেস্তিজো ঘাসের বিছানা ছেড়ে উঠল। মারিয়াকে নিয়ে রাজবাড়িতে গেল।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই মেস্তিজো ফিরে এল মারিয়াকে নিয়ে। সঙ্গে সেই দু'জন চিমু পাহারাদার। হেসে বলল--'রাজা লুপাকার মেজাজ এখন খুব ভালো। চিকামার গন্যমান্য উনকারা নাকি দল বেঁধে রাজারানীকে উৎসবে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেছে। কাজেই অনুমতি বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেছে।'

রাতের খাওয়া-দাওয়া সারল ফ্রান্সিসরা। মারিয়া পাহারাদার সৈন্য দু'জনও ওদের সঙ্গে খেল।

একটু রাত হতেই সবাই চলল উৎসবের প্রাঙ্গণের দিকে। ফ্রান্সিস উপহার পাওয়া পঞ্চো পরল। মারিয়া তাই দেখে হাসতে লাগল।

হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তির বেদীর সামনের প্রাঙ্গনে উৎসবের আয়োজন হয়েছে। দেবতার পূজো দুপুরবেলাই হয়ে গেছে। স্বর্ণমূর্তির অর্থাৎ কাঠের মূর্তি ফুলে পাতায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। বেদীতেও ফুলপাতার স্তূপ। প্রাঙ্গনের চারিদিকে মশাল জ্বলছে। উৎসব প্রাঙ্গন আলোয় আলোময়। প্রাঙ্গনের চারপাশ বহু নারী-পুরুষ-শিশুরা জড়ো হয়েছে। গাছের গুঁড়ি কুরে তার মুখে ভেড়ার চামড়া আটকে বাজনা তৈরি করা হয়েছে। সেটাই একজন দমাদম বাজাচ্ছে। কচ্ছপের নাড়ি দিয়ে তৈরী বাজনা আর একজন বাজাচ্ছে। টানা টানা সুরের বাজনা।

একটু পরেই দুটো পাহাড়ী ঘোড়ায় চেপে রাজা লুপাকা আর রানী এল। সামনে পেছনে রাজার দেহরক্ষীরা। দু'জনেই বেশ সেজেগুজে এসেছে। রাজার মাথায় মোটা করে হলুদ ফেট্টি বাঁধা। তাতে একটা ধবধবে সাদা পাখির লম্বা পালক। রানীর ঢিলেঢালা পোশাকে কাচের চুকরো বসানো। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে সেসব। উপস্থিত উনকারা কেউ কিন্তু রাজারানীর জয়ধ্বনি করল না। শুধু তাকিয়ে দেখল। শুধু উপস্থিত চিমু সৈন্যরা হাতের বর্শা আকাশের দিকে তুলে কী বলল সমস্বরে চিৎকার করে। বোধহয় রাজা লুপাকা ও রানীর জয় ঘোষণা করল।

দেবরক্ষী মূর্তি সেই মাথাটার নিচেই পাথরের আসন। রাজারানী ঘোড়া থেকে নেমে এই আসনে বসল। শুরু হলো বাজনা। খুব সেজেগুজে একদল উনকা মেয়ে প্রাঙ্গনে ঢুকল। তাদের গায়ে উজ্জ্বল সুতোর নক্সা আঁকা ঢিলেঢালা পঞ্চো। মাথার বিনুনিতে নানা রঙের ফুল গোঁজা। মাথায় কপালে লাল মোটা ফেট্টি বাঁধা। তাতে নানা রঙের পাখির পালক। বাজনার তালে তালে শুরু হলো মেয়েদের নাচ। নাচের সঙ্গে বেশ চড়া সুরে মেয়েরা গানও গাইতে লাগল। ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। দর্শকরা চিৎকার করে তাদের উৎসাহিত করতে লাগল।

নাচগান থামল। রানী হাত তুলে আবার নাচিয়েদের নাচগান করতে নির্দেশ দিল। আবার বাজনা বেজে উঠল। শুরু হলো নাচ আর সেইসঙ্গে গান। সেই গান উনকা ভাষার গান। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল--'এটা হচ্ছে হুয়াকা দেবতাকে বন্দনার গান।' নাচগান চলল কিছুক্ষণ। দর্শকরা নাচিয়েদের দিকে ফুল ছুঁড়ে দিতে লাগল। চিৎকার করে উনকা ভাষায় কী বলতে লাগল। বোধহয় নাচিয়েদের বাহবা দিতে লাগল।

নাচ গান শেষ হলো। বাজনা বন্ধ হলো। গোলমাল থামতে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি তরুণ নাচিয়ে মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়াল। দর্শকরা অবাক। তরুণটির মুখ মশালের আলোয় উজ্জ্বল। উত্তেজনায় তরুণটির ঠোঁটদুটো কাঁপছে। তরুণটি মুখের কাছে হাতের চেটো গোল করে চিৎকার করে কী বলে উঠল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'সর্বনাশ।' ছেলেটি রাজা কোলার জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ও বিপদে পড়বে। তারপরেই তরুণটি তীক্ষ্ণস্বরে একটা গান ধরল। মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য জাগল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'ছেলেটি রাজা কোলার গুণকীর্তন করে গান গাইছে উনকারা সবাই এই গান জানে।' সত্যিই দেখা গেল সব দর্শকরা-বেশির ভাগই

উনকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তরুণটির গানের সঙ্গে ততক্ষণে গলা মিলিয়েছে নাচিয়ে উনকা মেয়েরাও। আস্তে আস্তে উপস্থিত প্রায় সব দর্শকরা সেই গানের সঙ্গে গলা মেলাল।

ওদিকে রাজা লুপাকা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, রানীও। রাগে রাজা লুপাকার মুখ লাল হয়ে গেছে। তার চিরশত্রু রাজা কোলার গুনগান গাইছে তারই সামনে। রাজা চিৎকার করে কী বলে উঠল। চিমু সৈন্যরা বর্শা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল উনকাদের ওপর। উনকাদের মুখের গান বন্ধ হয়ে গেল। গান থামিয়ে নাচিয়ে মেয়েরাও প্রাঙ্গণ থেকে পালাল। দর্শকদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হলো। শুধু সেই তরুণটি একা তখনও গান গেয়ে চলেছে। রাজা লুপাকা তার দেহরক্ষীর একজনকে ইঙ্গিত করল। রক্ষীটি ছুটে এসে তরুণটির বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিল। তরুণটি উবু হয়ে উৎসব প্রাঙ্গণে পড়ে গেল। গান বন্ধ হয়ে গেল। কয়েকবার নড়ে ওর দেহটা স্থির হয়ে গেল।

শাঙ্কো অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল-'ইস, সঙ্গে যদি তীর ধনুকটা থাকতো ঐ দেহরক্ষীটাকে এক্ষুনি নিকেশ করতাম।' ওদিকে লোকজন সব ছোটাছুটি করে এদিক ওদিক পালাতে শুরু করেছে। চিমু সৈন্যদের বর্শার ঘায়ে কিছু লোক জখমও হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই প্রাঙ্গণ জনশূন্য হয়ে গেল। আহত লোকদের আর্ত চিৎকার শোনা যেতে লাগল।

ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে বলল-'শিগগির তোমাদের কোনো বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে এসো। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।' ফ্রান্সিস, বিস্কো আর শাঙ্কো আহত লোকজনদের ধরাধরি করে প্রাঙ্গণের একধারে এনে শুইয়ে দিল। মারিয়া নিজেদের ঢোলা পোশাক থেকে কাপড় ছিঁড়ে আহতদের ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে লাগল। তাতে কারো ক্ষতস্থান থেকে রক্তঝরা বন্ধ হলো। একটু পরেই মেস্তিজো একজন বৈদ্যকে নিয়ে এল। সে তার ঝোলা থেকে ওষুধ বের করে আহতদের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস ডেকে বলল-'মারিয়া, এবার চলো আমাদের আর কিছু করার নেই।

ফ্রান্সিসরা ফিরে এল। মেস্তিজো আহতদের দেখাশুনো করার জন্যে থেকে গেল। বিশেষ করে মৃত তরুণটির সৎকারের জন্যেই মেস্তিজোকে ফ্রান্সিস থাকতে বলল। ফেরার পথে ফ্রান্সিসের বারবার সেই উদ্দীপ্তমুখ গাইয়ে তরুণটির কথা মনে পড়তে লাগল। ওর মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল।

তারপর কয়েকদিন কাটল। ওদিকে জাহাজে ফেরার তাগিদ রয়েছে। ফ্রান্সিসদের ফিরতে দেরি হলে হয়তো বন্ধুরা এসে হাজির হবে।

সেদিন বিকেলের দিকে মারিয়া ফ্রান্সিসদের আস্তানায় এল। সঙ্গে দু'জন রক্ষীও এল। মারিয়া বলল-'ফ্রান্সিস্, চলো বেড়িয়ে আসি।' বিস্কো আর শাঙ্কো বলল- চলো আমরাও যাবো।' মেস্তিজোও ওদের সঙ্গী হলো। চিকামার রাস্তা দিয়ে চলল ওরা আর দুজন চিমু সৈন্যরা, চিকামার অধিবাসীরা ওদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এই ভিনদেশি মানুষগুলো বিশেষ করে ঐ মেয়েটি অর্থাৎ মারিয়া যে কেন এখানে এসেছে, কেন এখনো আছে তাই ওরা ভেবে পেল না।

হুয়াকা দেবতার সেই কাঠের নকল মূর্তি বেদীর কাছে ওরা পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। ওরা দেখল নকল মূর্তির তেমনি ফুলপাতায় প্রায় চাপা পড়ে গেছে। চিকামার উনকা লোকেরা আসছে ফুলপাতা হাতে। পুজো দিচ্ছে। ফুলপাতা দিচ্ছে

মূর্তিতে। বেদীও ঢেকে গেছে ফুলপাতায়। কিছু লোক আবার বিরাট উঁচু কাঠের মই বেয়ে উঠে দেবরক্ষীর মাথায় গলায় ফুলপাতা ছুঁড়ে দিচ্ছে। অত উঁচু মইটা বোধহয় পূজো দেবার সুবিধের জন্যেই এখন লাগানো হয়েছে।

ফ্রান্সিস ভাবল—হুয়াকার মূর্তিটা তো কাছে থেকে দেখছি কিন্তু দেবরক্ষীর মূর্তিটা ভালো করে দেখা হয়নি। কারণ তখন মইটা ছিল না। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তোমরা অপেক্ষা কর। দেবরক্ষীর মাথাটা কাছে থেকে দেখে আসছি।'

ফ্রান্সিস কাঠের সেই অনেক উঁচু মইটার কাছে গেল। তারপর ওপর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মইটা বেয়ে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে মূর্তির মুখের কাছে এল। মোটা ঠোঁট দাঁত পেরলো। নাক ছাড়ালো। চোখ দুটো পুরো গোল নয়। কেমন চৌকো মতো। চোখ দুটো পার হলো। কপাল পার হলো। উঠে এল মাথার উষ্ণীষের কাছে। এতক্ষণ গলা মুখ চোখ নাক চোখ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এসেছে। কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কিছুই দেখতে পেল না। দেবরক্ষীর উষ্ণীষের ওপর নামল ফ্রান্সিস। চারদিকে তাকিয়ে দেখল। বিকেলের নরম আলোয় অনেকদূর দেখা যাচ্ছে। চিকামার রাজবাড়ি বাড়িঘর রাস্তা তিতিকাকা বন দূরে সমুদ্রের দিকে পাহাড়ের সারি সব দেখা গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে হুয়াকার মূর্তি বেদী পূজার্থী ও মারিয়াদের দেখল। ফ্রান্সিস মনে মনে রাজা কোলার প্রশংসা করল। একটা ছোট পাহাড় কেটে এইরকম মুর্তির মাথা তৈরি করা শুধু পরিশ্রমের কাজই নয় সেইসঙ্গে শিল্পবোধও থাকা চাই।

এবার ফ্রান্সিস নামবার জন্যে মইয়ে পা রাখল। তারপর আস্তে আস্তে নামতে লাগল। উষ্ণীষ পার হলো। যখন মূর্তিটার কপালের কাছে এল তখনই মূর্তিটার কপালের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস থমকে দাঁড়াল। কপালে কী যেন কুঁদে আঁকা। ও প্রথমে ভাবল হয়তো কপালের কোনো অলঙ্কার। ভালো করে দেখলো। সন্দেহ হলো। অলঙ্কার নয়-কী যেন পাথর কুঁদে লেখা। বিদ্যুৎচমকের মতো হঠাৎ ওর মনে পড়ল রাজপুরোহিত ল্লামার শেষ কথাটা-রাজা কোলা যে কথাটা বলেছিলেন-'সবই ললাটের লিখন।' তাহলে তো এই মূর্তিটার কপালে নিশ্চয়ই কিছু লেখা আছে। এই লেখাটা তো তাহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কী লেখা আছে কপালে?

ফ্রান্সিস দ্রুত নেমে এল মই বেয়ে। ফ্রান্সিসকে এভাবে দ্রুত নেমে আসতে দেখে মারিয়া সবাই বেশ আশ্চর্য হলো। কী হলো ফ্রান্সিসের? নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে।

ফ্রান্সিস মই থেকে নেমে মেস্তিজোর কাছে ছুটে এল। বলল—' মেস্তিজো, রাজা কোলা বলেছিলেন 'সবই ললাটের লিখন।' তাই কিনা?'

—'হ্যাঁ। মেস্তিজো বলল। কিন্তু ফ্রান্সিস এই কথাটা বলেছে কেন ও ঠিক বুঝল না। কথাটার এত গুরুত্বই বা দিচ্ছে কেন।

—'তোমার গুরুদেব রাজপুরোহিতও এই কথাটাই বলেছিল সবই ললাটের লিখন। তাই কিনা?'

'—হ্যাঁ।'

—'চলো মই বেয়ে উঠতে হবে। এসো তাড়াতাড়ি।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসের এই পাগলামির কারণ বুঝল না। তবু ফ্রান্সিসের কথামতো মইয়ের কাছে এল। দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস উঠতে উঠতে বলল—'মেস্তিজো,

তুমি, তোমার গুরুদেব রাজপুরোহিত আর রাজা কোলা মিলে এই মূর্তিটা বানিয়েছিলে। পাথর কুঁদে।'

—'হ্যাঁ।' মেস্তিজো বলল- 'তবে বলতে পারো রাজা কোলার কৃতিত্বই বেশি। সমস্ত পরিকল্পনাটাই রাজা কোলার। উনিই পাথর কেটেছেন কুঁদেছেন আমরা শুধু পাথর মসৃণ করেছি।'

দেবরক্ষীর কপালের কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—'ললাটের লিখন মানে কপালের লেখা।' এবার মূর্তির কপালের সেই লেখাগুলো দেখাল। 'বলো তো ওগুলো কী লেখা?' মেস্তিজো লেখাগুলো দেখল। লেখাগুলো দেখতে এমনি—

(০৪৮১২১৬)

মেস্তিজো মনোযোগ দিয়ে লেখাগুলো দেখে বলল-'এগুলো কোনো লেখা নয়। পর পর কয়েকটা উনকা ভাষায় অঙ্কের সংখ্যা কুঁদে লেখা। আমার মনে হয় রাজা কোলা এগুলো পরে কুঁদে লিখেছিলেন।'

—'বলো তো সংখ্যাগুলো কী?'ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো পড়ে পড়ে বলল-০ ৪ ৮ ১২ ১৬। ফ্রান্সিস আশা করেছিল লুকানো স্বর্ণমূর্তির সম্বন্ধে কোনো সাঙ্কেতিক লেখা। এখন বুঝল এগুলো অঙ্ক। একটু হতাশই হলো। তবু অঙ্কগুলো মনে মনে মুখস্থ করল। বলল-'আর কিছু লেখা নেই?'

—'না। কিন্তু এই অঙ্কগুলো দিয়ে তোমার কী হবে?' মেস্তিজো বলল।

—'হবে হবে। তবে অনেক ভাবতে হবে এই অঙ্কগুলো নিয়ে। তবেই রহস্য ভেদ করা যাবে। রাজা কোলা যখন নিজে এই অঙ্কগুলো কুঁদে লিখেছিলেন তখন নিশ্চয়ই এই অঙ্কগুলোর গুরুত্ব আছে। তাছাড়া 'ললাটের লিখন' কথাটা ভুলে যেও না।' ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস নামতে লাগল। ও তখনও অংকের সংখ্যাগুলো নিয়ে ভেবে চলেছে। সঙ্গে মেস্তিজোও নামতে লাগল। মূর্তিটার মুখের কাছে এসে মুখটা দেখতে লাগল। মোটা ঠোঁট মূর্তিটার। প্রায় চৌকোনো। দাঁতগুলো পর পর সাজানো। ফ্রান্সিস কিছুটা অন্যমনস্ক ভঙ্গীতেই দাঁতগুলো দেখতে লাগল। হঠাৎ ওর মনে হলো-অঙ্কের ব্যাপার যখন, তখন দাঁতগুলো সংখ্যায় কটা দেখতে হয়। ও

গুনলো। মোট ১৬টা দাঁত। এবার মুর্তিটার কপালের দিকে তাকাল। ঐ তো ওখানে শেষ সংখ্যা-১৬। আশ্চর্য! তাহলে তো সংখ্যাগুলোর সঙ্গে যোলোটা দাঁতের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কী সেই সম্পর্ক ?

মই বেয়ে দু'জনে নেমে এল। মারিয়া বিস্কো শাঙ্কো এগিয়ে এল। মারিয়া বলল- 'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস? তোমাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।'

একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল- 'হ্যাঁ মারিয়া স্বর্ণমূর্তির রহস্যের সমাধান প্রায় হাতের মুঠোয়। তবে ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

বিস্কো, শাঙ্কো জানে ফ্রান্সিস ওসব ব্যাপারে কখনও বাজে কথা বলে না। ও নিশ্চয়ই মূর্তি উদ্ধারের হদিস পেয়েছে।

ওদের মধ্যে আর কোনো কথা হলো না। মারিয়া এই ব্যাপারে ফ্রান্সিসকে কোনো প্রশ্ন করল না। সময় হলে ফ্রান্সিস সব বলবে। ফ্রান্সিসরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। মারিয়াকে নিয়ে রক্ষী দু'জন রাজবাড়ি চলে গেল।

ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ ঘাসের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। মেস্তিজোর মনে তখনও সংশয়। ফ্রান্সিস কি পারবে? দেবরক্ষী মূর্তির কপালে কয়েকটা অঙ্কের সংখ্যা লেখা আছে। তা থেকে কি স্বর্ণমূর্তি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা বের করা যাবে?

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল-'মেস্তিজো তুমি দুটো কাজ কর। লেখবার জন্যে একটা সাদা চামড়া আর কালি কলম নিয়ে এসো। আর তামার হাতুড়ি ছেনি কোথায় আছে?'

—'ও দু'টোও নিয়ে এসো।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো চলে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এল। হাতে সাদা চামড়া আর পালকের কলম দোয়াতদান। হাতুড়ি ছেনিও সঙ্গে এনেছে।

ফ্রান্সিস নিল সে সব। মেস্তিজো বিস্কো শাঙ্কো সাগ্রহে এগিয়ে এল। দেখা যাক ফ্রান্সিস কী করে এসব নিয়ে। ফ্রান্সিস ভেড়ার চামড়ায় কালি কলমে লিখল—

০ ৪ ৮ ১২ ১৬

সংখ্যাগুলো লিখে ও ভাবতে লাগল এবং সংখ্যাগুলো নিশ্চয়ই কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করছে। সে সংখ্যাটা কত? ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল। এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কী হবে তা ওরা বুঝতেই পারল না। সংখ্যগুলো মুখে আওড়াতে আওড়াতে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল সব সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে চার অঙ্কের। তাহলে ৪ই সেই নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলো ইঙ্গিত করছে।

ফ্রান্সিস খুশির হাসি হাসল। উৎসাহের কারণ কী? ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো চলো দেবরক্ষীর মূর্তিতে উঠবো।'

—'কেন?' মেস্তিজো বলল।

—'তুমি হাতুড়ি ছেনি দিয়ে দেবরক্ষীর চার নম্বর দাঁতটা তুলবে।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো অবাক। বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো?'

—'সেটা পরে বুঝবে? চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

সবাই দেবরক্ষীর মূর্তির সামনে এল। তখন রাত হয়েছে। বেদী প্রাঙ্গণ জনশূন্য। বেদীর সামনে প্রাঙ্গনের ধারে মশাল জ্বলছে। চারপাশ মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস মইটার সামনে এল। মেস্তিজোকে ইঙ্গিতে মই বেয়ে উঠতে বলল। দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। মেস্তিজোর হাতে হাতুড়ি ছেনি। বিস্কো শাঙ্কো নিচে দাঁড়িয়ে রইল।

মই বেয়ে উঠতে উঠতে দু'জনে মূর্তিটার মুখের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল-'মূর্তির পাথরটা কি খুব শক্ত?'

—'না-না। এটা বোসেটা পাথর কেটে তৈরি। বোসেটা পাথর সাধারণ পাথরের চেয়ে নরম।'

—'তাহলে চার সংখ্যায় দাঁতটা ছেনি দিয়ে কেটে তোলো।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো হাতুড়ি ছেনি হাতে চার নম্বর দাঁতটার কাছে মইয়ে পা রেখে দাঁড়াল। এই মূর্তি তৈরির সময় ও পাথর কাটার কাজ করেছে। ওর অভ্যেস আছে এই ভাস্করের কাজে। ও চার সংখ্যার দাঁতটায় হাতুড়ি ছেনি চালাতে চালাতে হেসে বলল-'তোমার ধারণা এই দাঁতের খোঁদলে স্বর্ণমূর্তি আছে?'

—'ধারণা নয়, বিশ্বাস।' ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল। ও একটা মশাল নিয়ে এসেছিল। সেটা মেস্তিজোর সামনে ধরে রইল। উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছে। নির্জনে মন্দির প্রাঙ্গণে হাতুড়ি ছেনির ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠছে। মেস্তিজো পাথর-দাঁত ভাঙতে লাগল। সত্যি বোসেটা পাথর তেমন শক্ত নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দাঁত অনেকটা ভেঙে খোঁদল দেখা গেল। কিন্তু খোঁদল শূন্য. কিছু নেই তাতে। মেস্তিজো একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল-'পেলে কিছু?'

—'হিসেব মেলেনি। আবার ভাবতে হবে। চলো নামি।' ফ্রান্সিস মই বেয়ে নামতে লাগল। পেছনে মেস্তিজো। বিস্কো শাঙ্গো তখন নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছে ফ্রান্সিস কি সতিাই লুকোনো স্বর্ণমূর্তি খুঁজে পেল? ফ্রান্সিস আর মেস্তিজোকে আস্তে আস্তে নামতে দেখে ওরা বুঝল ফ্রান্সিস ব্যর্থ। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারেনি।

ফ্রান্সিসরা আস্তানায় ফিরে এল। পথে কেউ কোনো কথা বলল না। ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফ্রান্সিস অঙ্কের সমাধান ভাবতে লাগল।

পরিদিন সকালে ফ্রান্সিসের স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কথা চিকামায় ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন বেদীর সামনে এসে ভিড় করল। দেখল দেবরক্ষীর দাঁত ভাঙা হলো কেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা বিশ্রাম করছে। রাজবাড়ি থেকে রাজার একজন দেহরক্ষী এল। ফ্রান্সিসকে কী বলল। ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। মেস্তিজোর দিকে তাকাল। মেস্তিজো বলল-'রাজা লুপাকা তোমাকে ডেকেছে।'

—'ও। ঠিক আছে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। নইলে কেউ কারো কথা বুঝবে না।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো ফ্রান্সিসের সঙ্গে রাজবাড়ি চলল।

রাজা লুপাকা পাথরের সিংহাসনে বসেছিল। ফ্রান্সিস ও মেস্তিজো সামনে এসে দাঁড়াল। মেস্তিজো মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। ফ্রান্সিস মাথা নোয়াল না। এই লুপাকার আদেশেই সেদিন গায়ক তরুণটি প্রাণ হারিয়েছিল। এই বেদনা ফ্রান্সিস ভুলতে পারেনি। দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে মেস্তিজো দোভাষীর কাজ করল। রাজা ও ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা হলো এই রকম—

রাজা-'স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবে?'

ফ্রান্সিস- 'হ্যাঁ।'

রাজা- [হেসে] 'কোনোদিনই পারবে না।'

ফ্রান্সিস- 'দেখা যাক। অপেক্ষা করুন।'

রাজা- 'না, আমি আর অপেক্ষা করবো না। দু'দিন সময় দিলাম। হয় স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করো, নইলে আমার রাজত্ব থেকে বিদেয় হও।'

ফ্রান্সিস- 'দু'দিন অনেক সময়।'

রাজা- 'আর একটা কথা। শুনলাম তুমি সোনার মূর্তি খুঁজতে গিয়ে দেবরক্ষীর মূর্তির ক্ষতি করেছো। ঐ মূর্তির আর ক্ষতি করা চলবে না।'

ফ্রান্সিস- 'কিন্তু ঐ মূর্তি তো আপনার চিরশত্রু রাজা কোলার হাতে তৈরি।'

রাজা- 'ঐ মূর্তির নিচে আমি আমার নাম ভাস্কর হিসেবে খোদাই করে দেবো। ওটা আমার তৈরি বলে সবাই জানবে।'

ফ্রান্সিস- 'বেশ। তবে একটা কথা। ঐ মূর্তির আর একটু ক্ষতি আমি করবো, কারণ প্রথমবারে আমার হিসেব মেলেনি। এটুকু আপনাকে মেনে নিতে হবে।'

রাজা 'যদি স্বর্ণমূর্তি পাই তবে এটুকু মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। ফ্রান্সিসের সঙ্গে আর কোনো কথা হলো না। ওরা দুজন আস্তানায় ফিরে এল।

একটু সকাল সকাল খেয়ে নিল শাঙ্কো। বরাবরের মত তীর ধনুক নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়ল। চলল তিতিকাকা বনের দিকে। বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সারা দুপুর শিকার করল-'দু'টো খরগোস আর চারটে বুনো মুরগি। বিকেলের দিকে ফিরে আসছে তখন আত্মগোপনকারী তিনজন উনকা সৈন্যর সঙ্গে দেখা। ওরা শাঙ্কোর সঙ্গে সঙ্গে তিতিকাকা বনের প্রান্ত পর্যন্ত এল। এখানে ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে চিকামা যাওয়ার ধূলোটে পথ। ওরাও পথের কাছাকাছি এসেছে, দেখল দু'জন চিমু সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে এলাকাটা পাহারা দিচ্ছে। উনকা তিনজন ওদের দেখা মাত্র বনের দিকে ছুটল। চিমু ঘোড়সওয়ার সৈন্যরাও পিছু ধাওয়া করল। একজন বর্শা ছুঁড়ল। একজন উনকা সৈন্যের পিঠে গেঁথে গেল বর্শাটা। সে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। বাকি দু'জনের একজনের একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে বর্শা ছুঁড়ল। বর্শা বিঁধল চিমুসৈন্যের একজনের ঘোড়ার পেটে। ঘোড়াটা জোরে লাফিয়ে উঠল। তারপর আরোহী সৈন্যটিকে নিয়ে ঘাসের প্রান্তরে পড়ে গেল। অন্য জন ছুটে এল। উনকা সৈন্য দু'জন ততক্ষণে বনের আড়ালে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। শাঙ্কো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার চিমু সৈন্য দু'জন শাঙ্কোর কাছে এল। দু'জন ঘোড়া

থেকে নেমে এল। একজন শাঙ্কোর তীর ধনুক কেড়ে নিল। অন্যজন শাঙ্কোর দু'হাত দড়ি দিয়ে বাঁধল। বাঁধা দড়িটা ধ'রে ঘোড়ায় উঠল অন্যজনও তীর ধনুক নিয়ে ঘোড়ায় উঠল। দু'জন আস্তে আস্তে চালাল। শাঙ্কোর হাতে বাঁধা দড়ি একজন ধ'রে নিয়ে চলল। শাঙ্কোও কোন প্রতিবাদ না ক'রে চলল ওদের পেছনে পেছনে। সৈন্য দু'জন মুখ ফিরিয়ে শাঙ্কোকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছে। শাঙ্কো ওদের কোন কথাই বুঝতে পারে নি। চুপ ক'রে থেকেছে।

তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। রাজবাড়ির পশ্চিমদিকে একটা লম্বাটে পাথরের ঘরের সামনে এসে সৈন্য দু'জন ঘোড়া থেকে নামল। শাঙ্কো যেসব খরগোস, বুনো মুরগি শিকার করেছিল সেসব সেই সৈন্যটি নিয়ে গেলো। অন্য সৈন্যটি ঘরটার দরজার কাছে গেলো, দরজার দু'পাশে মশালের আলোয় দেখা গেল দুজন সৈন্য বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। শাঙ্কো বুঝল এটা কয়েদঘর; সৈন্যটি এবার শাঙ্কোর কাছে এল। হাত বাঁধা শাঙ্কোকে নিয়ে ঘরটার দরজার কাছে এলো ততক্ষণে দরজাটা খোলা হয়েছে. কয়েদঘরের পাহারাদার সৈন্যটি শাঙ্কোকে ঘরের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। শাঙ্কো এবার চারপাশে তাকিয়ে ঘরটা দেখল। লম্বাটে ঘর। পাথুরে দেওয়ালে দুপাশে দুটে মশাল জ্বলছে। তার আলোয় দেখল মেঝেতে লম্বা লম্বা শুকনো ঘাস বিছানা। তার ওপর হাত বাঁধা অবস্থায় শুয়ে বসে আছে কয়েকজন উনকা সৈন্য। শাঙ্কো প্রথমে শুকনো ঘাসের ওপর বসল। তারপর শুয়ে পড়ল।

ওদিকে যত রাত বাড়তে লাগল ফ্রান্সিসের ও বিস্কোর উদ্বেগ ততই বাড়তে লাগল। শাঙ্কো এখনো ফিরে এলো না-কী হল ওর? ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আরো রাত বাড়লো। শাঙ্কো তখনও ফিরে এ[illegible]া না. ফ্রান্সিস অধৈর্য্য হয়ে বলল—

—বিস্কো তৈরি হয়ে চলো, তিতিকাকা বনে যাবো। বিস্কো উঠে দাঁড়ালো, কোমরে তরোয়াল গুঁজলো। ফ্রান্সিসও কোমরে তরোয়াল গুঁজে নিলো। মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে দেখল মেস্তিজো ঘুমিয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস ওর দিকে এগিয়ে গেলো। কাঁধে ঠেলা দিয়ে ডাকল- মেস্তিজো, মেস্তিজো?

—মেস্তিজো বন্ধ চোখ খুলে তাকালো।

ফ্রান্সিস বলল-শাঙ্কো এখনো ফেরেনি। চল ওকে খুঁজতে যাবো।

মেস্তিজো তাড়াতাড়ি উঠে বসে বলল- সে কী? শাঙ্কোর আবার কী হলো?

ফ্রান্সিস বলল- কিছুই বুঝতে পারছি না। চলো দেখি।

তিনজনে বাড়ির বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়াল. রাত তখন গভীর। দেখল রাস্তা জনশূন্য. এখানে ওখানে দু-একটা মশাল জ্বলছে। তিনজনে চলল তিতিকাকা বনের দিকে। বনের কাছাকাছি এসে দেখল ঘাসের প্রান্তরে জ্যোৎস্না পড়েছে, তিতিকাকা বনের গাছ গাছালির মাথায়ও জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। ওরা বনের মধ্যে ঢুকলো। এগিয়ে চলল। দেখল ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এখানে ওখানে ভাঙা জ্যোৎস্না

পড়েছে। ওরা আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যদের আস্তানার উদ্দেশ্যে চলল। ফ্রান্সিস ও বিস্কো মাঝে মাঝেই গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলো-

—'শাঙ্কো-ও শাঙ্কো-ও-।'

কিন্তু উনকা সৈন্যদের আস্তানার কাছাকাছি আসতেই কয়েকজন উনকা সৈন্য উদ্যত বর্শা হাতে ছুটে এলো।

মেস্তিজো চিৎকার করে বলল।- 'আমরা বন্ধু। আমি মেস্তিজো।'

সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাঙা জ্যোৎস্নায় আলোর মেস্তিজোকে চিনতে পারলো। মাথা নুইয়ে তাকে সম্মান জানালো। ফ্রান্সিস ও বিস্কোকেও চিনতে পারল। ঘরটার কাছাকাছি আসতেই সৈন্যদের দলপতি ছুটে এলো ফ্রান্সিসদের দেখে। চিৎকার করে কী বলে উঠল। মেস্তিজো সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল—সর্বনাশ শাঙ্কোকে চিমু সৈন্যরা বন্দী করে নিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস চমকে উঠে বলল।- সে কী? কখন?

এবার দলপতি এগিয়ে এসে মেস্তিজোকে কী বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—আজকে বিকেলের দিকে বনের বাইরে চিকামা যাবার রাস্তার ধারে শাঙ্কোকে ওরা বন্দী করেছে তারপর চিকামায় নিয়ে গেছে। বোধহয় কয়েদখানায় বন্দী করে রেখেছে।

ফ্রান্সিস বলে উঠল—'বিস্কো চলো চিকামায় ফিরি।' এসময় দলপতি মেস্তিজোকে কী সব বলল। মেস্তিজো বলল।

—ফ্রান্সিস রাজপুত্র পিসকোজ এই আস্তানায় এসেছেন। উনি তোমাদের কথা শুনেছেন। তোমরা যদি ওর সঙ্গে কথা বলো তাহলে খুবই ভালো হয়।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল। —'বেশ, কিন্তু বেশি সময় দিতে পারবো না। আমাদের এক্ষুনি চিকামায় ফিরে যেতে হবে আর শাঙ্কোর মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে।'

'—ঠিক আছে। চলো।' মেস্তিজো বলল।

মেস্তিজো আর দলপতি আগে আগে চলল। পেছনে অন্য সৈন্যরা আর ফ্রান্সিস ও বিস্কো। একটু এগোতেই সেই লম্বাটে বাড়িটার সামনে এল ওরা। এবার দলপতি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সেই বাড়িটার বড় উঠোন মত জা[illegible]য় এল ওরা। দলপতি পূর্ব কোণার একটা ঘরের দিকে চলল। ঘরের কাছে এসে দেখা গেল ঘরের দরজা খোলা। দলপতি দরজার সামনে দাঁড়াল। দু'হাত বুকে রেখে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে কী বলল। ঘরের ভেতর থেকে ভরাট গলায় কার কথা ভেসে এল। দলপতি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। প্রথমে মেস্তিজো ঢুকলো। পেছনে ফ্রান্সিস আর বিস্কো। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল মোটা কাপড় পাতা ঘাসের বিছানায় একজন শক্ত সমর্থ যুবক ব'সে আছে। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি। কিন্তু কোন পার্থিব [illegible]লক নেই। মেস্তিজো মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফ্রান্সিসকে গলা [illegible] বলল—রাজা [illegible]র ছেলে রাজপুত্র পিসকোজ।' ফ্রান্সিস আর বিস্কো

অল্প মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। রাজপুত্র পিসকোজ হেসে বিছানা থেকে উঠল। ফ্রান্সিসের ডানহাতটা ধ'রে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—'তুমি ফ্রান্সিস—বীর-নাম শুনেছি-ব'সো।' রাজপুত্র পিসকোজ নিজে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিসের হাত ধ'রে বসাল' বিস্কো বসল। রাজপুত্র বলল—মেস্তিজো- অল্প স্পেনীয় ভাষা-শিখেছি। গুছিয়ে -বলতে পারবো না। রাজা লুপাকা-চিকামা দখল-অত্যাচার-হত্যা-বন্দী-তাড়াবো' লুপাকাকে-চিকামা-স্বাধীন-আপনাদের সাহায্য। ফ্রান্সিস প্রথমে বুঝে উঠতে পারলো না কী বলবে। একটু ভেবে নিল। বলল-এব্যাপারে আপনার এখানকার দলপতিকে আমি সব বলেছি। মেস্তিজোও জানে। আমরা এক্ষুণি আপনাদের সাহায্য করতে পারবো না। কারণ রাজকুমারী মারিয়া এখন রাজ প্রাসাদে প্রায় বন্দিনী। আমরা এই অবস্থায় রাজা লুপাকার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চাই না। আমার বক্তব্য মেস্তিজো আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে। মেস্তিজো মৃদুস্বরে কিছুক্ষণ রাজপুত্রকে কী বলল। রাজপুত্র চুপ ক'রে সব শুনল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল-'আপনার বন্ধু-বন্দী-লুপাকা হৃদয়হীন -নৃশংস-বন্ধু-জীবন বিপন্ন-। ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—রাজা লুপাকা যদি আমার বন্ধুকে আমার অনুরোধে মুক্ত দেয়-ভালো কথা। কিন্তু যদি আমার বন্ধুর ওপর অত্যাচার করে তবে বন্ধুর মুক্তির জন্যে, মারিয়ার মুক্তির জন্যে আমাদের অস্ত্র ধরতেই হবে। তখন আপনাদের পাশে আমাদের পাবেন।' রাজপুত্র হেসে হাত তুলে ব'লে উঠল—'দুঃসাহসী ফ্রান্সিস তোমাদের সামান্য সাহায্য-অনেক। ধন্যবাদ। ফ্রান্সিসরা আবার মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। মেস্তিজোও বাইরে এল। বলল-চলো আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। তিনজন চলল চিকামার দিকে। পথে মেস্তিজো বলল—ফ্রান্সিস আমাদের খাওয়া দাওয়া কিন্তু কিছুই হয়নি। চলো আস্তানায় গিয়ে কিছু খেয়ে নি, ফ্রান্সিস বলল। —' শাঙ্কোকে সুস্থ না দেখা পর্যন্ত আমার মুখে খাওয়া রুচবে না। পথে আসতে আসতে সূর্য উঠল, ভোর হল। ওরা যখন রাজবাড়ির পাশেই সেই লম্বা ঘরওয়ালা কয়েদঘরের সামনে এসে পৌঁছল তখন সকাল হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস কয়েদঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এই কয়েদঘরে ওদের আগে বন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছিল। দেখল চারজন' চিমু সৈন্য বর্শা হাতে কয়েদঘর পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে কাছে ডাকল, বলল—

—'মেস্তিজো ওদের জিজ্ঞাসা করো যে শাঙ্কোকে এখানে বন্দী করা হয়েছে কী না? আর শাঙ্কো সুস্থ আছে কী না।

মেস্তিজো পাহারাদারদের এসব কথা জিজ্ঞেস করল। উত্তরে পাহারাদাররা কী সব বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসের দিকে ফিরে বলল।

'হ্যাঁ, শাঙ্কোকে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে আর শাঙ্কো সুস্থ আছে।'

—শাঙ্কোকে কেন বন্দী করা হয়েছে জিজ্ঞাসা কর।

—চিমু পাহারাদারী মেস্তিজোকে কী বলল। মেস্তিজো বলল—

—ওরা সন্দেহের বশে শাঙ্কোকে বন্দী করেছে। ওদের সন্দেহ তিতিকাকা বনে যেসব উনকা সৈন্যরা আত্মগোপন করে তাদের সঙ্গে শাঙ্কোর যোগ আছে। শাঙ্কো গুপ্তচর। একটু পরেই রাজসভার কাজ শুরু হবে। তখন রাজার সামনে শাঙ্কোকে হাজির করা হবে। রাজা বিচার করে শাস্তি দেবেন সেই শাস্তিই শাঙ্কোকে পেতে হবে। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভেবে দেখল এক্ষুনি চিমু পাহারাদারদের সঙ্গে লড়াইতে নামা উচিত হবে না। সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওরা ফিরে এসে রাজবাড়ির সিংহদ্বারে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস, বিস্কো সারারাত কিছু খেতেও পারেনি, ঘুমুতেও পারেনি। মেস্তিজোরও একই অবস্থা তিনজন তখন প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত। সদর দেউড়ির পাশে একটা লম্বাটে পাথরের ওপর ওরা বসে পড়ল।

বেলা বাড়তে লাগলো। একসময় রাজবাড়ির সদর দেউড়ি খুলে গেলো। লোকজন রাজসভার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ফ্রান্সিসরাও গেলো। একসময় রাজা লুপাকা এলো। পাথরের সিংহাসনে বসল। ততক্ষণে পাহারাদার সৈন্যরা হাত বাঁধা শাঙ্কোকে রাজার সামনে এনে উপস্থিত করেছে। একজন পাহারাদার শাঙ্কোকে দেখিয়ে গড়গড় করে কী সব বলে গেলো। রাগে রাজা লুপাকার মুখ লাল হয়ে উঠল। চিৎকার করে রাজা কী বলে উঠল। মেস্তিজো চাপা গলায় বলে উঠল--

'ফ্রান্সিস, পাঁচ ঘা বেত মারার হুকুম হয়েছে'। তখন লম্বা, কালো বেত হাতে একজন সৈন্য এগিয়ে এলো। প্রচণ্ড জোরে চাবুক চালালো শাঙ্কোর গায়ে। শাঙ্কোর সমস্ত শরীর নড়ে উঠল। ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। বসে পড়ল, ফ্রান্সিস বুঝল চাবুকের পাঁচটা ঘা শাঙ্কো সহ্য করতে পারবে না, অজ্ঞান হয়ে যাবে। ও মেস্তিজোকে বলল--

শিগগির রাজাকে বলো চাবুক মারা বন্ধ করতে। আমি রাজার সঙ্গে কথা বলব। মেস্তিজো চিৎকার করে দুহাত ওপরে তুলে লুপাকাকে সে কথা বলল। এবার মেস্তিজো মারফৎ রাজা লুপাকা ও ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো-।

ফ্রান্সিস- শাঙ্কো আমার বন্ধু। তাকে চাবুক মারা হচ্ছে কেন?

রাজা-- ও গুপ্তচর।

ফ্রান্সিস-- আপনি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

রাজা-- আমার সৈন্যরা তার প্রমাণ পেয়েছে।

ফ্রান্সিস-- মিথ্যে কথা. যদি এ মিথ্যে অভিযোগে আমার বন্ধুকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব না।

রাজা-- কিন্তু তোমাদের তো সেই জন্যই এখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সিস-- আমার বন্ধুকে যদি মুক্তি দেওয়া না হয় তাহলে আমি স্বর্ণমূর্তি খুঁজবো না।

রাজা-- তাহলে তোমাদের দুজনকেও বন্দী করা হবে।

ফ্রান্সিস-- বেশ তাই করুণ। কিন্তু আমার বন্ধুকে আর একটাও চাবুক মারা চলবে না।

রাজা-- ওর আরো চারটে চাবুকের ঘা পাওনা আছে।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠল-- না-না।

রাজা লুপাকা আঙুল নেড়ে পাহারাদারদের ইঙ্গিত করল, ওরা পাঁচজন ছুটে এসে ফ্রান্সিস ও বিস্কোর হাত বেঁধে ফেলল। তারপর ওদের কোমর থেকে তরোয়াল খুলে নিল। আবার চাবুকের ঘা পড়ল শাঙ্কোর পিঠে, তারপর আবার। শাঙ্কো পাথুরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চাবুকের ঘায়ে আহত শাঙ্কোর দিকে। ফ্রান্সিসের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। বিস্কোর চোখেও জল। ওরা অসহায় বন্দী, কিছুই করার নেই।

পাহারাদাররা ফ্রান্সিস ও বিস্কোকে নিয়ে হাঁটতে লাগল কয়েদঘরের দিকে। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল। ওর মাথায় অনেক চিন্তা। শাঙ্কোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মারিয়ারও যাতে কোন বিপদ না হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। ওদের দুজনকে কয়েদঘরে ঢোকানো হল। একটু পরেই পাহারাদাররা আহত শাঙ্কোকে কয়েদঘরে রেখে গেলো। ফ্রান্সিস ও বিস্কো আহত শাঙ্কোর ওপর ঝুঁকে পড়ল। বাঁধা দুটো হাত দিয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কোর মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমন সময় কয়েদঘরের দরজায় টং করে শব্দ হলো। ফ্রান্সিস দেখল মেস্তিজো লোহার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস তাকাতেই ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে লোহার দরজার কাছে দাঁড়াল। মেস্তিজো বলল-- 'ফ্রান্সিস, অনেক কায়দা করে রাজা লুপাকাকে হাত করেছি। বলেছি ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখব এবং এইভাবে রাজপুত্র পিসকোজ ও আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যদের সব খবরাখবর জোগাড় করব এবং তা রাজা লুপাকাকে জানাবো। রাজা খুব খুশি, আমাকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছে।' ফ্রান্সিস বলল-- 'মেস্তিজো- তুমি যে করেই হোক শাঙ্কোর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।'

'দেখছি,' একথা বলে মেস্তিজো চলে গেলো। ফ্রান্সিস এবার শাঙ্কোর পাশে ভাল ক'রে বসল। শাঙ্কোর মাথা নিজের কোলে তুলে নিল। শাঙ্কো ব্যথায় একটু কঁকিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস ডাকলো-- 'শাঙ্কো?'

--উঁ?

--খুব কষ্ট হচ্ছে?

--না। শাঙ্কো মৃদু হাসল। বলল--'বুঝলে ফ্রান্সিস-- আমি খুব আহত হবার ভান করেছি যাতে আরো চাবুক খেতে না হয়। তবে পিঠটা ভীষণ জ্বালা করছে। দেখতো কতটা কাটল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে শাঙ্কোর জামাটা খুলতে লাগল। বিস্কোও সাহায্য করল। জামা খোলা হ'লে মশালের আলোয় ওরা দেখল তিন চারটে লম্বাটে কালশিটের দাগ শাঙ্কোর পিঠে। একটা দাগ একেবারে পিঠের চামড়া কেটে বসেছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে কাটা জায়গাটা থেকে। ফ্রান্সিস বুঝল--

শাঙ্কোর চিকিৎসা প্রয়োজন। নইলে কাটা জায়গাটা পেকে যেতে পারে। ফ্রান্সিস বলল-- 'বিস্কো চিনেমাটির হাঁড়িটায় জল নিয়ে এসো।' বিস্কো উঠল। ঘরের কোনায় রাখা হাঁড়িটা থেকে চিনেমাটির বাটিতে ক'রে জল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস নিজের কোমরের ফেট্টি থেকে কিছুটা কাপড় ছিঁড়ল। কাপড়ের টুকরোটা জলে চুবিয়ে শাঙ্কোর পিঠের কালসিটে দাগে, কাটা জায়গায় আস্তে আস্তে জল বুলিয়ে দিল। শাঙ্কো একবার নড়ে উঠল। জল লাগায় বেশ জ্বালা ক'রে উঠল। পরে একটু ঠাণ্ডা লাগায় ভাল লাগল।

তখনই কয়েদঘরের দরজায় শব্দ হ'ল। দেখা গেল দরজা খোলা হচ্ছে। দু'জন পাহারাদার বন্দীদের জন্যে চীনামাটির বড় গোল পাত্রে খাবার নিয়ে ঢুকল। ওরা বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। তিনকোণা পাতা বন্দীদের সামনে ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিল। খাবার ঢেলে দিল। গতরাত থেকে খাওয়া নেই, ঘুম নেই। ফ্রান্সিসরা যেন ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেছে। ফ্রান্সিস খাবার খেতে খেতে বলল-- কিছুই ফেলো না-- পেট পুরে খাও। মুখে ভালো না লাগলেও খাও। বন্দীদশায় ফ্রান্সিস সব সময় একথা বলে। শাঙ্কোও উঠে বসে খেতে লাগল। সেই ধানের রুটি, বুনো আলু আর সামুদ্রিক মাছের ঝোল। মেন্তিজোর আস্তানায় তিতিকাকা বনের আস্তানায় এমনি খাবারই ওরা খেয়েছে। খেয়ে অভ্যস্ত হ'য়েছে। পেট পুরেই খেল তিনজনে। তারপর অনেকটা জল খেল। পাহারাদাররা এঁটো পাতা নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল।

কয়েক ঘণ্টা কাটল। খেয়ে দেয়ে ফ্রান্সিস গায়ে বেশ জোর ফিরে পেল। লোহার দরজায় আবার শব্দ উঠল- ঢ ঢাং ঢং ঘর্ র্ র্। ওরা দেখল মেন্তিজো একটা লম্বা মত বুড়ো লোককে নিয়ে ঢুকছে। লোকটার মুখে পাকা দাঁড়ি গোঁফ। মাথায় কালো কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। মাথায় পাকা চুল পেছনে বেণীর মত পাকানো। গলায় নানা রঙের পাথরের টুকরোর মালা, হাতে একটা বোঁচকা। ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা বদ্যি। বদ্যি শাঙ্কোর কাছে এসে বসল। ওর পিঠের কালসিটে দাগ, চাবুকের ঘা এসব ভালো করে দেখল। তারপর ঝোলা থেকে চীনামাটির বোয়াম বের করল। একটা গাছের পাতা বের করল, তারপর সেই পাতার বোয়াম থেকে হলুদ রঙের কিছু গুঁড়ো ঢালতে ঢালতে মেন্তিজোকে জল নিয়ে আসতে বলল।

--মেন্তিজো জল নিয়ে এলো, বদ্যি সেই জল গুঁড়োটার ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঢেলে আঠার মতো করল। তারপর শাঙ্কোর পিঠে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। প্রথমে শাঙ্কো একটু চেঁচিয়ে উঠল, বোধহয় জায়গাগুলো জ্বালা করে উঠল। তারপর শাঙ্কো শান্ত হলো। বোধহয় জ্বালা যন্ত্রণা একটু কমল। ওষুধ লাগিয়ে বদ্যি মেন্তিজোকে কী বলল, মেন্তিজো পাতাটায় ওষুধ কিছুটা রেখে দিল। তারপর চলে গেল, মেন্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল-- ওষুধ রইল। কাল সকালে লাগিয়ে দিও। সেদিন কাটল, মেন্তিজো পরের দিনও ওষুধ এনে দিলো।

দিন চারেক কাটল, শাঙ্কো এখন অনেকটা সুস্থ। সেদিন ফ্রান্সিস মেন্তিজোকে

বলল-

--দেখো, রাজা লুপাকা শাঙ্কোকে যেভাবে বিনা কারণে শাস্তি দিলো, তাতে রাজার বিরুদ্ধে আমি রুখে দাঁড়াতে পারতাম। কিন্তু মারিয়ার কথা ভেবে আমি নিজেকে সংযত করেছি।

--ফ্রান্সিস। মেস্তিজো বলল--

--তোমাকে বলিনি কিন্তু এখন তো বলতেই হয়। মারিয়াকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হচ্ছে না। কারো সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না।

ফ্রান্সিস বলল।

--এটা হবে আমি জানতাম। কিন্তু এখন যে করেই হোক মারিয়াকে উদ্ধার করতে হবে, মেস্তিজো তুমি কী একা পারবে।

--নিশ্চয়ই পারবো। মেস্তিজো বলল--

--আমি সেসব ছকে রেখেছি। কিন্তু আমার ভয় হলো পরে রাজা লুপাকা এসব জানতে পারলে আমার জীবন বিপন্ন হবে।

--তোমার কোনো ভয় নেই। তোমাকে দুটো কাজ কতে হবে। মারিয়াকে মুক্ত করতে হবে আর আমাদের জাহাজে আমার বন্ধুদের বিপদের সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। ভাবছিলাম রাজা লুপাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব না। কিন্তু আর লড়াইয়ে না নেমে উপায় নেই। তুমি আমার বন্ধুদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে সোজা তিতিকাকা বনে গিয়ে রাজপুত্র পিসকোজের কাছে নিয়ে যাবে। পিসকোজ যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকামা আক্রমণ করে। আমি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করব কিন্তু যদি পালাতে না-ও পারি আমার বন্ধুরা এসে ঠিক আমাদের উদ্ধার করবে। মেস্তিজো বলল--

ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, দেখি কতদূর কী করতে পারি। মেস্তিজো সেদিন সন্ধ্যেবেলা রাজা লুপাকার সঙ্গে দেখা করল। বলল-

--মহারাজ আমি গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়েছি যে রাজপুত্র পিসকোজ আগামী পূর্ণিমার দিন চিকমা আক্রমণ করবে।

--পূর্ণিমা কবে?রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

--আর সাতদিন পরে। তারপর মেস্তিজো বলল।

--কালকে দেবরক্ষীর পূজো। সেই উৎসবে আপনি ও মহারাণী আসবেন। রাজকুমারী মারিয়াকেও আসার অনুমতি দেবেন এই আমার অনুরোধ। রাজা কিছুক্ষণ ভাবলেন তারপর বললেন।

--বেশ তাই হবে, কিন্তু রাজকুমারী মারিয়ার সঙ্গে পাহারাদার সৈন্য যাবে। --বেশ। মেস্তিজো বলল।

পরদিন দুপুর থেকেই দেবরক্ষীর পূজোর উৎসব শুরু হ'ল। চিকামার অধিবাসীরা দলে দলে পুজোর আঙ্গিনায় আসতে লাগল। মই বেয়ে উঠে দেবরক্ষীর

গলায় মালা পরাতে লাগল। দেবরক্ষীর মূর্তির বেদীতে ফুল পাতা ছড়িয়ে দিতে লাগল।বুনো গাছের শুকনো কষ জড়ো করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল পূজাঙ্গনে। মেস্তিজো সারাদিন পুজো নিয়ে ব্যস্ত রইল। উৎসব জমে উঠল সন্ধ্যাবেলা। সমস্ত পূজাঙ্গন ঘিরে অনেক মশাল জ্বলল। শুরু হ'ল নাচ গান। দলে দলে মেয়েরা সুর করা নাচের আসরে নাচগান করতে লাগল।

সন্ধ্যের পরেই ঘোড়ায় চড়ে রাজা লুপাকা ও রানী এল উৎসব প্রাঙ্গনে। বসল দেবরক্ষীর মূর্তির বেদীতে। রাজা রানী দু'জনেই বেশ সেজেগুজে এসেছে। শুধু চারদিকে দাঁড়ানো চিমু সৈন্যরা রাজারানীর জয়ধ্বনি দিল। চিকামার অধিবাসীরা কোন জয়ধ্বনি দিল না।

একটু পরেই দু'জন পাহারাদার সৈন্যের পাহারায় মারিয়া এল। মারিয়া চিন্তাগ্রস্ত। ফ্রান্সিস, বিস্কো, শাঙ্কো বন্দী। কয়েদঘরে কী কষ্টে না জানি ওদের দিন কাটছে মারিয়ার এই উৎসবে আসার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মেস্তিজো ওর সঙ্গে দেখা করে বারবার অনুরোধ করেছে- এই উৎসবে আপনি অবশ্যই আসবেন। আপনার মন ভালো নেই। তবু আসবেন। তাই মারিয়াকে আসতে হলো। মারিয়া বেদীতে বসে উৎসব দেখতে লাগলো। এই সময় মেস্তিজো ওর কাছে এলো। বলল---

—আপনি আমার সঙ্গে আসুন। দেবরক্ষীর পূজা করুন তাহলে আপনার মঙ্গল হবে। মারিয়া উঠে মেস্তিজোর পেছনে পেছনে আসতে লাগল। মারিয়ার পাহারাদার দুজন চিমু সৈন্য ওকে অনুসরণ করল। ওরা সকলে এসে মেস্তিজোর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল, মেস্তিজো ইঙ্গিতে পাহারাদার দুজনকে বাইরে দাঁড়াতে বলল। তারপর মারিয়াকে নিয়ে ঘরে তুলল, ঘরে ঢুকে মেস্তিজো ওর পুরোহিতের পোশাক নানান রঙের সুতোর কাজ করা গায়ের চাদরটা ফেলে দিল। একটা পঞ্চো গায়ে পরে নিল। তারপর পেছন দিকটার দরজাটা খুলে মারিয়াকে চাপা-স্বরে ডাকল—রাজকুমারী তাড়াতাড়ি চলে আসুন! দুজনে দরজার বাইরে এল। তারপর মেস্তিজো দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো। পেছনে মারিয়া। মারিয়ার পাহারাদার দুজন সৈন্য তখনো বর্শা হাতে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মেস্তিজো ও মারিয়া যতটা দ্রুত সম্ভব যেতে লাগলো। সব লোকজন তখন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা। ওদের লক্ষ্যই করল না। মেস্তিজো ও মারিয়া রাস্তায় এসে নামল। রাস্তা জনশূন্য। সবাই উৎসবের প্রাঙ্গনে গিয়ে জড়ো হয়েছে। এক সময় ওরা চিকামা শহর থেকে বেরিয়ে এলো। আকাশে খণ্ড চাঁদ। তার আলোয় মেস্তিজো দেখল ধারে কাছে লোকজন নেই। এবার মেস্তিজোও দাঁড়িয়ে পড়ল। মারিয়াও দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনেই বেশ হাঁপাচ্ছে তখন। মেস্তিজো বলল—

—রাজকুমারী—ফ্রান্সিস আমাকে দুটো দায়িত্ব দিয়েছে। এক, আপনাকে মুক্ত করার সেটা করলাম। দুই, জাহাজে গিয়ে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের সব কথা জানানো। এইবার আমাকে সেই কাজটা করতে হবে। আপনি জাহাজে ফিরে যাবেন তো।

মারিয়া বলল—না আপনি চিকামাতেই কোথাও আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিসরা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি চিকামা ছেড়ে যাবো না।

—কিন্তু চিকামায় থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয় থাকলে আপনি যে কোন সময় বিপদ পড়তে পারেন।

—তাহলে চিকামার বাইরে আমার অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিন। মেস্তিজো বেশ চিন্তায় পড়ল। ও ভাবতে লাগলো মারিয়াকে চিকামার বাইরে কোথায় রাখা যায়। তখন হঠাৎ মনে পড়ল তিতিকাকা বনের সেই আস্তানার কথা। বলল—

তিতিকাকা বনের মধ্যে আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যরা একটা আস্তানা তৈরি করেছে। সেখানে মৃত রাজা কোলার পুত্র পিসকোজ আছে। আপনি ঐ আস্তানায় নিরাপদে থাকতে পারবেন।

—তাহলে খুবই ভালো হয়। মারিয়া বলল।

মেস্তিজো মারিয়াকে তিতিকাকা বনের দিকে নিয়ে চলল।

তিতিকাকা বনের মধ্যে যখন ওরা ঢুকল তখন রাত গভীর। বনের গাছপালার নিচে অন্ধকার। পথ বলে কিছু নেই। বনের এখানে ওখানে চাঁদের ভাঙা অস্পষ্ট আলোয় মেস্তিজো দ্রুত এগিয়ে চলল পেছনে মারিয়া। এক সময় ওরা সেই কাঠের বাড়ির কাছে এলো। হঠাৎ তিন চার জন আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্য ওদের ঘিরে ধরল। মেস্তিজো চিৎকার করে বলে উঠল। উনকা সৈন্যরা ওকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। তারপর ওদের বাড়িটার মধ্যে নিয়ে গেলো। ঘরে ঢুকে মারিয়া মশালের আলোয় দেখল লম্বাটে ঘরটায় অনেক লোকজন ঘাসের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। এক কোনায় রাজপুত্র পিসকোজ ঘুমিয়ে ছিল। মেস্তিজো কাছে বসে কী বলে ডাকলো। পিসকোজের ঘুম ভেঙে গেলো। সে উঠে বসল। মারিয়াকে দেখে বেশ অবাকই হলো। মেস্তিজো রাজপুত্রকে এক নাগাড়ে কী বলে গেলো। রাজপুত্র কী বলল। তখন মেস্তিজো মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—আমি রাজপুত্রের কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছি। রাজপুত্র আপনাকে এখানেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মেয়েরা যে ঘরে থাকে সেই ঘরে। এবার মেস্তিজো মারিয়াকে নিয়ে ঘরের বাইরে এলো। একটা বড় উঠোন পেরিয়ে পুব কোণায় একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। মেস্তিজো ঘরের দরজায় আস্তে ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মেস্তিজো কী বলল। দরজা খুলে একজন মধ্যবয়স্কা উনকা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। মেস্তিজো তাকে কী বলল। স্ত্রীলোকটি মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে কী বলল। তারপর দরজা থেকে স'রে দাঁড়াল। মেস্তিজো মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী আপনি এখানে থাকবেন। এরাই আপনার দেখাশুনো করবে। আমি সমুদ্রতীরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের খবর দিতে। মারিয়া ঘরটায় ঢুকল। দেখল ঘরে দু'টো মশাল জ্বলছে। মেঝেয় ঘাসের বিছানায় মোটা কাপড়ের চাদর পাতা। কিছু স্ত্রীলোক শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুম ভেঙে

দু'একজন মারিয়াকে দেখল। মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকটি মারিয়াকে বিছানা দেখাল। তারপর কী বলল। বোধহয় মারিয়াকে শুতে বলল।

মেস্তিজো উঠোন মত জায়গাটায় নামল। তারপর ঐ আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল। চলল মরুভূমির মত সেই ঢালা সমুদ্রতীরের উদ্দেশ্য। দু'একটা টিলার মত পাহাড়ী এলাকা পার হ'য়ে মেস্তিজো সেই মরুভূমির মত এলাকায় এল। তখন চাঁদ পশ্চিমদিগন্তে হেলে পড়েছে। মৃদু-জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে মরুভূমি এলাকায় জোরে হাওয়া আসছে। সমুদ্রের দিক থেকে বালি উড়ছে। মেস্তিজো চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

ভোর হ'ল। মেস্তিজো দূর থেকে সমুদ্রের তীরে নোঙর করা ফ্রান্সিসদের জাহাজটা দেখল। ও জাহাজটার কাছে যখন পৌঁছল তখন সকাল। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে মেস্তিজো ভাইকিংদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করল। দু'জন পাহারাদার ভাইকিং জাহাজের রেলিং-ধরে কাছে এলো, ঝুঁকে পড়ে মেস্তিজোকে দেখলো। মেস্তিজো চিৎকার করে বলল—

—খুব জরুরি খবর আছে। আমাকে জাহাজে উঠতে দাও। ততক্ষণে আরো কিছু ভাইকিং ডেকের -রেলিং এর কাছে হাজির হয়েছে। ওরা তখন একটি কাঠের পাটাতন নামিয়ে দিল তীর পর্যন্ত। মেস্তিজো কাঠের পাটাতনের ওপর হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠল। ভাইকিংরা ওকে ঘিরে ধরল। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল

—কী সংবাদ? মেস্তিজো বলল—

—সব বলছি। আগে আমাকে কিছু খেতে দিন, ভাইকিংরা ওকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলো। মাংস, রুটি খেতে দিলো। মেস্তিজো খাচ্ছে তখনি হ্যারি এলো। হ্যারি জিজ্ঞাসা করল—

আপনি কে? কী খবর এনেছেন? মেস্তিজো তখন আস্তে আস্তে নিজের পরিচয় ফ্রান্সিসদের বন্দী দশা আর তিতিকাকা বনে মারিয়া আশ্রয় লাভের কথা বলল? তারপর ফ্রান্সিসের নির্দেশও জানলো।

হ্যারি বলল। — আমরা সকালের খাবার খেয়েই চিকামা রওনা হবো আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ভাইকিংরা স্নান খাওয়া সেরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জাহাজের ডেক-এ এসে জমায়েত হ'ল। প্রথমে মেস্তিজো পাটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজ থেকে নামলো ওরা আকাশের দিকে তরোয়াল উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল— — ও হো-হো-হো মরুভূমির ওপর দিয়ে শুরু হলো। মরুভূমির বালি এর মধ্যেই তেতে উঠেছে। সমুদ্রে দিক থেকে হাওয়া ছুটছে জোরে। সূর্যের তেজও বেশ, তার মধ্য দিয়েই ভাইকিংরা চলল। দুপুর নাগাদ চিক্লাই শহরে এসে পৌঁছল। সেখান থেকে হেঁটে চিকামায় এসে যখন পৌঁছল তখন বিকেল। মেস্তিজোরা চিকামা শহরে ঢুকলো না কয়েকটা পাহাড়ি টিলা পেরিয়ে তিতিকাকা বনে ঢুকলো। যখন তিতিকাকা বনের আস্তানায় এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয় হয়। মেস্তিজো হ্যারিকে

রাজপুত্র পিসকোজের কাছে নিয়ে গেলো। পিসকোজ সমাদরে হ্যারিকে ঘাসের বিছানায় বসালো। তারপর ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় ফ্রান্সিসের বিপদের কথা বলল—

—এই অবস্থায় আমাদের আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। মেস্তিজো রাজা লুপাকাকে বলেছে যে, আপনারা পূর্ণিমার দিন আক্রমণ করবেন। পূর্ণিমার এখনো ছ'দিন বাকি। রাজা লুপাকা এই কটা দিন নিশ্চিত থাকবে। সেইজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আক্রমণ করতে হবে। আপনার আপত্তি না থাকলেও আমরা কালকেই চিকামা আক্রমণ করতে পারবো। পিসকোজ মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বলল—

রাজা লুপাকাকে তৈরি হবার সময় দেবো না। কালকে রাতেই আমরা আক্রমণ করবো। আমি আজকেই সব আস্তানায় খবর পাঠাচ্ছি কাল বিকেলে সব সৈন্যরা এখানে-জড়ো হবে। এই সময় মারিয়া ঘরে ঢুকল। হ্যারি মারিয়াকে মুক্ত ও সুস্থ দেখে খুশি হলো। উঠে দাঁড়িয়ে তাকে মাথা নিচু করে সম্মান জানালো। বলল—

রাজকুমারী কালকে যুদ্ধ শুরু হবে। এ অবস্থায় আপনার এখানে না থাকাই ভালো, আপনি রাজী হলে আপনাকে জাহাজে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি। মারিয়া দৃঢ় স্বরে বলল— না- আমি এখানেই থাকবো।

—কিন্তু এই লড়াই হাঙ্গামার মধ্যে আপনার কিছু হ'লে—

—আমার কিছু হবে না।

—বেশ। হ্যারি আর কিছু বলল না। রাজকুমার পিসকোজ বলল—এই লড়াইয়ে আমাদের সাহায্য করুন আমরা চাই।

—নিশ্চয়ই। তবে আপনারা আপনাদের যে রকম যুদ্ধ নীতি সেভাবে লড়াই চালাবেন। আমরা আমাদের নীতি অনুযায়ী লড়বো। হ্যারি বলল।

—বেশ। পিসকোজ বলল। এবার হ্যারি মেস্তিজোকে বলল—আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনাকে চিকামায় যেতে হবে।

—সে কী ক'রে হয়। রাজকুমারী মারিয়াকে আমি পালাতে সাহায্য করেছি একথা এতক্ষণে রাজা লুপাকা জেনে গেছে। আমি চিকামায় ঢুকলেই চিমু সৈন্যরা আমাকে বন্দী করবে। রাজা লুপাকার কাছে নিয়ে যাবে। কী সাংঘাতিক শাস্তি—

—দাঁড়ান দাঁড়ান, শাস্তি এড়ানোর উপায় বার করছি। হ্যারি বলল। তারপর পাথরের মেঝেয় দু'একবার পায়চারি করল। ভাবতে লাগল। একসময় মেস্তিজোকে বলল— আচ্ছা আপনি তো রাজপুরোহিত। পুজো করতে আপনার করতে কী কী লাগে?

—ফুল লতাপাতা তিতিকার হ্রদের পবিত্র জল— ধোঁয়ার জন্যে গাছের শুকনো কষ এ সব।

—তিতিকাকা হ্রদের জল তো শুধু আপনিই আনেন? হ্যারি বলল—

—তাহ'লে ধরা পড়লে রাজা লুপাকাকে বলবেন— রাজকুমারী মারিয়া পুজো করতে চেয়েছিলো। তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনি তিতিকাকা হ্রদে পবিত্র জল

আনতে যাচ্ছিলেন। তখনই আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যরা আমাদের বন্দী ক'রে তাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়েছিল। আপনি অনেক কষ্টে পালিয়ে চিকামায় চলে এসেছেন। পারবেন না এসব বলতে?

মেস্তিজো একটু চিন্তা করে বলল—হ্যাঁ তা পারবো।

—এইবার রাজাকে আপনি বলবেন যে দিন কয়েকের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হবে। সেই যুদ্ধে যাতে রাজা লুপাকা জয়লাভ করতে পারেন তার জন্য আপনি কালকে সন্ধ্যেবেলা পূজার আয়োজন করেছেন। সব চিকামাবাসীরা যেন সেই পূজা উৎসবে অংশগ্রহণ করে। মেস্তিজো হ্যারির পরামর্শটা ভাবতে লাগল। রাজপুত্র পিসকোজ বলল— আপনি পুজোর কথা বলছেন কেন?

হ্যারি বলল— রাজপুত্র কালকে সন্ধ্যেবেলা পুজোর আয়োজন হ'লে চিকামার অনেক লোক সেই পুজোর উৎসবে অংশ নিতে যাবে। চিমু সৈন্যরাও যাবে। রাজবাড়িতে থাকবে কিছু প্রহরী সৈন্য। আমরা সহজেই তাদের পরাস্ত করতে পারবো। রাজা রানীকে বন্দী করতে পারবো। রাজা রানীকে বন্দী করতে পারলে চিমু সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যাবে। তারা সহজেই বশ্যতা স্বীকার করবে। চিকামার মানুষজন পুজোর অঙ্গনে থাকবে। অযথা নিরীহ মানুষও এই লড়াইয়ের সময় মারা পড়বে না।

হ্যারির কথাগুলো রাজপুত্র পিসকোজ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর হেসে ডান হাত বাড়িয়ে বলল— আপনি সত্যই বুদ্ধিমান! হ্যারি হেসে পিসকোজের হাত ধরল।

—তাহ'লে কাল সকালে আমি চিকামা নগরে যাবো। মেস্তিজো বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই মেস্তিজো চিকামা নগরের দিকে চলল। পথে নিজের গায়ের পঞ্চোর এখানে ওখানে ছিঁড়ে ফেলল। মাথার চুল দাড়ি এলোমেলো করল। ও যা ভয় পেয়েছিল তাই হ'ল। চিমু সৈন্যরা ওকে বন্দী করল। হাত বেঁধে নিয়ে চলল রাজা লুপাকার কাছে। লুপাকা ওকে দেখে তো আগুন। মেস্তিজো হ্যারির শেখানো মতো সব বলল। দেখা গেল এতে কাজ হ'য়েছে। রাজা লুপাকা শুনল সব। এবার মেস্তিজো রাজার যুদ্ধজয়ের জন্য বিশেষ পুজোর কথা বলল। রাজা লুপাকা খুশি হ'ল। মেস্তিজোকে মুক্তি দিল। মেস্তিজো মুক্তি হ'ল।

মেস্তিজো সারা শহর ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যেবেলা বিশেষ পুজো ও আনন্দোৎসবের কথা ঘোষণা ক'রে বেড়াল।

দেখা গেল সত্যই ঘোষণায় কাজ হ'য়েছে। সন্ধ্যে হ'তেই পুজোর প্রাঙ্গনে ভিড় জমে গেল। রাত হতে ভিড় বাড়ল। নাচগান চলল। চিমু সৈন্যরাও দল বেঁধে এল। আনন্দ উৎসবে মেতে গেল।

ওদিকে সন্ধের পরেই তিতিকাকার আস্তানায় লড়াইয়ের তোড়জোড় শুরু হলো। আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যরা আস্তানার উঠোনে সারি বেঁধে দাঁড়াল। আস্তানার বাইরে খোলা জায়গায় সশস্ত্র জড়ো হলো। সবার সম্মুখে দাঁড়ালো রাজপুত্র

পিসকোজ তার সঙ্গে হ্যারি। রাজপুত্র যাত্রা শুরু করার ইঙ্গিত দিলো। ভাইকিং ও উনকা সৈন্যরা চলল চিকামা নগরীর দিকে। আকাশে মস্ত চাঁদ। তারই ভাঙা ভাঙা আলো পড়েছে তিতিকাকা বনের এখানে ওখানে তাতে অন্ধকার কাটেনি। তারই মধ্যে দিয়ে ভাইকিংরা ও উনকা সৈন্যরা চলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা চিকামা নগরীর রাস্তায় এসে উঠল। দেখা গেল পথ জনশূন্য। দোকানপাট বন্ধ। বাড়ির ঘরের আলো নেভানো। প্রায় সকলেই চলে গেছে পুজোর প্রাঙ্গণে। রাজবাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল চারজন চিমু সৈন্য উৎসব থেকে ফিরে আসছে। ওরা কাছাকাছি এসে রাজপুত্র পিসকোজ উনকা ও ভাইকিংদের দেখে হকচকিয়ে গেলো। পিছু ফিরে পালাবার চেষ্টা করতেই উনকা সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। চারজনই হার স্বীকার করল। উনকা সৈন্যদের দলপতি ওদের হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তার পাশে রাখলো। এবার পিসকোজের নেতৃত্বে উনকা সৈন্যরা ছুটল রাজবাড়ির দিকে। হ্যারি তাদের একজনকে থামালো। আকারে ইঙ্গিতে জানতে চাইলো কয়েদঘরটা কোথায়? সৈন্যটি ডান হাত তুলে একটা লম্বাটে পাথরের তৈরি ঘর দেখলো। তারপর ছুটল রাজবাড়ির দিকে। হ্যারি তার বন্ধুদের নিয়ে চলল। কয়েদঘরের দিকে। কয়েদঘরের সামনে এসে দেখলো দরজার দু'পাশে মশাল জ্বলছে। পাঁচজন চিমু সৈন্য কয়েদঘর পাহারা দিচ্ছে। দরজার কড়ায় একটা বড় তালা ঝুলছে। হ্যারি ভাইকিংরা পাহাদারদের ঘিরে ফেলল। পাহারাদাররা তো হতবাক। ওরা বুঝতেই পারলো না এরা কারা? কোত্থেকে এল? হ্যারি ইঙ্গিতে ওদের অস্ত্র ত্যাগ করতে বলল। ভয়ে ওদের তখন মুখ শুকিয়ে গেছে। ওরা তাড়াতাড়ি হাতের বর্শা ফেলে দিল। দড়ি দিয়ে ওদের হাত বাঁধা হলো। তারপর দরজার বাইরে বসিয়ে রাখা হলো। পাহারাদার একজনের কোমরে চাবির গোছা ঝুলছিল। হ্যারি এগিয়ে গিয়ে তার গলায় তরোয়ালের ধারালো মাথাটা ঠেকালো। ইঙ্গিতে বলল দরজা খুলে দিতে লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলে একপাশে সরে এলো। হ্যারি কয়েদঘরের মধ্যে ঢুকল চাপাস্বরে ডাকল—

ফ্রান্সিস - বিস্কো - শাঙ্কো। ফ্রান্সিস দরজা খোলার শব্দে ভেবেছিল খাবার লোকেরা বোধহয় এসেছে। হ্যারি আরেকবার ডাকল ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল এতো হ্যারির গলা। বিস্কো ঘুমুচ্ছিল, ওর-ও ঘুম ভেঙে গেলো। শাঙ্কোও হ্যারির গলা শুনে চাপাস্বরে বলে উঠলো—

হ্যারি আমরা এখানে, মশালের আলোয় হ্যারি ফ্রান্সিসদের দেখতে পেলো। শুকনো ঘাস ছড়ানো মেঝের ওপর দিয়ে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। তারপর হ্যারি তরোয়াল দিয়ে হাতের দড়ি কেটে দিলো। বিস্কো আর শাঙ্কোর হাতের দড়িও কেটে দিলো। ফ্রান্সিস বলল— তোমরা তাহলে খবর পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ, আমরা তিতিকাকা বনে এসেছিলাম। রাজপুত্র পিসকোজ তার উনকা সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজবাড়ি আক্রমণ করেছে, ওখানে বোধহয় লড়াই চলছে।

—আর সব বন্ধুরা? ফ্রান্সিস বলল।

—সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চলো।

—তার আগে এই কয়েদঘরে যে উনকা সৈন্যরা বন্দী রয়েছে ওদের মুক্ত করতে হবে। ফ্রান্সিস অন্য বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বলল। শাঙ্কো নিজের ঢোলা জামার মধ্যে থেকে বড় ছুরিটা বের করল। দ্রুত গিয়ে অন্য বন্দীদের হাত বাঁধা দড়ি কেটে দিল। যুদ্ধ বন্দীরা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলো।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের বাইরে এল। পেছনে অন্য সদ্যমুক্ত উনকা সৈন্যরা। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়াল। মেস্তিজো হেসে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের হাত ধরল।

—মেস্তিজো- আমাদের তরোয়াল তীর ধনুক কোথায় রাখা হ'য়েছে? মেস্তিজো বাঁ পাশে একটু দূরে ছোট ঘর দেখিয়ে বলল- ঐ যে অস্ত্রঘর। নিশ্চয়ই ওখানে রেখেছো ফ্রান্সিসরা অস্ত্রঘরের সামনে এল। ঘরটার দরজার সামনে মশাল জ্বলছে। দু'জন পাহারাদার বর্শা হাতে অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকার ফুঁড়ে খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের আসতে দেখে ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মেস্তিজো একটু দূর থেকে বলল— অস্ত্র ত্যাগ কর নইলে মরবে। ওরা দু'জন বর্শা ছুঁড়ে ফেলে অন্ধকার মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেল। বিস্কো একটা বর্শা তুলে দরজার তালা লাগানো লোহার আংটায় বর্শার মুখ ঢুকিয়ে প্রাণপণ চাড় দিল। কয়েকবার চাড় দিতেই একটা তালাটা খসে পড়ল। দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস ঢুকল। ঘরটায় মশাল জ্বলছিল। মশালের আলোয় দেখল একপাশে ওর আর বিস্কোর তরোয়াল দু'টো রাখা। পাশে শাঙ্কোর তীর ধনুক। ফ্রান্সিস, বিস্কো ও শাঙ্কো নিজেদের অস্ত্র নিল। সদ্য মুক্তি পাওয়া উনকা সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা বর্শাগুলোর ওপর। সবাই হাতে হাতে বর্শা নিল।

বাইরে এল সবাই। হ্যারি বলল— ফ্রান্সিস রাজপুত্র পিসকোজ উনকা সৈন্যদের নিয়ে রাজবাড়ি আক্রমণ করেছে। জানি না এখনো ওখানে লড়াই চলছে কি না।

চলো আমরা রাজবাড়ি যাই। আমরা রাজপুত্র পিসকোজের হ'য়ে লড়াই করবো। লুপাকা শাঙ্কোকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। একটি তরুণ উনকাকে রাজার আদেশে আমি করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখছি। মেস্তিজোর কাছে শুনেছি রাজা লুপাকা হত্যা, অত্যাচার, লুণ্ঠন এখানে কীভাবে চালিয়েছিল। কাজেই রাজা লুপাকাকে এসবের শাস্তি পেতে হবে। চলো- প্রয়োজনে আমরা লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বন্ধুদের তাকিয়ে এসব কথা বললো। ভাইকিং একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো -ও-হো-হো। সবাই রাজবাড়ির দিকে চলল।

রাজবাড়ির কাছে পৌঁছে দেখল উনকা সৈন্যরা রাজবাড়ি ঘিরে ফেলেছে। সবাই বর্শা হাতে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস মেস্তিজো বলল- তুমি রাজবাড়ির মধ্যে যাও কী ঘটেছে বুঝতে পারছি না। সব জেনে এস। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।

মেস্তিজো দ্রুতপায়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল। সৈন্যরা পথ ছেড়ে দিল।

ফ্রান্সিসরা খোলা তরোয়াল হাতে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মেস্তিজো ছুটতে ছুটতে এল। চিৎকার করে বলতে লাগল- ফ্রান্সিস আমাদের জয় হ'য়েছে। রাজা লুপাকা ও রানী রাজবাড়ির অন্দরবাড়ির বন্দী। রাজপুত্র পিসকোজ তোমাদের রাজবাড়ির ভেতরে আসতে অনুরোধ করেছে। ফ্রান্সিস ডাকল- হ্যারি?

—বলো।

—কী করবে এখন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। রাজপুত্র যেতে অনুরোধ করেছে। চলো। হ্যারি বলল।

—বেশ।

মেস্তিজো ওদের পথ দেখিয়ে রাজসভায় নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা দেখল সিংহাসন শূন্য। একটা সাধারণ পাথরের আসনে রাজপুত্র পিসকোজ বসে আছে। ফ্রান্সিসরা কাছে আসতে পিসকোজ ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। হেসে ফ্রান্সিসের ডান হাত জড়িয়ে ধরল। আমার বিপদে আপনারা সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। আমার পক্ষে যথেষ্ট। লড়াই শেষ হয়নি। পুজোর প্রাঙ্গনে- নগরে নানা জায়গায় চিমু সৈন্যরা ছড়িয়ে আছে। আমরা রাজবাড়ি দখল করেছি। রাজারানী। বন্দী এই সব সংবাদ ওরা ওখানে এখনো পায়নি। আমি আশঙ্কা করছি ওরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সংবাদ পাবে। তখন নিশ্চই রাজারানীকে মুক্ত করতে এখানে আসবে। তখন লড়াই হবেই রাজপুত্রের কথা শেষ হ'তে না হতেই উনকা সৈন্যদের দলপতি ছুটে রাজপুত্রের সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে গড় গড় ক'রে কী বলে গেল। রাজপুত্র মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর দলপতিকে কী যেন আদেশ দিল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—ফ্রান্সিস রাজপুত্র যা আশঙ্কা করেছিল তাই হ'য়েছে। পূজা প্রাঙ্গনে রাজবাড়ি দখল ও রাজারানী বন্দী এ সংবাদ পৌছে গেছে। চিমু সৈন্যরা সবাই সেখানে জড়ো হ'য়েছে ওরা রাজবাড়ির দিকে আসছে। লড়াই হবেই।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা যখনই মুক্ত হ'ল মেস্তিজো তখনই দু'জন উনকা সৈন্যকে পাঠিয়েছিল তিতিকাবনে। ওরা দুটো পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল। তিতিকায় বনের আস্তানায় পৌঁছল ওরা। স্ত্রীলোকদের যে ঘরে মারিয়া থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছিল সেখানে গেল ওরা। মারিয়াকে উনকা ভাষায় ফ্রান্সিসদের মুক্তিলাভের কথা বলল। কিন্তু মারিয়া ওদের উনকা ভাষা কিছুই বুঝল না। স্পেনীয় ভাষা বলতে পারে এমন কেউ সেখানে নেই। তবে সৈন্য দু'জন হেসে কথাগুলো বলেছিল। তা'তে মারিয়া বুঝল যে সংবাদ শুভ। সৈন্য দু'জনের নির্দেশমত মারিয়া একটা ঘোড়ায় উঠল। অন্য ঘোড়াটায় একজন সৈন্য উঠল। সে পথ দেখিয়ে মারিয়াকে মেস্তিজোর নির্দেশমত রাজবাড়িতে নিয়ে এল।

মারিয়া রাজবাড়ির সামনে এসে দেখল চিকামার অধিবাসীদের ভীষণ ভিড় রাজবাড়ির সামনে। সবাই আনন্দে চিৎকার হৈ হল্লা করছে। ঘোড়ায়চড়া মারিয়াকে দেখে ওরা যাওয়ার পথ ক'রে দিল। রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে মারিয়া ঘোড়া

থেকে নামল। সঙ্গী সৈন্যটি মারিয়াকে রাজসভাগৃহে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা মারিয়াকে দেখে চিৎকার করে উঠল। ও-হো-হো। ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। মারিয়া ফ্রান্সিসকে দেখল। হাসতে হাসতে ছুটে এসে ফ্রান্সিসের বাঁ হাতটা জড়িয়ে ধরল। সুস্থ মারিয়াকে দেখে ফ্রান্সিসও খুশি। বলল- মারিয়া- লড়াই কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। চিমু সৈন্যরা রাজবাড়ি আক্রমণ করতে আসছে। তুমি অন্তঃপুরে যাও। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল- না- অমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো।

—বেশ তবে আমার বন্ধুদের পাশে থাকবে। অন্য কোথাও যাবে না।

—আচ্ছা মারিয়া বলল।

ওরা কথা বলছে তখনই বাইরে থেকে হৈ হল্লা শোনা গেল। পিসকোজ গলা চড়িয়ে বলে উঠল মেস্তিজো নিশ্চয়ই চিমু সৈন্যরা এসে গেছে। আমাদের সৈন্যরা তৈরি তো?

হ্যাঁ- আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। মেস্তিজো বলল- মেস্তিজো রাজপুত্রের সঙ্গে ওর যা কথা হ'ল তা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস এবার রাজপুত্রকে বলল যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমি কয়েকটা কথা বলবো।

—বেশ বলুন।

—দেখুন চিমু সৈন্যরা এসে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা আক্রমণ করতে পারে। যাতে আরো মানুষেব মৃত্যু না হয়, রক্তপাত না হয় তার জন্য আমি একবার চেষ্টা করতে চাই। আশা করি আপনি আমাকে সেই সুযোগ দেবেন। রাজপুত্র ভাবল। বলল—কী ভাবে?

—রাজা লুপাকা ও রানীকে তাহ'লে মুক্তি দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—অসম্ভব। রাজপুত্র বলল।

আমি বলি সম্ভব। আজকে সুযোগ এসেছে চিমু রাজ্য আর মোচিকা রাজ্যের এতদিনের শত্রুতা দূর করার। ফ্রান্সিস বলল।

—কী ভাবে? রাজপুত্র বলল।

অপার মহানুভবতা দিয়ে। শুধু আপনি এইটুকু মহানুভবতা দেখান যে যাকে আপনি অনায়াসে হত্যা করতে পারবেন সেই রাজা লুপাকাকে মুক্তি দিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু এতে কি লড়াই এড়ানো যাবে- দু'রাজ্যের শত্রুতা দূর হবে? রাজপুত্র বলল।

সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি শুধু রাজা লুপাকা আর রানীকে মুক্তি দিতে সম্মত হোন। ফ্রান্সিস বলল।

রাজপুত্র একবার মেস্তিজোর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিসের কথাগুলো মেস্তিজোর খুব ভালো লাগল। সত্যিই তো। শুধু লড়াই হত্যা রক্তপাত কখনও মানুষের ভালো করতে পারে না। মেস্তিজো উনকা ভাষায় বলল- রাজপুত্র আপনি ফ্রান্সিসকে একটা সুযোগ দিন। হয়তো এতে আমাদের ভালোই হবে। রাজপুত্র ফ্রান্সিসকে

বলল- বেশ- রাজা লুপাকা আর রানীকে মুক্তি দেব। কিন্তু সৈন্যরা যদি তারপরেও লড়াই করতে চায়?

তা'হলে লড়াই হবে। রাজা লুপাকা আর রানীকে যাবজ্জীবন এখানে বন্দী হ'য়ে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল বেশ দেখুন চেষ্টা করে। রাজপুত্র বলল।

ওদিকে রাজবাড়ির সামনে তখন চিমু সৈন্যরা এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে বলছে রাজা রানীকে মুক্তি দাও। নইলে চিকামার সবাইকে আমরা মেরে ফেলবো।

ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে ডাকল। বলল-তুমি আমার সঙ্গে বাইরে চলো। মেস্তিজো একটু ভয় পেল। ফ্রান্সিস হেসে বলল- ভয় নেই চলো।

ওরা দুজনে বাইরে রাজবাড়ির সদর দেউড়ির কাছে এল। মশালের আলোয় দেখল চিমু সৈন্যরা বর্শা হাতে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দলপতি হুকুম দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ফ্রান্সিস এদিক ওদিক তাকাল। দেখল দেউড়ির পাশে একটা উঁচু পাথরের চৌকোনো চাঁই। ফ্রান্সিস বলল- মেস্তিজো তুমি এই পাথরের চাঁইয়ে উঠে দাঁড়াও। ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে পাথরের চাঁইতে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। মেস্তিজো চিৎকার ক'রে বলল- সবাই শান্ত হও। আমার কথা শোন। চিৎকার চ্যাঁচামেচি বন্ধ হল। এবার নিচে থেকে ফ্রান্সিস যা বলতে লাগল মেস্তিজো উনকা ভাষায় তা চিৎকার ক'রে বলতে লাগল- চিকামার অধিবাসী ভাই বোনেরা একটা লড়াইয়ের মুখোমুখি আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। একদিকে চিমু সৈন্যরা তৈরি হয়েছে রাজবাড়ি আক্রমণ ক'রে রাজা লুপাকা ও রানীকে মুক্ত করার জন্যে, অন্যদিকে উনকা সৈন্য আর আমার বীর ভাইকিং বন্ধুরা প্রস্তুত তাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। এই পরিস্থিতিতে আমি চিকামার ভাই বোনদের অনুরোধ করছি তোমরা এখান থেকে যে যার বাড়ি যাও। আমরা চাই না যে নিরীহ চিকাম্যবাসীরা এই লড়াইয়ের সময় মারা যাক বা আহত হোক মেস্তিজো থামল। চিকামাবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। তারা আস্তে আস্তে সেই জায়গা থেকে চলে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সাধারণ লোকজন খুব সামান্য রয়েছে। এবার বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়ানো সারিবদ্ধ চিমু সৈন্যদের স্পষ্টই দেখা গেল। ফ্রান্সিসের কথা মেস্তিজো আবার চিৎকার করে বলতে লাগল আমার চিমু ভাইয়েরা আমরা এখানে বিদেশী। তবু আমরা চাই যে এই শান্তি পূর্ণ চিকামা নগরে যেন আর লড়াই না হয়। আমি রাজপুত্র পিসকোজকে অনুরোধ করেছি উনি যেন রাজা লুপাকা আর রানীকে মুক্তি দেন। তিনি সম্মত হ'য়েছেন। রাজা রানী একটু পরেই রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবেন। চিমু সৈন্য ভাইদের অনুরোধ করছি মুক্ত রাজা রানীকে নিয়ে তারা যেন নিজেদের চিমু রাজ্যে ফিরে যায়। অযথা রক্তপাত আমরা চাই না। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—ওরা বলছে ওরা লড়াই করে রাজা রানীকে মুক্ত করবে। ফ্রান্সিস আবার মেস্তিজো মারফৎ বলতে লাগল— যদি চিমু সৈন্য ভাইয়েরা আমার এই অনুরোধ না রাখো যদি তোমরা লড়াই করতে নামো তা'হলে তোমরা কেউ জীবিত অবস্থায় চিমুরাজ্যে

ফিরে যেতে পারবে না। আমরা ভাইকিং। লড়াইয়ে যে আমরা হার স্বীকার করতে শিখিনি। এখন ভেবে দেখ তোমরা মৃত্যু চাও না জীবিত অবস্থায় রাজা রানীকে নিয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে যেতে চাও? মেস্তিজো থামল। চিমু সৈন্যরা এবার চুপ করে রইল। দেখা গেল ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ফ্রান্সিসের কথা আবার মেস্তিজো বলতে লাগল- রাজা লুপাকার আদেশে তোমরা চিকিমাবাসীদের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছিলে তা তোমরা ভালো ক'রেই জানো। রাজা লুপাকা নির্মম হৃদয়হীন। তবু রাজপুত্র পিসকোজ তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সম্মত হ'য়েছেন রাজা লুপাকাকে ও রানীকে মুক্তি দিতে। এর পরেও তোমরা কি শান্ত সংযত হবে না? চিমু সৈন্যরা আস্তে আস্তে উদ্যত বর্শা নামাল। ওরা বুঝল এই অবস্থায় লড়াই করতে গেলে ওদের জীবন বিপন্ন হবে। মুক্ত রানীকে নিয়ে ফিরে যাওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। ওদের মনোভাব ফ্রান্সিস বুঝতে পারল। মেস্তিজোকে বলল- অন্দরে যাও। রাজপুত্রকে বলো রাজা লুপাকা আর রানীকে মুক্তি দিতে। মুক্ত রাজা রানীকে নিয়ে চিমু সৈন্যরা নিজেদের রাজ্যে চলে যাক। মেস্তিজো দ্রুতপায়ে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পরে দুটো ছোট ঘোড়া রাজবাড়ির দেউড়িতে এনে রাখা হ'ল। রাজবাড়ি থেকে প্রথমে রাজপুত্র পিসকোজ বেরিয়ে এল। পেছনে রাজা লুপাকা ও রানী দুজনে এসে ঘোড়া দু'টোর সামনে দাঁড়াল। রাজপুত্র তাদের ঘোড়ায় উঠে বসতে সাহায্য করল। রাজারানীকে নিয়ে ঘোড়া দুটো চিমু সৈন্যদের দিকে চলল। তখন ফ্রান্সিস মেস্তিজোর মারফৎ বলল রাজা লুপাকা রাজপুত্র পিসকোজ আপনাদের মুক্তি দিয়ে যে মহানুভবতা দেখালেন আশা করি আপনি তা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্মরণে রাখবেন। ভবিষ্যতে আর কোনদিন মোচিকা রাজ্য আক্রমণ করতে আসবেন না। আপনাদের দুই রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা চিরদিনের জন্য দূর হোক- আমরা এই কামনা করছি। রাজা লুপাকা একবার শুধু ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর যেমন মাথা নিচু ক'রে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সেভাবেই মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে ঘোড়া চালাতে লাগল। চিমা সৈন্যরা রাজা লুপাকার জয়ধ্বনি দিল। তবে সেই জয়ধ্বনি খুব জোরালো শোনাল না। চিমু সৈন্যরা দু'ধারে সার দিয়ে দাঁড়ালো। মাঝখানে রইল ঘোড়ায় চড়া রাজা লুপাকা ও রানী। ওরা আস্তে আস্তে উত্তর মুখো চিমু রাজ্যের দিকে যাত্রা শুরু করল। কিছুক্ষণ উপস্থিত সবাই সেদিকে তাকিয়ে রইল। রাজা রানীকে নিয়ে চিমু সৈন্যরা কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল।

রাতে রাজবাড়ির অন্দরমহলে খাবার ঘরে ফ্রান্সিসরা খেতে বসল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে স্বর্ণমূর্তির সব কথা বলল। একবার চেষ্টা ক'রে খোঁজ পায়নি তাও বলল। তারপর খেতে খেতে বন্ধুদের উদ্দেশে বলল- ভাইসব-হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে আমি, বিস্কো আর শাঙ্কো এখানে এসেছিলাম। সেই স্বর্ণমূর্তি এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। হিসেবে একটু গরমিল হচ্ছে তাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সেই স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবো। তাই বলছিলাম- তোমরা কাল সকালে জাহাজে ফিরে যাও। এখানে আমি হ্যারি আর বিস্কো থাকবো।

আমরা কয়েকদিনের মধ্যে কাজ সেরে জাহাজে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস আসতে মারিয়া বলে উঠল- আমিও থাকবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল- বেশ তুমিও থাকবে। এমনিতেই ভাইকিং বন্ধুদের মন খারাপ। একটা লড়াই হ'তে হ'তে হ'ল না। ওরা আর এখানে থাকতে চাইছিল না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল- সমুদ্রতীরে আমাদের জাহাজটা অরক্ষিত অবস্থায় আছে। কোন জলদস্যু এসে যদি জাহাজে চুরি করে নিয়ে যায় তাহ'লে আমরা এই বিদেশে ভীষণ বিপদে পড়বো। কাজেই কাল সকালেই তোমরা জাহাজে ফিরে যাও। ভাইকিং বন্ধুরা কেউ আর কোন আপত্তি করল না। ওরা নিঃশব্দে খেতে লাগল।

সেই রাতে সবাই রাজবাড়িতে অতিথি সমাদরে রইল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিসরা বাদে আর সব ভাইকিংরা সমুদ্রতীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ফ্রান্সিস, হ্যারি, মারিয়া, বিস্কো, শাঙ্কোকে নিয়ে পুরোনো আস্তানায় চলে এল। মেস্তিজো ঐ আস্তানাতেই ছিল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস ভেড়ার চামড়ায় কালি কলম নিয়ে অঙ্ক কষতে বসল। অঙ্ক করে আর কাটাকাটি করে।

মারিয়া ফ্রান্সিসের সেই ভেড়ার চামড়ায় লেখা অঙ্কের সংখ্যা দেখে বলল 'কী ব্যাপার তুমি কি পড়াশোনা শুরু করলে এই বুড়ো বয়সে?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল- 'মারিয়া তুমি তো জানো- পড়াশুনার সময়টা কেটেছে আমার বিচিত্র সব অভিযানে।'

-'কী যে বল ফ্রান্সিস? তোমাদের মতো মানুষ একটা জাতির গর্ব। পড়াশুনো তোমার না হয় নাই হলো।' মারিয়া বলল।

-'আজকে কিন্তু একটু দুঃখই হচ্ছে। এই দেখ একটা সাধারণ হিসেব মেলাতে পারছি না।' ফ্রান্সিস বলল।

-'ঠিক আছে আমাকে দাও। আমি মিলিয়ে দিচ্ছি।' মারিয়া বলল।

তখন ফ্রান্সিস মূর্তির কপালে উৎকীর্ণ অঙ্কের সংখ্যা, দাঁতের সংখ্যা, চার-এর পার্থক্য ধরে চার নম্বর দাঁত ভাঙা এবং কিছুই না পাওয়া সমস্ত ব্যাপারটাই বলল। মারিয়া মন দিয়ে শুনল। তারপর চামড়ায় লেখা অঙ্কের সংখ্যাগুলো দেখে বলল - 'ফ্রান্সিস, তুমি একভাবে হিসেব করেছো। হিসেবটা অন্যভাবেও হয়। তুমি পার্থক্য ধরেছো চার-এর। কিন্তু তিন-এর পার্থক্যটাই বোধ হয় ঠিক।'

-'তাহলে তিন সংখ্যার দাঁত?

-'না। কারণ চার নম্বর দাঁতে নিশ্চয়ই খোঁদল পেয়েছো?

-হ্যাঁ পেয়েছি।'

-'তাহলে সেই সঙ্গে তিন সংখ্যার দাঁতের খোঁদলটাও কাছাকাছি রয়েছে। তিন সংখ্যার দাঁতে মূর্তি লুকানো থাকলেও নিশ্চয়ই তার সামান্য অংশ হলেও দেখতে পেতে। ফ্রান্সিস তিন সংখ্যা নয়।'

-'তাহলে?' ফ্রান্সিস বেশ সমস্যায় পড়ল।

-'আচ্ছা, মূর্তির কপালে আর কোন চিহ্ন ছিল?' মারিয়া বলল।

-'না।'

-'কিন্তু আমার মনে হয় অঙ্কের সংখ্যাগুলোর কী ভাবে হিসেব হবে, মানে যোগ হবে না বিয়োগ হবে এরকম কোন ইঙ্গিত ওখানে নিশ্চয়ই আছে। রাজা কোলা নিশ্চয়ই কিছু চিহ্ন রেখেছেন।' মারিয়া বলল।

-'সেটা তাহলে আর একবার দেখতে হয়। তুমিও চলো। 'ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চলল হুয়াকার বেদীর উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছে মেস্তিজো মই বেয়ে উঠতে লাগল। ওর মনে তখনও সংশয়। ভালো করে দেখতে লাগল। অঙ্কগুলো ছাড়িয়ে একটু দেখা গেল অস্পষ্ট একটা চিহ্ন। এই চিহ্নটা উনকাদের ভাষায় যোগচিহ্ন। মেস্তিজো অবাক হলো। ও মনে মনে মারিয়ার বুদ্ধির প্রশংসা করল। মই বেয়ে দ্রুতই নেমে এল। ফ্রান্সিসরা সবাই এসে ওকে ঘিরে ধরল। মেস্তিজো মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল-'রাজকুমারী মারিয়া, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। অঙ্কগুলোর পরে একটা অস্পষ্ট যোগচিহ্ন আছে।' মারিয়া খুশির চোটে লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস বলল-'কিন্তু মারিয়া এখন করবে কি করে। চামড়া কালি কলম তো আনিনি।'

-'এই সামান্য হিসেবের জন্যে ওসবের প্রয়োজন নেই।' মারিয়া বলল। তারপর হুয়াকা দেবতার বেদীর সিঁড়িতে বসল। একটা লাল পাথরের টুকরো নিল। সব সংখ্যাগুলো লিখল। ফ্রান্সিসরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। মারিয়া সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল- 'সব সংখ্যা যোগ করলে হয় চল্লিশ। কিন্তু দাঁতের সংখ্যা ষোল। হবে না। যে সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তা ষোলোর কম কোনো সংখ্যা।' তারপর মারিয়া সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে নানাভাবে হিসেব করতে লাগল। কিন্তু নিচের সংখ্যা পেল না। ও ভাবল- আচ্ছা যদি প্রত্যেকটি পার্থক্যের সংখ্যাকে যোগ করি । ও বেদীর সিঁড়িতে এইবাবে লিখল-

০ - ৪ = ৩
৪ - ৮ = ৩
৮ - ১২ = ৩
১২ - ১৬ = ৩

নিচে টান দিয়ে লিখল — ১২

ফ্রান্সিস বলল- 'তিন সংখ্যা কিভাবে পেলে।'

মারিয়া বলল- 'শূন্য থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যা বাদ দিলে পার্থক্য হয় ৩ অঙ্কের। যেমন শূন্য বাদ ১ ২ ৩ = ৩ সংখ্যা তেমনি ৪ বাদ ৫ ৬ ৭ ৩ সংখ্যা। এভাবে পার্থক্যগুলো যোগ করেই পাই - ১২ সংখ্যা।

মারিয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেলল। চেঁচিয়ে বলল ফ্রান্সিস, বারো সংখ্যার দাঁত।

ফ্রান্সিস ডাকল - 'মেস্তিজো, হাতুড়ি ছেনি নিয়ে চলো।'

দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। মূর্তির মুখের কাছে এসে দুজনে দাঁড়াল। বিকেলের সূর্যের লালচে আলো পড়েছে মূর্তিটায়। ওদিকে নিচের প্রাঙ্গণে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। অবাক চোখে দেখছে ফ্রান্সিসদের কাণ্ড। নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। হয়তো মূর্তিটা এভাবে নষ্ট করছে ভিনদেশিরা ওদের পছন্দ নয়।

মেস্তিজো দাঁতের ওপরের পাটি থেকে গুনে বারো সংখ্যার হাতুড়ি ছেনি চালাল। বার কয়েক হাতুড়ি ঠুকে ছেনি চালাতেই দাঁতের সামনের পাথরের আস্তরণ খুলে এল। দেখা গেল। হুয়াকা দেবতার সেই আসল স্বর্ণমূর্তি। খোঁদলে বসানো। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে সেই মূর্তির চোখে মুখে গায়ে। ঝিকিয়ে উঠছে মূর্তির গা, দু'ছোখে নীলকান্ত মণি, মাথায় কারুকাজ করা মুকুট, গায়ে অলঙ্কার। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখতে লাগল মূর্তিটা। একটু পরে ফ্রান্সিস বলল 'মেস্তিজো, আমি বিধর্মী। তোমাদের দেবমূর্তির গায়ে হাত দেব না। তুমি একা মূর্তিটা নিয়ে নামতে পারবে?

-'পারবো। কাঁধে নিয়ে নামবো। কথাটা বলে মেস্তিজো প্রথমে স্বর্ণমূর্তির সামনে কিছুক্ষণ মাথা নত করে রইল। মুখে বিড়বিড় করে কী বলল। তারপর মূর্তিটা খোঁদল থেকে বের করে কাঁধে তুলে নিল। এবার নিচে দাঁড়ানো চিকামার অধিবাসীরা মূর্তিটা দেখতে পেল। সবাই নিঃশব্দে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মাথা নুইয়ে রইল। চারিদিকে এত লোক। কোনো শব্দ নেই কারো মুখে।

প্রথমে ফ্রান্সিস মই থেকে নেমে এল। বিস্কো আর শাঙ্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল- কৃতিত্ব আমার নয়,মারিয়ার। ওর অঙ্কের হিসেব ছিল নির্ভুল। মারিয়াও হেসে বলল-কিন্তু সন্ধানের সূত্র তুমিই দিয়েছিলে। সব কৃতিত্ব তোমার।' ফ্রান্সিস হাসল। কোনো কথা বলল না।

মেস্তিজো স্বর্ণমূর্তি কাঁধে নিয়ে মই থেকে নামল। ফ্রান্সিসকে বলল-' এই মূর্তি নিয়ে কী করবো এখন?'

-'তোমাদের দেবতা, সেটা তোমাদের ব্যাপার। আমার কাজ ছিল মূর্তি উদ্ধার, তা আমি করে দিয়েছি। এখন আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।' ফ্রান্সিস বলল।

-'স্বর্ণমূর্তিটা তোমরাই নিয়ে যাও না। রাজা লুপাকার হাতে পড়লে ও হয় মূর্তিটা গলিয়ে ফেলবে নয় তো নিজেদের রাজ্যে নিয়ে যাবে।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস হেসে মাথা নেড়ে বলল- স্বর্ণমূর্তির ওপর আমাদের কোনো লোভ নেই। তোমাদের উপাস্য দেবতার মূর্তি। তোমাদেরই থাকবে। ' ওদিকে আসল স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে এই সংবাদ যুবরাজ পিসকোজের কাছে পৌঁছল। যুবরাজ ঘোড়ায় চেপে এল। আসল স্বর্ণমূর্তি দেখে যুবরাজ খুশিতে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। বারবার বলতে লাগল 'আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।'

-'ও কথা বলবেন না' ফ্রান্সিস বলল- মানুষ হিসেবে আমি আমার কর্তব্য

করেছি মাত্র।

যুবরাজ এবার আমাদের যাবার অনুমতি দিন। আমরা দেশে ফিরবো।

-সে কী ক'রে হয় ফ্রান্সিস। আগামী পূর্ণিমা পাঁচদিন পরে। সেদিন আমার রাজ্যাভিষেক হবে। সেই আনন্দ উৎসরে আপনারা থাকবেন না তাও কি হয়?

রাজপুত্র বলল।

উপায় নেই যুবরাজ, আমরা অনেকদিন দেশ ছাড়া। আমরা কালকেই দেশের দিকে যাত্রা করবো। রাজপুত্র চুপ ক'রে রইল। কী বলবে আর।

ফ্রান্সিস এবার মেস্তিজোর দিতে তাকাল। বলল -'মেস্তিজো, মূর্তি বেদীতে রেখে তুমি চলো আমাদের পথ দেখিয়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাবে।'

মেস্তিজো স্বর্ণমূর্তিটা কাধেঁ নিয়ে বেদীতে উঠল। কাঠের মূর্তির পাশে রাখল। মাথা নুইয়ে ভক্তি জানিয়ে নেমে এল। ততক্ষণে মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া উনকারা আনন্দে নাচানাচি শুরু করেছে। রাজা লুপাকাও খুশি।

সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মেস্তিজো। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা দেখল চিকামাবাসীরা দলে দলে হুয়াকা দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে চলেছে। হাতে তাদের ফুলপাতা। আনন্দে হাসছে ওরা। এতদ্দিন পরে আসল স্বর্ণমূর্তি পাওয়া গেছে। ফ্রান্সিস এই ভেবে খুশি হলো এতগুলো মানুষের মুখে ও হাসি ফোটাতে পেরেছে।

মরুভূমির পথ নয়। অন্য পাহাড়ী পথে মেস্তিজো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওদের সমুদ্র তীরে পৌঁছে দিল। জাহাজে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস ডাকল-'মারিয়া।'

'বলো।'

-'এবারও আমাদের হাত শূন্য।' ফ্রান্সিস বলল।

-'তা হোক। এজন্য আমার মনে কোনো দুঃখ নেই,' মারিয়া বলল।

সমাপ্ত